নীতিবিদ্যার রূপরেখা

[কলিকাতা, বর্ধমান ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের
ত্রিবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর জন্য]

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ

নলেজহোম • কলিকাতা-৬

৫৭, বিধান সরণি (কর্নওয়ালিস স্ট্রীট)

প্রকাশক :
শ্রীশান্তিকুমার মজুমদার, বি. এ.
নলেজ হোম
৫১, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৬৩

প্রচ্ছদশিল্পী :
সমীর রায়চৌধুরী

মুদ্রণে
বেঙ্গল প্রিন্টার্স
১১৭।১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि
वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि
बलमसि बलं मयि धेह्यो—
जोऽस्योजो मयि धेहि
मन्युरसि मन्युं मयि धेहि
सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥

"হে পরাৎপর পরমাত্মা! তুমি তেজস্বী, তোমার সেই অপরিমেয় তেজ আমাদের দাও, তুমি বীর্যবান্, তোমার সেই বীর্য আমাদের ভিতর স্থাপন কর, তুমি বলবান্, আমাদিগকে বলী কর। তুমি ওজস্বী, তোমার ওজস্বিতায় আমাদিগকে প্রবুদ্ধ কর, তুমি অধর্মের দণ্ডদাতা, অন্যায়কারীর শাস্তা, তোমার সেই অপরাজেয় দণ্ডশক্তি আমাদের মাঝে স্থাপন কর। তুমি চিরসহিষ্ণু—তোমার সেই ধৃতবীর্য সহিষ্ণুতা আমাদিগের অন্তরে উদ্দীপ্ত কর।"

উৎসর্গ

উৎসুক ও শ্রদ্ধাশীল আমার মানস-সন্তানদের উদ্দেশ্যে

গ্রন্থকারের নিবেদন

গতবৎসর আমার আত্মীয়া অধ্যাপিকা শান্তি দত্ত এম. এ., ডিপ্. এড্. (লণ্ডন) (বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের প্রধানা শিক্ষা-পরিদর্শিকা) ও জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ এম. এ., এম. এড.(সিড নী)র সহযোগিতায় মনোবিদ্যার রূপরেখা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে আনন্দের বিষয় যে পুস্তকখানা বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক-অধ্যাপিকার উচ্চপ্রশংসা লাভ করিয়াছে, বিভিন্ন সংবাদপত্রে অভিনন্দিত হইয়াছে, এবং অনেক মহাবিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদিত হইয়াছে। শীঘ্রই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবে।

ভগবদনুগ্রহে এই বৎসর "নীতিবিদ্যার রূপরেখা" ও "সমাজ-দর্শন" যুগপৎ প্রকাশিত হইল। ত্রিবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর দর্শন শাস্ত্রের ছাত্রছাত্রীদের কাছে, এই দুইটি বিষয় মিলাইয়া সম্পূর্ণ দ্বিতীয় পত্র। এ বই দুখানা পৃথক পৃথক বাঁধাই পাওয়া যাইবে। যাহারা এক সঙ্গে বাঁধাই বই কিনিবে তাহাদের, এক টাকা কম পড়িবে।

ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য অধ্যাপনার কার্য হইতে অবসর গ্রহণ কালে, এই দুঃখই মনকে সকলের চেয়ে বেশী পীড়া দিতেছিল যে ছাত্রছাত্রীদের প্রাণপূর্ণ আনন্দিত সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইলাম। আমার দীর্ঘ-শিক্ষক জীবনের সাধনার পরিণত ফল সেই প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের কাছে আজ পৌঁছাইয়া দিতে পারিলাম, ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা ও আনন্দ।

নীতিবিদ্যা সম্পর্কে সুলিখিত দেশী ও বিদেশী বইয়ের অভাব নাই। তথাপি সহজ সরস করিয়া এই বিদ্যার মূল কথাগুলি আলোচনা করিবার প্রয়োজন আজও আছে ইহা বিশ্বাস করি। তাই এই প্রয়াস। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় শিখিয়াছি যে, সহজ করিয়া বলাই সব চেয়ে কঠিন কাজ। ইহাও দেখিয়াছি যে তত্ত্বকথা পরিচিত জীবনের উদাহরণের সঙ্গে যুক্ত করিয়া পরিবেশন করিলে তবেই তাহা ছাত্রছাত্রীরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। সর্বত্রই সেই চেষ্টা করিয়াছি যাহাতে বিষয়টি তাহাদের কাছে পরীক্ষা পাসের জন্য প্রয়োজন শুষ্ক ও ভীতিজনক মনে না হয়, যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে যে নীতিবিদ্যার বা সমাজবিদ্যার আলোচনা বাস্তব জীবনের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত। ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভারতীয় আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী তুলিয়া ধরিতেও সর্বত্র চেষ্টা করিয়াছি। পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত না হইলেও, উপনিষদ-বেদান্তের আদর্শ, বিবেকানন্দের আদর্শ, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আদর্শ

আলোচনা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার আদর্শ কিছুটা বিস্তারিত ভাবেই আলোচনা করিয়াছি। ভারতীয় অন্য কোন কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এসব আলোচনা পাঠ্যসূচীভুক্ত।

যাঁহারা আমাকে সেবা দ্বারা, প্রীতিদ্বারা, স্নেহ ও শ্রদ্ধা দ্বারা এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনে সাহায্য করিয়াছেন, কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদের সকলকেই স্মরণ করি এবং তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করি।

আমার পুরাতন সহকর্মী অধ্যাপক প্রধান শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায় (যোগমায়া দেবী কলেজ), অধ্যাপক-প্রধান শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (আশুতোষ কলেজ) কাছে তাঁহাদের সতত অনুজোপম প্রীতি, শ্রদ্ধা ও সদুপদেশের জন্য আমি গভীর স্নেহের ঋণে আবদ্ধ। অধ্যাপিকা প্রতিমা সেন (যোগমায়া দেবী কলেজ) ও শ্রীমতী বাধারাণী সেন বি. এ., ছাপার পূর্বেই কয়েকটি অধ্যায় পাঠ করিয়া, এবং আলোচনা করিয়া আমাকে সহায়তা করিয়াছেন। দুজনেই আমার কন্যা সমানা, দুজনকেই আন্তরিক আশীর্বাদ জানাই।

এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালে—বহু দেশী ও বিদেশী লেখকের গ্রন্থ হইতে অকৃপণ ভাবে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি, ইহা বলাই বাহুল্য এবং সর্বত্রই যথাস্থানে ঋণ স্বীকার করিয়াছি। বিদেশী গ্রন্থকারদের মধ্যে—Muirhead, Lillie ও Rashdallএর নিকট আমার ঋণ সমধিক। বাঙ্গালী গ্রন্থকারদের মধ্যে P. B. Chatterjee, Dr J. N. Sinha ও Mitraর বই পাঠেও উপকৃত হইয়াছি।

আশা করি আমার পূর্বপ্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ সহকর্মীদের নিকট যে আনুকূল্য লাভ করিয়াছে, এই দুখানা পুস্তকও অনুরূপ আনুকূল্য লাভে সমর্থ হইবে। বই দুখানার উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাঁহাদের মতামত ও সদুপদেশ সাদরে আমন্ত্রণ করিতেছি।

পুস্তক দুখানা যথাসময়ে সুমুদ্রিত করিয়া প্রকাশের ব্যাপারে প্রকাশক শ্রীশান্তিকুমার মজুমদার ও তাঁহার সহকর্মীরা যে অনলস পরিশ্রম করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

বিনীত—

বিভুরঞ্জন গুহ

৭ জে, এস্. আর. দাশ রোড
কালিঘাট
কলিকাতা—২৬

১৫.৬.৬৩

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

CALCUTTA UNIVERSITY

SYLLABUS

ETHICS

Group A : Full marks—50

Definition and province of Ethics. Nature and utility of the study of Ethics.

Relation of Ethics to Psychology, Sociology, Politics and Metaphysics, Morality and Religion.

Actions : Moral and Non-moral.

Analysis of voluntary action ; Desire and End ; Motive and Intention.

Nature and object of moral judgment. Moral Sentiment. The moral faculty. Conscience and Prudence.

Moral obligation ; Nature and Grounds. Different Theories.

The leading Ethical Standards : Hedonism, Rationalism, Intuitionism and Perfectionism. Karma-yoga as a moral Ideal in Bhagavat Gita.

The sanctions of morality. The Moral Law. Sense of Duty.

Postulates of moral judgment ; Reason, Personality, Self-determination.

Duties and virtues : Their classification, Conflict of duties. Sin and Error. Theories of Reward and Punishment.

Growth of character. The Moral Ideal.

BURDWAN UNIVERSITY

SYLLABUS

ETHICS

Group A : Full marks—50

Definition, province and End of Ethics.

Relation of Ethics to Psychology, Sociology, Politics and Metaphysics, Morality and Religion.

Actions : Moral and Non-moral.

Analysis of voluntary action ; Psychological basis of Ethics. *e.g.* Desire and End ; Motive and Intention.

Nature and object of moral judgment. Moral Sentiment.

Moral obligation ; Nature and Grounds. Different Theories.

The leading Ethical Standards : Hedonism, Rationalism, Intuitionism and Perfectionism.

The sanctions of morality. The Moral Law.

Postulates of moral judgment ; Reason, Personality, Self-determination.

Duties and Virtues : Their classification, conflict of duties. Sin and Error. Theories of Punishment.

প্রথম অধ্যায়

[The Ethical point of view—nature of Ethics—definition of Ethics—Ethics not a positive science, but a normative science—Is Ethics a practical science? Value of Ethics—Good and the Right—Is Ethics an art?—Ethics a science or philosophy? Scope of Ethics.]

একজন ইংরেজ দার্শনিক হবস্ (Hobbes—1588-1679) এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, মানুষ স্বার্থপর জীব এবং তাহার সমস্ত ক্রিয়াই স্বার্থবুদ্ধিদ্বারা চালিত হয়। পরস্পরের স্বার্থ যাহাতে রক্ষিত হয়, সকলে শান্তিতে নিজ নিজ সম্পদ ভোগ করিতে পারে, সে জন্যই সে সমাজ গড়ে, রাষ্ট্রশাসন প্রবর্তন করে। অর্থবিদ্যাবিদ্‌রাও বলেন মানুষ স্বার্থের খাতিরে যে সমস্ত সম্পর্ক স্থাপন করে, যে সমস্ত কর্মে প্রবৃত্ত হয়, যে সব বিধিব্যবস্থা মানিয়া চলে, তাহার আলোচনাই তাঁহাদের বিজ্ঞানেব বিষয়বস্তু। তাঁহারা মানুষকে স্বার্থবুদ্ধিচালিত, উৎপাদন, বন্টন ও ভোগে নিরত, সাংসারিক লাভক্ষতি-সচেতন প্রাণী হিসাবেই দেখেন। তাঁহারা তাঁহাদেব বিজ্ঞানেব বিষয়বস্তু হিসাবে যে মানুষকে দেখেন তাঁহার নাম দিয়াছেন—'the economic man'—'অর্থনৈতিক মানুষ'।

অর্থবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী

কিন্তু মানুষ কি শুধুই স্বার্থপর প্রাণী? শুধুই লাভ-লোকসানের হিসাব করিয়া তাহার সমস্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে? তুমি বেড়াইতে বাহির হইয়াছ, দেখিলে, মা রুগ্ন শিশুর সেবা করিতেছেন, বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ দেশের জন্য প্রাণ দিতে আগাইয়া যাইতেছেন, পথের ভিখারী অন্য এক ক্ষুধার্ত কাঙ্গালের মুখে নিজের কষ্টলব্ধ অন্ন তুলিয়া দিতেছে, তখন কি তুমি এই হিসাবই কর—কতটা লাভের আশায়, ইহারা এ সমস্ত কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছে? বাস্তবিকপক্ষে লাভের আশায়ই কি মানুষ সব কাজ করে? আমরা কি সব সময়ই হিসাবের খাতা ও পেন্সিল পকেটে রাখি,—আর কোন কাজে প্রবৃত্ত হইবার আগেই অঙ্ক কষিয়া হিসাব করিতে বসি, কতটা লাভ, বা কতটা লোকসান হইবে? এবং তাহার পর, লাভের পরিমাণ অনুযায়ীই কাজ করি? মানুষ স্বার্থপর ইহা সত্য, কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে ইহাই একমাত্র সত্য নয়। মানুষ অত্যন্ত 'পাজী জাত' হইতে পারে, কিন্তু এত বড় 'পাজী' সে নয় যে, নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই সে দেখে না। মানুষ স্বার্থ যেমন চেনে, স্বার্থ ত্যাগ

করিতেও সে জানে। তাহা না হইলে পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হইত। বাস্তবিক পক্ষে অর্থনীতির মানুষ একটা অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌সান্—ইহা মানুষের একটা দিক মাত্র। ইহা সমস্ত গোটা মানুষের চিত্র নয়। মানুষ সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞান আছে। প্রত্যেক বিজ্ঞানই মানুষের এক একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক বাছিয়া নিয়া মানুষকে সেই বিচ্ছিন্ন গুণ অনুযায়ী বিচার করে। যেমন শারীরবৃত্ত মানুষের দেহটাকেই বিবেচনার বিষয় বলিয়া আলাদা করিয়া বাছিয়া নিয়াছে। মনোবিদ্যা বাছিয়া নিয়াছে—মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, আবেগ, ইচ্ছা ইত্যাদি মানসিক পবিবর্তনগুলিকে। আইন বাছিয়া নিয়াছে অধিকার ও কর্তব্যের বহু বিচিত্র সম্বন্ধ ও তাহাদের লঙ্ঘনকে। তেমনি অর্থবিদ্যাও বাছিয়া নিযাছে মানুষের স্বার্থেব দেনা-পাওনার দিকটিকে।[১]

বিজ্ঞান কাহাকে বলে?

স্পষ্টতই অর্থবিদ্যা মানুষেব একটা গুরুত্বপূর্ণ দিককে অন্য সমস্ত দিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিবেচনা করে। ইহাই বিজ্ঞানের পদ্ধতি। কোন জটিল বিষয়কে বুঝিতে গেলে, তাহাব অন্তর্গত বিভিন্ন দিককে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিবেচনা করিলেই তাহাকে ভাল করিযা বুঝা যায়। ইহাব জন্য বিজ্ঞানকে দোষ দেওয়া যায় না। নির্ভুল জ্ঞানলাভের জন্য এই পথই উৎকৃষ্ট পথ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, এবং এই পথ যে সুফলপ্রসূ হইয়াছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে সর্বদাই ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহাই জ্ঞানলাভের শেষ উদ্দেশ্য নহে। দর্শন এই কথাই মানুষকে স্মবণ করাইযা দেয। দর্শন বলে, বিচ্ছিন্নকে পরস্পরের সঙ্গে সুসঙ্গতভাবে যুক্ত কবিয়া সমগ্র দৃষ্টিলাভ করিলে, তবেই সত্যলাভ হইতে পারে। বিজ্ঞান সেই সত্যলাভেব পথে সহায়ক। কিন্তু সমস্ত বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে একটি সুষম সমগ্রতায বিধৃত কবিয়া না দেখিলে, একদেশদর্শিতার অপরাধ ঘটে। বিজ্ঞান না হইলে দর্শনের চলে না, আবার দর্শন না হইলেও বিজ্ঞানের কাজ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

মানুষের স্বার্থেব যেমন একটি দিক আছে, নিঃস্বার্থপরতারও আর একটি দিক আছে। আর্থিক লাভক্ষতি মানুষেব পক্ষে মূল্যবান্, কিন্তু দযা, মায়া, সত্য আচরণ, বীর্যবত্তা, শ্রদ্ধা, নম্রতাকেও সে জীবনে কম মূল্যবান্ মনে করে না। অর্থাৎ আর্থিক মূল্য (economic value)

নীতিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী

১। তাই অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা হইতেছে: "Economics is the study of mankind in the ordinary business of life" অথবা "Economics is the study of all those forms of social relationships and activities of man in providing for his material wants. It is the study of man's actions in getting and spending his income". Silverman—The Groundwork of Economics, P. 2

ছাড়াও অন্য আর এক মূল্যকে সে স্বীকার করে, সে মূল্যকে আমরা বলি নৈতিক মূল্য (moral values)। চুরি করিয়া অনেকে 'বড়লোক' হইতে পারেন, তাই ইহা হয়তো আর্থিক লাভের পথ ('চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড় ধরা'), কিন্তু মানুষের অন্তরে এ পথের প্রতি একটা বিরূপতা, ঘৃণা, অশ্রদ্ধা আছে। মানুষ বলে, চুরি করা 'বড়লোক' হইবার পথ হইতে পারে, কিন্তু মহৎ ব্যক্তি হইবার পথ নয়। এই যে বোধ ও বিচার ইহাকে বলি নীতিবোধ (moral sense)। অনেক সময় ইহাকেই বলি বিবেক (conscience)। এই বোধ আর্থিক লাভ না আনিলেও ইহাকে মানুষ উচ্চমূল্য দিয়া থাকে। মানুষের এই সাংসারিক নির্বুদ্ধিতার দিককে অস্বীকার করা চলে না, অবজ্ঞা করা চলে না। ইংরেজ বলে Honesty is the best policy—অর্থাৎ সততা সাংসারিক স্বার্থের দিক হইতে লাভজনক। যিনি প্রকৃত নীতিবিদ্, ইহা কিন্তু তাঁহার কথা নয়। তাঁহার কাছে সততার মূল্য সাংসারিক লাভের জন্য নয়। সাংসারিক লাভের চেয়েও বড় আর এক লাভের কথা মানুষ স্বীকার করে, তাহা হইল আদর্শনিষ্ঠা; সেখানে সাংসারিক লাভ-লোকসানের কথা অবান্তর। সত্য বলিয়াই সত্যের মূল্য। তাই যিনি সত্যকার নীতিবান্ তাঁহার প্রার্থনা,—

> "যদি দুঃখে দহিতে হয়
> তবু মিথ্যা চিন্তা নয়,
> যদি দৈন্য বহিতে হয়
> তবু মিথ্যা কর্ম নয়,
> যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নয়।
> জয় জয় সত্যের জয়।"[২]

মানুষ সামাজিক জীব ইহা যেমন সত্য, তেমনি মানুষ নীতিবান্ প্রাণী, ইহা তেমনই সত্য। সামাজিক জীবনের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক নিবিড়। মানুষের নৈতিক আচরণের আধার, তাহার সামাজিক জীবন। দয়া, দাক্ষিণ্য, মিথ্যা কথা, বঞ্চনা ইহারা নৈতিক কর্ম (কারণ, নীতি বলিতে ভাল ও মন্দ দুইই বোঝায়)। কিন্তু দয়া একলা মানুষ নিজেকে করিতে পারে না, অবশ্য জীবে দয়া ব্যাপক অর্থে ধরিলে নির্জন গুহাবাসী তপস্বী বনের পশু এমন কি বৃক্ষলতাকেও দয়া করিতে পারেন। চুরি করিতে হইলেও সমাজ পরিবেশ চাই। তাই মোটামুটিভাবে বলা যায় সমাজজীবনে কতগুলি আচরণ, কতগুলি অভ্যাস নিন্দিত ও প্রশংসিত হয়, এবং তাহাদিগকেই নীতি (Moral actions) বলা হয়। মানুষের সমাজ-

২। রবীন্দ্রনাথ—ব্রহ্মসঙ্গীত

জীবনের এই দিকটা, যাহা সৎ বা অসৎ এই দুই প্রভেদ দ্বারা চিহ্নিত করা যায়, তাহার সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান আলোচনা করে, তাহারই নাম নীতিবিদ্যা—Ethics or the science of morality। গ্রীক বিশেষ্য Ethos হইতে Ethics কথার উৎপত্তি। Ethos মানে হইল সামাজিক প্রথা, অভ্যাস, আচার। ইহা হইতেই আসে Ethic অর্থাৎ চরিত্র। অর্থাৎ সমাজ-গৃহীত প্রথা-আচার অনুসরণের অভ্যাসের দ্বারা ব্যক্তির যে চরিত্র গঠিত হয়, তাহাই নৈতিক আচরণ বলিয়া প্রশংসিত। যাহা তাহার ব্যতিক্রম, তাহা ব্যক্তির চরিত্রের ত্রুটি বলিয়াই নিন্দিত। যে শাস্ত্র মনুষ্য-আচরণ বা চরিত্রের প্রশংসা ও নিন্দার যুক্তিসঙ্গত মান নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, তাহারই নাম Ethics।

নৈতিক আচরণ সমাজ-বিধি সম্মত

অনুরূপ ভাবে Moral কথার মূল হইল, ল্যাটিন বিশেষ্য Mores, তাহার অর্থও সমাজ-সম্মত আচরণ, যাহা ব্যক্তি অনুশীলন দ্বারা অভ্যাস করে। তাই Ethics বলিতে আমরা সেই বিজ্ঞানকেই বুঝি, যাহা মানুষের আচরণের সামাজিক দিকটি আলোচনা করিয়া কল্যাণের মান নির্দেশ করিয়া দেয়। এই বিজ্ঞান মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করিয়া আদর্শের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, এবং যাহাকে আদর্শ বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইল, তাহা আদর্শ কেন, তাহার যুক্তিযুক্ততা আলোচনা করে। যাহাকে 'ভাল' বলা হইল, তাহা কেন ভাল, আর যাহাকে 'মন্দ' বলা হইল, তাহা কেনই বা মন্দ, তাহা এ বিজ্ঞান বিচার করিবে। এই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মানুষের স্বেচ্ছাকৃত আচরণ, যাহা অভ্যাস ও বিচারের ফল, এবং যাহা ব্যক্তির চরিত্রের সম্যক প্রকাশক। ইহাব উদ্দেশ্য মানুষের আচরণ বা চরিত্রের মান- বা আদর্শ-নির্দেশ। পূর্বেই বলিয়াছি, এই মান বা আদর্শ শারীরিক বা মানসিক যোগ্যতা সম্বন্ধে নহে, সাংসারিক লাভলোকসান সম্বন্ধেও নহে। এই আদর্শ মানুষের কল্যাণের। এই আদর্শ ঔচিত্য-অনৌচিত্যের। লিলি তাই বলিয়াছেন, আমরা নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে পারি যে ইহা সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আদর্শ-নির্ণায়ক বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান আচরণকে ন্যায় বা অন্যায়, ভাল বা মন্দ বা এই রকম কোন ভাবে পৃথক করে।[৩]

নীতিবিদ্যা মানুষের অভ্যাস ও প্রথা, এক কথায় তাহাদের চরিত্র, যে নীতি অনুযায়ী তাহারা আচরণ করিতে অভ্যস্ত, তাহা বিবেচনা করে। এই বিদ্যা ইহাও আলোচনা করে, মানুষের আচরণের ন্যায়-অন্যায়, অথবা অভ্যাসের শুভাশুভ, কোন নীতির উপর নির্ভর করে।[৪]

৩। Lillie—Introduction to Ethics, P. 2
৪। Mackenzie—A Manual of Ethics, P. 1

[ইহা প্রশ্ন করা যাইতে পারে সমাজবহির্ভূত মানুষের বেলায় কি নীতির শাসন প্রযোজ্য নয়? ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মানুষের অধিকাংশ নৈতিক আচরণই সমাজজীবনের আধারে। কিন্তু আমি একলা পাহাড়ে বসিয়া কুচিন্তা করিলে তাহাও নৈতিক বিচার-অন্তর্ভুক্ত। বাস্তবিকপক্ষে নৈতিক আচরণ বলিতে শুধু প্রকাশ্য কর্মই বুঝাইবে না, চিন্তা, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিও বুঝাইবে—তাহারা প্রকাশ্য কর্মে রূপ না পাইলেও। তাহার কারণ আমাদের চিন্তা, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিও আমাদের চরিত্র, আমাদের আচরণের অভ্যাসকে ব্যক্ত করে।

সমাজসম্মত না হইলেই কি তাহা 'অনৈতিক' (immoral) ও অন্যায় হইবে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, সমাজের আচার-প্রথা মানুষের কল্যাণ-উদ্দেশ্য সংসাধক। কিন্তু কখনো কখনো সামাজিক প্রথা তাহাদের প্রাণ ও প্রয়োজন হারাইয়া অবিচার ও উৎপীড়নের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা সমাজের বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে এককালে উপযোগী ছিল, কিন্তু আজ এ প্রথা শুধু অর্থহীন নয়, ইহা হিন্দু সমাজের সংহতি ও শক্তি ধ্বংস করিতেছে। যখন কোন প্রথা এ প্রকার অন্ধতা ও অবিচারের হেতু হয়, তখন কোন কোন সাহসী সংস্কারকামী তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সমাজ তখন হয়তো তাঁহাকে নিন্দা করে, তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনাও সহিতে হয়। তথাপি তাঁহার আন্দোলন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহা একদিন জয়যুক্ত হয়। সমাজ তাহার কুপ্রথা পরিবর্তন বা পরিত্যাগ করে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে সমাজের সম্মতি এবং নৈতিকতা ঠিক এক কথা নয়। সমাজের প্রচলিত প্রথার অন্ধ অনুকরণ নৈতিক আচরণ নয়। নীতিবুদ্ধির মূল মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত আছে, কিন্তু বিচারবুদ্ধি দ্বারাই ইহা ব্যক্তির জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।]

নীতিবিদ্যার সংজ্ঞার বিশ্লেষণ—নীতিবিদ্যা বা নীতিবিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইল তাহা কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

আমরা বলিতেছি নীতিবিজ্ঞান। কিন্তু বিজ্ঞান কথার অর্থ কি? এক জাতীয় কতগুলি বস্তু বা ক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ও যুক্তিসঙ্গত আলোচনা দ্বারা সে বিষয়ের মূল বিধি বা আইনের সন্ধানের নামকে বলা হয়, বিজ্ঞান। বিজ্ঞান নির্বিচারে পৃথিবীর সমস্ত বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রকাশের দুঃসাহস দেখায় না। বিজ্ঞানী বিনম্রভাবেই স্বীকার করেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অত্যন্ত প্রকাণ্ড ব্যাপার এবং সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেক বিজ্ঞানই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি বিশেষ দিক বাছিয়া নিয়া সেই বিশেষ বিষয়ে

সুশৃঙ্খল, যুক্তিসম্মত এবং যথাসম্ভব নির্ভুল ও সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভে চেষ্টিত হয়। বিজ্ঞানের জ্ঞান কোন বিষয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে নয়। বিজ্ঞানের চেষ্টা তাহার নির্দিষ্ট বিষয়ের সমস্ত দ্রব্য বা ঘটনার পশ্চাতে যে মূল সূত্র (fundamental laws) ক্রিয়া করিতেছে তাহার সন্ধান ও ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যার বেলায় বিজ্ঞান, যাহা প্রাকৃতিক ঘটনা, তাহাকে প্রাকৃতিক শক্তি অনুযায়ীই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে (tries to explain natural phenomena with reference to natural forces)। কাজেই দেখা যাইবে বিজ্ঞানের প্রণালী হইল সতর্ক বিশ্লেষণ ও বিচার। ইহা প্রত্যেক বিষয়কে সুশৃঙ্খল ভাবে আলোচনার দাবি করে। ইহা করিতে গেলে বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ ও পরীক্ষণ (observation and experiment) এই দুই হাতিয়ারের উপর নির্ভর করে। ইহার উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ,—সৃষ্টি নয়, কলকব্জা নির্মাণ নয়। বিজ্ঞানকে কলকব্জা বানাইবার কাজে, মানুষের সাংসারিক প্রয়োজন মিটাইবার কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাই বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য নয়। বি-জ্ঞান মানেই বিশেষ সুসম্পূর্ণ জ্ঞান। এই জ্ঞান সাধারণ সূত্র সম্বন্ধে (general laws) এবং এই জ্ঞান যথাসম্ভব নির্দিষ্ট ও নির্ভুল (accurate) হওয়া চাই।

প্রাকৃত বিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান

প্রাকৃত বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষণ ও পরিক্ষণ যতটা সোজা, মানসিক বিজ্ঞানগুলিতে তাহা নয় এবং মানসিক বিজ্ঞানগুলিতে প্রাকৃত বিজ্ঞানের মত নির্ভুলতা দাবি করা চলে না। সমস্ত বিজ্ঞানেই আলোচনা সুশৃঙ্খল ও যুক্তিসম্মত হওয়া চাই। নীতিবিজ্ঞানে পরীক্ষণ সম্ভবই নয়, এ বিজ্ঞানে অনেকখানি স্থানই সুসংবদ্ধ চিন্তা ও বিচারের (speculation)।

বিজ্ঞানের মধ্যে কতগুলি, দ্রব্য ও ঘটনার বিশ্লেষণ দ্বারা তাহাদের স্বরূপ নির্ণয়ে নিরত। এই বিজ্ঞানগুলিকে Positive Sciences বলা হয়। তাহারা আমাদের বলে, এই জিনিসগুলি বা ঘটনা এই রকম বা ওই রকম—Positive Sciences tell us about the nature of things as they actually are.

Positive & Normative Science

যেমন, রসায়ন (Chemistry) আমাদের বলে—হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই দুই গ্যাস্ ২:১ এই অনুপাতে মিলাইলে জল পাওয়া যায়। অথবা পদার্থবিদ্যা বলে শব্দের গতি সেকেণ্ডে ১১০০ ফিট্।

কিন্তু আবার কতগুলি বিজ্ঞান আছে যাহারা আদর্শ-নির্দেশ করে,—তাহারা বলে এটা উচিত, ওটা অনুচিত। এই বিজ্ঞানগুলিকে Normative Sciences বলা হয়। ইহারা মান বা আদর্শ (norm, standard) উপস্থাপিত করে—Normative Sciences tell us about ideals—about what ought

to be, rather than what actually is. যেমন, নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) সৌন্দর্যের আদর্শ-নির্দেশ করে, অথবা তর্কবিদ্যা (Logic) চিন্তার আদর্শ উপস্থাপিত করে। মনোবিদ্যা Positive Science, কিন্তু তর্কবিদ্যা Normative Science।

নীতিবিজ্ঞানও Normative Science—কারণ ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের আচরণের আদর্শ নির্ণয় করা। মানুষের আচরণ কি শেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবে, কোন মানের নিকটবর্তী হইতে চেষ্টা করিবে, নীতিবিজ্ঞান তাহাই সুশৃঙ্খল ভাবে বিচার-যুক্তিদ্বারা স্থির করিতে চেষ্টা করে। এখানেই নীতিবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে পৃথক।[৫] অনেক বিজ্ঞান আছে, যাহা একাধারে প্রকৃতি-নির্দেশক (Positive), এবং অন্যদিকে আদর্শ-নির্ণায়ক (Normative)। যেমন, ভেষজবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র একদিকে মানুষের নানা রোগের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে, বিভিন্ন ভেষজের গুণাগুণ বর্ণনা করে; আবার অন্যদিকে মানুষের সুস্থতার আদর্শ বা ভেষজের বিশুদ্ধতার মান নির্দেশ করে। স্থপতিবিদ্যাও তেমন একাধারে positive ও normative। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে (Politics) প্রকৃতি-নির্দেশক এবং আদর্শ-নির্ণায়ক এই দুইটি দিকই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহাকে নির্দিষ্টভাবে কোন এক দলে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। দুই দলেই ইহার সমান স্থান।

কিন্তু নীতিবিজ্ঞানের বেলা স্পষ্ট করিয়াই বলা চলে যে, ইহার আদর্শ-নির্ণায়ক দিকই বেশী প্রধান। অবশ্য নীতিবিজ্ঞানের একটা দিক আছে, যাহা প্রকৃতি-নির্দেশক। নীতিবিজ্ঞানে এই কথাটি আলোচনা করিতে হয়, মানুষের প্রকৃতিটি কি? মনুষ্য-প্রকৃতির স্বরূপ না জানিলে মনুষ্য-আচরণের আদর্শও স্থির করা যায় না। তাই নীতিবিজ্ঞানে মানুষের আচরণের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়। তথাপি, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে নীতিবিজ্ঞানের প্রধান কাজ হইতেছে মানুষের প্রকৃতি নিরূপণ করিয়া, তাহার আচরণের আদর্শ নির্ণয় করা।

আদর্শ অর্থ কি?

আদর্শ কাহাকে বলিব? কোন দলের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনা, তাহাই সেই দলের আদর্শ। আদর্শ অবাস্তব হইলে, তাহা সত্যকার আদর্শ হইতে পারে না। দুই মাসের শিশুর জন্য মাংস-পরোটা আহার আদর্শ হইতে পারে না, কারণ এমন আহার শিশুর শারীরিক পরিণতি অনুযায়ী

৫। The nature of Ethics......is distinguished from the Natural Sciences, in as much as it has a direct reference to an end, that men desire to attain or a type to which they wish to approximate. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 5

সম্পূর্ণ অসম্ভব। আবার যাহাকে আদর্শ বলা হয়, তাহা সহজলভ্য হইলে চলে না। যাহা দলের সকলেই করে, সকলেই পারে, তাহাকে আদর্শ বলা যায় না। আট মিনিটে এক মাইল দৌড়ানো সুস্থ ক্রীড়াবিদ্‌দের কাছে আদর্শই হইতে পারে না, কারণ সব ক্রীড়াবিদ্‌ই ইহা পারে। কিন্তু সাড়ে তিন মিনিটে এক মাইল দৌড়ানো আদর্শ বটে, কারণ চার মিনিটের সামান্য কিছু কম সময়ে যাঁহারা এক মাইল দৌড়াইতে পারেন তাঁহাদের সংখ্যা আজ পর্যন্ত পাঁচজনও নয়। কাজেই আদর্শের মধ্যে কষ্টসাধ্যতা থাকা চাই, তাহা অনায়াসলভ্য নয়। 'সর্বদা সত্য কথা বলিবে' ইহা মানুষের আদর্শ, কারণ ইহা অসম্ভব না হইলেও অনায়াসসাধ্য নয়। বাস্তবিকপক্ষে নীতিবিদ্যা মানুষকে এই কথাই বলে যে, তোমার মধ্যে সদা সত্যভাষণ-রূপ মহৎ গুণের সম্ভাবনা আছে, এবং সচেষ্ট অনুশীলনদ্বারা, স্খলন-পতনের মধ্য দিয়া, বিচলিত না হইয়া, নিষ্ঠার সঙ্গে এই চেষ্টায় রত থাকিলে একদিন এই গুণ অভ্যস্ত হইবে। তখনই বলা যাইবে যে, তোমার চরিত্র সুগঠিত হইয়াছে। এই লক্ষ্যে পৌছিতে আজও কোন মানুষ পারে নাই, যুধিষ্ঠির পারে নাই, ভীষ্মদেব পারেন নাই, মহাত্মা গান্ধীজী পারেন নাই। কিন্তু মানুষের আচরণের ইহাই শেষ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ইহাই তাই নৈতিক জীবনের 'আদর্শ'।

নীতিবিজ্ঞানের মূল্য

নীতিবিজ্ঞানকে দার্শনিক লক্ মনুষ্যজাতির সকলের চেয়ে উপযোগী আলোচনার বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—"Morality is the proper science and business of mankind in general." বাস্তবিকপক্ষে, পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ কি আছে, যাহাব নৈতিক আচরণের আদর্শ সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নাই? জ্ঞান না হইলে মানুষের চলে না। এই প্রয়োজনের তাগিদেই বিভিন্ন বিজ্ঞানের জন্ম। অধিকাংশ বিজ্ঞান হইতেছে বহির্মুখী, তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে বাহিরের বিশ্বকে জানা ও বোঝা। বাহিরের বস্তুগুলিকে জানিতে ও বুঝিতে পারিলে তবেই তো তাহাদের কাজে লাগাইতে পারা যাইবে। কিন্তু বাহিরের দ্রব্য এবং ঘটনা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যতটা প্রয়োজন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন জানা মানুষের প্রকৃতিকে। সেইজন্য সমস্ত মানবিক বিজ্ঞান, মানুষের পক্ষে নিবিড় আকর্ষণের বিষয়।

আবার সমস্ত মানববিজ্ঞানের মধ্যে নীতিবিজ্ঞান বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করে। মানুষকে মানুষ হিসাবে বাঁচিতে হইলে, নীতি বা আদর্শকে শ্রদ্ধা করিতেই হইবে। এখানে মানুষ ইতরপ্রাণী হইতে পৃথক। পশু প্রকৃতির অন্ধ তাড়নাদ্বারা চালিত, বুদ্ধিবিবেচনার সে অধিকারী নয়। তাই পশুর ব্যবহার (behaviour) থাকিতে পারে, কিন্তু আচরণ (conduct) নাই। মানুষের মধ্যেও সহজ প্রবৃত্তির

(instinct) তাড়না আছে, কিন্তু শুধুমাত্র সেই তাড়নাদ্বারাই সে চালিত হয় না। সে বিচার করে, বিবেচনা করে—সেই জৈব তাড়নাগুলিকে সে নিয়ন্ত্রিত করে, সংযত করে, কখনো বা তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করে। এইখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব। অ্যারিস্টটল তাই বলিয়াছিলেন যে নীতির মধ্যেই মানুষ মানুষ হিসাবে আপনাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে।[৬] নীতিই মানুষের শ্রেষ্ঠ স্বভাব। তাই সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে নীতিবিদ্যার বিশেষ মর্যাদা আছে। এই শাস্ত্রের মধ্যেই মানুষকে মনুষ্যত্বে সম্পূর্ণ বিকশিত জীব হিসাবে বিবেচনা করা হয়। নীতির ভূমিতে, সমস্ত মানুষে, তাহাদের সহস্র পার্থক্য সত্ত্বেও, এক। মানুষের এই সার্বজনীন প্রকৃতিরই আলোচনা আমরা পাই, নীতিবিদ্যায়।[৭]

নীতিবিদ্যা আলোচনায় আমরা যুক্তিদ্বারা বিচার করি, কোন্ আচরণ ন্যায় এবং কোঁন্ আচরণ অন্যায়। এবং ইহাও আমরা আলোচনা করি, কেন কোন আচরণকে ন্যায় বলি, এবং কেন কোন আচরণকে বলি অন্যায়? এই জ্ঞানের সার্থকতা কি?

সক্রেতিস্ বলিয়াছিলেন যে সত্যজ্ঞান লাভ এবং সত্যনিষ্ঠ হওয়া একই কথা। উপনিষদের ঋষিও এ কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন 'ব্রহ্মজ্ঞঃ ব্রহ্ম এব ভবতি'—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন। এখানে 'জ্ঞান' অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে প্রভেদ করিয়া থাকি। তাই দেখি ভক্ত অর্জুন ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,

নীতিবিদ্যা পাঠেই মানুষ নীতিবান্ হইবে এমন আশা করা যায় না।

"জানামি ধর্মং নচমে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্য ধর্মং নচমে নিবৃত্তিঃ"

ধর্ম কি তাহা বুদ্ধি দিয়া জানি, কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্ত হই না,—আবার অধর্ম কি তাহাও জানি, কিন্তু তাহা হইতে নিবৃত্ত হই না। তবে কি নীতিবিদ্যার আলোচনা নিরর্থক? ইহা স্বীকার্য যে, আমরা নীতিবিদ্যায় বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা ন্যায়-অন্যায়ের স্বরূপ, আচরণের আদর্শ ইত্যাদি বিবেচনা করিব। কিন্তু এমন দাবি নিশ্চয়ই হাস্যকর হইবে যে, আমাদের আলোচনার ফলে আমাদের

৬। "Can we suppose, that while a carpenter and a cobbler each has a function and business of his own, man has no business and function assigned him in nature?" Aristotle---Nic Ethics, i, P.7

৭। "Morality might in this sense be called the universal and characteristic element in human activity, its human element, par excellence, as distinguished from its particular, technical and accidental elements . the delineation of this (our common nature and common duty) the proper business of mankind in general, is the endeavour of ethical science."

ছাত্রেরা রাতারাতি নীতিবান্ হইয়া উঠিবে। ইহা নিশ্চয়ই সত্য, যদি আমরা এই কাজটি সত্যিই করিতে পারিতাম, তবে শিক্ষক জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছি বলিয়া গর্ববোধ করিতে পারিতাম। মানুষকে নৈতিক আদর্শের পথে চালনা করিতে হইলে, শিক্ষকের পক্ষে, উপদেশ ও আলোচনার চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর উপায় হইল, নৈতিক আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া তোলা। এমন আদর্শ নীতিবান্ শিক্ষকই গান্ধীজীর মতো বলিতে পারেন—"আমার জীবনই আমার বাণী।"

নীতিবিদ্যায় আদর্শগুলির যুক্তিযুক্ততা বিচার করে—আদর্শ সম্বন্ধে ধারণা তাহাতে স্পষ্ট হয়।

আমরা যে কাজে এখানে রত হইয়াছি তাহার উদ্দেশ্য অনেকটা সীমাবদ্ধ। তাহা হইল যুক্তি ও বিচার দ্বারা নীতির প্রকৃতি ও আদর্শের বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ। ইহারও প্রয়োজন আছে। নৈতিক জীবন অন্ধ প্রবৃত্তির ফল নয়, এবং অন্ধ অনুসরণ দ্বারাও ইহা আয়ত্ত করা যায় না। **বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা নৈতিক আদর্শগুলির যুক্তিযুক্ততা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিব।** নীতিবিদ্যা পাঠে আমরা জীবনের প্রত্যেক নৈতিক সমস্যার সমাধানের উপযোগী ছক্কাটা সদুত্তর পাইয়া যাইব, এমন দাবি নীতিবিদ্যা করে না। তবে **নৈতিক আদর্শের মূল সূত্রগুলি যদি আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি, তবে নৈতিক সংকটের দিনে কর্তব্য নির্ধারণ সম্বন্ধে পথ নির্দেশ অবশ্যই আমরা পাইব।** স্বচ্ছ বুদ্ধিবিচার জীবনের সর্বক্ষেত্রে মূল্যবান্। নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে সেই স্বচ্ছ বুদ্ধিবিচার প্রয়োগ। এই বিজ্ঞান যদি উপযুক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা অনুধাবন করি, তবে তাহার দ্বারা **আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ও গভীরতা দুইই বৃদ্ধি পাইবে** এবং সম্ভবতঃ তাহার ফলে আমরা বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে যে গভীর ঐক্য আছে তাহা বোধ করিতে পারিব এবং মানুষের প্রতি অনেক বেশী শ্রদ্ধাশীল হইব। ইহা সামান্য লাভ নয়।[৮]

৮। We begin our study of Ethics with intuitions that are vague, prejudiced and inconsistent; we should end our study with intuitions, that have established themselves by their coherence with one another, their relative alignment with the most generally accepted moral codes and the continued self-evidence with which they come to our minds after a wide and varied experience of life.........the chief value of ethics is not in the guidance it gives in particular cases, but in the development of width of outlook and seriousness of purpose in dealing with moral matters, generally. Lillie—An Introduction to Ethics, P. 17-19

ভাল-মন্দ—Good-Bad—মনুষ্য-আচরণের আদর্শ-নির্ধারণ নীতিবিদ্যার কাজ। এবং আদর্শের সঙ্গে "ভাল-মন্দ", "ন্যায়-অন্যায়" কথাগুলি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত।

'Good' কথার অর্থ কি ?

প্রথমে 'ভাল-মন্দ' এই জোড়া কথা দুইটি ধরা যাক। যেখানে বলি 'ভাল' সেখানেই বুঝি ভাল বিশেষণযুক্ত দ্রব্য বা ক্রিয়াটি ঈপ্সিত কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে, তাই তাহা মূল্যবান্। আমরা বলি 'টেবিলটি ভাল', 'ডেক্‌সটার ভাল খেলিতেছেন', 'মেয়েটি ভাল বংশের'। সর্বত্রই কোন না কোন মান অনুযায়ী কোন দ্রব্য বা ক্রিয়ার মূল্য নিরূপণ। সে মূল্য যে সর্বদাই সাংসারিক লাভক্ষতি দ্বারা নির্ধারিত, তাহা নয়। মানুষ অনেক সময় এমন জিনিসকে দাম দেয়, যাহার সংসারের হাটেবাজারে কানা-কড়ি মূল্য নাই—এমন কি কখনও মানুষ এমন জিনিসকেও মূল্য দেয় যাহা তাহার সাংসারিক স্বার্থের বিরোধী। **কিন্তু যাহাই মূল্যবান্, তাহাই কোন না কোন মান অনুযায়ী দামী।**

যাহা 'ভাল 'তাহা কোন বাঞ্ছনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।

কিন্তু সব জিনিসই সমান দামী নয়। কতগুলি জিনিস বা ক্রিয়ার নিজস্ব মূল্য নাই—তাহারা কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় (means to some desirable end), সেই জন্য তাহার দাম। কাগজে ছাপা টাকার নোটের নিজস্ব দাম কতটুকু ? তাহা দামী, যেহেতু সেই টাকার নোট দিয়া দেড় কিলো চাল কিনিতে পারি, যাহা জীবন রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয়। কিন্তু মানুষ কতকগুলি জিনিসকে নিজস্ব মূল্যেই দামী মনে করে—ইহারা উপায় মাত্র নয়—ইহারা নিজেই উদ্দেশ্য (they are ends in themselves)। যেমন গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন,

> ধর্ম নহে সম্পদের হেতু
> মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু ;
> ধর্মেই ধর্মের শেষ।[১]

ধর্ম তাই পরমপুরুষার্থ (Summum bonum—the highest good)। যাহা পরমপুরুষার্থ তাহা অন্য কিছুর জন্য দামী নয়, তাহার জন্যই অন্য কিছু দামী। প্রব্রজ্যা গ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়া ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন দুই স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে গবাদি পশু ও ভূ-সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া ছিলেন, তখন ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী স্বামীকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন, "সা হোবাচ মৈত্রেয়ী

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গান্ধারীর আবেদন

যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যাং ন্বহং তেনামৃতা ?” এই সমুদয় পৃথিবী যদি বিত্তের দ্বারা পূর্ণ হয়, আমি কি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব ? উত্তরে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন যে, বিত্তদ্বারা কখনও অমৃতত্ব আশা করা যাইতে পারে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি এই কথোপকথন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “পতির প্রতি কামনা বশতঃ পতিপ্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মাবস্তুর প্রতি কামনার জন্যই পতিপ্রিয় হয়।” অর্থাৎ আত্মাবস্তুই পরমপুরুষার্থ, তাহার চেয়ে মূল্যবান কিছু নাই, তাহার জন্যই স্ত্রী পুত্র কন্যা মূল্যবান্, যে হেতু আত্মাবস্তুই তাহাদের সকলের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের কাম্য করিয়াছে।[১০]

আমাদের আচরণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের সমগ্র আচরণের শেষ ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতেছে পরমপুরুষার্থ (Summum Bonum)। অর্থ, যশ, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ইত্যাদি আমরা কামনা করি, কিন্তু ইহাদের কোনটি নিজের জন্য কাম্য নয়—ইহারা প্রত্যেকেই অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের আচরণেব এমন আদর্শের সন্ধান করা, যাহা নিজস্ব মূল্যে চিরভাস্বর। কাজেই নীতিবিদ্যার সংজ্ঞার্থ (definition) দেওয়া যাইতে পারে the science of the highest ideal involved in human conduct।[১১]

নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য পরমপুরুষার্থ লাভ —Summum Bonum.

ন্যায়-অন্যায়—Right-Wrong—যাহা ন্যায় তাহা সিধা, সোজা, তাহা বক্র নয়, কুটিল নয়। তাই নীতিবান্ বলেন, ‘ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলবো সিধে রাস্তা দেখে’। ইংরেজী Right কথাটি ল্যাটিন্ ‘Rectus’ হইতে আসিয়াছে ; ইহার অর্থও হইল ‘যাহা সোজা’—যাহা নিয়ম বা আদর্শ অনুযায়ী। এই সত্যানুসরণ গুণকে ইংরেজীতে বলা হয় rectitude। আমাদের আচরণ তখনই প্রশংসনীয়, যখন তাহা স্বচ্ছ, তাহা সিধা, সরল—যাহা আদর্শ হইতে বিচ্যুত নয়। কাজেই বুঝিতে পারা যায়, আচরণ সরল হইতে হইলে, তাহা আদর্শানুসারী হইতে হইবে। তাই নীতিবিদ্যা সরল আচরণের পথ দেখাইয়া দেয়, ইহা বলিলেও এতটুকু ভুল হইবে না।

‘Right’ কথার অর্থ কি ?

নীতি ও আচরণ কর্ম-নির্ভর—নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্য মনুষ্য জীবনের আদর্শ-নির্ণয়। কিন্তু সেই আদর্শ কি একটি নিষ্ক্রিয় তুরীয় অবস্থা ? না, তাহা নয়;

১০। বৃহদারণ্যক উপনিষদ—১—৬

১১। Muirhead—Elements of Ethics, Bk.I, P. 2

নীতির আদর্শ, জীবন্ত মানুষেরই আদর্শ, তাহা মানুষের আচরণেরই আদর্শ।

নৈতিক জীবন উদ্যম ও কর্ম-নির্ভর

যে সন্ন্যাসী সংসার ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের নির্জন দুর্গম গুহায় তপস্যায় রত, তিনি নৈতিক জীবনের দায়িত্ব ত্যাগ করিয়া, সমাজ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক আমাদের দেশে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলে সমস্ত পরিচয়, সমস্ত ব্যক্তিত্ব, সমস্ত সংস্কার বিসর্জন দিতে হয়। তাঁহার সম্বন্ধে বলা যায় তিনি ভাল-মন্দের উর্ধ্বে—beyond good and evil! কিন্তু সমাজই নৈতিক জীবনের আধার এবং সমাজের কর্তব্যের মধ্য দিয়াই, সংসারের সংগ্রাম ও প্রলোভনের মধ্য দিয়াই, সাধারণ মানুষকে নৈতিক জীবনের আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে। যিনি সংসার হইতে, তাহার ধুলা ময়লা প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া নির্মল রহিলেন, তাঁহার অপাপবিদ্ধতার মধ্যে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা কই? সংসারের আবর্জনার মধ্য দিয়া, তাহার উত্তাপ উত্তেজনার মধ্য দিয়া, প্রলোভন পতনের মধ্য দিয়া, ধুলাকাদা গায়ে মাখিয়া, আবার যিনি উঠিয়া দাঁড়ান, যিনি অন্ধকারের অমঙ্গলের সমুদ্র সন্তরণ করিয়া, পথের কাঁটা পায়ে দলিয়া, রক্তাক্ত চরণে আলোর অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং শেষদিন বিনম্র মস্তকে বিশ্ববিধাতার কাছে উপস্থিত হন, তিনিই তো বীর। ইহাই নৈতিক জীবনের আদর্শ—নিষ্ক্রিয়তা নয়, সংগ্রাম ও উদ্যম, আদর্শনিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস, স্খলনপতন সত্ত্বেও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া সম্মুখের দিকে অনায়ত্ত আদর্শের দিকে অগ্রগমন—ইহাই হইল নৈতিক জীবনের স্বরূপ।[১২] স্বামী বিবেকানন্দ তাই শ্রেষ্ঠ নীতিবান্ পুরুষ, কারণ তিনি কর্মযোগী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও তাই উপদেশ,

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥[১৩]

নীতিবিদ্যাকে প্রয়োগবিদ্যা বলা যায় কি?—Is Ethics a practical science?—নীতিবিদ্যাকে আদর্শানুসারী (normative science)

১২। MacKenzie—A Manual of Ethics. P. 14

১৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩য় অধ্যায়, ৪—৬

বলা হইয়াছে। যে আদর্শ অবাস্তব ভাব মাত্র নয়, জীবনে প্রয়োগের উদ্দেশ্যেই আদর্শের নির্দেশ। নীতিবিদ্যা যখন নৈতিক জীবনের আদর্শ কি, তাহা বিচার করে, তখন এ আদর্শ কি করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাহা নির্দেশের ভারও যদি নীতিবিদ্যার উপর থাকে, তবে তাহাকে প্রয়োগবিদ্যা বা practical science বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য প্রত্যেক বিজ্ঞানের সত্যই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত। সেই অর্থে সমস্ত বিজ্ঞানই প্রয়োগবিদ্যা এ কথা মানিতে হয়। শারীরবৃত্ত (physiology) বা জ্যোতির্বিদ্যা (astronomy) শুধু আমাদের জ্ঞানের পিপাসা মেটায় না, বাস্তব জগতে ইহাদের প্রয়োগও আছে। কিন্তু ম্যাকেঞ্জীর মতে যে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যক্ষভাবে জীবনের প্রয়োজনে প্রয়োগ করা যায়, তাহাদিগকেই প্রয়োগবিদ্যা বলা উচিত। যেমন, ভেষজবিদ্যা অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবেই মানুষের রোগ নিরাময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত, তাই ইহাকে practical science বলিলে কোন বাধা নাই। কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ক শাস্ত্র (theology) এমন ভাবে কোন প্রত্যক্ষ প্রয়োজন মেটায় না। কাজেই যে সব জ্ঞানের চর্চা প্রধানতঃ বুদ্ধির পিপাসা মেটায়, ইহাদিগকে জ্ঞানানুসারী বিদ্যা (theoretical science) বলা উচিত। এখন কথা হইতেছে, নীতিবিদ্যা এর কোন দলে পড়িবে? ম্যাকেঞ্জীর মতে নীতিবিদ্যা আচরণের আদর্শ অনুসন্ধান করে, তাই ইহা normative science বটে, কিন্তু কি করিয়া এই আদর্শ জীবনে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার খুঁটিনাটি নির্দেশ আমরা নীতিবিদ্যা হইতে পাইব না। জীবনের কোন্ অবস্থায় কোন্‌টি কর্তব্য তাহার তৎক্ষণাৎ সঠিক উত্তর নীতিবিদ্যা পাঠে পাওয়া যাইবে না। কাজেই নীতি-বিদ্যা আদর্শানুসারী বিজ্ঞান হইলেও প্রয়োগবিদ্যা নয়।[১৪] মুইরহেড্ জ্ঞানা-নুসারী বিদ্যা (theoretical science) এবং প্রয়োগবিদ্যার মধ্যে তীক্ষ্ণ ভেদরেখার পক্ষপাতী নন। তাঁহার মতে, সমস্ত জ্ঞানানুসারী বিদ্যারই কোথায়ও না কোথাও প্রয়োগের ক্ষেত্র আছে, আবার সমস্ত প্রয়োগবিদ্যারই একটা জ্ঞানের দিক আছে।

নীতিবিদ্যা আদর্শানুসারী, কিন্তু উহা প্রয়োগবিদ্যা কি?

ম্যাকেঞ্জীর মতে নীতিবিজ্ঞান প্রয়োগ-বিদ্যা নয়।

১৪। Ethics must content itself, with understanding the nature of the ideal, and must not hope to formulate rules for its attainment...It discusses the ideal of goodness and is not directly concerned with the means by which this ideal of goodness may be realised. Ethics therefore, though a normative science, is not to be regarded as a practical science. MacKenzie—Manual of Ethics, Pp. 9-10

বাস্তবিকপক্ষে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য জ্ঞান-পিপাসার পরিতৃপ্তি হইলেও, তাহা সেখানেই শেষ হয় না। জ্ঞানই শক্তি (Knowledge is power) এবং বুদ্ধিমান মানুষ জ্ঞানের শক্তিকে সর্বদাই কাজে লাগাইতে চেষ্টা করেন। সমস্ত সকল প্রয়োগকর্মের পিছনেই শুদ্ধ বুদ্ধির পরিতৃপ্তি ও জ্ঞানার্জনের ভিত্তি থাকেই। তবে তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে, কোন কোন বিদ্যার সঙ্গে জীবনের প্রয়োজনের সম্বন্ধ নিকটতর। সে হিসাবে নিশ্চয়ই নীতিবিদ্যার সম্বন্ধ মানুষের জীবনের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ। এমন কি জ্যোতির্বিদ্যা বা শারীরবৃত্তের চেয়ে নীতিবিদ্যার গুরুত্ব জীবনের প্রয়োজনে অনেক বেশী। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বুদ্ধিবিচার দ্বারা আদর্শ নির্ধারণই নীতিবিদ্যার প্রধান কাজ। কি করিয়া জীবনে আদর্শগুলি রূপায়িত করিয়া তুলিতে হইবে সে আলোচনা নীতিবিদ্যার কাছে গৌণ।[১৫]

মুইরহেড্ ও নীতি-বিদ্যাকে প্রয়োগবিদ্যা বলিয়া চিহ্নিত করিতে চান না

সেথ্ নীতিবিদ্যাকে প্রয়োগবিদ্যা বলার বিরুদ্ধে আপত্তির কোন কারণ দেখেন নাই। নীতিবিদ্যার আদর্শ তো আলমারীতে সাজাইয়া দূর হইতে প্রশংসা করিবার জিনিস নয়, জীবনে প্রয়োগেই তাহার সার্থকতা। জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রয়োগকে পৃথক করিয়া রাখা যায় না। আদর্শকে বুদ্ধিবিবেচনা দ্বারা স্থাপিত করিয়া, তাহাকে জীবনের প্রয়োজনে লাগাইতে হয়। আদর্শের প্রয়োগ তো অন্ধ প্রক্রিয়া হইতে পারে না। অ্যারিস্টটল বলিয়াছিলেন, নীতিবিদের কাছে আদর্শের জ্ঞান এবং তাহার প্রয়োগ এই দুইকে পৃথক করা সম্ভব নয়, তিনি এই দুই বিষয়ে সমভাবেই আগ্রহী।[১৬]

সেথ্ নীতিবিদ্যাকে প্রয়োগবিদ্যা বলিয়া স্বীকার করেন

তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, নীতিবিদ্যার প্রয়োগের দিককে অস্বীকার করিবার কারণ নাই, কিন্তু ইহার মূল উদ্দেশ্য প্রয়োগ নয়, নীতির আদর্শ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান। অবশ্যই জীবনের সমস্যা সমাধানে ইহা প্রয়োগযোগ্য। কিন্তু কোন্ অবস্থায়, কি ভাবে, নৈতিক আদর্শ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার খুঁটিনাটি নির্দেশ নীতিবিদ্যা আমাদের দেয় না।

নীতিবিদ্যা কি একটি কলা বা কৌশল ?—Is Ethics an art ?—কলা হইতেছে কোন নির্দিষ্ট ফল লাভের জন্য কতকগুলি বিধি বা নিয়মকানুন (an art is

---

১৫। Muirhead—Elements of Ethics, P. 32-33

১৬। It is impossible to separate theory from practice. As Aristotle insisted, the abiding interest of the moralist is practical, as well as theortical. Seth—Ethical Principles.

a set of rules to produce a result)—যেমন বাঁশী বাজানো একটি কলা ;

নীতিবিদ্যা একটি "কলা" নয়। নৈতিক-ক্রিয়া, একটা কৌশল বা 'কায়দা' নয়

বাঁশী বাজাইতে হইলে কতগুলি কৌশল জানা চাই; ইহার কতগুলি নিয়ম আছে। আমাদের নৈতিক ব্যবহার কি এমন কতগুলি কৌশল, যাহা আয়ত্ত করিলে আমাদের আচরণ শোভন ও প্রশংসনীয় হইতে পারে? নৈতিক আচরণ অভ্যাস-সাপেক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা সর্বদাই বিচারসাপেক্ষও বটে। ইহা আয়ত্ত করিবার বাঁধাধরা কোন কায়দা বা কৌশল নাই। যাহাকে কলা বলা হয়, (যেমন বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্মাণ), তাহার একটা ফল (product) আছে, তাহা অনেক সময়ই একটা দ্রব্য (যেমন শাড়ী, বাড়ী)। কিন্তু নৈতিকতার ফল হইতেছে আদর্শনিষ্ঠ আচরণ। ইহা কোন বস্তু নয়, অবস্থাও নয়,—ইহা ক্রিয়া।[১৭]

নীতিবিদ্যাকে কি বিজ্ঞান বলা চলে?—Is Ethics a Science?—প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই বিষয়বস্তু, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক খণ্ডাংশ। আমরা বলিয়াছি, নীতিবিদ্যা

নীতিবিদ্যা কি বিজ্ঞান না দর্শন?

মানুষকে একটি বিশেষ দিক হইতে আলোচনা করে, সেটা হইল, মানুষের আচরণের ন্যায়-অন্যায়ের দিক। আচরণ বা Conductকে ম্যাথু আর্নল্ড বলিয়াছেন জীবনের তিন চতুর্থাংশ—three-fourths of life। কিন্তু ম্যাকেঞ্জী বলিলেন, আচরণই তো মানুষের সমগ্র জীবন। নীতিবিদ্যা, মানুষকে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের যাহা পরিচায়ক (অর্থাৎ নৈতিক আচরণ) তাহা দিয়াই বিচার করে। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গী সামগ্রিক। এবং এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দর্শনেরই বৈশিষ্ট্য। কাজেই নীতিবিদ্যাকে বিজ্ঞান না বলিয়া, দর্শনই বলা উচিত।[১৮] এই মত আংশিকভাবে সত্য। ইহা স্বীকার্য যে, নীতিবিদ্যার সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধ অন্যান্য বিজ্ঞান অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। একথা আদর্শানুসারী অন্য শাস্ত্রগুলি সম্পর্কেও বলা চলে। কিন্তু তথাপি আমরা নীতিবিদ্যাকে বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করিবারই পক্ষপাতী। দর্শন মানুষকে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তাহার স্থান নির্দেশ করে, তাহার মূল্য নির্ণয় করে। কিন্তু নীতিবিদ্যার কাজ এতটা ব্যাপক নয়। তাছাড়া আচরণই মানুষের সব, একথা বলা চলে না। মানুষের দেহের পরিবর্তন, তাহার সহজাত প্রবৃত্তি, আবর্তক্রিয়া, ইত্যাদি অনেকটাই অন্ধ ও যুক্তি-

১৭। Goodness is not a capacity or potentiality; but an activity. MacKenzie-A Manual of Ethics, P. 14

১৮। Ibid—P. 17-18

বিচারবহির্ভূত। ইহারা মানুষের ক্রিয়ার অঙ্গ হইলেও, ইহাদিগকে আচরণ বলা যায় না। কারণ, মানুষের আচরণ যুক্তি-বুদ্ধিচালিত। এমনকি যুক্তি-বুদ্ধিচালিত সমস্ত ক্রিয়াও মানুষের আচরণের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা নৈতিক দৃষ্টিতে নির্গুণ (neutral) হইতে পারে, তাহা আচরণে প্রতিফলিত না হইতে পারে। তাছাড়া নীতিবিদ্যার আলোচনায় আমরা বিজ্ঞান-অনুসৃত পদ্ধতিই অনুসরণ করিব, ইহার পথ সম্পূর্ণ ধ্যানের পথ (pure speculation) নয়। মানুষের প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অপরিহার্য, ইহা আমরা দেখিয়াছি। তবে পদার্থবিদ্যা বা অন্যান্য প্রাকৃত বিজ্ঞানের (natural sciences) মত নীতিবিদ্যায় পরীক্ষণ (experiment) ও নির্ভুল পরিমাপের (accurate measurement) প্রণালী ব্যবহার করা চলে না।

কি অর্থে ইহা বিজ্ঞান?

কোন আচরণের ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিচার যুক্তিনির্ভর, কিন্তু এখানে সহজাত অন্তর্দৃষ্টিও (intuition) প্রয়োজন। অন্তর্দৃষ্টির প্রণালী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রণালী হইতে অবশ্যই পৃথক।[১৮] কাজেই নীতিবিদ্যাকে অন্যান্য প্রাকৃত বিজ্ঞানের সমশ্রেণী বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। তথাপি বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষণগুলি ইহাতে বিদ্যমান বলিয়াই নীতিবিদ্যাকে আদর্শানুসারী বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করার আমরা পক্ষপাতী।

নীতিবিদ্যার প্রণালী

[নীতিবিদ্যার ছয়টি বিভিন্ন রূপ আছে: (১) বিভিন্ন দেশের নৈতিক আদর্শের বিবরণ—ইহা ঐতিহাসিক এবং অস্তিবাচক বৈজ্ঞানিক আলোচনা—a positive science of morals। এখানে কোন্ আদর্শ শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে কোন বিচার নাই। (২) কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ তাহার বিচার ও বিবরণ—the normative science of ethics।

নীতিবিদ্যার বিভিন্ন রূপ

(৩) নীতির শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলির যুক্তিযুক্ততা বিচার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের মূল সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের প্রয়াস—moral philosophy।

১৮। It may be suggested that the analysis which is used in the physical sciences, and which many moralists try to use in discovering the meaning of ethical terms, is not an appropriate method for ethical study at all ......It may be argued in reply that such analysis leads in ethics, as in other sciences, to a fuller understanding, and that the essential thing is only that our final moral judgment should be made on the whole action and not on its analysed elements. Such a final judgment must be intuitive, but it is an intuition modified by analysis and comparison.

Lillie—An Introduction to Ethics, Pp. 17-18

(৪) কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে, কোন্ নৈতিক আদর্শ, কি ভাবে প্রযোজ্য, দুই আদর্শের মধ্যে আপাত সংঘাতের ক্ষেত্রে কোন্ আদর্শ বলবত্তর হইবে, এ সব খুঁটিনাটি নির্দেশক শাস্ত্র—casuistry or applied ethics।

(৫) নৈতিক জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে উপদেশাবলী—moralizing or practical ethics—যথা, প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া, শৌচকর্মাদির পর উত্তম রূপে মুখ হাত পা প্রক্ষালন করিবে,—গুরুজনদিগকে প্রণাম করিবে, অতিথিকে কখনও অভুক্ত ফিরাইয়া দিবে না ইত্যাদি।

(৬) নৈতিক আদর্শের অনুসরণ—সৎজীবন যাপনের অভ্যাসগঠন—the art or practice of living a good life।

স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, আমরা দ্বিতীয় অর্থে নীতিবিদ্যাকে গ্রহণ করিয়াছি—Lillie —An introduction to Ethics, P. 14]

নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু ও পরিধি—The subject-matter and scope of Ethics—উপরের আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে নীতিবিদ্যার বিচার্য বিষয় কি কি।

নীতিবিদ্যার বিষয়-বস্তু ও সীমা

(১) ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় কাহাকে বলে? ইহাদের প্রকৃতি কি? নৈতিক বিচার (moral judgment) হইতে অন্যান্য বিচারের (logical judgment) প্রভেদ কোথায়? নৈতিক বিচারের বস্তু কি? নৈতিক বিচারের কি পৃথক কোন শক্তি আছে? ন্যায়-অন্যায় বিচারে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইতেছে, ন্যায়-অন্যায়ের মান নির্দেশ (standards of moral judgment)। আমরা দেখিব নৈতিক মূল্য-বিচারের বিভিন্ন মান বা আদর্শ আছে। এই আদর্শগুলির তুলনামূলক বিচার ও তাহাদের সমন্বয় সম্ভব কিনা, তাহা আলোচনা করিতে হইবে।

(২) নৈতিক আদর্শ নির্ণয় করিতে হইলে, মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে হইবে। নৈতিক আচরণ বিচার, যুক্তি ও ইচ্ছাসাপেক্ষ। মানুষের আচরণ সচেষ্ট ক্রিয়া (voluntary action)। ইহাদের প্রকৃতি-বিশ্লেষণ মনস্তত্ত্বের কাজ এবং এই মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা নীতিবিদ্যার পক্ষে অপরিহার্য।

(৩) নৈতিক আচরণ দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তির ক্রিয়া। যে কাজ বিচার-বিবেচনার পর, ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষ করে, তাহার জন্য মানুষের দায়িত্ব আছে। এ দায়িত্বের স্বরূপ বুঝিতে গেলেই মানুষের ব্যক্তিত্ব (personality), বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতা (rationality) এবং ক্রিয়াসম্পাদনে স্বাধীনতা (self-determination) স্বীকার করিতে হয়। ইহাদের আলোচনাও এই শাস্ত্রে না করিয়া উপায় নাই।

(৪) যাহা নৈতিক কর্ম, তাহা কর্তব্য—তাহার সম্পর্কে আমাদের দায় আছে, বাধ্যবাধকতা (moral obligation) আছে। সে দায় কাহার কাছে? অমোঘ নৈতিক বিধির (Moral Law) অধীন আমরা—দায় বিধাতার সেই বিধির কাছে। কাজেই নীতিবিদ্যার নৈতিক বিধির প্রকৃতি আলোচনাও করিতে হয়।

(৫) নৈতিক জীবনের সঙ্গে কতগুলি অনুভূতি ও গভীর আবেগ (sentiments) যুক্ত থাকে। নীতিবিদ্যায় তাহাদের প্রকৃতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

(৬) নৈতিক আচরণের সহিত পাপ-পুণ্যের প্রশ্নও জড়িত। তাহাও নীতি-বিদ্যার আলোচিতব্য বিষয়।

(৭) অনেক আচরণ গর্হিত। তাহার জন্য সমাজ দোষী ব্যক্তির শাস্তি বিধান করে। শাস্তির উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত তাহা নীতিবিদ্যার বিচার্য।

(৮) নৈতিক জীবন স্থিতিশীল নয়। নীতির শনৈঃ শনৈঃ উৎকর্ষ বা বিকাশ আছে। নৈতিক আদর্শের বিকাশ কোন দিকে, তাহাও আলোচনা করা প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্তসার

মানুষের একটা দিক হইল স্বার্থের সম্বন্ধের সাংসারিক দিক। এই দিক অর্থনীতির আলোচনার বিষয়। শারীরবৃত্ত মানুষের দেহ সম্বন্ধে, মনোবিদ্যা মানুষের মানস-ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করে। প্রত্যেক বিজ্ঞানই বিশ্বজগতের একটি বিশেষ দিক নিয়া সম্যক আলোচনা করে। নীতিবিদ্যাও মানুষের আচরণ নিয়াই আলোচনা করে। ইহার উদ্দেশ্য আচরণের আদর্শ-নির্ণয়। নৈতিক জীবন সমাজজীবনেব অন্তর্গত। সমাজের আধারেই মানুষের নৈতিক আচরণ। নৈতিক আচরণ সমাজের বিধিসম্মত এবং ইহার আদর্শ ক্ষুদ্র স্বার্থ নয়, মানুষের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণ। মানুষেব আচরণ পশুর ব্যবহার হইতে পৃথক। পশু সহজাত প্রবৃত্তির অন্ধ তাড়নায় কাজ করে, তাই তাহার কর্মের কোন নৈতিক মূল্য নাই। মানুষের আচরণ যুক্তি, বিচার, ইচ্ছা, অনুশীলন ও অভ্যাসের উপব নির্ভর করে। তাই ইহা তাহার চরিত্র বা ব্যক্তিত্বেব প্রকাশক। নীতিবিদ্যাব কাজ হইল, মানুষের আচরণের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নির্দেশ করা এবং কোন্ ভিত্তির উপর মানুষের আচরণের ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ নির্ভর করে, সেই মৌলিক বিধিগুলি নির্ধারণ করা, এবং তাহাদের যুক্তিযুক্ততা আলোচনা করা। ইহা সুসংবদ্ধভাবে মানুষের আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে, কাজেই ইহা বিজ্ঞান। কিন্তু অন্যান্য প্রাকৃত বিজ্ঞান কতগুলি নির্দিষ্ট দ্রব্য বা ক্রিয়ার প্রকৃতি বা স্বরূপ বাস্তবিক কেমন, তাহা জানিতে চেষ্টা করে, ইহাদের বলে positive sciences। কিন্তু নীতিবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মানুষের আচরণের প্রকৃতি-নির্ণয় নয়, তাহাদের আদর্শ-নির্দেশ। সুতরাং ইহা normative science।

নীতিই সম্পূর্ণ মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। পশুর নীতি নাই, নীতিবোধও নাই। নীতিবিদ্যা তাই একহিসাবে মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। নীতিবিদ্যা নৈতিক আদর্শের স্বরূপ, তাহাদের সত্যতা ইত্যাদি, বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া মানুষের নীতিবোধকে স্বচ্ছ করে। নীতিবিদ্যা পাঠেই মানুষ নীতিবান্ হইবে, এমন দাবি করা যায় না। কিন্তু ইহা পাঠে, অন্ততঃ ইহা আমরা বুঝিতে পারি যে, নৈতিক আদর্শগুলি অযৌক্তিক ও খামখেয়ালী নয়। ইহাতে আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রসার ও গভীরতা দুইই বৃদ্ধি পায়।

আদর্শের সঙ্গেই 'ভাল', 'ন্যায়' ইত্যাদি বিশেষণের সম্বন্ধ আছে। যাহা ভাল, তাহা কোন কাঙ্ক্ষণীয় উদ্দেশ্য সাধন করে, তাহা মূল্যবান্। নৈতিক আদর্শগুলিও আমরা পরম মূল্যবান্ মনে করি। ইহারা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন করে বলিয়া মূল্যবান্ নয়, তাহারা নিজেরাই উদ্দেশ্য, —তাই নিজ মূল্যেই তাহারা মূল্যবান্। 'ন্যায়' অর্থ হইল যাহা বিধিসম্মত। নৈতিক আচরণ ন্যায় আচরণ, কারণ তাহা নৈতিক বিধি অনুসরণ করে। নৈতিক আচরণের আদর্শ নির্বিরোধ 'ভালমানুষী' নয়। নীতির আদর্শ কর্ম, উদ্যম, ও সংগ্রামের আদর্শ। সমাজ-সংসার ত্যাগ করিয়া বিরোধ ও অপ্রিয়তা হইতে পলায়ন, নৈতিক জীবনের লক্ষণ নয়।

নীতিবিদ্যা আদর্শানুসারী হইলেও, কোন্ বিশেষ অবস্থায় কোন্ বিশেষ আচরণ আমরা করিব, তাহার খুঁটিনাটি নির্দেশ নীতিবিদ্যার কাজ নয়। কাজেই ইহাকে প্রয়োগবিদ্যা ঠিক বলা যায় না। তবে নীতিবিদ্যা শুধুই বুদ্ধির পরিতৃপ্তি খোঁজে না। তাহার আদর্শগুলি জীবনে প্রয়োগের জন্যই।

নীতিবিদ্যাকে একটি 'কলা' বলা চলে না। নৈতিক আচরণ কোন 'কৌশল' বা 'কায়দা' নয়। তাহা সৎবুদ্ধিপ্রসূত এবং প্রত্যেককেই তাহা নিজ চেষ্টায় আয়ত্ত করিতে হয়।

অন্যান্য প্রাকৃত বিজ্ঞানের মত নীতিবিদ্যায় পরীক্ষণ সম্ভবপর নয়। কিন্তু এ বিদ্যার ক্ষেত্রেও সুশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের স্থান আছে। কিন্তু কোন্ কাজ ভাল, কোন্ কাজ মন্দ, তাহা শুধুই বিচার দ্বারা বিশ্লেষণ দ্বারা নির্দেশ করা যায় না, তাহার জন্য বিবেকের অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। আবার নীতিবিদ্যার একটা দিক, দার্শনিক আলোচনা, তাহাতে নীতির শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলির যুক্তিযুক্ততা বিচার দ্বারা, সমগ্র বিশ্বের মূলসত্তার সঙ্গে তাহাদের যুক্ত করিয়া, মানুষকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিবার প্রয়াস হয়। সেই জন্য কোন কোন পণ্ডিত এই বিদ্যাকে নীতি-দর্শন বলার পক্ষপাতী।

নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু হইতেছে: (১) ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায়ের ধারণাগুলির বিশ্লেষণ ও বিচার, নৈতিক বিচারের স্বরূপ নির্ণয় এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন,—ন্যায়-অন্যায়ের শ্রেষ্ঠ মান কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা।

(২) মানুষের প্রকৃতি এবং সচেষ্ট ক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

(৩) নৈতিক আচরণের পিছনে আছে দায়িত্ববোধ। ইহার স্বরূপ বুঝিতে গেলে, ব্যক্তিত্ব, বিচারবুদ্ধি ও স্বাধীনতার ধারণাগুলির আলোচনা প্রয়োজন।

(৪) নৈতিক কর্মের জন্য দায় কাহার কাছে? এ প্রশ্নের বিচার, এবং এই প্রসঙ্গে যে নৈতিক বিধির কাছে এ দায়, তাহার স্বরূপ আলোচনা।

(৫) নৈতিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত অনুভূতি ও গভীর আবেগের স্বরূপ বিশ্লেষণ।

(৬) পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন আলোচনা।

(৭) নৈতিক আদর্শ লঙ্ঘনে শাস্তি, কোন্ উদ্দেশ্যে দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা।

(৮) নৈতিক আদর্শের বিকাশ ও ইহার গতি সম্বন্ধে আলোচনা।

Questions

1. What is Ethics ? What are the distinct characteristics of ethical study ?

2. "Ethics is a normative science, but not a practical science." Do you agree ? Discuss fully.

3. What are the uses of the study of Ethics ?

4. Indicate the scope of Ethics.

দ্বিতীয় অধ্যায়

নীতিবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান

[Mental Sciences : Psychology & Ethics, Sociology & Ethics, Politics & Ethics, Religion & Ethics, Metaphysics & Ethics]

মানুষের প্রকৃতি নিয়া যে বিজ্ঞানগুলি আলোচনা করে, তাহার মধ্যে মনোবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, অর্থবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা প্রধান। নীতিবিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যার সম্বন্ধ এখন আমরা আলোচনা করিব।

মনোবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা—Psychology and Ethics—মনোবিদ্যা মানুষের সমগ্র মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, মানুষের আন্তরিক প্রকৃতির স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করে। ইহা তাই একটি Positive Science— প্রকৃতি-নির্দেশক বিজ্ঞান। মানসিক অবস্থাগুলিকে তিনটি প্রধান দলে ভাগ করিয়া দেখা হয়, যথা, জ্ঞান (cognition), অনুভূতি (emotion) এবং উদ্যম বা ইচ্ছা (conation)। এই মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়াগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ-নির্ণয় এবং তাহাদের বিধিগুলির আবিষ্কার এই বিজ্ঞানেব কাজ। এই বিজ্ঞান ব্যক্তিকেন্দ্রিক (individualistic)। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র ও পৃথক। মনোবিদ্যা এই স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য ও ব্যক্তিত্বকে বুঝিতে চেষ্টা করে। ব্যক্তি-মানুষের মন নিয়াই এই বিজ্ঞানের সূত্রপাত, তাই ওয়ার্ড বলিয়াছিলেন,—The standpoint of Psychology is individualistic। অবশ্য কোন বিজ্ঞানই শুধু মাত্র ব্যক্তিকে নিয়া, বিশেষকে নিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বিশেষের মধ্যে যে ঐক্যের ও সামান্যের সূত্র (universality) আছে, তাহা আবিষ্কারই প্রত্যেক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের মন নিয়া মনোবিদ্যার আলোচনা শুরু হইলেও, সমস্ত মানুষের মনের সাধারণ বিধিগুলি কি, তাহা এ বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে, বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে চায়।

নীতিবিদ্যারও বিষয় মানুষের প্রকৃতি। কিন্তু এই বিদ্যার উদ্দেশ্য মানুষের প্রকৃতি-বিশ্লেষণ নয়, তাহার স্বরূপ-নির্দেশ নয়, তাহার আদর্শ-নির্দেশ। মানুষের যে ইচ্ছা ও উদ্যমের দিক, তাহা মনোবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা এ দুইয়েরই আলোচ্য সাধারণ বিষয় (the common subject of discussion)। কিন্তু মনোবিদ্যা জানিতে চায় মানুষের ইচ্ছা ও উদ্যমের স্বরূপটি কিরূপ (what is the nature

of human volition), আর নীতিবিদ্যা জানিতে চায়, মানুষের ইচ্ছা ও উদ্যম কোন আদর্শের দিকে ধাবিত হওয়া উচিত। একটির দৃষ্টিভঙ্গী প্রকৃতি-নির্দেশক (Positive) এবং আর একটির দৃষ্টিভঙ্গী আদর্শ-নির্দেশক (Normative)।[১] দুইটিই মানব-বিজ্ঞান ও মানস-বিজ্ঞান, কিন্তু এক হিসাবে মনোবিদ্যার বিষয়, নীতিবিদ্যার বিষয় হইতে ব্যাপকতর। মনোবিদ্যা মানুষের সমগ্র মনকেই জানিতে বুঝিতে চায়, কিন্তু নীতিবিদ্যা মানুষের উদ্যম ও ইচ্ছার দিকটাই বিবেচনা করে।

মানুষের আচরণই নীতিবিদ্যার বিশেষ আলোচনার বিষয়। অবশ্য নৈতিক আচরণের আলোচনায়, বিচার-বুদ্ধি বা আবেগের কথা সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না। তবে নীতিবিদ্যায় তাহাদের আলোচনা গৌণ। মনোবিদ্যা আজ প্রায় সম্পূর্ণভাবে দর্শনের প্রভাবমুক্ত, কিন্তু নীতিবিদ্যার আলোচনা দর্শন হইতে বিচ্ছিন্ন করা প্রায় অসম্ভব। নীতিবিদ্যা মানুষকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করে না, সমাজের অন্তর্গত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব হিসাবেই দেখে। আচরণের নৈতিকতা সামাজিক আধারেই হইয়া থাকে। মনোবিদ্যা কিন্তু ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নভাবেই বুঝিতে চেষ্টা করে।[২]

পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, মানুষের প্রকৃতিটি কি তাহা ঠিক করিয়া না জানিলে, মানুষের আচরণের আদর্শ নির্দেশ করা যায় না। সে হিসাবে নীতিবিদ্যা মনোবিদ্যার কাছে ঋণী।[৩]

সমাজবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যা—Sociology and Ethics—সমাজবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যা এ দুইটি বিদ্যাই মানুষকে গোষ্ঠিবদ্ধ জীব হিসাবে আলোচনা করে।

কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের পরিধি অনেক বেশী ব্যাপক। সমাজজীবনে মানুষ নানা বিচিত্র সম্বন্ধে যুক্ত হয়, বিভিন্ন মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া চালিত হয়, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বহু ধরনের সংস্থা ও সংগঠন গড়ে। সমাজজীবনে মানুষের সমস্ত সম্পর্ক নৈতিক নয়। সমাজে মানুষের স্বার্থের সম্বন্ধ আছে (economic relations),

---

১। Ethics inquires how we *ought* to will, not how we actually do will. Psychology, on the other hand deals with the process of volition as it actually occurs, without reference to its rightness or wrongness. Stout—Manual of Psychology (1910), P. 6

২। MacKenzie - A Manual of Ethics, P. 27

৩। কোন্ আচরণ ন্যায়, কোন্ আচরণ অন্যায়, তাহার নির্দেশ, অথবা এই ন্যায়-অন্যায় বিচারের যৌক্তিকতা-নির্ণয় মনোবিদ্যার বিষয়বহির্ভূত। তবে, ইহা সত্য যে, কোন আচরণের পশ্চাৎপটে যে মানসিক অবস্থা থাকে, তাহা সম্পূর্ণ জানিলে তাহার নৈতিক বিচার সহজ হয়—**While psychology cannot justify or condemn actions, it appears reasonable to think that the psychological explanation of an action may affect our ethical judgment of them. Lillie—An introduction to Ethics, P. 20**

শিক্ষার আয়োজন আছে, সংস্কৃতি চর্চা আছে, আনন্দ ব্যসন, এমন কি ব্যভিচারের প্রয়োজন মিটাইবারও নানা ব্যবস্থা আছে। সমাজবিজ্ঞান মানুষকে এ সমস্ত ক্রিয়া ও সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করে। কিন্তু নীতিবিদ্যা মানুষকে অনেক ছোট গণ্ডীর মধ্যে বিবেচনা করে। নৈতিক আচরণই এই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। সমাজবিজ্ঞান প্রধানতঃ প্রকৃতি-নির্দেশক (Positive) বিজ্ঞান, কিন্তু নীতিবিদ্যা হইতেছে, আদর্শ-নির্দেশক (Normative)। অবশ্য একথা বলা যাইতে পারে যে সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধের এবং মানুষের যত বিচিত্র ক্রিয়া আছে তাহাদের, কোন না কোন নৈতিক তাৎপর্য আছে; ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, এমন কি আনন্দেরও নৈতিক মূল্য আছে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান এই বিচিত্র সম্বন্ধ ও ক্রিয়াগুলিকে নৈতিক আচরণ হিসাবে বিচার করে না। সামাজিক ক্রিয়া হিসাবেই বুঝিতে চেষ্টা করে। সমাজজীবনের আদর্শ আলোচনাও সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয় বটে, কিন্তু ইহাই প্রধান বিষয় নহে।

সিজ্‌উইকের মতো কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, মানুষের নীতিবুদ্ধি সমাজ-জীবনেরই ফল, এবং নীতিবিদ্যাকেও তাই সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলা চলে।[৪] অবশ্যই ইহা স্বীকার্য যে মানুষের নৈতিক দোষগুণ, অভ্যাস, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গী বহুলাংশে সমাজজীবন দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা মানিতে হইবে যে নীতিবান্ মানুষ সমাজদ্বারা সম্পূর্ণভাবে গঠিত নয়। তাহা হইলে ব্যক্তির নিজ কর্মের জন্য কোন দায়িত্ব থাকিত না। সমাজজীবনের আধারেও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন বিচার-ক্ষমতা আছে, ইহাই তাহার নৈতিক জীবনের তাৎপর্য। নৈতিক আদর্শের মূল্য এই জন্যই যে, তাহা যান্ত্রিকভাবে ব্যক্তির উপর বাহির হইতে আরোপিত হয় না—তাহা ব্যক্তিকে নিজ চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়। সমাজবিজ্ঞান মানুষকে তাহার আচার, প্রথা ইত্যাদির মধ্য দিয়া বাহিরের দিক হইতে দেখে, কিন্তু নীতিবিদ্যা মানুষকে তাহার আন্তরিক বিশিষ্ট চরিত্রের দিক হইতেই বিচার করে।

নীতিবিদ্যার একটি প্রয়োগের দিক আছে (Practical interest)। ইহা শুধু বুদ্ধির তৃপ্তি, জ্ঞানস্পৃহার তৃপ্তি (theoretical interest) নয়। নীতিবিদ্যার

৪। We only know the individual man as a member of some society; what we call his virtues are chiefly exhibited in his dealings with his fellows, and his most prominent pleasures are derived from intercourse with them; thus it is a paradox to maintain that man's highest good is independent of his social relations, or of the constitution and condition of the community of which he forms a part. Sidgwick—Methods of Ethics.

আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করিবার আহ্বান ও দায়িত্ব আছে মানুষের অন্তরে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের এমন কোন আবেদন নাই।

রাষ্ট্রনীতি ও নীতিবিদ্যা—Politics and Ethics—সমাজের বিচারের ও শাসনের কেন্দ্রীভূত সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থার নাম রাষ্ট্র। রাষ্ট্র তাই সমাজ-জীবনেরই অঙ্গ। এবং রাষ্ট্রনীতি এক হিসাবে সমাজনীতির অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা তিন শাস্ত্রই মানুষকে গোষ্ঠিজীবনের অন্তর্গত করিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু তিনের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ আছে। রাষ্ট্রনীতি ও নীতিবিদ্যা দুইই মানুষের আচরণের বিচার করে এবং দুইই আচরণের মান-নির্দেশ করে। কিন্তু রাষ্ট্র মানুষের আচরণের বিচাব করে, আইনের মাপকাঠিতে; আর নীতিবিদ্ বিচাব করেন ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শের মাপকাঠিতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাহা আইনসঙ্গত, তাহা নীতিসঙ্গতও বটে। তথাপি এ দুই এক নয়। রাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিভঙ্গী হইতেছে, সাংসারিক প্রয়োজনের, কিন্তু নৈতিক আদর্শের উদ্দেশ্য হইতেছে সর্বাঙ্গীন শুভ ও মঙ্গলেব। বাজনীতিবিদ্ রাষ্ট্রের কোন সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যার প্রশ্রয় নিতে দ্বিধা করেন না। তিনি বলেন উদ্দেশ্য সাধু হইলে, উপায় অসাধু হইতে দোষ নাই (the end justifies the means)। কিন্তু নীতিবিদের কাছে সত্য বলিয়াই সত্য দামী।[৫] এবং উদ্দেশ্য সৎ হইলেও, যদি উপায় অসৎ হয়, তবে সে আচরণ নিন্দার্হ। কোন অবস্থায়ই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা চলিবে না।[৬]

রাষ্ট্রনীতি মানুষকে বাহিরের দিক হইতে, তাহার আচরণের ফলাফল অনুসারে বিচার করে; কিন্তু নীতিবিদ্যা মানুষকে বিচার করে, তাহার অন্তরের বিশুদ্ধতা দ্বারা। যদি শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া কাজ করিলেও, তাহা সমাজ বা রাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে, তবে রাষ্ট্র তাহাকে দণ্ডনীয় বলিয়া বিচার করিবে। কিন্তু নীতি-বিদ্যার মতে যে কর্ম শুভেচ্ছাপ্রণোদিত, তাহা শুভকর্ম,—তাহার ফলাফল যাহাই হোক না কেন।

রাষ্ট্রের শক্তির মূল পশুবল—দণ্ডদানের ক্ষমতা। রাষ্ট্রের প্রতীক তাই সেনাবাহিনী, পুলিস, আদালত। কিন্তু নৈতিক আদর্শের শক্তির মূল, শুভবুদ্ধির কাছে স্বেচ্ছায় ব্যক্তির আত্মসমর্পণ। রাষ্ট্র আইনের জোরে বাধ্যতা আদায় করে, আর নৈতিক আদর্শের কাছে স্বাধীন মানুষ স্বেচ্ছায় অবনত হয়। আইন দ্বারা

৫। The standard of Ethics is moral perfection, while that of Politics is expediency or public utility. Ethics aims at virtue. Politics aims at expediency. Sinha—A Manual of Ethics.

৬। Muirhead—Elements of Ethics, P. 40ff

মানুষকে জোর করিয়া নীতিবান্ করিয়া তোলা যায় না—**you cannot make men moral by Acts of Parliament**।

নৈতিক আদর্শের শক্তি ও মর্যাদা রাষ্ট্রপ্রণীত আইনের চেয়ে অনেক বেশী। বাস্তবিক পক্ষে, শুধু বাহুবলের উপর কোন রাষ্ট্র নির্ভর করিতে পারে না। নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন রাষ্ট্রই দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারে না।[৭]

রাষ্ট্রনীতির একটা বৃহৎ অংশ হইতেছে বিবরণাত্মক। তাহা প্রধানতঃ প্রকৃতি-নির্ধারক বিজ্ঞান (positive science) আর নীতিবিদ্যা হইতেছে আদর্শ-নির্দেশক বিজ্ঞান (normative science)।

এই দুই বিদ্যা পরস্পরনির্ভর। পূর্বেই বলা হইয়াছে রাষ্ট্রের আদর্শ নৈতিক আদর্শের অনুমোদন লাভ না করিলে, তাহা অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও তাহার নৈতিক পরিপূর্ণতা সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার শেষ উদ্দেশ্য হইতে হইবে।

আবার, বিপরীত দিকে ইহা বলা যায় যে, সুস্থ রাষ্ট্রব্যবস্থায়ই কেবলমাত্র ব্যক্তির সম্পূর্ণ নৈতিক বিকাশ সম্ভবপর। তাই প্লেটো মানুষের শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ আলোচনার ভিত্তিস্থাপন করিলেন সুস্থ, সবল, সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে—Republicএ। অ্যারিস্টটল্ এই মতেরই অনুসরণ করিয়া বলিলেন, নীতিবিদ্যা রাষ্ট্রনীতিরই অন্তর্গত। রাষ্ট্রনীতির পরিধি অ্যারিস্টটল্ অত্যন্ত ব্যাপক করিয়াই দেখিয়াছেন। প্রচলিত অর্থে রাষ্ট্রনীতিকে এমন ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখা হয় না।[৮]

নীতিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব—Ethics and Religion—নীতি ও ধর্ম দুইয়েরই উদ্দেশ্য মানুষের আত্মিক কল্যাণ। কেহ কেহ বলিবেন, নীতির উদ্দেশ্য ইহজগতে মানুষের কল্যাণ, আর ধর্মের উদ্দেশ্য হইতেছে পারত্রিক মঙ্গল। কিন্তু ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব নয়, উচিতও নয়। ঐহিক বিশুদ্ধ জীবনই আনন্দময় পারত্রিক জীবনের ভিত্তি। ধর্ম ও নীতি দুইয়ের জন্যই প্রয়োজন বিশুদ্ধ হৃদয় এবং নিঃস্বার্থ শুভকর্ম।

নীতি ও ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য আছে। নীতিবিদ্যা বলে, মানুষ নিজ প্রয়াস দ্বারা, সংগ্রামের মধ্য দিয়া নৈতিক জীবন লাভ করিবে। সমস্ত নৈতিক উদ্যমের

৭। Law and institutions, not based on moral principles, caunot endure long, for the most potent of all forces is the moral force of the world. Mitra—Elements of Morals, P. 74

৮। MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 32

পশ্চাতে থাকিবে স্বাধীন অহং-এর পুরুষকারে বিশ্বাস। আর ধর্মে হইল আত্মসমর্পণ, আত্মবিলোপ। ভক্ত বলেন,

'তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ
করুণাময় স্বামি!'

নীতিবিদ্যায় আদর্শ কথনোই সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় না, ইহা ক্রমশঃ আমাদের উচ্চতর আদর্শের দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু ইহা কখনও সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় না। নৈতিক জীবন তাই অতৃপ্তি ও সংগ্রামের জীবন। কিন্তু ধর্মে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া ভক্ত বলে,

'তোমার কোলে লুকিয়ে মাগো
ডাকবো শুধু মা মা ব'লে!'

এখানে সমস্ত উদ্যম ও সংগ্রামের সমাপ্তি। ইহা চির শান্তিতে আশ্রয়লাভ।[৯]

তাহাদের পার্থক্য সত্ত্বেও ধর্ম ও নীতি পরস্পরবিরোধী নয়। বাস্তবিকপক্ষে তাহাদের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। পেলী (Paley) বা দেকার্তের মতে ধর্মই হইতেছে নীতির উৎস। সমস্ত নৈতিক আদর্শের মূল হইতেছেন ঈশ্বর—তিনি সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম। সমস্ত নৈতিক উদ্যমের পরিসমাপ্তি ভগবদ্-প্রাপ্তিতে—ধর্মজীবনে। মার্টিন্যু (Martineau) বলেন, নীতিবোধের মূল হইতেছে, ব্যক্তির নিজ কর্মের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ। কিন্তু এ দায় কাহার কাছে? ঈশ্বর, যিনি নৈতিকবিধানের উৎস, তাঁহার কাছেই মানুষের এই দায়। নীতিবোধ বিশুদ্ধ জীবনের গোড়ার কথা, কিন্তু তাহার শেষ পরিণতি ধর্মে।

আবার ধর্মও নীতিবিরোধী বা নীতিবিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখি, অনেক তথাকথিত ধর্মীয় প্রথা, আচার, ক্রিয়া সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ, যথা—সতীদাহ, জাতিভেদ। এখানে ইহা নিঃসন্দেহেই সত্য যে, এই প্রথা-আচারগুলি 'ধর্মের নামে' হইলেও, ইহারা ধর্মের প্রাণহীন খোলস মাত্র—ইহারা প্রকৃত ধর্ম নয়। কান্ট ইয়োরোপীয় দর্শনের ক্ষেত্রে নীতিবোধকে উচ্চমর্যাদার আসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। নীতিবোধই ধর্মের সোপান। আমাদের নীতিবোধের মধ্যে এ নিশ্চিত প্রত্যয় থাকে যে, নৈতিক জীবন একদিন না একদিন পুরস্কৃত হইবেই, কোথায়ও না কোথায়ও নীতি এবং সুখের মিলন ঘটিবে। অনেক সময়ই আমরা সংসারে দেখি সাধু মানুষ দুঃখ পায় এবং দুর্জন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু এই অবিচার, চিরন্তন

৯। **Morality lives in the arena of human effort and conflict, its field is a field of battle. But religion is victory and peace. It is confidence and repose due to faith in the conservation or conservator of value. Edwards—The Philosophy of Religion, P. 166**

রীতি হইতে পারে না। এই জীবনেই সমস্ত হিসাবনিকাশ হইয়া যায় না। এই জীবনের পরপারে যে মহান্ বিচারক সাধুকে পুরস্কৃত করেন, যিনি আদর্শনিষ্ঠ নীতিবানের মস্তকে এই জীবনের পরপারে জয়ের মুকুট পরাইয়া দেন, তিনিই ভগবান্। তাঁহার অভ্রান্ত বিচার এবং তাঁহার অতুলনীয় মহত্ত্বে বিশ্বাসই ধর্ম। তাই আদর্শ জীবনের প্রস্তুতি নীতি-অনুসরণে, এবং তাহার শেষ পুরস্কার ধর্মলাভে। ধর্মের মূলে আছে অনন্ত জীবনে বিশ্বাস, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। এই পৃথিবীর সীমিত জীবনে আদর্শের পূর্ণতা, জ্ঞানের পূর্ণতা, সৌন্দর্যের পূর্ণতা কখনও সম্ভবপর নয়। নীতির অনুসরণ সেই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত পূর্ণতা, অনন্ত সৌন্দর্য জীবনে রূপায়ণের পথে ক্রম অগ্রসরমান পদযাত্রা। ধর্ম ও ভগবদ্প্রাপ্তিতেই এই যাত্রাব অবসান।

কাজেই নীতি ও ধর্ম পবস্পর-নির্ভরশীল। কিন্তু এ দুই এক নয়। স্লিয়ার-মেকার বলিযাছিলেন, শুধু নীতি, ধর্মের স্থান অধিকার করিতে পারে না। ধর্ম ও নীতি দুইই এক চরম সত্যবস্তুকে স্বীকার করে, কিন্তু ধর্মের মধ্যে সেই সত্যবস্তুর সঙ্গে অনুভূতিব দ্বারা এক হইবার যে আনন্দ ও প্রত্যয় আছে, শুধুমাত্র নীতিতে তাহা নাই। ধর্মের মধ্যে তাই এক অতীন্দ্রিয় উপাদান আছে, যাহা নীতির মধ্যে নাই। নীতির আদর্শ যাহা শুভ, যাহা শিব, কিন্তু ধর্মের আদর্শ মহত্তব, তাহা হইতেছে সত্য, শিব ও সুন্দরের সমন্বয়।[১০] নীতি মানুষকে মানুষের সঙ্গে যুক্ত করে সমাজজীবনে, আর ধর্ম মানুষকে যুক্ত করে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে, আর নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ভগবানের সাথে।

নীতিবিদ্যা ও অধিবিদ্যা—Ethics and Metaphysics—যে বিদ্যা জগৎ ও জীবনেব গভীরতম সমস্যাগুলি আলোচনা দ্বারা একটি সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বুঝিতে চেষ্টা করে, তাহার নাম দর্শন বা অধিবিদ্যা। অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্যতম হইল, এমন সব আদর্শ, যাহাদের চিরন্তন মূল্য আছে। নৈতিক আদর্শ এমনই একটি চিরন্তন মূল্য। সেই হিসাবে অনেক পণ্ডিতের মতে নীতিবিদ্যা দর্শনেরই একটি শাখা। কিন্তু বর্তমানের অধিকাংশ পণ্ডিতই ইহাকে আদর্শানুসারী **বিজ্ঞান** হিসাবেই গণ্য করিয়াছেন।

সমস্ত বিজ্ঞানই চূড়ান্তভাবে দর্শনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আদর্শানুসারী বিজ্ঞানগুলির দর্শনের সম্বন্ধে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। নীতিবিদ্যায় যে আদর্শের কথা আলোচনা করা হয়, তাহাদেব সত্যতা (validity) ও স্বরূপ-নির্ধারণ দর্শনের বিবেচ্য বিষয়। নৈতিক আদর্শের স্বরূপ ও মূল্য বুঝিতে গেলে, জগৎ, জীবন,

১০। Edwards—The Philosophy of Religion, P. 164-166

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও পরমেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তাহা বুঝিতে হয়। বিশেষতঃ নীতিবিদ্যা আলোচনায় এই দার্শনিক প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হইতে হয়—(১) ব্যক্তি-সত্তার স্বরূপ কি, তাহা কি শুধু ইন্দ্রিয়চালিত, না বিচারচালিত ; না ইন্দ্রিয় ও বিচার এই দুই দ্বারাই সম্মিলিতভাবে চালিত ? ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য না স্বীকার করিলে, নৈতিক বিচারের অস্তিত্বই থাকে না।

(২) ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই যুক্ত থাকে, ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা (freedom of the will) এবং দায়িত্ববোধ (sense of responsibility)। ব্যক্তির যদি স্বাধীন ইচ্ছার ক্ষমতা না থাকে, তবে নৈতিক জীবনও সম্ভব হয় না।

(৩) ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে জগতের কি সম্বন্ধ ? জগতে নৈতিক আদর্শের কি কোন মূল্য আছে ? জগৎ কি কতগুলি অন্ধ শক্তি দ্বারা চালিত, না ইহা কোন মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছাক্রমে, নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে চালিত হইতেছে ?

(৪) ব্যক্তি ও সমাজ কি ভাবে যুক্ত ? স্বার্থসিদ্ধি ও সাংসারিক সুবিধার জন্যই কি মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ ? ব্যক্তির সুখ বড়, না সমাজের মঙ্গল বড় ? না কি সমাজের সেবার মধ্য দিয়াই ব্যক্তির সম্পূর্ণ ও সার্থক আত্মবিকাশ সম্ভব ?

(৫) যে ভগবৎসত্তা জগৎ ও জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, তাহার সহিত নৈতিক আদর্শের সম্বন্ধ কি ? নৈতিক আদর্শ কি মানুষের অলীক কল্পনা, না ইহা কোথায়ও পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হইয়া চিরন্তনভাবে সত্য হইয়া বিরাজমান ?

এ প্রশ্নগুলির সুমীমাংসা নীতিবিদ্যার সম্যক আলোচনার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন।

নীতিবিদ্যা দর্শনের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু ইহারা অভিন্ন নয়। ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও লক্ষণীয়।

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই দর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তু, কাজেই তাহার পরিধি নীতিবিদ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক। নীতিবিদ্যার আলোচ্য, মানুষের আচরণ ও তাহার আদর্শ। এই আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা দর্শনেরও একটি প্রধান শাখা (axiology)। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে শুধু আচরণের শুভ আদর্শই (the ideal of goodness) বিবেচিত হয় না, সত্য ও সুন্দরের আদর্শও (ideals of truth and beauty) আলোচিত হয়।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার উদ্দেশ্য শুদ্ধজ্ঞান-লাভ, বুদ্ধির তৃপ্তি। কিন্তু নীতিবিদ্যায় আচরণের, আদর্শের আলোচনা শুধুই বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদ্দেশ্যে নয়। তাহা জীবনে প্রয়োগেরও দায়িত্ব আছে।

সংক্ষিপ্তসার

মানুষ নিয়া, এবং মানুষেব মন নিযা যে সমস্ত বিদ্যা আলোচনা করে তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে মনোবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম ও অধিবিদ্যা বা দর্শন। নীতিবিদ্যাও এই দলেরই অন্তর্গত, এবং ইহাদেব প্রত্যেকেব সহিতই নীতিবিদ্যার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

মনোবিদ্যা মানুষকে ব্যক্তিহিসাবে আলোচনা করে, ইহার বিষয়বস্তু মানুষের মনের সমস্ত অবস্থা ও ক্রিয়া। ইহা একটি প্রকৃতি-নির্দেশক বিজ্ঞান।

নীতিবিদ্যা মানুষকে সামাজিক জীব হিসাবে বিবেচনা করে, এবং ইহার দৃষ্টিভঙ্গী আদর্শ-অনুসারী। নীতিবিদ্যা মনোবিদ্যার মত মানুষেব সমগ্র মন নিয়া আলোচনা করে না—ইহা শুধুমাত্র মানুষের আচরণের আদর্শ নিয়াই আলোচনা কবে। নৈতিক আচরণের সঙ্গে যুক্ত গভীর আবেগ এবং আদর্শ সম্বন্ধে যুক্ত বিচার-বিবেচনা ও ইচ্ছা সম্বন্ধেও অবশ্য প্রসঙ্গতঃ এই শাস্ত্রেব আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু ইহাব আলোচনার মুখ্য বিষয় হইতেছে, মানুষের মনের একটি দিক মাত্র,—তাহা হইল,—আচরণের সঙ্গে যুক্ত ইচ্ছা।

নীতিবিদ্যায় আচরণেব আদর্শ নির্ণয করিতে হইলে, মানুষের প্রকৃতি কি, এই মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন প্রথমে মীমাংসা করিতে হয়, কাবণ কোন জিনিসের আদর্শ কি হওয়া উচিত, তাহা তাহার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং নীতিবিদ্যা মনোবিদ্যার কাছে ঋণী।

সমাজবিজ্ঞান এবং নীতিবিদ্যা এই দুই বিদ্যাই গোষ্টিবদ্ধ মানুষকে নিয়া আলোচনা। সমাজবিজ্ঞানের বিস্তার অনেক বেশী ব্যাপক। কারণ মানুষ মানুষের সঙ্গে যতপ্রকার বিচিত্র সম্বন্ধে ও সংগঠনে মিলিত হইতে পারে, তাহার সবই সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। সমাজবিজ্ঞানেব অধিক অংশ প্রকৃতি-নির্দেশক, সামান্য অংশ আদর্শ-অনুসারী : নীতিবিদ্যা সম্পূর্ণ ভাবেই আদর্শ-নির্দেশক। সমাজবিজ্ঞান মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে অনেকটা বাহির হইতে দেখে, কিন্তু নীতিবিদ্যা মানুষকে বিচাব কবে আন্তরিক শুচিতাব দিক হইতে। সমাজ-বিজ্ঞানে কোন প্রয়োগেব দিক নাই—নীতিবিদ্যার আদর্শ জীবনে প্রয়োগের দাবি রাখে।

রাষ্ট্রনীতিও মানুষকে সমাজ-সম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দেখে। রাষ্ট্র সমাজের শক্তি ও শাসনের দিক। রাষ্ট্রবন্ধনের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রজার সাংসারিক স্বার্থরক্ষা ও তাহাকে বহিরাক্রমণ ও দেশের ভিতরের বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করা। রাষ্ট্রের আদর্শ নিজ স্বার্থ ও গৌরববৃদ্ধি, তাহার অস্ত্র হইল কৌশল ও শঠতা। নীতির আদর্শ হইল সত্য ও সুবিচার, তাহার পথ হইল বিশুদ্ধ ও সরল আচরণ। রাষ্ট্রনীতির প্রধান অংশ হইল, প্রকৃতি-নির্দেশক। নীতিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইল আদর্শানুসারী। রাষ্ট্রনীতি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে বাহির হইতে দেখে আইনের দৃষ্টিতে, নীতিবিদ্যায় মানুষকে অন্তরের দিক হইতে বিচার করে, আদর্শের ও আচরণের বিশুদ্ধতা দ্বারা।

এই দুই বিদ্যা পরস্পরনির্ভর। সুপরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থায়ই মানুষের সম্পূর্ণ নৈতিক বিকাশ সম্ভব। আবার রাষ্ট্রও নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে স্থায়ী হইতে পারে না।

নীতি ও ধর্ম দুইয়েরই উদ্দেশ্য মানুষের আত্মিক কল্যাণ। কিন্তু দুইয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য আছে। নীতি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের আদর্শ-নির্দেশ করে। ধর্ম মানুষকে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করে। নীতিবিদ্যা অহংএর উদ্যম ও পুরুষকারে বিশ্বাসী। ভক্ত ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণ করিযা আত্মবিলোপ-প্রয়াসী। নৈতিক জীবন হইল সংগ্রামের ক্ষেত্র, ধর্ম হইল শান্তি ও বিশ্রামের আশ্বাস।

নীতির আশ্রয় ধর্ম। ঈশ্বরই সমস্ত আদর্শের উৎস। কাজেই ধর্মেই নৈতিক জীবনের শেষ পরিণতি। আবার নীতিহীন ধর্ম মিথ্যা প্রাণহীন আচার মাত্র।

সমস্ত বিদ্যারই ভিত্তি অধিবিদ্যা বা দর্শন। নীতিবিদ্যা আদর্শানুসারী বিজ্ঞান বলিয়া অধিবিদ্যার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ অনেক নিবিড়।

অধিবিদ্যা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিতে চেষ্টা করে। অধিবিদ্যার একটা অংশ আদর্শ সম্বন্ধে বিচার—তাহাতে আচরণের আদর্শ, জ্ঞানের আদর্শ, সৌন্দর্যের আদর্শ সবই অন্তর্ভুক্ত। নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় শুধুমাত্র আচরণের আদর্শ।

ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, স্বাধীন ইচ্ছা, দায়িত্ব, ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ ইত্যাদি বহু দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা নীতিবিদ্যার পক্ষে অত্যাবশ্যক। নীতিবিদ্যায় আদর্শের সত্যতা ও যুক্তিযুক্ততা দর্শনের আলোচনার বিষয়। নীতিবিদ্যা দর্শনশাস্ত্রের কাছে তাই গভীরভাবে ঋণী।

Questions

1. Indicate the distinction between Ethics & Politics. How are they related to one another?
2. Show why a knowledge of Psychology is necessary for Ethical study.
3. Indicate the true relation between morality and religion.
4. How is Ethics related to Philosophy?

তৃতীয় অধ্যায়

ক্রিয়া—নৈতিক ও না-নৈতিক

Actions : Moral and non-moral

[Moral action—narrow & wide sense, Non-moral actions. Moral actions are voluntary actions. Analysis of voluntary actions—three stages. Spring of action, desire, conflict of desires, deliberation, decision, determination. Analysis of desire, universe of desire, desire and end ; desire, wish & will. Motive—Is pleasure the motive of actions ? Psychological hedonism—paradox of hedonism—Motive & Intention.]

নীতিবিদ্যার কাজ, ক্রিয়ার নৈতিকতা বিচার এবং তাহার আদর্শ-নির্ণয়। কোন্ কাজকে আমরা ভাল বলিয়া প্রশংসা, অথবা মন্দ বলিয়া নিন্দা করিতে পারি? কোন জড়বস্তু বা ইতর প্রাণীর ক্রিয়াকে আমরা নৈতিক মানে বিচার করি না। যদি ভূমিকম্পে সহস্র প্রাণীর মৃত্যু হয়, দশ সহস্র গৃহ বিধ্বস্ত হয়, তবে তাহা নিয়া আমরা দুঃখ করিতে পারি, কিন্তু এ কথা বলি না, 'ভূমিকম্প অত্যন্ত অন্যায়'। আবার গোরু ঘোড়া গৃহপালিত জন্তুদের আমরা ভালবাসি, তাহাদের নিকট হইতে অনেক উপকারও পাই, তথাপি এ কথা বলি না, যে গোরু দুধ দিয়া অত্যন্ত 'সৎ' কাজ করিতেছে,—তাহার কাজ খুব 'ন্যায়'। অর্থাৎ, **মানুষের কাজেরই নৈতিক বিচার হয়।**

Non-moral actions : actions of immature children

আবার, অল্পবয়স্ক বালক যদি কৌতূহলবশতঃ ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়, এবং তাহার ফলে, একটি গ্রাম পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, ফলটা যতই দুঃখজনক হউক না কেন, সেই ছোট ছেলের জেল জরিমানা হইবে না। তাহার কারণ শিশুর বুদ্ধি অপরিণত, এবং তাহার ক্রিয়ার নৈতিক বিচার চলে না।

Of the insane and the feeble-minded

অনুরূপ কারণে অপ্রকৃতিস্থ উন্মাদের ক্রিয়া যতই সাংঘাতিক বা সুফলপ্রসূ হউক না কেন, তাহার নৈতিক মূল্য নাই। কাজেই বুঝিতেছ যে, অপরিণত বুদ্ধি-প্রসূত ক্রিয়ার, অথবা জড় বা বিকৃত বুদ্ধি-সঞ্জাত ক্রিয়ারও ন্যায়-অন্যায় বলিয়া নিন্দা বা প্রশংসা করা যায় না। **সুস্থ, পরিণত মানুষের কাজেরই নৈতিক মূল্য আছে।**

পরিণত মানুষেরও সব কাজ, 'ভাল-মন্দ' বলিয়া নৈতিক বিচার হয় না। সহজ প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়া (Instinct—যথা, ক্ষুধার্ত হইলে খাদ্যগ্রহণ, ভয় পাইলে

পলায়ন); আবর্তক্রিয়া (Reflex action—যথা, নাকে নস্য ঢুকিলে হাঁচা, তীব্র আলো পড়িলে চোখ বুজিয়া ফেলা); চিন্তামাত্র ক্রিয়া (ideo-motor action—যথা, সিগারেট জ্বালাইয়া দেশলাই পকেটে পোরা ইত্যাদি) যান্ত্রিক ক্রিয়াগুলিরও কোন নৈতিক বিচার (moral judgment) হয় না।[১] অর্থাৎ, **পরিণত বুদ্ধ মানুষের বুদ্ধিচালিত ক্রিয়ারই নৈতিক বিচার চলে।** এই সব ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধেই বলা যায় যে, এগুলি ন্যায় বা অন্যায়।

Instincts, Reflex actions, ideo-motor actions.

প্রবলতর ব্যক্তি, জোর করিয়া, তাহার ক্ষমতার অধীন কোন দুর্বলকে দিয়া কোন গর্হিত কাজ করাইলে, সে দুর্বল ব্যক্তিকে একাজের জন্য দায়ী করা বা নিন্দা করা যায় না। যে কাজ স্বাধীন মানুষ স্ব-ইচ্ছায় করে, তাহার জন্যই তাহার নৈতিক বিচার হইতে পারে।

[Moral, Immoral ও Non-moral এই তিনটি কথার তাৎপর্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন। Moral কথাটি সংকীর্ণ অর্থে, সেই ক্রিয়াগুলিকেই বোঝায়, যেগুলি প্রশংসাযোগ্য, নৈতিক বিচারে যাহাদের 'ভাল' বা ন্যায় বলা যায়। কিন্তু এই অধ্যায়ে Moral কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হইতেছে। **Moral বলিতে ন্যায় ও অন্যায় সমস্ত ক্রিয়াই বোঝায়।** যে ক্রিয়া সম্বন্ধে নৈতিক বিচার (ভাল-মন্দ) প্রয়োগ করা যায়, তাহাই Moral action। তাই, অন্ধজনে দয়া করাও Moral action, দরিদ্রের ধন অপহরণ করাও Moral action।

Moral, Immoral, Non-moral

সংকীর্ণ অর্থে Moral কথার বিপরীত হইতেছে Immoral বা অনৈতিক। ইহার অর্থ হইল এমন ক্রিয়া, যাহা নৈতিক বিচারে নিন্দনীয়, যাহা মন্দ, যাহা অন্যায়। **কাজেই চুরি করা ব্যাপক অর্থে Moral, এবং সংকীর্ণ অর্থে Immoral।**

ব্যাপক অর্থে Moral কথার বিপরীত হইল Non-moral বা না-নৈতিক। ইহার অর্থ এমন ক্রিয়া, যাহা ভালও নয় মন্দও নয়, অর্থাৎ এমন ক্রিয়া যাহার নৈতিক বিচার চলে না, যেমন শিশুর কোন ক্রিয়া, অথবা সহজ প্রবৃত্তি-সঞ্জাত ক্রিয়া—instincts।]

১। The thought of the cold wind blowing in at the door of my study may make me rise automatically and move toward the door in order to shut it without there being any conscious desire in my mind to do so......in so far as the ideo-motor action is automatic, it tends to be involuntary. It is only when conscious desire affects the action, as in my conscious desire for fresh air......that the ideo-motor action becomes a voluntary action and so within the sphere of ethics. Lillie—An Introduction to Ethics, P. 21-22

কাজেই সেই ক্রিয়া সম্বন্ধেই নৈতিক বিচার সম্ভব, যাহা প্রাপ্ত (adult) সুস্থ (normal) মানুষ বিচার-বিবেচনার ফলে স্বেচ্ছায় করে (voluntary actions)। এ সমস্ত কাজের জন্য ব্যক্তিকে দায়ী করা যায়।

যে সমস্ত ক্রিয়া অন্ধ ও যান্ত্রিক ভাবে সম্পন্ন হয়, তাহারা **স্বেচ্ছাকৃত** নয়, (non-voluntary actions)—তাহাদের সম্বন্ধে কোন নৈতিক বিচার হয় না। অভ্যাসজাত ক্রিয়াও (habits) চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়। সিগারেটখোর খাওয়ার পর সিগারেট টানে, এখানে কোন চিন্তা-ভাবনা প্রয়োজন হয় না। বারে বারে অনুশীলনের ফলে, এ জাতীয় ক্রিয়া প্রায় অন্ধভাবেই নিষ্পন্ন করা যায়, কিন্তু তাহা হইলেও **অভ্যস্ত ক্রিয়া সম্বন্ধে নৈতিক বিচার প্রয়োগ করা হয়,**—আমরা বলি, মদ্যপানের অভ্যাস নিন্দনীয়। অভ্যস্ত ক্রিয়া প্রায় অন্ধ ও যান্ত্রিক হইলেও নৈতিক বিচারসাপেক্ষ। তাহার কারণ, অভ্যাসের গোড়াতে থাকে সচেতন চেষ্টা। সিগারেট খাওয়া যে অভ্যাস করিল, গোড়াতে তাহাকে গুরুজনের চোখ এড়াইয়া, কুসঙ্গীদের প্ররোচনায় ইহা চেষ্টা করিয়া, সচেতন ভাবে ও স্বেচ্ছায়ই শিখিতে হইয়াছে। অভ্যাস গঠিত হইলেও, ব্যক্তি নিজ চেষ্টা দ্বারা সে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, কু-অভ্যাস পরিত্যাগ, প্রবল ইচ্ছাশক্তির পরিচায়ক এবং দৃঢ় চরিত্রবত্তা সূচনা করে।

স্বেচ্ছাকৃত বা চেষ্টিত ক্রিয়ার বিশ্লেষণ—Analysis of voluntary action—দিল্লীতে এক সভাতে বক্তৃতা শুনিতে গেলাম। প্রধানমন্ত্রী নেহরু চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্য অকাতরে দান করিবার জন্য আবেদন করিলেন। তিনি চাহিলেন দেশের জন্য অলংকার, অর্থ, বস্ত্র, রক্ত ও শ্রম। একজন আমার মতো মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হাতের সোনার বালা খুলিয়া দিল, একজন ধনী মারোয়াড়ী একলক্ষ টাকার চেক্ লিখিয়া দিল, একটি ছোট ছেলে তাহার গায়ের গরম আলোয়ানটি দান করিল, কয়েকটি মেয়ে তাহাদের টিফিনের পয়সা একত্র করিয়াছিল, তাহা দিল। আমারও ইচ্ছা হইল কিছু দান করি, সঙ্গে আমার টাকা পয়সা গহনা কিছু নাই। চিন্তা করিয়া দেখিলাম, সকলেরই দেশের জন্য কিছু কিছু ত্যাগ করিতে হইবে, নেফায় ও লদাখে আমাদের বহু জোয়ান গুরুতর আহত হইয়াছে, তাহাদের জন্য রক্ত চাই। একটু ভয় হইল, সূচের খোঁচা লাগিবে, শরীর দুর্বল হইবে, ইত্যাদি। একটু দ্বিধার পরই মন স্থির করিলাম, আগাইয়া গিয়া ডাক্তারকে বলিলাম, আমি দেশের জন্য রক্ত দিতে চাই, হাত বাড়াইয়া দিলাম। তিনি রক্ত নিলেন।

Voluntary action : an example

উপরে যে চেষ্টিত ক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া হইল তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এ জাতীয় ক্রিয়ার তিনটি স্তর থাকে : (১) মানসিক প্রস্তুতির স্তর (mental stage of preparation), দৈহিক সক্রিয়তার স্তর (organic stage) এবং বাহ্যজগতে পরিবর্তনের স্তর (extra-organic stage)। কোন কাজ যখন স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে করা হয়, তখন অভাববোধ, অস্বস্তি, কি ভাবে সেই অভাব ও অস্বস্তি দূর হইবে, সে সম্বন্ধে চিন্তা, অভাব দূর করিতে সক্ষম এমন অভীপ্সিত দ্রব্য সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা, বিপরীত আকাঙ্ক্ষাগুলির মধ্যে বিরোধ, বিভিন্ন পথ সম্পর্কে বিবেচনা, সংকল্প ইত্যাদি কতগুলি মানসিক অবস্থা একটির পর আর একটি অনুসরণ করে। এই অবস্থাগুলি সমগ্রভাবে মনেরই নানা পরিবর্তন। এ অবস্থা বা পরিবর্তনগুলিকেই মানসিক স্তর বলা হইয়াছে।

Three stages :
(a) Mental
(b) Organic
(c) Extra-organic

ইহার পরের স্তর হইতেছে, সংকল্পকে রূপায়িত করিবার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া যেমন, ডাক্তারের কাছে হাঁটিয়া গেলাম, তাঁহাকে রক্তদান করিবার সংকল্প জানাইলাম, রক্ত দান করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলাম।

সকলের পরের স্তর হইতেছে, কর্মের সমাপ্তি। এই স্তরে দৈহিক ক্রিয়া দ্বারা বাহ্যজগতে কিছু পরিবর্তন সাধন করি, তাহার দ্বারা উদ্দিষ্ট ফল লাভ করি অথবা বিফল হই। এখানে সংকল্পের সমাপ্তি যেমন, ডাক্তার সিরিঞ্জ দিয়া আমার হাতে সূচ ফুটাইয়া রক্ত টানিয়া নিলেন। সব ক্ষেত্রেই যে চেষ্টা সফল হয় তাহা নয়। যেমন, চাকুরীর জন্য বহু চেষ্টার পর Interviewর সুযোগ মিলিল। কিন্তু চাকুরী মিলিল না।

নীতিবিদ্যায় যখন আমরা সচেষ্ট ক্রিয়ার বিশ্লেষণ করি, তখন উপরোক্ত তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথম স্তর সম্বন্ধেই বিবেচনা করিব। কেননা, কোন আচরণের নৈতিকতা বিচারে আমাদের মানসিক স্তরই বিবেচ্য। ফললাভ করিতে সমর্থ হইলাম কিনা, তাহার উপর কর্মের ন্যায়-অন্যায় নির্ভর করে না। চোর যদি চুরি করিতে সক্ষম নাও হয়, তথাপি সে যে চুরির সংকল্প করিয়াছিল, তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং কাহারও কোন বাস্তবিক ক্ষতি না হইলেও, তাহার কাজটি অন্যায়, তাহা নিন্দনীয়।

Analysis of the mental stage

এবার মানসিক স্তরের বিভিন্ন অবস্থাগুলির ক্রম আলোচনা করা যাক।

প্রথম হইল অভাববোধ। তুমি একটি মেয়ের পরনে নূতন ফ্যাসানের একখানা শাড়ী দেখিয়া ভাবিলে, 'আহা! এমন সুন্দর শাড়ী আমার একখানাও

নাই।' এ রকম অভাববোধ ও তাহার জন্য কিছু মানসিক অশান্তি না হইলে কর্মের উদ্যম আসিতে পারে না। কাজেই অভাববোধটা শুধুই বুদ্ধিদ্বারা বিশ্লেষণ নয়, তাহা অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত থাকা চাই, কিছু পীড়া জন্মানো চাই। তবেই তাহা কর্মে প্রবৃত্ত হইবার প্রেরণা যোগাইতে পারে (spring of action)। অভাবটা বাস্তব হইতে পারে, কাল্পনিকও হইতে পারে। ইহা অন্ধ জৈব ব্যাপার হইতে পারে, সহজ প্রবৃত্তিজাত হইতে পারে, অথবা সচেতনভাবে অনুভূত হইতে পারে।

Feeling of want (spring of action)

যখন তাহা সচেতন ভাবে অনুভূত, তখনই তাহাকে আকাঙ্ক্ষা বা desire নাম দেওয়া হইয়া থাকে। পশুর ক্ষুধা-তৃষ্ণাজনিত অভাব ও অস্বস্তির অস্পষ্ট বোধকে বলা হয় appetite। ইহাকে অস্পষ্ট বা অন্ধ বলা যায় এই জন্য যে, পশু কিসে তাহার অভাব ও অস্বস্তি দূর হইবে তাহা স্পষ্ট বা সচেতন ভাবে মনের মধ্যে জানে না। ক্ষুধা পাইলে ক্ষুধার তৃপ্তি যে দ্রব্য দ্বারা ঘটে, সে বস্তুর কাছে অন্ধ তাড়না দ্বারাই সে নীত হয়। স্পষ্ট চিন্তা দ্বারা সে অভাব পরিপূরক বস্তুকে মনের সামনে আনে না। কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষা বা desire, পশুর appetiteএর মতন অন্ধও নয়, অস্পষ্টও নয়। অন্য মেযের শাড়ীখানা দেখিয়া তোমার যখন মন খারাপ হয়, এবং তোমার মনে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তখন তুমি পরিষ্কার ভাবেই জান কি তুমি চাও, কোথায় তাহা পাওয়া যাইতে পারে। মানুষের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অস্বস্তি ও বেদনা যেমন আছে, তেমনি ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তির কল্পনায় কিছু বা আনন্দও আছে। তুমি মনে মনে কল্পনা করিয়া খুশী হও, ওই শাড়ীর মতো একখানা শাড়ী কিনিয়া যখন তুমি পরিবে, তখন তোমাকে কেমন সুন্দর মানাইবে।

Desire different from vegetable want & appetite.

[ম্যাকেঞ্জী উদ্ভিদের অভাববোধ (Vegetable want), পশুর অভাববোধ (appetite) এবং মানুষের অভাববোধের (desire) মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করিয়াছেন। ছায়ায় আবদ্ধ লতার আলোর জন্য যে হাহাকার তাহা প্রায় সম্পূর্ণই অন্ধ। সেখানে একটা উদ্দেশ্যের পানে অন্ধ আকুলতা আছে, তাহা জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত (it is blind tendency towards particular ends, which are involved in the development of life)। রবীন্দ্রনাথের গানেব,

ঝর্ণা যেমন আলোর লাগি।
না জেনে রাত কাটায় জাগি।

এই দুইটি চরণ তুলনীয়।

পশুর বেলায় উদ্দেশ্যের দিকে যেমন অন্ধগতি থাকে, তেমনি অভাবজনিত অস্বস্তি সম্বন্ধে সচেতনতা অস্পষ্টভাবে হইলেও বর্তমান থাকে, এবং কোন্ বস্তু তাহার অভাব মিটাইবে তাহা সম্বন্ধেও, পশুর মনে, অন্ততঃ অস্পষ্ট ধারণা থাকে। ক্ষুধার্ত সিংহ যখন বনে শিকার অন্বেষণ করে, তখন কিসে তাহার ক্ষুধা মিটিবে, সে সম্বন্ধে তাহার মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা থাকে। কিন্তু লতা যখন আলোর দিকে ফিরে, তাহার অভাব-বোধ থাকিলেও, কিসে সে অভাব দূর হইবে সে সম্বন্ধে সচেতনতা তাহার থাকে না। পশুর অভাববোধের বেলাতেও সম্ভবতঃ, তৃপ্তি-অতৃপ্তির অনুভূতিই প্রধান উপাদান, কিন্তু অভাব যে বস্তু মিটাইতে সক্ষম, সে দ্রব্য সম্বন্ধে ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। মানুষ যখন অন্ধ প্রবৃত্তির বশে চালিত হয় তখন সে পরিণাম চিন্তা করে না। তখন সে পশুর স্তরে অবনমিত হইয়াছে। কারণ মানুষের বিশেষত্ব হইতেছে যে, সে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব (rational animal)। সুতরাং মানুষের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ অন্ধ উদ্ভিদ বা জান্তব আবেগ মাত্র নয়। মানুষের আকাঙ্ক্ষায় অভাববিমোচক বস্তু সম্বন্ধে মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা থাকে, তাহার সহিত জড়িত সুখ ও দুঃখের অনুভূতি থাকে ; কিন্তু তাহারি উপর থাকে এই ধারণা, যে আকাঙ্ক্ষার বস্তু একটি নির্দিষ্ট প্রয়োজন মিটাইবে, তাহা মূল্যবান। তাহা একটি ক্ষণিক অনিয়ন্ত্রিত কামনা নয়, তাহা বুদ্ধি দ্বারা শাসিত, মঙ্গল উদ্দেশ্য অভিমুখে নিয়ন্ত্রিত। পশু ক্ষুধার্ত হইলে, খাদ্য কাছে পাইলে, তাহা নির্বিচারে গ্রহণ করিবে, সে মানা মানিবে না। কিন্তু মানুষের বিচার আছে, মর্যাদাবোধ আছে, তাই ক্ষুধার্ত হইলেও অপরিচিতের কাছে, এমন কি অনেক সময় পরিচিতের কাছেও, খাদ্য যাচ্ঞা করিবে না। পশুর কামনাগুলি বিচ্ছিন্ন, এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ পরিতৃপ্তির দাবি করে, কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলি তাহার জীবনের অন্যান্য আকাঙ্ক্ষা ও ভাবের সঙ্গে যুক্ত হইয়া একটি বলয় সৃষ্টি করে। তাই মানুষের আকাঙ্ক্ষা তাহার ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। ইহা তাহার চরিত্রের প্রকাশক। ক্ষুধা নিতান্ত জান্তব ব্যাপার। ইহাতে পশু ও মানুষে প্রভেদ সামান্যই। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাই appetite, কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষা ইহা হইতে উচ্চস্তরের। সাধু ও বীরের আকাঙ্ক্ষা কৃপণ ও অসভ্যের আকাঙ্ক্ষা হইতে পৃথক। সেই ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে।[২] আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা অনেকে এই সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি স্বীকার করেন না।]

যদি ব্যক্তির মনে একটিই সরল ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে, এবং তাহা পূরণের পথে যদি দুস্তর বাধা না থাকে, তাহা হইলে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে ব্যক্তি কর্ম করিতে উদ্যত হয়।

২। MacKenzie— Manual of Ethics, P. 44-66

কিন্তু যেখানে কর্মটি জটিল (complex action), অর্থাৎ যেখানে একাধিক তীব্র আকাঙ্ক্ষা যুগপৎ ব্যক্তির মনে উপস্থিত থাকে, সেখানে তৎক্ষণাৎ ব্যক্তি কর্মে উদ্যত হইতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষাগুলি বিভিন্নমুখী (যেমন, আমরা রসগোল্লাও চাই, আবার সিনেমা দেখিতেও চাই), আবার কখনো তাহারা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী (যেমন, পরীক্ষার পড়া তৈরী করিব, না বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখিতে যাইব)। এ সব ক্ষেত্রে এই বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষাগুলি ব্যক্তির মনকে বিভিন্ন দিক হইতে আকর্ষণ করিতে থাকে। এখানে যেন বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম চলিতে থাকে (conflict of desires)। ইহার ফলে, ব্যক্তির মন দ্বিধাগ্রস্ত হয় এবং কর্ম স্থগিত থাকে (postponement of action)। কিন্তু এই দ্বিধাগ্রস্ত সংশয়াপন্ন অবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না। বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটিই কোন্ এক মুহূর্তে জয়যুক্ত হয়। ব্যক্তি তখন সেই আকাঙ্ক্ষাটির পরিতৃপ্তির জন্যই উদ্যত হয়। অনেক সময়ই বলা হয় যে, বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সংঘর্ষে প্রবলতমটিই জয়যুক্ত হয়, এবং ব্যক্তি সেই আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়াই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এভাবে কথাটা বলিলে, ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে। বাস্তবিকপক্ষে আকাঙ্ক্ষাগুলি ব্যক্তির বাহিরের শক্তি নয়, এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি ব্যক্তিকে চালিত করে, ইহা বলা ঠিক নয়। আকাঙ্ক্ষাগুলি ব্যক্তিরই আকাঙ্ক্ষা,—তাহারা ব্যক্তিরই চরিত্রের বিভিন্ন দিক। কোন আকাঙ্ক্ষা যখন জয়ী হয়, তখন তাহা প্রবলতম এই জন্যই যে, ব্যক্তির সমর্থন তাহার পশ্চাতে আছে। ব্যক্তিই স্থির করে, কোন্ আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সে কাজ করিবে। কোন্ উদ্দেশ্যকে বর্তমান মুহূর্তে ব্যক্তি অধিক মূল্য দিতেছে; তাহার উপরই কোন্ আকাঙ্ক্ষা জয়ী হইবে, তাহা নির্ভর করে।[৩]

Complex voluntary action

Conflict of desires

মনের মধ্যে বিপরীত কয়েকটি আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলে, মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়। তখন ক্রিয়া স্থগিত থাকে। তখন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ততা এবং তাহাদের ফলাফল সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা চলিতে থাকে (the stage of deliberation)। বিচার-বিবেচনার পর, ব্যক্তি কোন একটি পথ অনুসরণ করিতে মনস্থ করে (stage of decision)। ব্যক্তির চরিত্রের উপর নির্ভর করে সে

Postponement of action and deliberation—decision

৩। Desires are always for objects, and these objects are always relative to a self for whom they have value. It is owing to their having a value for self that they become 'objects of desire', whose character, even whose existence, may be said to be dependent upon the character of the self to whom they appeal. Muirhead—The Elements of Ethics, P.53

বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন্‌টিকে প্রাধান্য দিবে, কোন্‌টিকে বরণ করিবে। সন্তানদের ক্ষুধায় অন্ন সংগ্রহের জন্য কেহ বাছিয়া নিবেন সৎ পরিশ্রমের পথ, আবার কেহ বাছিয়া নিবেন চৌর্য ও বঞ্চনার পথ। কে কোন্ পথ বাছিয়া নেন, তাহা দ্বারা তাহার চরিত্র বুঝিতে পারা যায়।

যখন বিচার-বিবেচনা চলিতে থাকে, তখন কোন্ আকাঙ্ক্ষাটি যোগ্যতম, তাহার যেমন বিচার হয়, তেমনি বিচার হয়, কোন্ উপায়ে (means to be employed) আকাঙ্ক্ষাটির পরিতৃপ্তি ঘটিবে। যে আকাঙ্ক্ষাটি ব্যক্তি কোন এক মুহূর্তে বাছিয়া নিল, তাহাই তৎমুহূর্তে তাহার কর্মের প্রেষণা (motive) হইবে।[৪] বিচার-বিবেচনা কালে, ব্যক্তি শুধু একটি আকাঙ্ক্ষাকেই যে বরণ করিল তাহা নহে, সে একটি নির্দিষ্ট পথও বাছিয়া নেয়। এবং সেই নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য যে পথ সে গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থির করিল, তাহার ফলাফলও সম্পূর্ণ বিচার করিয়া যদি ব্যক্তি কোন কর্মপন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে, তবে তাহাকে বলা হইবে ব্যক্তির সম্পূর্ণ অভিপ্রায় (Intention)। ইহা কখনও আকস্মিক হইতে পারে না। ব্যক্তির অভিপ্রায় তাহার সম্পূর্ণ নৈতিক সত্তার পরিচায়ক। ইহার দ্বারাই তাহার নৈতিক বিচার হয়।

Intention

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত (decision) গ্রহণের পরই ব্যক্তি কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু কখনো কখনো নানা কারণে কর্ম স্থগিত থাকিতে পারে। তখন সিদ্ধান্তে অবিচল থাকিবার মনের দৃঢ়তাকে বলা হয় সংকল্প (Resolution or determination)।

Resolution

স্থির সিদ্ধান্ত করার পরই আসে, কর্মের জন্য দৈহিক উদ্যোগ। ইচ্ছা (volition) হইল দৈহিক উদ্যোগের মানসিক দিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি সচেতন চিন্তা দ্বারাই স্থির করে, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি কি দৈহিক পরিবর্তন প্রয়োজন। জেমস্ অবশ্য মনে করেন যে, কর্মের চিন্তাই বিনা বিবেচনায় দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন ক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়। চিন্তামাত্র ক্রিয়া (ideo-motor action) সম্বন্ধে ইহা সত্য হইলেও, সমস্ত চেষ্টিত ক্রিয়ারই ইহা প্রকৃতি, এ মত সত্য বলিয়া মনে হয় না।

চেষ্টিত ক্রিয়ার সর্বশেষ স্তর হইতেছে, বাহ্যজগতে ব্যক্তির চেষ্টার দ্বারা কোন পরিবর্তন সংঘটন, যেমন গাছে পাকা পেয়ারা দেখিয়া খাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু

৪। During deliberation the conflicting desires are regarded as possible motives for action; when the decision is formed, the chosen desire becomes the actual motive. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 65

গাছটি উঁচু, ফলটি নাগালের বাহিরে, গাছে উঠিতে পারি না, ঢিল দিয়াও পাড়া গেল না। অবশেষে পাশের বাড়ী হইতে আঁকশি চাহিয়া আনিয়া, ফলটি পাড়িয়া লইলাম। ফলটি পূর্বে ছিল গাছের উঁচু ডালের মাথায়, এবার তাহা আমার করায়ত্ত হইল।

Desire—এবার আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। কোন ফলের জন্য বা উদ্দেশ্য লাভের জন্য ব্যক্তির মানসিক বেগকে আমরা আকাঙ্ক্ষা বলি। সহজ মনে হইলেও, আকাঙ্ক্ষা একটি সরল বা অমিশ্র অবস্থা নহে। পূর্বে আমরা জৈব ক্ষুধা (appetite) ও মানুষের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রভেদ করিয়াছি। মানুষের আকাঙ্ক্ষায় মনের তিনটি প্রধান উপাদান, জ্ঞান (cognition), অনুভূতি (emotion) এবং উদ্যম (conation) এই তিনটিই মিশ্রিত থাকে। আকাঙ্ক্ষায় বর্তমান অভাবজনিত অস্বস্তিবোধ, ভবিষ্যতে ফলপ্রাপ্তির কল্পনায় সুখ, এবং অনায়ত্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চেষ্টা, এই সব অবস্থাই বর্তমান থাকে।

আকাঙ্ক্ষার জ্ঞান বা বোধমূলক উপাদান (Cognitive elements of desire) হইতেছে (১) বর্তমান অভাববোধ, (২) কি বস্তু বা অবস্থা সেই অভাব দূরীকরণে সমর্থ, সে সম্বন্ধে ধারণা, (৩) কি উপায় অবলম্বন করিলে অভাব দূর হইতে পারে সে, সম্বন্ধে জ্ঞান, (৪) বর্তমান অভাব এবং ভবিষ্যতে অভাব পূরণের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে বোধ। এই দুইয়ের মধ্যে দূরত্ব ও পার্থক্য যত বেশী হইবে, ততই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইবে।

Cognitive, emotive and conative elements in desire

আকাঙ্ক্ষার অনুভূতি বা **আবেগের উপাদান (Emotional elements of desire)**—অভাববোধ সর্বদাই অপ্রীতিকর, বেদনাদায়ক (painful)। এই পীড়া যদি না থাকিত, তবে আকাঙ্ক্ষা কর্মোদ্যমের উৎস হইতে পারিত না। কারণ, ইহাই জীবধর্ম যে, সে দুঃখ এড়াইতে চায়, অভাব দূর করিতে চায়। কিন্তু আকাঙ্ক্ষায় বর্তমান অভাবের জন্য যেমন দুঃখ থাকে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে যে আনন্দ হইবে, তাহার কল্পনায় সুখ আছে (pleasant)।

আকাঙ্ক্ষায় **উদ্যম বা চেষ্টার উপাদান (Conative elements of desire)**—অভাববোধের দুঃখ, ও অভীষ্ট সিদ্ধির আনন্দ, মানুষকে উত্তেজিত করে উদ্যমের পথে,—অভাব দূর করিয়া, বাধা অতিক্রম করিয়া আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে আয়ত্ত করিতে। ইহাতেই পৌরুষের প্রকাশ।

আকাঙ্ক্ষার দিগ্বলয়—Universe of desire.

মানুষের আকাঙ্ক্ষা পশুর প্রবৃত্তির মত একটি বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের তাড়না নয়। পশু প্রতি মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন ভাবে বাঁচে (lives from moment to moment)। যখনি কোন প্রবৃত্তির উদয় হয়, তৎমুহূর্তেই সে তাহার পরিতৃপ্তি খোঁজে। তাই তাহার জীবনের মধ্যে কোন সমগ্রতা বা ঐক্যবোধ থাকে না। অবশ্য কখনও কখনও মানুষও মুহূর্তের প্রবৃত্তির তাড়নায় অন্ধভাবে কাজ করিয়া বসে, ক্ষণিক রাগের মাথায় স্ত্রীকে খুন করিয়া বসে। এই অবস্থায় আমরা বলি 'সে পশুবৎ আচরণ করিয়াছে।'

Universe of desire—higher and lower

যদি কামের উত্তেজনায়, রাগের বশে, অথবা ভয়ে দিশাহারা হইয়া, মানুষ কোন গর্হিত কাজ করিয়া বসে, তবে সে কাজকে ব্যক্তির আচরণ বলাই যায় না। কারণ মানুষের আচরণ, চিন্তা-বিচার-প্রসূত, তাহা অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত। তাহা ক্ষণিক মুহূর্তের ব্যাপার নয়। ব্যক্তির জীবনধারার ঐক্যের সঙ্গে তাহার যোগ আছে। যখন ক্ষণিক উত্তেজনাবশে মানুষ কাজ করে তখন সে বাস্তবিকই 'প্রবৃত্তির দাস'—সে আর দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি নয়। সে মানুষের মর্যাদা হইতে ভ্রষ্ট।[৫]

মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি সমগ্রতা আছে, তাহা খণ্ড খণ্ড ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, কর্মের যোগফল মাত্র নয়। সেই জন্যই বলা হয় মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলির এক একটি দিগ্বলয় আছে, তাহারা কতগুলি বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তির বেগ মাত্র নয়।[৬]

কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্বের অনেকগুলি তল (levels) আছে। তাহাদের মধ্যে উচ্চনীচের প্রভেদ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় আমাদের মধ্যে অনেকগুলি 'কাঁচা আমি' আছে। যখন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থের আকাঙ্ক্ষায় কাজ করি, তখন অত্যন্ত ছোট 'আমি'র ভূমি হইতে কাজ করিতেছি। যখন সন্তানের স্বার্থের আকাঙ্ক্ষায় কাজ করি, তখন যে 'আমি' কাজ করিতেছে তাহার ভূমি বা তল উর্ধ্বতর—যদিও তাহাও 'কাঁচা আমি'। এখানে

Levels of the self

৫। If a man is entirely "carried away" by feeling—by anger or fear, for instance, he cannot properly be said to *act* at all, any more than a stone acts when a man throws it at an object......if he is entirely mastered by his passion, we cannot pass a moral judgment on his act any more than on the act of a mad man or one who is drunk. MacKenzie—Manual of Ethics, P. 63

৬। The desires of a person...are not an isolated phenomenon, but form an element in the totality, or as we may say, the *universe* of his character. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 47

আমার আকাঙ্ক্ষার ভূমির পরিধি, একান্ত নিজস্ব স্বার্থের আকাঙ্ক্ষা হইতে বৃহত্তর। আবার যেখানে গ্রামের বা দলের স্বার্থের আকাঙ্ক্ষা হইতে কাজ করি, তাহার ভূমির পরিধি আরো অধিকতর বিস্তৃত। যখন দেশের স্বার্থকামনায় কাজ করি, তখন আরো উচ্চতর আকাঙ্ক্ষার ভূমি হইতে কাজ করিতেছি। যখন পৃথিবীর সব মানুষের মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় উদ্যম করি, তখন আমার আকাঙ্ক্ষার ভূমি আরো বৃহত্তর। সর্বশেষ যখন সর্ব আকাঙ্ক্ষা ভগবানের পায়ে অর্পণ করিয়া বলিতে পারি "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি", তখন আকাঙ্ক্ষার শ্রেষ্ঠতম ভূমিতে উত্তীর্ণ হই, এবং আকাঙ্ক্ষার দিগ্বলয়ও সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি লাভ করে। ইহাই হইল 'পাকা আমি'র অবস্থা। বাস্তবিকপক্ষে এই ভূমিতে উত্তীর্ণ হইলে, আমিত্বই লুপ্ত হইয়া যায়। ইহাই হইল ধর্মজীবন লাভ ব্রহ্মসত্তা প্রাপ্তি।

ইহা সাধারণ নিয়ম হিসাবে বলা যায় যে, যে আকাঙ্ক্ষার দিগ্বলয় যত বিস্তৃত, সে আকাঙ্ক্ষার নৈতিক মূল্যও তত বেশী। তাই নিজ স্বার্থের আকাঙ্ক্ষায় যে কাজ করি, তাহার চেয়ে সন্তানের স্বার্থের আকাঙ্ক্ষায় যে কাজ করি, তাহা অধিকতর প্রশংসনীয়। গ্রামের বা দলের স্বার্থাকাঙ্ক্ষায় কাজের চেয়ে দেশের বা পৃথিবীর স্বার্থাকাঙ্ক্ষায় কাজের নৈতিক মূল্য অধিকতর। একই মানুষের মধ্যে এই রকম আকাঙ্ক্ষার বহু দিগ্বলয় থাকে, তাহার মধ্যে কোন কোন বলয় সংকীর্ণ, কোনটি বা অধিকতর বিস্তৃত। যে মানুষ আকাঙ্ক্ষার বিস্তৃততর দিগ্বলয় হইতে কাজ করিতেই অভ্যস্ত তাহাকে আমরা অধিকতর শ্রদ্ধা করি, আর যে মানুষ নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের আকাঙ্ক্ষার দ্বারাই সাধারণতঃ চালিত, তাহার চরিত্র নিম্নস্তরের, ইহাই আমরা সিদ্ধান্ত করি। অবশ্য যে মানুষ **স্বার্থপর চরিত্রের** সে মানুষ যে সর্বদাই ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই কাজ করে, এমন নহে। ঘোরতর স্বার্থপর মানুষও কখনও কখনও নিঃস্বার্থপরভাবে মহৎকর্ম করিতে পারেন, এমন উদাহরণ বিরল নহে।

The higher and more comprehensive the universe of desire, the higher the moral value of the action

আবার বিপরীতভাবে **নিঃস্বার্থ চরিত্রের** মানুষও ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা চালিত হন না, এমন নহে। বাস্তবিক, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্বের উপাদান মিশ্রিত হইয়া আছে। স্টিভেন্‌সনের একটি উপভোগ্য উপন্যাস আছে। তাহার নায়ক দিনের বেলায় ভদ্র, শান্ত, পরোপকারী ডাঃ জেকিল্ (Dr. Jekyll), আর রাত্রিতে তিনিই পরিবর্তিত হন, নরপিশাচ মিঃ হাইডে (Mr. Hyde)। সম্ভবতঃ ইহা সমস্ত মানুষের জীবনেরই রূপক (symbol)। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই পশু ও দেবতা একসঙ্গে পাশাপাশি বাস করে। আমাদের কোন এক মুহূর্তের

আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ বুঝিতে গেলে, ইহা জানা প্রয়োজন হয় - আকাঙ্ক্ষার কোন্ দিগ্বলয় হইতে,—পশু বা দেবতার কোন্ স্তর হইতে কাজটি সেই মুহূর্তে করা হইতেছে। বাহিরের ফল দেখিয়া, অনেক সময় আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার স্বরূপটি ঠিক ধরা যায় না। তাই কোন কাজের নৈতিক মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে, আকাঙ্ক্ষার দিগ্বলয়টি জানা দরকার। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যিনি সাধারণতঃ আকাঙ্ক্ষার বিস্তৃততর দিগ্বলয় বা উচ্চতর ভূমি হইতে **কাজ করিতে অভ্যস্ত**, তাঁহার চরিত্র উন্নততর। কোন এক মুহূর্তের কাজ হইতে, কোন ব্যক্তির চরিত্র-বিচার সব সময় সম্ভব নয়। সাধারণতঃ, তাঁহার আকাঙ্ক্ষার দিগ্বলয় সংকীর্ণ না বিস্তৃত--তিনি ক্ষুদ্র স্বার্থের আকাঙ্ক্ষা হইতে কাজ করিতে অভ্যস্ত, না বৃহত্তর স্বার্থের আকাঙ্ক্ষা হইতে কাজ করেন, তাহা জানিতে পারিলেই, তাঁহার চরিত্রের যথোপযুক্ত বিচার করিতে পারি। ব্যক্তির কোন একটি কাজকে বিচার করিতে হইলে, কোন্ অবস্থার মধ্যে, আকাঙ্ক্ষার কোন্ দিগ্বলয় হইতে কাজটি হইতেছে, ব্যক্তির চরিত্রের কোন্ দিকটি কাজের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে, তাহা জানা প্রয়োজন।[৭] যে মানুষের চরিত্র যত সুগঠিত, তাঁহার আকাঙ্ক্ষার বিভিন্ন দিগ্বলয়গুলি ততই সুসংহত। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বেরই ইহা লক্ষণ যে, সে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষাগুলি একটি স্থির কেন্দ্রে সুসংহত,—একটি ধ্রুব আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জন্যই এক হিসাবে মহৎ ব্যক্তিদের চিন্তা ও কর্ম বুঝিতে পারা অনেক সহজ। মহাত্মা গান্ধীজী খুব 'রহস্যময়' ব্যক্তি (enigmatical personality) নন। সত্য ও অহিংসা এই দুইটি (বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার কাছে এই দুই আদর্শ অভিন্ন) কেন্দ্রবিন্দুতেই তাঁহার জীবনের সমস্ত চিন্তা, অনুভূতি ও কর্ম সংহত। যতই আমরা এভাবে সংহত হইতে পারি, ততই আমাদের অন্তরের আত্মবিরোধের অবসান ঘটে এবং আমরা শান্তি লাভ করি। এ প্রকার সংহত ব্যক্তিত্বই নৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।[৮]

৭। Each desire belongs to a particular universe, and loses its meaning if we pass out of that universe into another. The universe to which a desire belongs is the universe that is constituted by the totality of what we call a man's *character*, as that character presents itself at the time at which the desire is felt. It is, in short, the universe of the man's *ethical point of view* at the moment in question. MacKenzie—Manual of Ethics, P. 48

৮। Some people seem to keep these different universes a good deal apart from one another, all their lives ; a man of this sort is very different in his home, from what he is in his business, very different on holiday from what he is in working life. With some people, the various universes of desire becomes one single system ; in Pope's word, 'one master passion in the breast, like Aaron's serpent swallows up the rest'......with most people, however, there is no single dominating desire, but in the experience of life, the various universes find a place in a coherent system. Lillie—An Introduction to Ethics, P. 27-28

ব্যক্তি ও আকাঙ্ক্ষা—The Individual and desire.—আকাঙ্ক্ষা কর্মের প্রেরণা বা শক্তি যোগায় সত্য, কিন্তু ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই চালিত এ কথা সত্য নয়। আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বাহিরের শক্তি নয়, এবং ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষার লড়াইয়ে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে এবং, বলবত্তম আকাঙ্ক্ষা তাহার নিজস্ব জোরেই জয়ী হয়, ইহাও সত্য নয়। আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই কোন বস্তুপ্রাপ্তির জন্য, এবং সেই বস্তু ব্যক্তির কাছে মূল্যবান বলিয়াই, আকাঙ্ক্ষা বেগ লাভ করে। ব্যক্তিই স্থির করে, কোন বস্তুকে সে দাম দিবে এবং তাহাই নির্ধারণ করে, কোন্ আকাঙ্ক্ষা জয়যুক্ত হইবে। কোন্ বস্তুকে ব্যক্তি দাম দিতেছে, তাহা দিয়াই বোঝা যায়, তাহার চরিত্র কি। সেই জন্যই বলা যায়, মানুষের আকাঙ্ক্ষা তাহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের দ্যোতক।[১]

Desire controls the individual or the individual controls the desire?

আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য—Desire & End—আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই কোন বস্তু-অভিমুখী। সেই বস্তুকে আকাঙ্ক্ষার উদ্দেশ্য (end) বলা হয়। যাহা ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার উদ্দেশ্য, তাহা নিশ্চয়ই ব্যক্তির কাছে মূল্যবান। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার সব উদ্দেশ্যবস্তুই সমান মূল্যবান্ নয়; অবস্থাভেদে, ব্যক্তিভেদে পৃথক পৃথক উদ্দেশ্যবস্তু মূল্যবান্ হয়। পৃথিবীর অনেক উদ্দেশ্যবস্তুই নিজের জন্য দামী নয়, অন্য কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক বলিয়াই তাহারা দামী। কিন্তু যে উদ্দেশ্যবস্তু নিজের মূল্যেই মূল্যবান্, যাহা অন্য উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র নয়,—যাহা নিজেই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য (Summum Bonum) তাহাকেই চরম নৈতিক আদর্শ বলিয়া বিবেচনা করা হয়।

Desire & End.

Desire, Wish and Will—আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, সংকল্প সাধারণতঃ এই কথাগুলিব মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদগুলি আমরা লক্ষ্য করি না। কিন্তু ম্যাকেঞ্জী ইহাদের প্রভেদ স্পষ্টভাবে নির্দেশের পক্ষপাতী। যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির মনে অনেকটা স্থায়ী ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, যাহা অন্যান্য আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংঘর্ষ সত্ত্বেও সক্রিয় থাকে, তাহাকেই ম্যাকেঞ্জী ইচ্ছা বা wish আখ্যা দিয়াছেন। তিনি উদাহরণ দিয়াছেন, ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্য আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে, কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা জৈব

Desire, Wish & Will

১। Desires are always for objects, and these objects are always relative to a self for whom they have value. It is owing to their having a value for self that they become 'objects of desire', whose character, even whose existence may be said to be dependent upon the character of the self to whom they appeal. Muirheard—the Elements of Ethics, P. 55

প্রবৃত্তির জন্যেই বলবৎ হয়। কিন্তু ধর্মীয় আচরণের আকাঙ্ক্ষা হইতে অথবা কর্তব্যবুদ্ধি হইতে, অথবা সামাজিক ভদ্রতা বশতঃ, ব্যক্তি ক্ষুধার্ত হইয়াও খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারে। এ অবস্থায় আমরা বলি যে খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও, ব্যক্তি খাদ্যের ইচ্ছা প্রকাশ করে না। বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার সংঘাতের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা অন্য আকাঙ্ক্ষাকে ছাপাইয়া ওঠে—যে আকাঙ্ক্ষা অন্য আকাঙ্ক্ষাগুলিকে দমিত করে, তাহাকেই ইচ্ছা বা Wish বলিতে হইবে।[১০]

জয়ী আকাঙ্ক্ষাকে ম্যাকেঞ্জী Wish বলিয়াছেন। আবার ইচ্ছা ও সংকল্পের (wish and will) মধ্যে তিনি পার্থক্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইচ্ছা কখনো কখনো এমন একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ বিষয় সম্বন্ধে হইতে পারে, যাহার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্বন্ধ নাই—যাহা সত্যই কার্যে পরিণত করা সম্ভব নয়। কিন্তু যাহা সংকল্পিত (willed) তাহা কার্যে পরিণত করার যোগ্য। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া, অনেক ইচ্ছা সংকল্পে পরিণত হইতে পারে না। আমি আমার ঘৃণ্য শত্রুর মৃত্যু ইচ্ছা করিতে পারি, কিন্তু সত্যই তাহার মৃত্যু ঘটাইতে চেষ্টিত না হইতে পারি। শেক্‌সপীয়রের King Richard IIIএ Lady Anne, Duke of Gloucesterকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

> "Though I *wish* thy death,
> I *will* not to be the executioner"

এখানে ইচ্ছা আছে, কিন্তু সংকল্পের অভাব। আবার কখনও কখনো সংকল্পের মধ্যে এমন উপাদান থাকিতে পারে, যাহা ইচ্ছার মধ্যে ছিল না। রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদীরা অত্যাচারী জারের মৃত্যু কামনা করিয়া, সেতুর উপর চলমান, জারকে বহনকারী, রেলগাড়ীখানা ডিনামাইট দিয়া ধ্বংস করিবার সংকল্প করিল। কিন্তু ইহার ফলে, সঙ্গে সঙ্গে আরো বহু নির্দোষ ব্যক্তির প্রাণনাশ ঘটিবেই। কিন্তু তাহা সন্ত্রাসবাদীদের ইচ্ছার অন্তর্গত ছিল না। শেক্‌সপীয়রের Romeo and Julietএ বৃদ্ধ ঔষধবিক্রেতা তাহার দারিদ্র্যের জন্যই রোমিওর কাছে বিষ বিক্রয় করিতে

১০। We may briefly say that a *wish* is an *effective desire*...A hungry man may be said to have a desire for food, but this desire may be dominant only within the universe of animal inclination. The desire may be kept in abeyance by a sense of religious obligation, by devotion to work... in such cases we may say that the man no longer wishes for food, though a desire for food continues...held as it were in leash. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 52

সংকল্প করিল, কিন্তু এই বিষপানে Romeoর মৃত্যু ঘটিবে, ইহা তাহার ইচ্ছা ছিল না—তাই বিষ বিক্রয়কালে সে Romeoকে বলিল—

My poverty, but not my will consents.

আমরা দেখিব যাহাকে গ্রীন্ ও ম্যাকেঞ্জী সংকল্প বা will বলিয়াছেন, তাহাই ব্যক্তির অভিপ্রায় বা Intention। ইহাতেই ব্যক্তির সম্পূর্ণ চরিত্রের প্রকাশ। নৈতিক বিচারের বেলায় আমরা বিচ্ছিন্ন একটি আকাঙ্ক্ষার বিচার করি না, আকাঙ্ক্ষার সমগ্র দিগ্বলয়েরই বিচার করি।[১১]

সংকল্প ও কর্ম—Will and Act.—সংকল্প হইতেই চেষ্টিত কর্ম করা হয়, ইহা সত্য। কিন্তু সংকল্প করিয়াও অবস্থাগতিকে কর্ম স্থগিত থাকিতে পারে। সংকল্প ভবিষ্যতে কোন পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত, এবং ভবিষ্যৎ সর্বদাই অনিশ্চিত। অনেক চিন্তা করিয়া, হিসাব করিয়া, বিবেচনা করিয়া কর্মপন্থা স্থির করিয়া, কোন কর্ম করিবার সংকল্প করিলাম। কিন্তু যখন কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম তখন দেখিলাম, অবস্থার পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার দিগ্বলয়ও পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। যাহা পূর্বে না করিলেই নয় মনে হইয়াছিল, তাহা পূর্বের আকর্ষণ হারাইতে পারে। তাহা হইলে কাজটি হয়তো আর করা হয় না—অথবা হয়তো তাহার গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। রাত্রে সংকল্প করিলাম যে ভোরে উঠিয়া রোজ বেড়াইতে যাইব, কিন্তু যখন ভোর হইল তখন দেখি, লেপের তল হইতে ঠাণ্ডার মধ্যে আর কিছুতেই উঠিতে ইচ্ছা করিল না। সংকল্পও ভাঙ্গিয়া গেল। যেখানে সম্ভাব্য কর্মের ফলাফল গুরুতর, এবং যেখানে কর্মের সফলতা সম্বন্ধে বিষম সন্দেহের অবকাশ আছে, সেখানেই সংকল্প ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।[১২] অবশ্য যাঁহারা দৃঢ়চরিত্র তাঁহারা অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও সংকল্পে অবিচলিত থাকেন। তাঁহারা উদ্দেশ্যকেই তাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখে সতত রাখিতে চেষ্টা করেন, ছোটখাটো বাধা বিপত্তি অসুবিধাকে উপেক্ষা করেন এবং সংকল্পকে

১১। A wish is a dominant single desire; whereas the will depends on the dominance of a universe of desire. Mackenzie—A Manual of Ethics, P. 44

১২। Between the acting of a dreadful thing
And the first motion, all the interim is
Like a phantasma, or a hideous dream:
The genius and the moral instruments
Are then in council; and the state of man,
Like to a little kingdom, suffers then
The nature of an insurrection.

Shakespeare—Julius Caesar, Act II, Scene i 11, 63. sq.

কর্মে পরিণত করেন।[১৩] যদিও কর্মদ্বারাই আমরা মানুষের বিচার করি, এবং তাহা অন্যায় নয়—কারণ, কর্ম সংকল্পেরই পরিণতি, তথাপি কর্মদ্বারা মানুষের চরিত্র সব সময় বিচার করা যায় না। নৈতিক বিচার বাস্তবিকপক্ষে কর্ম বা তাহার ফলাফল সম্পর্কে নহে। যে মানুষ সে কর্ম করিতেছে, তাহার সম্পর্কে।

সংকল্প ও চরিত্র—Will and Character—চরিত্র হইতেছে কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অথবা আকাঙ্ক্ষার দিগ্বলয় হইতে কর্ম করিবার অভ্যাস। নোভালিস্ বলেন, চরিত্র হইতেছে সম্পূর্ণ সুগঠিত সংকল্প—A character is completely fashioned will। তাঁহাকেই আমরা সচ্চরিত্র বলি, যিনি কর্তব্যবুদ্ধির দিগ্বলয় হইতে কর্ম করিতে অভ্যস্ত, তাহাকেই বলি কৃপণ, যাহার আকাঙ্ক্ষার দিগ্বলয়ের বিশেষত্ব হইতেছে, অর্থসঞ্চয়ের লোভ। যাহার কর্ম এই প্রকার নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী অথবা আকাঙ্ক্ষার দিগ্বলয়ের সঙ্গে সাধারণতঃ যুক্ত থাকে না, তাহাকে আমরা অস্থিরচিত্ত অথবা দুর্বলচরিত্র মানুষ বলি। এ সমস্ত লোক কখনো আকাঙ্ক্ষার এক দিগ্বলয়, আবার কখনো অন্য দিগ্বলয় হইতে কর্ম করে। তাহাদের জীবনে নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নাই; তাহারা অবস্থার স্রোতে নিজেদের গা ভাসাইয়া দেয়। অধিকাংশ মানুষই যে একটি মাত্র নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বা দিগ্বলয় হইতে কাজ করে তাহা নয়,—তবে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার বিভিন্ন দিগ্বলয়ের মধ্যে একটি মোটামুটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকে। কিন্তু এই নির্দিষ্ট সম্বন্ধটি বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন এবং ইহাই তাহাদের চরিত্রের বিভিন্নতা নির্দেশ করে।[১৪]

Will reflects character

আকাঙ্ক্ষা, প্রেষণা, অভিপ্রায়—Desire, Motive, Intention—আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আছে অভাববোধের দুঃখ এবং তাহা দূর করিবার জন্য তাড়না। এই পীড়া ও তাড়না না থাকিলে, মানুষ কোন কর্মেই প্রবৃত্ত হইত না। আকাঙ্ক্ষা যখন কোন বস্তুপ্রাপ্তির জন্য তাড়না হিসাবে ক্রিয়া করে, তখন তাহাকে বলা হয় প্রেষণা বা Motive। Motive কথার মূলগত অর্থ হইতেছে, যাহা কর্মে প্রবৃত্ত করায়,—which moves to action। কি আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করায়? এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন পণ্ডিত লোক বিভিন্ন ভাবে দিয়াছেন। কাজেই Motive বা প্রেষণা কথাটিও পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। বেন্থাম্, মিল্ ইত্যাদি প্রেয়োবাদীরা (Hedonists) বলেন অভাবজনিত দুঃখ বা

Motive – different senses—that which impels to action or induces to action

১৩। MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 56

১৪। Ibid—P. 58

ভবিষ্যতে ফলপ্রাপ্তিজনিত সম্ভাব্য আনন্দের অনুভূতিই মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করায়, কাজেই তাঁহারা এই সুখদুঃখের অনুভূতিকেই কর্মের প্রেষণা (motive) বলিয়াছেন। মিল্ বলিলেন, যে অনুভূতি ব্যক্তিকে কর্মে প্রবৃত্ত করায়, তাহারই নাম প্রেষণা—'a motive is a feeling which makes him (the agent) will to do'. বেন্থাম্ও একই কথা ভিন্ন ভাষায় বলিলেন, 'প্রেষণা মোটামুটিভাবে বিশেষ কোন কর্মের দ্যোতক সক্রিয় সুখ ও দুঃখের অনুভূতি।'[১৫]

Is motive a feeling ?

কিন্তু বোধিবাদীরা (Rationalists) বলেন যে, ইতরপ্রাণীর পক্ষে সুখ-দুঃখের অনুভূতিই কর্মের প্রেষণা যোগায় সত্য, কিন্তু মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব—সে সুখদুঃখের অনুভূতি বা প্রবৃত্তির অন্ধ তাড়না হইতেই কর্ম করে না। সে ইহাও চিন্তা করে, কি তাহার পক্ষে শ্রেয় (good)। বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাহার অনুভূতিকে শ্রেয়ঃ বা শুভকর্মের পথে নিয়ন্ত্রিত করে, সুতরাং কর্মের প্রেষণা অনুভূতি নয়, তাহা হইতেছে শ্রেয়ঃ উদ্দেশ্যাভিমুখী চিন্তা। অনুভূতি কর্মের করণ-কারণ (efficient cause), কিন্তু শ্রেয়ঃ উদ্দেশ্যাভিমুখী চিন্তা হইতেছে তাহার অন্তিম-কারণ (final cause)।[১৬] পিতা যখন সন্তানকে সুশিক্ষার জন্য বিদ্যালাভের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠান, তখন একদিক হইতে পিতৃস্নেহরূপ সহজ প্রবৃত্তি তাঁহার কর্মের মূলে ক্রিয়া করিতেছে, ইহা বলা যায়। আবার অন্যদিক হইতে বলা যায় যে, পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, তাহার সুষ্ঠু বিকাশ ও ভবিষ্যৎ জীবিকা অর্জনের জন্য তাহাকে প্রস্তুতির ইচ্ছা ইত্যাদি বিচারমূলক চিন্তা পিতার ক্রিয়াকে চালিত করিতেছে। কোন কোন নীতিবিদ্ কর্মের প্রেরণা হিসাবে একটি দিককেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন এবং অন্যদিক সম্বন্ধে তাঁহারা প্রায় অন্ধ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই দুইটি দিকই কর্মের প্রেরণার উপাদান যোগায়।[১৭] শুধুমাত্র সুখদুঃখের অনুভূতিই যেমন কর্মের প্রেরণা নয়, তেমনি শুদ্ধ শ্রেয়োচিন্তাও কর্মে মানুষকে

Or, the idea of an end ?

১৫। "A motive is substantially nothing more than pleasure or pain operating in a certain manner."--Bentham.

১৬। "Feeling cannot by itself be the motive of an action. For whatever else a motive is, it is agreed by all that it implies an end or aim representing something that is to be realised. While feeling as an element in desire may be said to be the efficient cause of action, a motive is generally admitted to imply a reference to a final cause or the idea of an end. Muirhead—The Elements of Ethics, P. 60-61

১৭। Lillie—An Introduction to Ethics, P. 29

প্রবৃত্ত করার, এ কথা বলা ঠিক নয়। ব্যক্তি সচেতনভাবে যে উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে মনের সামনে রাখিয়া তাহা সাধনের জন্য চেষ্টিত হয়, গ্রীন্, ম্যাকেঞ্জী প্রমুখ দার্শনিকেরা তাহাকেই motive বা প্রেষণা বলেন। ম্যাকেঞ্জী কার্যের জন্য আগ্রহ (impels) এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উদ্যমের (induces)-মধ্যে প্রভেদ করিয়া শেষোক্তটিকেই মানুষের কর্মের প্রেষণা বলিয়াছেন—"The motive, that which induces us to act, is the **thought of a desirable end.**" মুইরহেড উপরোক্ত দুই মতের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শুধুমাত্র সুখদুঃখের অনুভূতি মানুষকে কাজে প্রবৃত্ত করায় না, আবার শ্রেয়ঃ বস্তুর চিন্তা হইতেই কর্মে প্রবৃত্তি হয় না। শ্রেয়ঃ বস্তুর চিন্তা, ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার পরিমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বেগ লাভ করে। যেখানে একাধিক আকাঙ্ক্ষার বস্তু, বা আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির পথ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত থাকে, সে তাহার নিজ চরিত্র অনুযায়ী, তাহার মধ্যে একটি বাছিয়া লয়। ব্যক্তি দ্বারা বৃত এবং বাঞ্ছিত সেই আকাঙ্ক্ষাকেই প্রেষণা বলা যায়। কাজেই একথা বলা যায়,—"Motive is the chosen desire."[১৮]

Motive is the chosen desire.

এই অর্থে motive কথাটি ব্যবহার করিলে, conflict of motives' কথাটি অর্থহীন হয়। কারণ, বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সংঘর্ষ হইতে পারে (conflict of desires)। কিন্তু সেই সংঘর্ষের পরে, যে আকাঙ্ক্ষাটি ব্যক্তি পূরণের উদ্দেশ্যে বাছিয়া নিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই হইল প্রেষণা বা motive। প্রেষণার মধ্যে আর কোন সংঘর্ষ নাই।

সুখ কামনাই কি কর্মের প্রেষণা ?—Is pleasure the motive of actions ?

পূর্বের আলোচনা হইতে ইহা বুঝা যাইবে যে, প্রেয়োবাদীদের মতে, সুখের আকাঙ্ক্ষায়ই আমরা সব সময় কাজ করি। হয় আমরা দুঃখ এড়াইতে চাই, না হয় সুখ পাইতে চাই, এই জন্যই আমাদের সব উদ্যম, সব কর্ম-প্রচেষ্টা। বেন্থাম্ তাই বলিতেছেন, "আমরা সুখ ও দুঃখ এই দুই সাম্রাজ্যের প্রজা। ইহা হইতেই আমাদের সকল ধারণা ; আমাদের সমস্ত বিচার, জীবনের সমস্ত কর্ম-নিয়ন্ত্রণ এই দুইয়ের সঙ্গে যুক্ত করিয়াই পরিচালিত। যিনি ভান করেন যে, তিনি ইহাদের বশ্যতা-

The idea of pleasure induces us to act, — hedonists' view.

১৮। While the motive cannot be the feeling alone, neither can it be the thought or idea of the object alone. Thought itself cannot move to action. Involuntary action proper, what gives motive power to an idea, is not the mere presence in the mind, but its congruence with some preformed disposition or universe of desire. Muirhead—Elements of Ethics, P. 60-61

পাশ হইতে মুক্ত, তিনি জানেন না তিনি কি বলিতেছেন। তিনি যখন আপাতদৃষ্টিতে সকলের চেয়ে বড় সুখ পরিত্যাগ করিতেছেন এবং সব চেয়ে কঠিন দুঃখ বরণ করিতেছেন, তখনও বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার উদ্দেশ্য হইতেছে, সুখ অন্বেষণ ও দুঃখ পরিহার।" এই মতবাদকে "মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদ" (Psychological Hedonism) বলা হয়। মিল্ বেন্থামের মতোই এই মতে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন, যাহাতে সুখের সম্ভাবনা, তাহাকেই আমরা বাছিয়া নেই—যাহাতে দুঃখের সম্ভাবনা, তাহা আমরা স্বভাবতঃই পরিহার করি। তাঁহার মতে এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই। প্রত্যেক মানুষই অন্তর্দর্শন এবং আত্মবিচার দ্বারা এই মতের যাথার্থ্য বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে যাহা বাঞ্ছনীয় এবং যাহা সুখকর, এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।[১৯]

Criticism of 'psychological hedonism.'

কিন্তু সিজ্‌উইক্ এই মতবাদকে সুন্দর যুক্তি দিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, কোন জিনিস আকাঙ্ক্ষা করা এবং তাহা সুখকর বোধ করা, এই দুই যদি অভিন্নই হইত, তবে তাহার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির অন্তর্দর্শন ও আত্মবিচারের প্রয়োজন হইবে কেন? তাহা তো স্বতঃসিদ্ধই হইত। ইহা অস্বীকার করিলে তো স্বতঃবিরোধই হইত। বাস্তবিক পক্ষে প্রশ্নটি হইতেছে, আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু কি? সুখ পাইব, এই আশায়ই কি কাজ করি? অর্থাৎ, কোন কাজ করিবার পূর্বেই কি হিসাব করি, কতটা সুখ পাইব? এবং সেই সুখের আকাঙ্ক্ষাই কি সর্বদা আমাদের কাজে প্রবৃত্ত করায়? সিজউইক্ ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কোন একটি বস্তু লাভের জন্য কাজ করি; সুখটা পরে আসে, সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইলে, সে বস্তু আয়ত্ত হইলে। প্রথমেই সুখের আকাঙ্ক্ষা, এবং তাহার জন্যই কাজ, একথা সত্য নয়। আমরা যখন ক্ষুধার্ত হইয়া খাদ্য গ্রহণ করি, তখন একথা অধিকাংশ সময়েই চিন্তা করি না, খাদ্যগ্রহণ করিলে কতটা সুখ হইবে। অন্ততঃ সেই সুখের আকাঙ্ক্ষাই আমাদের খাদ্যগ্রহণে প্রবৃত্ত করায় না। খাদ্যগ্রহণ করিলে, অবশ্যই সুখ হয়।

Paradox of hedonism

যেখানে আগে থাকে, সুখের আকাঙ্ক্ষা,—কতটা সুখ পাইব, তাহার বিচার, সেখানে বরং সুখের হানি হয়। খুব প্ল্যান্ করিয়া, কতটা সুখ পাইব সে বিচার করিয়া, বনভোজনে গেলে বরং দেখা যায়, তেমন সুখ পাওয়া যায় না। খেলাধূলা, বিদ্যাচর্চার যে সুখ—

১৯। Desiring a thing and finding it pleasant, aversion to it and thinking of it as painful are phenomena entirely inseparable or rather two parts of the same phenomenon. Mill—Utilitarianism, Ch. IV

যাহাকে সিজ্‌উইক বলিলেন 'pleasure of pursuit'—সে সব ক্ষেত্রে সুখের চিন্তা ভুলিয়া গেলেই, তবে সুখ পাওয়া যায়—the best way to *get* pleasure is to *forget* it। ইহাকেই বলা হইয়াছে প্রেয়োবাদের আপাতবিরোধ—paradox of hedonism। যে সুখ-সুখ করিয়া সুখের পশ্চাদ্ধাবন করে, "সুখ যায় তারি ঠাঁই"। মেটারলিংকের Blue Bird রূপকের সাহায্যে এ কথাটিই বলিতে চাহিয়াছে। কিছুটা পরিমাণ আত্মবিস্মৃতি, কাজের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিবার অভ্যাসই শিল্পীকে শ্রেষ্ঠ আনন্দের আস্বাদ দিতে সমর্থ। কাজের মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ করিয়া হারাইতে পারিলেই সত্যকার সুখ পাওয়া যায়।[২০]

We generally desire certain ends—achievement of the aims result in pleasure.

কাজেই সুখের আকাঙ্ক্ষা হইতেই সর্বদা আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই, এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া মনে হয় না। সাধারণতঃ আমরা আকাঙ্ক্ষা করি সুখকর বস্তুকে, কিন্তু সুখকেই আমরা সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করি, একথা ঠিক নয়। আকাঙ্ক্ষার বস্তু আয়ত্ত করিলে সুখ হয়, ইহা নিশ্চিতই সত্য; কিন্তু সুখের জন্যই বস্তুকে আকাঙ্ক্ষা করি, এ কথা সত্য নয়। ইংরেজীতে সুখের অনুভূতিকেও বলা হয় pleasure, আবার সুখদায়ক বস্তুকেও বলা হয় pleasure। সাধারণতঃ যখন pleasure কথাটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়, তখন সুখের বস্তুকে বুঝায়, কিন্তু pleasure

Pleasure and pleasures

কথাটি একবচনে ব্যবহৃত হইলে সুখানুভূতি বুঝায়। ম্যাকেঞ্জী তাই বলিলেন, মিল্‌ যখন বলেন—'আমরা সর্বদা সুখ অন্বেষণ করি'—we always desire pleasure—তখন তিনি pleasure কথার দুটি অর্থের পার্থক্য না করাতে গোলযোগ সৃষ্টি হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে মিলের বলা উচিত ছিল, "We always desire pleasures"— আমরা সর্বদা সুখের বস্তু অন্বেষণ করি। একথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু তিনি যখন বলেন, We always desire pleasure—এবং ইহার অর্থ করেন যে, 'আমরা সর্বদাই সুখের অনুভূতি আকাঙ্ক্ষা করি'—তাহার জন্যই কাজে প্রবৃত্ত হই, তখন তাঁহার কথা নিশ্চয়ই সত্য নয়।[২১]

২০। A certain degree of disinterestedness seems to be necessary in order to obtain full enjoyment. A man who maintains throughout an epicurian mood, fixing his mind on his own pleasure, does not catch the full spirit of the chase. In all kinds of Art, again, the exercise of the creative faculty is attended by intense and exquisite pleasures; but in order to get them, one must forget them. Sidgwick—History of Ethics, P. 192

২১। That we desire such objects (money, power, music and health)... may show that we seek *pleasures*, but not that we seek *pleasure*. And that we seek pleasures is a mere tautology. It means simply that we seek what we seek. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 75

তাহা হইলে, এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে, কর্মের প্রেষণা শুধু অন্ধ সুখবোধও নয়, বিশুদ্ধ যুক্তিবিচারও নয়। যাহা ব্যক্তির তৎকালীন আকাঙ্ক্ষার দিগ্বলয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তেমন উদ্দেশ্যই ব্যক্তিকে কর্মে প্রবৃত্ত করায়।[২২]

প্রেষণা ও অভিপ্রায়—Motive and Intention.

ব্যক্তির কর্মের প্রেষণা তাহা হইলে এমন একটি সুখদায়ক উদ্দেশ্যবস্তুর চিন্তা, যাহা ব্যক্তির তৎমুহূর্তের আকাঙ্ক্ষার পরিমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

Intention—wider than motive. Intention = Motive + consideration of means and foreseen consequence + decision to act in spite of certain undesirable results

কিন্তু কর্ম করিতে হইলে, শুধুমাত্র কর্মের উদ্দেশ্যবস্তু স্থির করিলেই চলে না, কি উপায় অবলম্বন করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, কি তাহার সম্ভাব্য ফলাফল, তাহাও বিচার করিতে হয়। এই সমস্ত কথা বিচার করিয়া যদি কোন একটি পন্থা অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে তাহাই হইবে কর্মের অভিপ্রায় বা Intention। একটি কর্মের জন্য প্রবল আগ্রহ জন্মিল, আগ্রহের বস্তুও স্থির হইল, কিন্তু কি উপায়ে সে বস্তু আহরণ করিতে হইবে তাহা আলোচনা করিয়া দেখা গেল, ইহার ফলাফল নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় বা বিপজ্জনক। অথচ কাজটি করিতে গেলে সেই ফলাফলের জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে! এই অবস্থায় সংকল্প পরিত্যাগ করিতে পারি। এখানে কর্মের প্রেষণা বা আগ্রহ আছে, কিন্তু তাহার ফলের দায়িত্ব গ্রহণের অভিপ্রায় নাই। কিন্তু ফলাফল বিবেচনা করিয়াও যদি কর্মে প্রবৃত্ত হই, তখন নিশ্চিতই বলা যাইবে যে, কর্মটি আমার অভিপ্রেত (intentional)। এখানে কর্মের ফলাফল জানিয়াই কাজে হাত দিয়াছি, ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। ইহার জন্য সমস্ত নিন্দা ও প্রশংসা আমার প্রাপ্য। কখনো কখনো ইহাকে কর্মের উদ্দেশ্য বা Purposeও বলা হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য বা Purpose বলিতে কর্মের মানসিক দিকটাই বোঝায়, কিন্তু অভিপ্রায়ে কর্মের বাহ্য ফলাফলের উপরই বেশী জোর। প্রেষণা বা Motive অভিপ্রায়ের একটি উপাদান। কিন্তু অভিপ্রায় বা Intention অনেক বেশী জটিল ব্যাপার। আমরা একটি সমীকরণ (equation) সাহায্য অভিপ্রায়ের স্বরূপটি প্রকাশ করিতে পারি—যথা, অভিপ্রায় (Intention)=প্রেষণা (motive)+উপায় সম্বন্ধে বিচার (consideration regarding the means to be employed)+ফলাফল সম্বন্ধে বিচার

২২। A motive, we may say generally, is an end which is in harmony or conformity with the universe within which it is presented. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 74

(consideration of the foreseen consequences)+বিচারান্তে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সংকল্প। একটি উদাহরণ দিয়া কথাটি পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করা যাক্। বাংলা দেশে "স্বদেশী যুগে" কিছু সংখ্যক দৃঢ়সংকল্প চরিত্রবান যুবক অনুভব করিলেন যে, পরাধীনতার দুঃখ অসহনীয়, এবং তাঁহারা বহু দ্বিধা-সন্দেহের পর স্থির করিলেন যে ইংরেজকে এই দেশ হইতে তাড়াইতেই হইবে। এই সংকল্পই হইল, তাঁহাদের সমস্ত কর্মোদ্যমের প্রেরণা (motive of all their activities)। শয়নে, জাগরণে এই চিন্তাই তাঁহাদিগকে পাগল করিল। তাঁহারা সংকল্প করিলেন, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যত বড় মূল্যই দিতে হউক না কেন, যত দুঃখই সহিতে হউক না কেন, তাঁহারা নিরুদ্যম হইবেন না। কিন্তু কি করিয়া এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ? উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করিয়া, শাসক সম্প্রদায়ের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহার জন্য চাই রিভলভার, বোমা, পিস্তল। কিন্তু ইহা সংগ্রহ করা তো সহজ নয়। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ কোথা হইতে আসিবে ? প্রকাশ্যে ও স্বেচ্ছায়, এমন কি গোপনেও, দেশের লোক ইংরেজের ভয়ে, পুলিসের ভয়ে এ টাকা দিবে না। তবে উপায় ? ডাকাতি করিতে হইবে। নিরপরাধ অথচ বিত্তবানের ঘরেই ডাকাতি করিতে হইবে, ভাল কথায় না দিলে উৎপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেই হইবে। এই যুবকেরা সকলেই ভদ্র ও শিক্ষিত। তাঁহাদের অন্তর ইহাতে সায় দিল না। এই ফল তাঁহারা চান নাই। তথাপি উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে, এই পথই তাঁহারা বিচারের পর, বাছিয়া নিলেন। তাঁহারা জানিতেন নরহত্যা ঘৃণিত অপরাধ, তথাপি বিচার করিয়া স্থির করিলেন, উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে ইহা করিতেই হইবে। তাঁহারা জানিতেন হিংস্র শাসক সম্প্রদায় বিপ্লবীদের খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বহু নিরীহ মানুষের উপর উৎপীড়ন করিবে, তাঁহারা জানিতেন অর্থের লোভে বা ভয়ে, দলের কোন কোন যুবক, দলের গোপন কথা পুলিসের কাছে প্রকাশ করিয়া দিবে, তাঁহারা জানিতেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশের ভাগ্যে জুটিবে কঠিন অত্যাচার, জেল, অনাহার, কশাঘাত—নিশ্চিতই তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করিতে হইবে। এসব জানিয়াও তাঁহারা বিপ্লবের সর্বনাশা পথে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এখানে দেশপ্রেম,—দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করার বাসনা ছিল তাঁহাদের প্রেষণা—Motive। কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল দেশের মুক্তির জন্য গোপনে নিষিদ্ধ অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহ, ডাকাতি, নরহত্যা, চরম দুঃখবরণ।

An example : Swadeshi dacoities

বেন্থাম্ এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এই ভাবে করিলেন, প্রেষণা হইল **যাহার জন্য**, যে উদ্দেশ্যে, কাজটি করা হয়। আর অভিপ্রায় হইল **যাহার জন্য, যে উদ্দেশ্যে এবং যাহা সত্ত্বেও** কাজটি করা হয়। অভিপ্রায়ের মধ্যে কর্মের **অনুকূল এবং প্রতিকূল** দুই উপাদানই থাকে। পরীক্ষা পাস করা তোমাদের উদ্দেশ্য, ইহা তোমাদিগকে আকর্ষণ করে। কিন্তু রাত জাগিয়া পড়িতে হইবে, কষ্ট করিয়া, সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া তৈরী করিতে হইবে, ফিসের টাকা সংগ্রহ করিতে পিতামাতাকে কষ্ট দিতে হইবে, হয়তো অবাঞ্ছিত বড়লোক আত্মীয়ের কাছে হাত পাতিতে হইবে, এই সব পন্থা মনকে আকর্ষণ করে না, বরং বিমুখ ও বিষণ্ণ করে; তথাপি উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহারা তোমাদের অভিপ্রায়ের অঙ্গ।[২৩]

ম্যাকেঞ্জী অভিপ্রায়ের নানা শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন: (১) তাৎক্ষণিক বা নিকট অভিপ্রায় (Immediate Intention) এবং দূরবর্তী অভিপ্রায় (Remote Intention)। দুইজন লোক আর একজন লোককে জল হইতে উদ্ধার করিল। দুইজনেরই তাৎক্ষণিক অভিপ্রায় এক, অর্থাৎ লোকটিকে জল হইতে উদ্ধার। কিন্তু তাহাদের দূরবর্তী অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইতে পারে। প্রথম ব্যক্তির অভিপ্রায় লোকটির প্রাণরক্ষা, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির অভিপ্রায়, তাহাকে ফাঁসীকাঠে ঝুলান।

Classification of intentions

(২) অভিপ্রায় আবার বাহ্য এবং আন্তর এই দুই দলে ভাগ করা যায়। একদা লিন্কন্ একটি শূকর ছানাকে এক ডোবা হইতে তুলিয়া তাহার কষ্টমোচন করিলেন। এটি অভিপ্রায়ের বাহ্য দিক। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে প্রশংসা করা হইলে, তিনি বলিলেন যে, তিনি শূকর শাবকের কষ্ট মোচনের জন্য এ পুণ্যকর্মটি করেন নাই, উহাকে ডোবায় ডুবিতে দেখিয়া, তাঁহার মনে যে অস্বস্তি বোধ হইতেছিল, তাহা দূর করিবার জন্যই এ কাজটি করিয়াছিলেন। ইহা তাহা হইলে, লিন্কনের অভিপ্রায়ের আন্তর দিক।

২৩। According to Bentham, *motive* is that *for the sake of which* an action is done, whereas the *intention* includes both that *for the sake of which, and that in spite of which* the action is done. Motive includes only the persuasives; intention includes both the persuasives and the dissuasives. What induces us to perform an act, is always something that we have to achieve by it (and even that we consciously intend to achieve by it) which would not serve as an inducement to its performance and which might even serve as an inducement not to perform it MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 65

(৩) অভিপ্রায় প্রত্যক্ষও হইতে পারে, অপ্রত্যক্ষও হইতে পারে। নরেনবাবু বাল্য জীবনে দারিদ্র্যের কঠিন দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, সুতরাং যৌবনে তিনি ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জনের সংকল্প করিলেন। অর্থোপার্জন এখানে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিপ্রায়। কিন্তু শীঘ্র 'বড়লোক' হইবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি সুদূর আফ্রিকায় গিয়া ব্যবসায় করা স্থির করিলেন। এখানে স্বদেশ স্বজন হইতে বিচ্যুত হইয়া আফ্রিকায় যাইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অপ্রত্যক্ষ অভিপ্রায়। কেহ কেহ প্রত্যক্ষ অভিপ্রায়কে প্রেষণা এবং অপ্রত্যক্ষ অভিপ্রায়কেই অভিপ্রায় বলিবেন।

(৪) অভিপ্রায় আবার আকারগত এবং বস্তুগত এ দুরকমই হইতে পারে।

শিলচরের বরকত আলী মুন্সী বর্তমান ডেপুটি কমিশনারের বদলির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট দরখাস্ত করিতে চান, যেহেতু তিনি মনে করেন যে হিন্দু ডেপুটি কমিশনার, মুসলমান-বিদ্বেষী। আবার প্রবীণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট ডেপুটি কমিশনারের বদলির জন্য আবেদন করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন যেহেতু, তাঁহার আশঙ্কা বর্তমান অসমীয়া ডেপুটি কমিশনার বাঙ্গালী হিন্দুর দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন। এখানে দুজনের বস্তুগত অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন, যদিও আকারগত অভিপ্রায় এক।

(৫) সর্বশেষ, অভিপ্রায় সচেতনও হইতে পারে, অবচেতনও হইতে পারে। সুধন্যবাবু গ্রামের মঙ্গলের জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপন করিলেন, ইহা তাঁহার সচেতন অভিপ্রায়। কিন্তু তাঁহার অবচেতন মনে এমন কোন শক্তি ক্রিয়া করিয়া তাঁহাকে হয়তো এ কাজে প্রবৃত্ত করাইয়াছে যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার চেতনা নাই। এমন হইতে পারে, তাঁহার অবহেলায় তাহার স্ত্রী সুচিকিৎসার অভাবে মারা গিয়াছেন। তাঁহার অবচেতন মনে হয়তো এজন্য অপরাধবোধ আছে, যাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি এই হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন।[২৪]

বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের কর্মের পিছনে অবচেতন ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার উপর খুব জোর দেন। বিশেষতঃ ফ্রয়েডপন্থীরা মনে করেন, মানুষের সমস্ত সচেতন ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে অবচেতন মনের নিগূঢ় প্রভাব। মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা যাহা সচেতন মনে প্রকাশ পায়, তাহা হইল মানুষের মনের ভদ্র পোষাকী চেহারা। কিন্তু আসলে এই ভদ্র পোষাকী মনের গভীরে আছে অভদ্র, ইতর, পশুস্বভাব। তাহারাই বাস্তবিক পক্ষে আমাদের ইচ্ছা-

Unconscious intentions are not objects of moral judgment.

২৪। MacKenzie—A Manual of Ethics, Pp. 60-62

আকাঙ্ক্ষাকে বেগবান করে।[২৫] কিন্তু লিলি ঠিকই বলিয়াছেন, যে নীতিবিদ্যা আলোচনায় 'প্রেষণা' ও 'অভিপ্রায়'গুলিকে সচেতন মানসিক ক্রিয়া হিসাবেই দেখা উচিত। কারণ যাহা অচেতন বা অবচেতন মনের ব্যাপার, তাহার কোন নৈতিক বিচার সম্ভব নয়।[২৬]

সংক্ষিপ্তসার

ব্যাপক অর্থে 'নৈতিক' (Moral) কথার অর্থ এমন কর্ম যাহার নৈতিক বিচার চলে—যাহার সম্বন্ধে বলা যায়, ইহা ন্যায় বা অন্যায়। সংকীর্ণ অর্থে 'নৈতিক' মানে যে কর্ম ন্যায় বা শুভ। প্রথম অর্থে নৈতিকএর বিপরীত হইল না-নৈতিক (Non-moral), অর্থাৎ এমন ক্রিয়া যাহার নৈতিক বিচার চলে না, যাহাকে ন্যায় বা অন্যায় বলিয়া অভিহিত করা যায় না। দ্বিতীয় অর্থে নৈতিক-এর বিপরীত হইতেছে অ-নৈতিক (Immoral), অর্থাৎ যে ক্রিয়াকে আমরা অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করি। এই অধ্যায়ে আমরা 'নৈতিক' কথাটি প্রথম ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করিব। নৈতিক ক্রিয়া অর্থ এমন ক্রিয়া যাহা 'ভাল' বলিয়া প্রশংসা করিতে পারি, অথবা 'মন্দ' বলিয়া নিন্দা করিতে পারি। যে কর্ম সুস্থ বয়স্ক মানুষ চিন্তা ভাবনা বিচার বিবেচনা অন্তে করে, যাহার উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্পর্কে সে সচেতন, তাহাকেই শুধু নৈতিক কর্ম বলা যায়।

না-নৈতিক ক্রিয়া হইতেছে—জড় পদার্থের ক্রিয়া, পশু বা শিশুদের ক্রিয়া, বয়স্ক মানুষের সহজক্রিয়া (instincts), আবর্ত ক্রিয়া (reflexes), ইচ্ছামাত্র ক্রিয়া (ideo-motor actions)।

পরিণত সুস্থ মানুষের সচেষ্ট সচেতন ক্রিয়ারই কেবল মাত্র নৈতিক বিচার চলে। অভ্যাস-জাত ক্রিয়াও নৈতিক, কারণ মূলে এ সমস্ত ক্রিয়া সচেষ্ট ও সচেতন। এ সমস্ত কর্মের জন্য ব্যক্তিকে দায়ী করা যায়।

সচেষ্ট সচেতন ক্রিয়ার (voluntary actions) তিনটি স্তর: (১) মানসিক স্তর, (২) দৈহিক পেশীক্রিয়ার স্তর ও (৩) তাহার বাহ্যজগতে ফলাফলের স্তর।

নৈতিক বিচার সচেষ্ট ক্রিয়ার মানসিক স্তর সম্বন্ধেই। সচেষ্ট ক্রিয়ার প্রথমেই থাকে অভাব-বোধ। তাহার সঙ্গে যুক্ত থাকে অভাববোধজনিত কিছুটা অস্বস্তি যাহা কর্মে প্রবৃত্ত হইবার প্রেষণা (motive)। মানুষের অভাববোধ, পশুর জৈব আকাঙ্ক্ষা (appetite) হইতে উচ্চ-স্তরের। মানুষ যখন অভাব বোধ করে, তখন কি বস্তু তাহার অভাব দূর করিবে এবং কোথায় তাহা পাওয়া যাইবে সে সম্বন্ধে সে সচেতন। সে বস্তু সংগ্রহের জন্য মানুষের যে ব্যাকুলতা, তাহা হইল তাহার আকাঙ্ক্ষা (desire)। আকাঙ্ক্ষা তীব্র হইলে এবং তাহার বস্তু আহরণের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা না থাকিলে মানুষ সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণে প্রবৃত্ত হয়।

২৫। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য গুহ, দত্ত, ঘোষ—'মনোবিদ্যার 'রূপরেখা'-র 'চেতনা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৬। Lillie—An Introduction to Ethics, P. 21

কিন্তু অনেক সময়, একাধিক বিপরীত আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিকে যুগপৎ আকর্ষণ করে। তখন মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়, সে কোন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবে। প্রেয়োবাদীদের মতে তখন বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় (conflict of desires) এবং কর্ম স্থগিত থাকে (postponement of action)। তাহার পর সর্বাপেক্ষা বলবতী আকাঙ্ক্ষাই জয়ী হয়। এ মত অনুসারে, ব্যক্তি যেন নিষ্ক্রিয়, আকাঙ্ক্ষাগুলি তাহাকে চালনা করে। যেখানে একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা, সেখানে সেটিই ব্যক্তিকে কর্মে প্রবৃত্ত করায়, আর যেখানে আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব, সেখানে সর্বাপেক্ষা বলবতী জয়ী আকাঙ্ক্ষাই কর্মে প্রবৃত্ত করায়। কিন্তু এ মত সত্য নয়। ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষার দাস নয়, আকাঙ্ক্ষাগুলির মধ্যে কোনটি জয়ী হইবে, তাহা ব্যক্তিই বিচার দ্বারা নিজ চরিত্র অনুযায়ী স্থির করে।

যে আকাঙ্ক্ষাটি জয়ী হইয়া কর্মে প্রবৃত্তি দেয়, তাহা হইল প্রেষণা বা Motive। প্রেষণা কি সুখ-দুঃখের অনুভূতি (Spring of action), না ইহা উদ্দিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে ধারণা বা চিন্তা (idea of the end), তাহা দিয়া মতভেদ আছে। প্রেষণার মধ্যে এই দুই উপাদানই বর্তমান, এই মত সত্য বলিয়া মনে হয়। প্রেষণা হইতেছে সুখকর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যবস্তুর চিন্তা যাহা কর্মের বেগ দান করে।

আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ও সংকল্প (desire, wish & will) এই তিনের মধ্যে প্রভেদ করা হয়। যে আকাঙ্ক্ষা অনেকটা স্থায়ী, যাহা অন্য আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংঘর্ষ সত্ত্বেও সক্রিয় থাকে, সেই জয়ী আকাঙ্ক্ষাকেই ম্যাকেঞ্জী ইচ্ছা (wish) বলিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা আমরা কোন ক্রিয়া ইচ্ছা করিতে পারি, তথাপি তাহা কর্মে পরিণত না করিতে পারি। কারণ, ইচ্ছার স্তরে বাস্তব অবস্থা, ব্যক্তির সামর্থ্য, তাহার সম্মুখে বাধার পরিমাণ হয়তো বিবেচিত হয় নাই। সব বিবেচনা করিয়া যদি কোন ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হই, তখন সেই দৃঢ় মানসিক অবস্থাকে বলা হয় সংকল্প (will)। যাহা সংকল্পিত হইল, তাহাই যে কর্মে পরিণতি লাভ করিবে, তাহা না হইতে পারে। কাজেই সংকল্প (will) এবং ক্রিয়ার মধ্যেও প্রভেদ করিতে হয়।

আকাঙ্ক্ষা (desire), প্রেষণা (motive)ও অভিপ্রায় (intention) এই তিনের মধ্যের পার্থক্যও লক্ষ্য করিতে হইবে। যে আকাঙ্ক্ষাটি ব্যক্তি বাছিয়া নিয়াছে তাহাই তাহার কর্মের প্রেষণা জোগায়। কর্মের প্রেষণা শুধু অন্ধ সুখাকাঙ্ক্ষা নয়, অনুভূতি নিরপেক্ষ যুক্তি বিচার ও বিবেচনা দ্বারা উদ্দেশ্যবস্তু সম্বন্ধে ধারণাও নয়। যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির তৎকালীন আকাঙ্ক্ষার দিগবলয়ের সঙ্গে সংহতিপূর্ণ এবং তাহার অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করে, সেই বস্তুর আকাঙ্ক্ষাকেই কর্মের প্রেষণা বলা হইবে। কিন্তু কর্মের প্রেষণার বেগ সত্ত্বেও, কর্ম অনুষ্ঠিত না হইতে পারে। কর্ম সম্পাদন করিতে হইলে, শুধু উদ্দেশ্যবস্তু জানিলেই চলে না, কিভাবে কর্ম সম্পাদন করিতে হইবে সে উপায় (means) স্থির করিতে হয় এবং কর্মের সম্ভাব্য ফলাফলও (possible consequences) নির্ধারণ করিতে হয়। এই সমগ্র বিবেচনা—প্রেষণা (moitve) + উপায় সম্বন্ধে চিন্তা (consideration of the means of action) + সম্ভাব্য ফলাফল সম্বন্ধে চিন্তা (consideration of the possible consequences + সমস্ত বিবেচনা সত্ত্বেও কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সংকল্প (will)—ইহাকে বলা হয় অভিপ্রায় বা Intention। বেন্থাম বলিলেন, যাহার জন্য কাজ শুরু করিবার

প্রবৃত্তি হয় (that for the sake of which, the action is done) তাহা হইল প্রেষণা (motive) এবং অভিপ্রায় (intention) হইতেছে, যাহা সত্ত্বেও কাজ করিবার সংকল্প থাকে (that in spite of which, the action is done) অর্থাৎ কর্মের অনুকূল ও প্রতিকূল সমগ্র উপাদানই অভিপ্রায় বা Intention-এ বর্তমান।

এই অভিপ্রায় সমগ্র ব্যক্তির চরিত্রের পরিচায়ক। সুতরাং, ইহা নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু। শুধু প্রেষণা দ্বারা কোন কর্মের নৈতিক বিচার সম্পূর্ণ হয় না। প্রেষণার সহিত অভিপ্রায় যুক্ত করিয়া দেখিলেই ব্যক্তির চরিত্রের প্রকৃতিটি সম্পূর্ণ বোঝা যায়। ব্যক্তির চরিত্রকেই আমরা বিচার করি।

Questions

1. Distinguish between moral, immoral and non-moral actions. Which actions are non-moral actions ? Give illustrations.

2. What actions are called moral actions and why ? Discuss.

3. 'Only voluntary actions of a normal healthy adult individual are the objects of moral judgment'. Explain.

4. Give an analysis of voluntary action and in this connection point out the distinction between desire and motive, wish and will, motive and end. Illustrate your answer with the help of examples.

5. What is the meaning of the term motive ? Is motive a feeling or an idea ? Is pleasure always the motive of an action ? Discuss.

6. Distinguish clearly between motive & intention. 'Intention not motive, reveals the character of a person and is the proper object of moral judgment.' Critically discuss the statement.

চতুর্থ অধ্যায়

নৈতিক বিচারের স্বরূপ ও তাহার বিষয়বস্তু

Nature and Object of Moral Judgment

[Judgments : Factual & Ethical ; Nature of moral judgment—the object of moral judgment—not motive alone but intention also. Character, the real object of moral judgment—Subject of moral judgment—the impartial spectator. Nature of moral consciousness—moral sense theory, Rationatistic theory, characteristic of moral consciousness—development of moral conscicuness]

বাস্তব বিচার ও নৈতিক বিচার—Factual and Ethical Judgment— আমরা যখন বলি, "আজ দিনটা বড় ঠাণ্ডা," তখন আবহাওয়া সম্বন্ধে বিচার করিতেছি। এখানে আমার বাহ্যপরিবেশ হইতে যে উত্তেজক (ঠাণ্ডা হাওয়া) আসিয়া পৌঁছিতেছে, তাহার স্বরূপটা নির্ণয় করিতেছি। এ জাতীয় বিচারকে বলা হয় বাস্তব বা বস্তু-সম্পর্কিত বিচার—Factual judgments। কিন্তু আমরা যখন বলি, 'অন্যের মনে অযথা আঘাত দেওয়া অন্যায়', তখন বিচারটা যাহা ঘটিতেছে, তাহা সম্বন্ধে নহে, যাহা হওয়া উচিত, সেই সম্পর্কে। এ জাতীয় বিচারকে বলা হয় মূল্যবোধক বিচার —Value judgments। সাধারণতঃ তিন প্রকারের 'মূল্য' (value) আমরা স্বীকার করি, সত্য, সুন্দর ও শিব বা কল্যাণ। তর্কবিদ্যার বিচার সত্যের আদর্শানুযায়ী, নন্দনশাস্ত্রের (Aesthetics) বিচার সুন্দরের আদর্শানুযায়ী এবং নীতিবিদ্যার বিচার আচরণের কল্যাণাদর্শ অনুযায়ী।[১]

বস্তুবিচার ও মূল্যবিচার

নৈতিক বিচারের স্বরূপ—The Nature of the Moral Judgment— যখন কোন ক্রিয়ার নৈতিকতা বিচার করি, তখন আমরা বলি, আমাদের বিবেক অনুযায়ী—কাজটি ভাল বা মন্দ। বিবেক কি মনের একটি পৃথক শক্তি? প্রাচীনেরা তাহাই মনে করিতেন। কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্ মনের এ প্রকার বিচ্ছিন্ন

১। That which is an object of interest is *eo ipso* invested with value. Any object, whatever it be, acquires value when any interest, whatever be it, is taken in it; just as anything whatsoever becomes a target when anyone whosoever aims it. Perry—General Theory of Value, P. 115-16

শক্তিতে (faculties) বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন, মন একটি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য এবং বিবেক সমগ্র মনের চেতনা ও বিচারের সঙ্গেই যুক্ত। মনের মধ্যে বাস্তব বিচার, তার্কিক বিচার, নৈতিক বিচার এ রকম সব প্রকোষ্ঠ ভাগ করা নাই। প্রত্যেক বিচারের মধ্যেই 'আরো ভালো'র দিকে ইঙ্গিত বা গতি আছে। আমরা যাহাকে বিবেক বলি, তাহা এই 'আরো ভালো'র দিকেই অন্তরের আকুতি। এমন মনে করা ভুল যে, আমাদের মনের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ আদর্শের একটি স্থির মূর্তি আছে, তাহার সঙ্গে মিলাইয়া আমরা নিজের বা অপরের কাজকে বিচার করি। বাটলারের মতে বিবেকের কাজ হইতেছে শান্ত বিচার-বিবেচনা দ্বারা আদর্শনির্ণয়। ইহা কখনো কখনো সত্য, এ প্রকার শান্ত যুক্তি-বিবেচনা, আমাদের কোন ক্রিয়ার নৈতিকতা বিচারের সহায়ক হয়। কিন্তু কখনো কখনো অস্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা, অথবা কতকটা অন্ধ অনুভূতি দ্বারাই আমরা বুঝি, কোন কাজটি ন্যায়, কোনটি অন্যায়, যদিও স্পষ্টভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে কেন কাজটি ন্যায় বা অন্যায়, তাহা নির্দেশ করিতে পারি না।

নৈতিক বিচার একটি পৃথক শক্তি নয়

যখন কোন ক্রিয়াকে 'ন্যায়' বলিয়া নৈতিক বিচার করি, তখন তাহার মধ্যে চারিটি তাৎপর্য থাকে—(ক) ইহা মূল্যবান্ বা আদর্শানুসারী, (খ) ইহা কর্তব্য বা করণীয়, (গ) নীতিগতভাবে ইহা যুক্তিগত, (ঘ) ইহার মূল্য কাল্পনিক নয়, ইহার বাস্তব সত্যতা আছে।

নৈতিক বিচাবেব তাৎপর্য

(ক) পূর্বেই বলিয়াছি নৈতিক বিচার হইল কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে। এখানে সর্বদাই থাকে মূল্যবোধ, বা আদর্শ-বিচার; সে আদর্শ কল্যাণের, শুভকর্মের। এই জন্যই নৈতিক বিচারের ভাষা হইতেছে—'ইহা শুভ', 'ইহা অশুভ'।[২]

নৈতিক বিচার-শুভ অশুভ

(খ) যখন বিচার করি, এ কাজটি ন্যায়, তখনই ইহা স্বীকার করিয়া লই এ কাজটি আমায় করিতে হইবে। অর্থাৎ 'ন্যায়' বলিয়া কোন কাজ বিচারের সঙ্গেই এই দাবি থাকে যে, কাজটি আমার করণীয় (moral obligation)। প্রাচীনপন্থীরা বলিবেন বিবেকবুদ্ধি হইল, আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের আদেশ। কিন্তু আধুনিক চিন্তাধারা অনুযায়ী ন্যায় কর্মের সম্বন্ধে যে দাবি ও আহ্বান, তাহা বাহিরের কোন

যাহা ন্যায় তাহা করণীয়

২। When we wish to make a moral judgment emphasizing this aspect of value or disvalue, we tend to use the terms 'good' and 'bad', rather than the terms 'right' and 'wrong'. Lillie—An Introduction to Ethics, P. 82

আদেশ নয়, অন্তরের শুভবুদ্ধিরই প্রেরণা। নৈতিক বিচারের এই দিকই প্রকাশ পায়, যখন আমরা বলি 'ইহা কর্তব্য', 'ইহা অকর্তব্য'।

(গ) আবার নৈতিক বিচারের মধ্যে মূল্যবোধ এবং কর্তব্যের তাগিদই থাকে না। যখন বলি কাজটি ন্যায় (right) তখন এই বোধও থাকে যে কাজটি অবস্থা বিবেচনায়, যুক্তিযুক্ত।[৩] একটি উপার্জনশীল যুবক একটি মেয়েকে ভালবাসিয়াছে, বহুদিন যাবৎ তাহারা পরস্পর মেলামেশা করিয়াছে এবং ছেলেটি মেয়েকে বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কিন্তু ছেলে এবং মেয়ের অভিভাবকেরা দুই পক্ষই এ বিবাহে আপত্তি করিলেন। এ অবস্থায়, ছেলে সৎ হইলে, তাহার পক্ষে **উচিত** হইবে, নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা,—**অন্যায়** হইবে, বাধার সম্মুখীন হইয়া, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পিছাইয়া যাওয়া।

যাহা ন্যায়, তাহা যুক্তিযুক্ত, সঙ্গত

(ঘ) যখন কোন লোক বলে, 'সত্য কথা বলা উচিত'—তখন একথাই সে বুঝাইতে চায়, যে শুধু তাহার নিজের বিবেচনায়ই ইহা উচিত, তাহা নয়,—ইহা সকলের পক্ষেই উচিত। ইহার সত্যতা ব্যক্তিনিরপেক্ষ—ইহার ঔচিত্য সর্বজনগ্রাহ্য।

যাহা ন্যায়, তাহা কাল্পনিক নয়—সর্বজনগ্রাহ্য।

নৈতিক বিচারের বিষয়—The Object of Moral Judgment.

নৈতিক বিচার বয়স্ক সুস্থ মানুষের বিচারবিবেচনাপ্রসূত আচরণ সম্পর্কে। সাধারণতঃ, আমরা যখন মানুষের বিচার করি, তখন তাহার কার্যের ফলাফলের কথাটিই মনে রাখি। চুরি করা অন্যায়, কারণ তাহাতে অন্যের অকারণ ক্ষতি হয়। আবার অনেক সময় প্রচলিত আচার বা সামাজিক বিধির যাহা বিরোধী, আমরা তাহার নিন্দা করি। এ সমস্ত বিচারই হইতেছে বাহ্য,—বাহির হইতে মানুষের বিচার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিচার নির্ভুল, কিন্তু অনেক সময় ইহাতে সুবিচার হয় না। আমাদের কর্মের ফলাফল কখনো কখনো আমাদের আয়ত্তাধীন নয়। আমাদের কর্মের ফলে এমন ক্ষতি হইতে পারে যাহা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ছিল, এবং যাহা ঘটনাচক্রে ঘটিয়াছে, যাহার জন্য আমরা বাস্তবিক দায়ী নই। গত সরস্বতী পূজার দিন হাজরা রোডের কাছে এক পূজামণ্ডপ হইতে বিসর্জনের

নৈতিক বিচার কি কার্যের ফলাফল দ্বারা ?

৩। The action is suitable in some unique and probably indefinable way to the situation in which the doer finds himself. Lillie—An Introduction to Ethics, P. 84

জন্য গঙ্গার ঘাটে নিয়া যাইবার জন্য একটি মোটর লরীতে প্রতিমা তোলা হইল। পাড়ার ছেলেরা মহানন্দে লরীতে চাপিয়া বসিল। কয়েকটি ছেলে লরীর উঁচু ধারের উপর বসিল। হর্ন দিয়া হঠাৎ গাড়ী স্টার্ট দিতেই একটি বালক লরীর উপর হইতে রাস্তায় পড়িয়া গেল। পিছনে পিছনে আর একটি লরী আসিতেছিল—ছেলেটির মাথা পিছনের গাড়ীটির চাকার তলে পড়িয়া পিষ্ট হইয়া গেল। এখানে সামনের লরীর চালক বা পিছনের গাড়ীর চালক কেহই এই বালকের মৃত্যুর জন্য দায়ী নয়। অযথা জনতা খেপিয়া গিয়া, পিছনের গাড়ীর চালককে গুরুতর মারপিট করিল। ইহা নিশ্চয়ই সুবিচার নয়।

নৈতিক কর্মের পশ্চাতে মানসিক অবস্থা বিচার্য।

মনোবিদ্যায় মানুষের আগ্রহের ফলে এখন মানুষের কাজের আন্তর দিকের প্রতিই মানুষের আগ্রহ বেশী হইয়াছে—এজন্য নৈতিক বিচারের বেলায়ও কর্মের বাহ্য ফলাফল, অথবা সমাজের আচারবিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যের চেয়ে, ব্যক্তির ইচ্ছা, প্রেষণা, অভিপ্রায়, বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।[৪]

নৈতিক বিচার কি প্রেষণার? না অভিপ্রায়ের? না চরিত্রের?

কিন্তু আন্তরিক দিকের কোন অংশ সম্বন্ধে নৈতিক বিচার? সংকল্প (will), প্রেষণা (motive), অভিপ্রায় (intention) বা চরিত্র (character) কোনটিকে আমরা ন্যায় বা অন্যায় বলিয়া বিচার করি?

কাণ্ট বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর মধ্যে অথবা পৃথিবীর বাহিরেও এমন কিছুই নাই যাহাকে সম্পূর্ণভাবে ভাল বলা যায়, একমাত্র ব্যতিক্রম হইতেছে সাধুসংকল্প—"there is nothing in the world or even out of it that can be called good without qualification except a good will".[৫] প্রাণ বল, অর্থ বল, রূপ বল, যশ বল, শক্তি বল, কোনটিরই নিজস্ব দাম নাই। তাহারা কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার উপরই নির্ভর করে, তাহারা ভাল না মন্দ।

৪। The development from the level of custom to the level of conscience, has tended to make moralists attend more to the mental processes leading to an action than to the action itself or to its outward consequences. The moralist feels that, in doing so, he is getting nearer to the moral quality of the action than if he attends merely to the outward act, the form of which may be modied by outside circumstances. Lillie—An Introduction to Ethics, P. 85

৫। Kant : Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals, I sec., P. 9 (Abbott)

কিন্তু সাধুসংকল্পের সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায়, ইহা অবিমিশ্র ভাল, ইহা নিখাদ সোনা। ইহার দাম অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না। ইহার ফল যদি বাস্তবক্ষেত্রে অনিষ্টকরও হয়, তথাপি সাধুসংকল্প তাহার মূল্য হারাইবে না। সাধুসংকল্প বলিতে এমন অভ্যস্ত মানসিক গঠন বুঝাইবে, যাহা স্বভাবতঃ সৎকর্মেই ব্যক্তিকে নিয়োজিত করে। সুতরাং, সংকল্পের বাস্তব ফলাফল সম্পূর্ণ বাদ দিয়া, শুধু মাত্র তাহার মানসিক দিকটি বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাকে ভাল ও মন্দ বলিতে পারা যায় কিনা সন্দেহের বিষয়। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, দরিদ্র বিধবা, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ইত্যাদির উপকারার্থ নিঃস্বার্থভাবে স্বল্প-সঞ্চয়ভিত্তিক একটি সমবায় সমিতি স্থাপন করিলেন। এই সমিতি বহু লোকের উপকার করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু ভদ্রলোকের চোখে ছানি পড়িতে শুরু করিল, তিনি ভাল দেখিতে পান না, তাঁহার বিশ্বস্ত সেক্রেটারী খাতাপত্র দেখিতে লাগিলেন। কিছুদিন বাদে হঠাৎ একদিন সেক্রেটারী পলাইয়া গেলেন, হিসাবে গুরুতর ত্রুটি ধরা পড়িল, সমিতি ফেল পড়িল—বহু দরিদ্র লোক সর্বস্বান্ত হইল, ভদ্রলোক নিজেও জীবনের সঞ্চয় হারাইলেন। এখানে ভদ্রলোকের সাধুসংকল্পের অভাব ছিল না, অভাব ছিল সাংসারিক ব্যবসায়বুদ্ধির। সেই জন্যই তাঁহার সততা, নিঃস্বার্থ পরিশ্রম, সাধুসংকল্প সত্ত্বেও তিনি আদালতের বিচারে নিন্দিত হইলেন। সাধু-সংকল্প একটি নিরালম্ব ভাব মাত্র নহে, তাহার বাস্তব প্রকাশ থাকিবে সৎ আচরণে, এবং সেই জন্যই নৈতিক বিচার সম্পূর্ণভাবে কর্মের বাহ্য দিককে উপেক্ষা করিতে পারে না।[৬]

কান্ট: সাধুসংকল্পের ফল অশুভ হইলেও প্রশংসনীয়।

আবার বিপরীত দিকে, মিল্‌-বেন্‌থামের মতো প্রেয়োবাদীরা কর্মের ফলাফলকেই নৈতিক বিচারের বিষয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে, যে কর্মের ফল আনন্দদায়ক, তাহাই ন্যায়, আর যে কর্মের ফল দুঃখজনক, তাহাই অন্যায়! নৈতিক কর্মের নৈতিক বিচারে তাহার মানসিক প্রেষণার প্রশ্ন অবান্তর। বেন্‌থাম্‌ বলিলেন, কোন প্রেষণাকে শুভ বা অশুভ বলি, তাহাদের ফলাফল বিচার করিয়াই।[৭] মিল্‌ আরো উগ্র ভাষায় বলিলেন, কর্মের নৈতিকতার সঙ্গে তাহার মানবিক প্রেষণার কোন সম্পর্ক নাই।[৮] কোন 'কালোবাজারে'র রাজা খুব ঘটা

মিল-বেন্‌থাম: কর্মের ফল দ্বারাই নৈতিক বিচার

৬। Lillie—An Introduction to Ethics, P. 86

৭। If motives are good or bad, it is on account of their effects.
—Bentham

৮। The motive has nothing to do with the moraiity of the act—Mill

করিয়া দশলক্ষ টাকা ব্যয়ে শিশুদের জন্য এক চমৎকার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিলেন। বহু লোক ইহার দ্বারা উপকৃত হইল। সুতরাং ইহা একটি সৎকার্য। তিনি হয়তো 'পদ্মশ্রী' খেতাবের লোভে এই কাজটি করিয়াছেন। সেজন্য এই সৎ কার্যটি অসৎ হইয়া যাইবে না। মিল্ ও বেনথামের মতো প্রেয়োবাদীদের ধারণা, ইংল্যাণ্ডের লোকের 'বেনে বুদ্ধির'ই পরিচায়ক। তা ছাড়া আর এক কারণও আছে। মিল্ এবং বেন্থাম্ প্রেষণা বা motive বলিতে কর্মের পূর্বের সুখদুঃখের অনুভূতিকেই (springs of action) বোঝান। তাঁহাদের মতে, এই অনুভূতিই সর্বক্ষেত্রে কর্মের পশ্চাতে প্রেষণা হিসাবে কাজ করে। কর্মের উদ্দেশ্যবিচার কর্মের প্রেষণা দেয় না। তাঁহারা মনে করেন, এই সুখদুঃখের অনুভূতি সাধুরও কর্মের প্রেষণা দেয়, চোরেরও কর্মের প্রেষণা দেয়। কাজেই প্রেষণা বা motiveএ নৈতিকতার কোন রং লাগে না (morally colourless)। প্রেষণা শুধুই সুখদুঃখের অনুভূতিনির্ভর, একথাও সত্য নয়, এবং কর্মের ফলই তাহার নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করে, ইহাও সত্য নয়। প্রেয়োবাদ আলোচনাকালে আমরা কথাটি আরো বিশদভাবে আলোচনা করিব।

মার্টিন্যু বা বাট্‌লার, প্রেষণা অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তি কর্মে রত হয়, তাহাকেই নৈতিক বিচারের বিষয় বলিয়া মনে করিয়াছেন। কাজের ফল যাহাই হোক, উদ্দেশ্য সাধু হইলে কাজটি ন্যায়; এবং উদ্দেশ্য অসাধু হইলে, ফলাফল শুভ হইলেও কাজটি অন্যায়। অভিজ্ঞ শল্য চিকিৎসক যথাসাধ্য সাবধানে রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করিলেন, উদ্দেশ্য রোগীর কষ্ট নিবারণ; কিন্তু রোগী মারা গেল। এখানে ফল দুঃখজনক হইলেও, চিকিৎসকের কার্যের নিন্দা করা যায় না। তাঁহার উদ্দেশ্য সৎ ছিল, কাজেই নৈতিক বিচারে তাঁহার কর্মও সৎ। আবার ডাঃ জন্‌সন্ অন্য উদাহরণ দিলেন, এক দরিদ্র ভিখারীর প্রতি বিরক্ত হইয়া, তাহাকে মাথায় আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার দিকে একটি মুদ্রা ছুঁড়িয়া মারিলাম। ক্ষুধার্ত ভিখারী সে মুদ্রাটি তৎক্ষণাৎ কুড়াইয়া নিয়া, তাহা দিয়া খাবার কিনিয়া তাহার জঠরজ্বালা নিরসন করিল। দরিদ্র লোকটির দিক হইতে, অর্থাৎ কর্মের ফলের দিক হইতে, বিচার করিলে আমার কাজটি শুভ, কিন্তু আমার আন্তরিক উদ্দেশ্যের দিক হইতে বিচারে ইহা নিশ্চয়ই অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও বাস্তব ফলাফলের মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে কর্মের নৈতিকতা বিচারে আন্তরিক উদ্দেশ্যই প্রাধান্য লাভ করা উচিত।

বাট্‌লার ও মার্টিন্যুর মতে কর্মের প্রেষণা বা motive নৈতিক বিচারের বিষয়

Motive কথাটি যে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। মিল্ বা বেনথাম্ অন্ধ সুখ বা দুঃখবোধকেই কর্মের প্রেষণা বা Motive মনে করেন, তাহাও দেখিয়াছি। এ মত গ্রহণযোগ্য নয়, কেন তাহাও আলোচিত হইয়াছে। প্রেষণার মধ্যে উদ্দেশ্যবস্তুর বিচারেরও অবশ্য স্থান আছে। অভীপ্সিত উদ্দেশ্যবস্তু সম্বন্ধে ধারণা হইতেই দায়িত্ববুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কর্মে রত হয়। কিন্তু কর্মের নৈতিকতা বিচারে, ব্যক্তি কোন প্রেষণা হইতে কর্ম করিতেছে শুধু তাহার বিচারই যথেষ্ট নয়। প্রেষণায় উদ্দেশ্যবস্তু সম্বন্ধে বোধ থাকে সত্য, কিন্তু কি উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে, এবং কি তাহার ফলাফল হইতে পারে, সে সম্পূর্ণ বিচার থাকে না। তাহা অভিপ্রায় বা Intentionএর অন্তর্ভুক্ত। এই অভিপ্রায়টি জানা গেলেই কর্মের আন্তরিক দিকটি সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয়। অভিপ্রায় হইতে সংকল্পিত কর্মই বাস্তবিকপক্ষে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আচরণ (conduct) এবং এই আচরণেই ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ প্রকট হয়। তাই নৈতিক বিচার ন্যায্য হইতে গেলে, ব্যক্তির প্রেষণা কি, তাহা জানিলেই যথেষ্ট হয় না, তাহার অবচেতন ও সচেতন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিপ্রায়ও সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হয়। যে কাজের প্রেষণা অর্থাৎ উদ্দেশ্য সৎ এবং যাহা সদভিপ্রায়-সঞ্জাত, তাহাই শুভকর্ম (good action), তাহাই নৈতিক বিচারে ন্যায়সঙ্গত কর্ম (right action)। তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শুধু কর্মের প্রেষণা কি তাহা দ্বারাই কর্মের নৈতিক বিচার হয় না, তাহার সঙ্গে ব্যক্তির সম্পূর্ণ অভিপ্রায়ও জানা প্রয়োজন।[৯]

Motive কথার মানে কি?

Motive ও Intention

নৈতিক বিচার শুধু প্রেষণা সম্পর্কে নয়, ব্যক্তির সম্পূর্ণ অভিপ্রায় সম্পর্কে

পাশ্চাত্ত্য প্রেয়োবাদীরা বলেন, উদ্দেশ্য সৎ হইলে, উপায় অন্যায় হইলেও তাহা দূষণীয় নয়—The end justifies the means। কিন্তু শ্রেয়োবাদী গান্ধীজী বলিবেন, উদ্দেশ্য সৎ হইলেই চলিবে না, উপায়ও সৎ হওয়া চাই।[১০] অর্থাৎ কর্মের গুণ, সমগ্র অভিপ্রায়টিই সৎ ও ন্যায়সঙ্গত হওয়ার উপর নির্ভর করে।

৯। ভোগবাদী মিলও তাই বলিয়াছেন, The morality of the action depends entirely upon the intention, that is, upon *what the agent wills to do.*

১০। তাঁহার নিজস্ব সমাজতন্ত্রবাদ (সর্বোদয়) সম্বন্ধে তিনি বলিলেন,—This Socialism is as pure as crystal. It therefore requires crystal-like means to achieve it. Impure means result in an impure end.

কিন্তু অভিপ্রায়ও তো ব্যক্তি ও তাহার পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন একটি মানসিক অবস্থা নয়। ব্যক্তির চরিত্রের উপর তাহার অভিপ্রায় (intention) নির্ভর করে। সুতরাং ম্যাকেঞ্জী বলেন, নীতিবিচারের বিষয়, বাস্তবিকপক্ষে হইতেছে ব্যক্তি মানুষটি, তাহার সমগ্র চরিত্র। আমরা যখন বলি, 'এ কাজটি ন্যায়' বা 'ও কাজটি অন্যায়' তখন আমাদের বাস্তবিক বক্তব্য হইল, এ কাজের পিছনের মানুষটি ভাল বা মন্দ, তাহার কাজের মধ্য দিয়া যে চরিত্রের প্রকাশ তাহা ভাল বা মন্দ।[১১]

কিন্তু ব্যক্তির অভিপ্রায় বা Intention তাহার চরিত্রের উপর নির্ভর করে; নৈতিক বিচার তাই সম্পূর্ণ ব্যক্তিটির

কিন্তু কেহ কেহ হয়তো আরো উর্ধ্ব দার্শনিক ভূমি হইতে বলেন, ব্যক্তি তো ব্রহ্মসত্তা। সে কি বিচারের বিষয় হইতে পারে? কে বলিতে পারে, দস্যু রত্নাকরের পশ্চাতে সাধু রত্নাকর লুকাইয়া নাই? যে চোর, তাহার সব কাজই চৌর্যবৃত্তির গ্লানিতে মলিন নয়। কাজেই যীশুখ্রীষ্টের মত কেহ কেহ বলিবেন—অন্যায় কাজেরই নিন্দা কর, কিন্তু মানুষের বিচার করিও না—Judge not, lest ye be judged!

নীতিবিদ্যাব ভূমি হইতে এ মতই সঙ্গত মনে হয় যে, অসঙ্গত আচরণ, অন্যায় অভিপ্রায় এবং বিকৃত চরিত্রেরই প্রকাশক, এবং নৈতিক বিচার সমগ্র অভিপ্রায়ের মধ্য দিয়া যে চরিত্রের প্রকাশ তাহার সম্বন্ধেই। এবং চরিত্রে ব্যক্তিরই পবিচয়।

অন্যায আচবণ বিকৃত চরিত্রেরই প্রকাশক

Subject of Moral Judgment—নৈতিক বিচার বুদ্ধিবিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তিরই বিচার। ব্যক্তিত্বের বহু তল আছে। একদিক দিয়া মানুষ পশুর সমগোত্রীয়। যখন অন্ধ এবং অনিযন্ত্রিত আবেগ অনুভূতির বশবর্তী হইয়া সে কাজ করে, তখন পশুর সহিত তাহার প্রভেদ সামান্যই। কিন্তু সেই অবস্থায়ও মানুষ আপনাব উচ্চতর নৈতিক সত্তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে পারে না। তাই কৃত কর্মেব জন্য মানুষের অনুশোচনা আছে। অর্থাৎ, বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নিজেকে নিজেই বিচার করে, তাহার নৈতিক সত্তা তাহার পশু সত্তাকে ধিক্কার দেয়। ম্যাকেঞ্জী এই কথা বুঝাইবার জন্যই বলিয়াছেন যে, নৈতিক বিচারে মানুষ একটি পরিণত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে, একটি ভাবগত আদর্শের মাপকাঠিতে নিজ ও অপরের কর্মের বিচার করে।

কে বিচার করে?

বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নিজেই নিজেব বিচাব কবে

১১। It is only in a somewhat strained sense that the judgment can be said to be passed, either on the intention or on the motive alone. The truth seems to be rather that the fully developed moral judgment is always directly or indirectly on a *thing* done, but always on the *person* doing, that we pass moral judgment. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 111

শ্যাফ্‌টেসবেরী বলেন, সৌন্দর্যবিচারের জন্য প্রয়োজন বিদগ্ধ মনের। এই বিচার সকলে করিতে পারে না। শিল্পকৃতির মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে কলারসিকমণ্ডলীর কাছে আমরা যাই, তাঁহাদের বিচারই আমরা মানিয়া নেই। ঠিক তেমনি, নৈতিক বিচারের জন্যও, এ বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ (moral connoisseur) তাঁহাদের উপর আমরা নির্ভর করি। কিন্তু এই বিচারক বাহিরের কোন ব্যক্তি নন, তিনি মানুষের নিজেরই অন্তর। এ মতের মধ্যে এটুকুই সত্য আছে যে, নৈতিক বিচার পরিণত যুক্তিবুদ্ধিসাপেক্ষ। কিন্তু শিল্পকর্মের বিচার এবং নৈতিক বিচারের মধ্যে প্রভেদও যথেষ্ট। শিল্পকর্মের নির্ভুল বিচারের জন্য আমাদের অন্যের কাছে যাইতে হয়, বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হইতে হয়। কিন্তু নৈতিক বিচারের বেলায় ব্যক্তি নিজের বিবেকবুদ্ধি দ্বারা, নিজেকেই সর্বাপেক্ষা নির্ভুলভাবে বিচার করিতে পারে। তা ছাড়া, শিল্পকৃতির বিচারের ক্ষেত্রে শিল্পকর্মের **ফলকেই** আমরা বিচার করি, কিন্তু নৈতিক বিচারের বেলায় আমরা বিচার করি আমাদের আচরণের ফলকে নয়— **আচরণকেই**।[১২]

নৈতিক বিচারের জন্য আমরা এবিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ (Moral connoisseur) তাঁহাদের উপর নির্ভর করি

শিল্পকর্মের ফলকেই আমরা বিচার করি। নৈতিক বিচারের বেলা আমরা আচরণের ফলকে নয়, আচরণেরই বিচার করি

অ্যাডাম্ স্মিথ্ অনুরূপ একটি মতবাদকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, আইনের বিচারের বেলায় যেমন, নৈতিক বিচারের বেলায়ও তেমনি "নিরপেক্ষ বিচারকে"র দৃষ্টিভঙ্গী (impartial spectator) প্রয়োজন। যাহার কর্মটি বিচার করা হইতেছে তাহার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা থাকিলেও যেমন তাহার কর্মটির উপযুক্ত বিচার করিতে অক্ষম হই, তেমনি যাহার প্রতি কঠিন বিদ্বেষ আছে, তাহার কার্যও অকারণ রুক্ষতার সহিত বিচার করিয়া, তাহার প্রতি অবিচার করিয়া বসি। সেই জন্যই বাংলার এই প্রবাদবাক্য—'যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা!' সুতরাং নৈতিক বিচার করিতে গেলে, কিছুটা নৈর্ব্যক্তিকতা (impersonalness) ও নির্মমতা (detachment) প্রয়োজন। ইহা হইতেই তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, নৈতিক বিচার আমরা **প্রথমে নিজের করি না, অপরের করি**। এই বিচারের মধ্যে থাকে, অনুরাগ-বিরাগের মোহ,

আডাম্ স্মিথের Impartial spectator

নৈতিক বিচারে কিছুটা নৈর্ব্যক্তিকতা ও নির্মমতা প্রয়োজন

১২। MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 140

তাই এ বিচার অনেক সময়ই অসঙ্গত।[১৩] ক্রমেই ইহা বুঝিতে শিখি যে, আমরা যেমন নিজ অনুরাগ-বিরাগ অনুযায়ী খুব সহজে অন্যের বিচার করি, অন্যেও ঠিক অনুরূপ ভাবে, আমাদের কাজের বিকৃত বিচার করে। তাই কোন কাজ পূর্বের মতো নির্বিচারে করিতে পারি না। নিজের কর্মগুলিকে তখন নিজের বাহির হইতে (objectively) দেখিতে চেষ্টা করি,—বুঝিতে চেষ্টা করি, অন্যের চোখে আমার কাজ কেমন দেখায়। নিজেকে এখানে দুই আমিতে যেন ভাগ করি—এক আমি হইল, যে কর্ম করে এবং আর-এক আমি হইল যে সে কর্মকে নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে বাহির হইতে বিচার করে।[১৪] "নিরপেক্ষ দর্শক আমি"র নৈর্ব্যক্তিক বিচারই প্রকৃত নৈতিক বিচার। অবশ্য একথা আমরা স্বীকার করিনা যে, অপরকে আমরা প্রথম বিচার করি এবং শেষে নিজেকে বিচার করি। বরং এ কথাই সত্য যে ব্যক্তি নিজেকে যত প্রত্যক্ষ ভাবে এবং নির্ভুল ভাবে বিচার করিতে পারে, বাহির হইতে আর কেহ তেমন পারে না। এবং হয়তো এ কথাও সত্য যে, যেখানে মমতা আছে, সত্যিকার দরদ আছে, সেখানেই আমরা অন্যকে সত্য করিয়া জানিতে পারি। নিরপেক্ষ নির্মম বিচারক মানুষকে বাহির হইতেই দেখেন। বুদ্ধির দৃষ্টিতে, আইনের দৃষ্টিতে, খোলা চোখে সত্যকার অন্তরের মানুষকে চেনা যায় না। তাই ফরাসী প্রবাদ বলে, Tout comprendre c'est tout pardonner—To know all is to forgive all এবং তিনিই অন্য মানুষকে সম্পূর্ণ জানিতে পারেন, যাঁহার ভালবাসা তাঁহাকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, অন্ধ স্নেহ সুবিচারের অন্তরায়। তাই নৈতিক বিচারের বেলায় কামনা বাসনার পঙ্কিল ক্ষেত্র হইতে, আদর্শের উচ্চতর ভূমিতে উত্তরণ একান্ত প্রয়োজন। সেই ভূমিতেই আমরা ব্যক্তির ক্ষুদ্র পরিধির সীমা অতিক্রম করিয়া সর্বমানবের অনুসরণযোগ্য মহৎ আদর্শে পৌছিতে পারি।[১৫]

"নিরপেক্ষ দর্শক আমি"র মোহশূন্য বিচারই প্রকৃত বিচার

বিপরীত মত—যেখানে সত্যকার মমতা, সেখানেই আমরা অন্যকে সত্য করিয়া জানিতে পারি

নৈতিক বিচার ব্যক্তি-গত মোহ-মমতার ঊর্ধ্বে

১৩। When I endeavour to examine my own conduct, when endeavour to pass sentence upon it...it is evident that, in all such cases, I divide myself, as it were, into two persons: and that I, the examiner and judge, represent a different character from that other I, the person whose conduct is examined into, and judged of. Adam Smith—Theory of Moral Sentiments, Part I, Sect I, Chs. ii & iii

১৪। Ibid—Part III, Ch. ii.

১৫। 'Our moral judgments involve a certain reference to a point of view higher than that of the individual who acts,— an appeal so to speak, "from Philip drunk, to Philip Sober"... in the moral judgment there is an appeal from the universe of the individual consciousness, to higher or more comprehensive system. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 144-145

নৈতিক চেতনার স্বরূপ—Nature of Moral Consciousness— মানুষেরই নৈতিক বিচারের ক্ষমতা আছে, পশুর এই ক্ষমতা নাই। মানুষ বলে, 'এ কাজটি ভাল, ওই কাজটি মন্দ'—'এটি ন্যায়, ওটি অন্যায়'। ইহাকেই বলা হয়, মানুষের 'নৈতিক চেতনা' (moral consciousness)। মানুষের এই চেতনা আছে যে, সমস্ত কর্মের মূল্য সমান নয়, তাহাদের মধ্যে কতক কাজ প্রশংসনীয়, কতক নিন্দনীয়। মানুষের এই চেতনা আছে বলিয়াই, মানুষ অপরের ও নিজের কর্মের মূল্য নির্ধারণ করিতে পারে, মানুষের চরিত্রের বিচার করিতে পারে, মহৎ কাযের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ বোধ করে, এবং ইতর কাজ করিতে লজ্জা বোধ করে। অন্যভাবে বলি, মানুষের বিবেক আছে।

মানুষের নৈতিক চেতনা আছে—তাই সে ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ করিতে পারে

কিন্তু এই নৈতিক চেতনা বা বিবেক, কি বস্তু? কি ইহার স্বরূপ?

The Moral-sense theory—কোন কোন পণ্ডিতের মতে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যেমন প্রত্যক্ষভাবে তৎক্ষণাৎ দ্রব্যের গুণ জানিতে পারে, তেমন বিবেকও তৎক্ষণাৎ কোন কর্মের নৈতিক গুণ সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে। কোন্ কাজ ভাল বা মন্দ, কোন্ কাজ ন্যায়, কোন্ কাজ অন্যায়, বিবেকের সাহায্যে তাহা আমরা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি। ইহা বিচারসাপেক্ষ নয়, ইহা তাৎক্ষণিক জ্ঞানলব্ধ—কাজেই, বিবেককে বলা হইল moral sense। এই প্রত্যক্ষ ন্যায়-অন্যায় বোধই পরে পরিণত নৈতিক বিচারে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু মূলতঃ, ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানলব্ধ (intuitive)। ইহা সত্য যে, অনেক সময় সম্পূর্ণ যুক্তি দিতে না পারিলেও, আমরা সহজ বুদ্ধিতেই একটি কাজ ভাল কি মন্দ, তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু সেই জন্য, ইহাকে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের মত প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা চলে কিনা সন্দেহ। নিরক্ষর মানুষের নীতিবোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রচলিত সামাজিক মতামতের দ্বারাই প্রভাবিত। সাধারণ লোকের নৈতিক জ্ঞানের মধ্যেও নিশ্চয়ই অস্পষ্ট এবং অপ্রকাশ্য যুক্তিবিচার কিছুটা থাকেই।

নৈতিক চেতনা অন্তরঙ্গ ইন্দ্রিয়বোধ

অনুরূপ আর একটি মত হইতেছে যে বিবেক বা নীতি চেতনা এক প্রকারের মজ্জাগত অনুভূতি (Moral sentiment)। যে কাজ ন্যায়, তাহা করিলে, অথবা তাহা অন্যকে করিতে দেখিলে, একটি গভীর আনন্দ বোধ হয়,—আমাদের মন তাহাতে সায় দেয় (a feeling of approbation)। এবং বিপরীতভাবে, একটি অসঙ্গত কাজ করিলে, বা অন্যকে করিতে দেখিলে, অস্বস্তির অনুভূতি

নৈতিক চেতনা এক-প্রকারের মজ্জাগত অনুভূতি

হয়—মন বিমুখ হয় (a feeling of disapprobation)। এই অনুভূতিগুলি মানবজীবনে মৌলিক। ইহারাই পরবর্তীকালে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নৈতিক বিচারে পরিণতি লাভ করে।

এই মতও পূর্ববর্তী মতের মতো অসম্পূর্ণ। এ প্রকার অনুভূতির অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু নৈতিক বিচার অন্ধ প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর নির্ভরশীল, এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। নৈতিক বিচার সর্বজন-গ্রাহ্য (universal)। তাহা একটি পরিণত আদর্শ-সাপেক্ষ। এ প্রকার পরিণত আদর্শ অন্ধ অনুভূতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল নয়। অনুভূতি ব্যক্তি-নির্ভর, পরিবর্তনশীল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সামান্য পরিবর্তন ঘটিলেই, অনুভূতিরও পরিবর্তন ঘটে। কাজেই অনুভূতি কখনই বিচারের নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি হইতে পারে না। নৈতিক বিচারের মধ্যে একটি স্থায়িত্ব ও সার্বজনীনতা আছে। এবং চিন্তা, যুক্তি, ন্যায়সঙ্গত বিবেচনার মধ্য দিয়াই, এ প্রকার সার্বজনীন, ধ্রুব আদর্শে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। উপরোক্ত মত ত্রুটির মধ্যে এই সত্য আছে যে, অনৈতিক অবস্থা হইতে মানুষের বিবেক বা নীতি চেতনা ক্রমবিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা হইতেই পারে না। তবে জীবনের মূলে যে নীতিবোধ বা নৈতিক অনুভূতি থাকে, তাহা সমাজজীবনে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া, সচেতন যুক্তি, বিশ্লেষণ, এবং কতকটা অবচেতন অনুসরণ দ্বারা, ব্যক্তির মনে স্থায়িত্ব লাভ করে। যুক্তিবাদী দার্শনিকেরা বিশ্বাস করেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অনুভূতি, অন্যান্য প্রাণীর মতো, মানুষেরও আছে। কিন্তু মানুষের বিশেষত্ব হইতেছে, যুক্তিবিচারের ক্ষমতায়। এই যুক্তিবিচার দ্বারা আলোকিত নীতিবুদ্ধিকেই বিবেক বলা চলে। ইহা পশুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতির মতো নয়। নীতিবোধ সামাজিক প্রথা-নির্ভর নয় (হবসের মতে, সমস্ত নীতিবোধই কৃত্রিম ও সামাজিক প্রথা-নির্ভর)। যাহা নীতিসঙ্গত তাহা চিরন্তন, এবং মানুষের যুক্তিবিচারের সহিত আদর্শের চিরন্তনতা সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১৬]

নৈতিক বিচার প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি মাত্র নহে, ইহার পিছনে সচেতন বিচারবুদ্ধির ক্রিয়া বর্তমান

১৬। Hobbes had held that the moral laws were artificial and conventional in character...Cudworth and Clarke had sought to prove the 'eternal fitness' of moral distinctions, their 'immutable and eternal' nature, their mathematical necessity, their utter rationality...Butler... seeks to bring ethics back to earth and to find in the peculiar nature and constitution of man the clue to all moral distinction. Seth—A Study of Ethical Principles, P. 171

এবার তাহা হইলে নৈতিক চেতনার (Moral consciousness) বিশেষত্ব নির্দেশ করা যাক—

Characteristics of Moral consciousness—(১) নীতিচেতনা আছে বলিয়াই, আমরা কোন কর্মের বা কোন ব্যক্তির নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করিতে পারি। এই চেতনা আছে বলিয়াই আমরা ন্যায় ও অন্যায়, শুভ ও অশুভের মধ্যে প্রভেদ করিতে পারি।

(২) ইহা মানুষের জীবনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহা পশুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতির মত অন্ধ ও বিবেচনাহীন নহে।

(৩) ইহা বিচার ও যুক্তিনির্ভর। বয়স্ক সুস্থ মানুষ, বিচার-বিবেচনা দ্বারা যে কাজ স্বেচ্ছায় করে, নৈতিক বুদ্ধিদ্বারা তাহারই বিচার করি। তর্কবিচারের বুদ্ধিগত ক্ষমতা এবং নৈতিক বিচারের ক্ষমতা পৃথক নয়। মানুষের মনের মধ্যে অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন ক্ষমতা (faculty) বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বাস করে না। সমগ্র মন, একই মন। এবং বিচারবুদ্ধিই মানসিক ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ পরিণতি। তাহাই সমস্ত ক্রিয়ার শাসন-নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করে।

(৪) নৈতিক চেতনার মধ্যে অবশ্যই থাকে, আদর্শ সম্বন্ধে প্রত্যয়। এ আদর্শ যুক্তিবিচার দ্বারা মানুষের মন গ্রহণ করে। এই আদর্শের নিকষেই সমস্ত চেষ্টিত ক্রিয়া, সচেতন, স্বেচ্ছাকৃত বা অভ্যস্ত আচরণের (voluntary and habitual conduct) নৈতিক বিচার। যে ক্রিয়া এই আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাহাই ন্যায়, যাহা এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত,—তাহাই নীতি-বিরুদ্ধ, তাহাই অন্যায়।

নৈতিক চেতনার বৈশিষ্ট্য কয়টি

(৫) নৈতিক চেতনা স্থাণু নয়, নৈতিক আদর্শও অচল নয়। জীবনের প্রধানতম প্রয়োজনের সঙ্গে ইহারা যুক্ত। নৈতিক চেতনা এবং নৈতিক আদর্শ আলমারীতে সাজাইয়া রাখিবার জিনিস নহে। তাহাদের মধ্যে আছে, কর্মের আহ্বান। জীবনে রূপায়ণের জন্যই আদর্শ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

(৬) নৈতিক চেতনার মধ্যে তাই শাসন আছে। মানুষের নৈতিক চেতনা আছে বলিয়াই, সে অনুভব করে, নৈতিক আদর্শের আহ্বানকে মানিতেই হইবে (obligatoriness)।

(৭) নৈতিক চেতনা সার্বজনীন সত্য, কিন্তু ইহা নিরালম্ব ধ্যান মাত্র নয়। সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই নৈতিক চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ। নৈতিক চেতনাই মানুষকে মানুষের সঙ্গে শ্রদ্ধায়, প্রেমে, সহযোগিতায় ও কর্তব্যবুদ্ধিতে যুক্ত করে। নৈতিক চেতনা সমাজকে সুস্থ রাখে, নির্মল রাখে।

নৈতিক চেতনার বিকাশ ও পরিণতি—The Development of Moral Consciousness—সম্পূর্ণ অসভ্য স্তরেও মানুষের অপরিপুষ্ট নৈতিক চেতনা ছিল। কিন্তু তাহা বিচারবুদ্ধিদ্বারা পরিমার্জিত ছিল না। অসভ্য মানুষ রক্ত-সম্পর্কিত ছোট বড় গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া বাস করিত। জীবনের প্রয়োজনেই আপন গোষ্ঠীর পতির নিকট অন্ধ আনুগত্য, এবং গোষ্ঠীর প্রথা ও আচরণ অনুকরণ স্বাভাবিক ছিল। ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীন বিচার তখনও নিতান্ত অস্পষ্ট ও অ-বিকশিত ছিল। দলের আচরণ হইতে ব্যতিক্রম তখন অক্ষমণীয় অপরাধ বলিয়াই বিবেচিত হইত। কাজেই তখন দলের আচরণের অনুসরণ ছিল প্রশংসিত, এবং তাহার ব্যতিক্রম ধিক্কৃত। ফ্রয়েডপন্থীরা দেখিয়াছেন যে, শিশু পিতামাতার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত একাত্মতা (identity) বোধ করিয়াই সমাজজীবনে স্বস্তি ক্রয় করে। ন্যায় বা অন্যায় শিশুর কাছে এবং অসভ্য মানুষের কাছে গোষ্ঠীর দ্বারা আচরিত ও প্রশংসিত, অথবা গোষ্ঠীর দ্বারা বর্জিত ও নিন্দিতের সমার্থবাচক ছিল।

নৈতিক চেতনা একেবারেই ছিল না, এমন অবস্থা কখনও মানুষের ছিল না ; তবে ইহা প্রথমে অপরিণত ছিল, ক্রমে পুষ্টি লাভ করিয়াছে

এই প্রাথমিক সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তি নিজেকে গোষ্ঠী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে শেখে না। তাহার ন্যায়-অন্যায়বোধ গোষ্ঠীর মঙ্গল-অমঙ্গলের সঙ্গেই যুক্ত। ইহাকে ক্লিফোর্ড—The Tribal Self বলিয়াছেন। যখন কোন ব্যক্তি তীব্র কোন প্রবৃত্তির তাড়নায়, এমন কাজ করে যাহা তাহার গোষ্ঠীর পক্ষে অশুভ তখন তাহার 'গোষ্ঠী-আত্মা'—তাহার 'ব্যক্তি-আমির' কাজকে নিন্দা করে।[১৭] অবশ্য এই বিচার, এই প্রাথমিক স্তরে নিশ্চয়ই সচেতন ভাবে হয় না। ব্যক্তির ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদবোধ তখন অনুকরণ ও ইঙ্গিতের ফল (imitation & suggestion) ; গোষ্ঠীর মঙ্গলের পক্ষে যে কর্ম অনুকূল, তাহা গোষ্ঠীর আত্মরক্ষার স্বার্থেই অনুশীলিত ও অভ্যস্ত হয় এবং ব্যক্তিও তাহা নিজ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী নয়—ইহা তাহার গোষ্ঠিজীবনেরই প্রতিফলন।[১৮] কিন্তু বন্য অসভ্য জীবন হইতে মানুষ কৃষিভিত্তিক

প্রথম অবস্থায় নৈতিক বিচার গোষ্ঠি-চেতনা ও অনুকরণ-নির্ভর

১৭। Clifford—Lectures and Essays: Essay On the Scientific Basis of Morals

১৮। ...customary modes of action grow up in the life of a people, that those modes of action that are favourable to its welfare tend on the whole to be selected and preserved, and that those modes of action also tend, on the whole, to be approved. In thus approving, the individual puts himself at the point of view of his tribe, but he does so unconsciously ; it does not occur to him that it would be possible for him to take up any other point of view. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 19

গ্রাম্যজীবন, এবং অবশেষে, শিল্পসমৃদ্ধ নাগরিক জীবনে উপনীত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি নিজেকে গোষ্ঠী হইতে বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসাবে দেখিতে শেখে, জীবিকা অর্জন ও জীবন চালনায় ব্যক্তিগত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়; অর্থাৎ গোষ্ঠিজীবন হইতে পৃথক তাহার নিজস্ব জীবন আছে, ইহা সে বুঝিতে শেখে। বিভিন্ন বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বিশেষতঃ মনোবিদ্যার অগ্রগতির ফলে মানুষ নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিতে অভ্যস্ত হয়, নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। সে যুক্তিবিচার দ্বারা নিজের ও পরের কর্মের মূল্য বিচার করিতে শেখে। তখনই বলা যায়, তাহার বিবেকের পরিণতি ঘটিয়াছে। নৈতিক জীবন পরিণত মানুষের কাছে শুধুমাত্র সমাজের আচারের অনুকরণ নয়, ইহা যুক্তিবিবেচনা-চালিত। ইহা শুধু যৌথ জীবনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নয়, ইহা ব্যক্তির নিজস্ব কল্যাণ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশেরও অনুকূল বলিয়া, সচেতন ভাবে অনুসৃত। অবশ্য ব্যক্তির নীতিবোধের এই পরিণতি অকস্মাৎও ঘটে না, আকস্মিকভাবেও ঘটে না। এই

ক্রমশঃ ব্যক্তি নিজেকে গোষ্ঠী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীন সত্তা হিসাবে দেখিতে শেখে

পরিণতির প্রধান তিনটি স্তর উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম স্তরে, গোষ্ঠীর আচার ও প্রথাই নীতির মাপকাঠি। দ্বিতীয় স্তরে, এই প্রথা ও আচারগুলি দেশের আইনে (positive laws of the land) পরিণত হয়, এবং ইহাদের সহিত সঙ্গতিই নৈতিক আচরণের পরিমাপক হয়। সর্বোচ্চ স্তরে, আচার ও প্রথা এবং প্রচলিত আইনের চেয়ে ঊর্ধ্বে বিবেকের আইন (the Law of Conscience or Moral Law) মর্যাদা লাভ করে। এ স্তরে পৌঁছিলে, নীতিবোধের দৃষ্টিভঙ্গীরও একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। পূর্বের দুই স্তরে মানুষের আচরণকে বিচার করা হয় বাহির হইতে, তাহার ফলাফল দিয়া, এবং বাহিরের প্রথা-আচার-আইনের সঙ্গতি দ্বারা। কিন্তু নীতিবোধের সর্বোচ্চ স্তরে মানুষ আচরণের বিচার করে, অন্তরের দিক হইতে—প্রেষণা, অভিপ্রায় ও চরিত্রের প্রকাশ অনুসারে। মানুষ তখন স্বীকার করিতে শেখে যে, বিবেকের আদেশ সাংসারিক লাভক্ষতির হিসাবের ঊর্ধ্বে। সমাজের প্রথা-আচারের পরিবর্তন ঘটে, রাষ্ট্রের আইনের সংশোধন হয়। তাছাড়া, ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমাজের প্রথার সংঘর্ষ হয়—প্রথার সঙ্গে রাষ্ট্রের আইনের বিরোধ ঘটে। কিন্তু মানুষের নীতিবুদ্ধি পরিণতি লাভ করিলে, সে তখন বিবেকের

প্রথম স্তরে গোষ্ঠীর প্রথা আচারই নীতির মাপকাঠি

দ্বিতীয় স্তরে প্রথা-আচারগুলি দেশের আইনরূপ নির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করে

পূর্বের দুই স্তরে নৈতিক বিচার কর্মের বাহিরের দিক হইতে

নির্দেশ,—নৈতিক বিধির নির্দেশ দ্বারাই এ সমস্ত বিরোধের ও অসঙ্গতির মীমাংসা করিতে শেখে। কিন্তু বিবেক শুধু অন্ধ হৃদয়াবেগ নয়, শ্রেষ্ঠ স্তরের নীতিবোধ—স্বচ্ছ ও পরিণত বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিমার্জিত, সংস্কৃত। এই পরিণত নীতিবোধের আদর্শ ব্যক্তিগত স্বার্থনির্ভর নয়,—ইহা কোন বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালের সীমাদ্বারা খণ্ডিত নয়—ইহা সার্বজনীন ও সর্বকালের। ইহার মর্যাদা ও শক্তি কোন রাজা বা সম্রাটের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না,—মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম হইতেই ইহার উদ্ভব। বাহিরের কোন শক্তি ইহা অনিচ্ছুক মানুষের স্কন্ধে চাপাইয়া দেয় নাই, মানুষের শ্রেষ্ঠ স্ব-ভাবেই ইহার মূল, তাই স্বেচ্ছায়ই মানুষ বিবেকের বিধির (moral law of conscience) বশ্যতা স্বীকার করে।

সর্বোচ্চ বিকাশের স্তরে নৈতিক বিচার ব্যক্তির অন্তরঙ্গ দিকের, তাহার চরিত্রের

নীতিবোধের বিকাশের ধারার এই বিশেষত্বগুলি আমরা লক্ষ্য করিলাম:

(১) ইহা গোষ্ঠিগত প্রথা-আচার হইতে রাষ্ট্রের আইনে বিকশিত হয়। অবশেষে সার্বজনীন সাধারণ নৈতিক বিধির ধারণার উদ্ভব হয়।

(২) প্রথমতঃ নৈতিক বিচার হয় বাহির হইতে, কর্মের ফলাফল দ্বারা, সমাজের ইচ্ছাব সহিত সঙ্গতি-অসঙ্গতি দ্বারা। অবশেষে বিচারের মাপকাঠি হয়, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের বিশুদ্ধতা দ্বারা।

(৩) প্রথমতঃ নীতিবোধ বিশেষ গোষ্ঠীর, বিশেষ কাল, বিশেষ অবস্থা অনুসারে পৃথক হয়, ক্রমে সর্বকালীন, সার্বজনীন আদর্শের উদ্ভব হয়। ইহার মূল্য সাংসারিক স্বার্থ ও সুবিধা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, ইহার মর্যাদা সমস্ত সাংসারিক বিধির ঊর্ধ্বে, ইহার মূল্য চিরন্তন। ইহার নিরিখেই অন্য সমস্ত আইনের মূল্য নির্ণীত হয়।[১৯]

সংক্ষিপ্তসার

বিচার দুই প্রকার—বস্তুবিচার এবং মূল্যবিচার। যখন বলি, লোহা এক প্রকার ধাতু, ইহা কৃষ্ণবর্ণ ও কঠিন, তখন তাহা বস্তু ও তাহার প্রকৃতিবিচার। কিন্তু যখন বলি, সোনা লোহার চেয়ে দামী, তখন তাহা মূল্যবিচার। নৈতিক বিচার হইল আচরণের মূল্যবিচার।

কিন্তু নৈতিক বিচাব বৈষয়িক সত্যবিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কোন শক্তি নয়।

১৯। MacKenzie—A Handbook of Ethics, P. 126

নৈতিক বিচারের এ কয়টি উপাদান—(১) নৈতিক বিচার আদর্শগত, বস্তুগত নয়। ইহা বলে, 'এই আচরণ ন্যায়', 'ওই আচরণ অন্যায়'। (২) যাহা ন্যায় বলিয়া জানি, তাহা করণীয় বলিয়াও মানি। (৩) যাহা ন্যায় তাহা শুধু যুক্তিসঙ্গত নয়, তাহা অবস্থা-উপযোগীও বটে। (৪) যাহা ন্যায় তাহা সত্য, এবং সর্বজন অনুসরণীয়।

নৈতিক বিচারের বিষয় কি? প্রেযোবাদীরা আচরণের ফলাফল দ্বারা ইহার নৈতিক বিচার করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু কাণ্ট প্রমুখ যুক্তিবাদীরা আচরণের অন্তরঙ্গ দিকই নৈতিক বিচারের বিষয় বলিয়া মনে করেন। বাট্‌লার বা মার্টিন্যু বলেন, কর্মের প্রেষণা (motive) বা যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তি কর্মে রত হয় তাহা নৈতিক বিচারের বস্তু। কিন্তু কর্মের প্রেষণা সৎ হইলেও, আচরণ নিন্দনীয় হইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে নৈতিক বিচার শুধু কর্মের প্রেষণা সম্পর্কে নয়, ব্যক্তির সম্পূর্ণ অভিপ্রায় (Intention) সম্পর্কে।

কিন্তু অভিপ্রায় ব্যক্তির চরিত্র ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। তাই নৈতিক বিচার শুধু আচরণের অভিপ্রায় সম্বন্ধেই নহে—সম্পূর্ণ ব্যক্তির সম্বন্ধেই। অন্যায় আচরণ অসম্পূর্ণ অথবা রুগ্ণ ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ।

নৈতিক বিচার কে করে? শ্যাফ্‌টেস্‌বারী বলেন, নৈতিক বিচারের জন্য আমরা এ বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ, এমন বিদগ্ধ, শীল মনের উপরই নির্ভর করি। কিন্তু এই নৈতিক বিচার, ব্যক্তির অন্তরের মধ্যেই ঘটে, ইহা বাহিরের কোন শক্তি নহে। শিল্পকর্মের বিচার হয় তাহার ফলের দ্বারা—কিন্তু নৈতিক বিচার আচরণের ফলের নয়, আচরণেরই।

অ্যাডাম্ স্মিথ বলিয়াছিলেন, নৈতিক বিচারের বেলায় 'নিরপেক্ষ বিচারকের' দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। আমরা নিঃসম্পর্কিত পর সম্পর্কেই এ প্রকার বিচার করিতে পারি। নিজের সম্পর্কে অনেকখানি মোহ ও মমতা থাকে, তাই নিজের বিচার সহজ নয়। নিজের বিচার করিতে হইলে, নিজেকে বাহির হইতে নির্মম বিচারকের দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

আমরা নৈতিক চেতনাসম্পন্ন জীব বলিয়াই নৈতিক বিচারের অধিকারী।

এই নৈতিক চেতনার স্বরূপ কি? কেহ কেহ বলিলেন, ইহা ইন্দ্রিয়বোধের মত প্রত্যক্ষ একপ্রকার আন্তরিক বোধ। তাই কোন্ কাজ ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় তাহা তৎক্ষণাৎই আমরা জানিতে পারি। আবার কেহ বলেন, ইহা একটি স্থায়ী জটিল অনুভব। ন্যায় কাজ করিলে বা দেখিলে, আমাদের গভীর আনন্দ হয়,—ইহা বিচারসাপেক্ষ নয়।

কিন্তু নৈতিক চেতনা একটি অনুভব মাত্র হইতে পারে না। ইহার পিছনে আমাদের যুক্তি-বুদ্ধির সমর্থন নিশ্চয়ই থাকিতে হইবে।

তাহা হইলে নৈতিক চেতনার প্রকৃতি কি? এই চেতনা আছে বলিয়াই আমরা ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ করিতে পারি। ইহা মানুষের বৈশিষ্ট্য,—ইহা অন্ধ জান্তব ব্যাপার নয়। ইহা বিচারবুদ্ধিনির্ভর। আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন প্রত্যয়, ইহার ভিত্তি। ইহা অচল ও অপরি-বর্তনীয় নয়, জীবনের প্রধানতম প্রয়োজনের সঙ্গে এ চেতনা যুক্ত। নৈতিক চেতনা আমাদের শাসন করে, আমাদের আনুগত্য দাবি করে। ইহা সার্বিক, কিন্তু ইহা নির্বস্তুক ধ্যানমূর্তি মাত্র নয়।

মানুষ আদিমতম অবস্থায়ও এই চেতনাশূন্য ছিল, না—ক্রমে এ চেতনা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। প্রাথমিক অবস্থায় গোষ্ঠীর প্রথা-আচারই ছিল, নৈতিক বিচারের মাপকাঠি।

ক্রমে তাহা রাষ্ট্রের আইনরূপে নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিল। ক্রমশঃ ব্যক্তি নিজেকে গোষ্ঠী হইতে বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসাবে দেখিতে শিখিল, এবং সর্বশেষে মানুষের নিজের আন্তরিক দিক অর্থাৎ তাহার চরিত্রকেই নৈতিক বিচারের বস্তু বলিয়া মান্য করিতে শিখিল ?

Questions

1 Distinguish between factual judgment and moral judgment. Indicate the content and significance of moral judgment.

2. What is the object of moral judgment ? Discuss fully.

3. Who is the subject of moral judgment ? Critically discuss the different views.

4. What is the nature of moral consciousness ? Discuss the different theories and indicate your own preference.

5. What are the stages of the development of moral consciousness ? Discuss.

পঞ্চম অধ্যায়

নৈতিকতার দায়

Moral Obligation

[Moral obligation—its nature & source—Moral sanctions,—external and internal, Evolutionist, Intuitionist, Rationalistic and Perfectionist views—Law of Nature, Law of the State & Moral Law—Conscience & Prudence]

কেন আমরা ন্যায়ের পথে চলি ? যখনই বোধ করি কোন কাজটি ন্যায়, তখনই সেই পথে চলিবার একটা দায় থাকে,—আবার যখনই কোন কাজটি অন্যায় বোধ করি, তখনই সেই পথ পরিত্যাগ করিবারও দায় থাকে। আমরা নিজের অন্তরেই মানিয়া লই, ন্যায়ের পথে চলিতে হইবে, অন্যায়ের পথ পরিহার করিতে হইবে। কি এই দায়বোধের স্বরূপ? কি জন্য এই দায়বোধ? কাহার কাছেই বা এই দায়?

যাহা সৎপথ বলিয়া স্বীকার করি, তাহা অনুসরণের দায় বোধ করি

কাণ্ট বলিবেন, নীতিবোধের মধ্যে আছে 'আদেশ' (Imperative)। আমাদের অন্তরের মধ্যে এ আদেশ যেন শুনিতে পাই,—'ইহা তোমার কর্তব্য, করণীয়'। আবার প্রলোভনের পথে, পাপের পথে যখন পা বাড়াই,

নীতি বোধের মধ্যে আছে আদেশ

"ও পথে যেওনা, ফিরে, এসো বলে,
বারে বারে তুমি ডেকেছ।"[১]

কেন আমরা এই আদেশ মানিয়া লই? এই আদেশ যদি বাহিরের কোন ব্যক্তির নিকট হইতে আসিত, তাহা হইলে সেই শক্তি যতই প্রবল হোক্ তাহার আদেশ স্বেচ্ছায় মানুষ মানিয়া নিত না।[২] এই আদেশ,—যাহাকে আমরা বিবেকও বলিয়া থাকি,—আমাদের অন্তর হইতেই উত্থিত হয়—ইহা আমাদের স্ব-ভাবজাত। আমরা যখন নীতির শাসন মানি, তখন আমাদের শ্রেষ্ঠ স্বরূপকেই মানি। মানুষের মনুষ্যত্বের মধ্যেই আছে—নৈতিকতা। মানুষ সকলের

এই আদেশ কোন বাহিরের শক্তি হইতে নয়, তাহা অন্তর হইতে নিঃসৃত

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ব্রহ্মসঙ্গীত
২। MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 255

উপরে নৈতিক সত্তা (a motal entity)। এই সত্তারই অধিকার কাছে মানুষের স্বেচ্ছাকৃত আনুগত্য দাবি করিবার। যদি বলি এই আদেশ ঈশ্বরের, তবে ইহাও মানিতে হইবে আমার অন্তরের মধ্যেই ঈশ্বরের স্থান। তিনি আমার বাহিরে, আকাশের ঊর্ধ্বে স্বর্গের সিংহাসন হইতে আমাদের শাসন করেন না। তাঁহার সিংহাসন মানুষের অন্তরেই। তাই বেদান্ত সাহস করিয়া বলিয়াছে 'সোঽহং'— 'আমিই সেই পরমব্রহ্ম'—তাঁহারই আদেশ নৈতিক জীবনে আমরা পালন করি। এই আদেশের মধ্যে বলপ্রয়োগ নাই, শাস্তিব ভয়ের সহিত যুক্ত হইয়া এই আদেশ বলে না, 'তোমাকে ইহা করিতেই হইবে'। নীতিব আদেশ বলে, 'তোমার নৈতিক সত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান-হেতু এই কাজ তোমার কর্তব্য—ইহা করা উচিত। ইহা না করিবার স্বাধীনতা তোমার আছে, কিন্তু ইহার ফলের দায়িত্বও তোমাকে নিতে হইবে।' নৈতিক আদেশের স্বরূপ কি, উৎস কি এবং কেন আমরা এই আদেশ শিরোধার্য করি, এ বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। তাহা এবার আলোচনা করিতে হইবে।

এই নৈতিক আদেশের স্বরূপ ও উৎস সম্বন্ধে বিভিন্ন মত

ভগবান, রাষ্ট্র বা সমাজের আইনই নৈতিক দায়ের উৎস

পেইলী বলেন, নীতিসঙ্গত কর্ম হইতেছে সেই কর্ম, যাহা ঈশ্বরের আদেশ অনুসরণ করে। ঈশ্বর পরমশক্তিমান্, তাঁহার হাতে আছে ন্যায়ের দণ্ড। তাঁহার আছে পুরস্কার-তিরস্কারের চূড়ান্ত ক্ষমতা। তাঁহার আদেশ, অন্তরে বিবেকের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়। সেই আদেশ চন্দ্র, সূর্য, নদী, বাতাস সকলেই মান্য করে। তিনি 'মহদ্ভয়ম্'—তাঁহার ভয়েই সকল বিশ্বজগৎ চলিতেছে। আমরাও তাঁহারই প্রজা, তাঁহার অমোঘ বিধান অমান্য করিবার শক্তি আমাদের নাই। তাঁহার শাসন অমান্যের মূল্য কঠিন শাস্তি—অনন্ত নরকবাস।

ভগবান, রাষ্ট্র বা সমাজের আইনই নৈতিক দায়ের উৎস ?

সাধারণ মানুষের কাছে ভগবানের এই ভয়াল শক্তিমান রূপ গ্রহণীয় হইতে পারে। কিন্তু আত্মসম্মানসম্পন্ন, যুক্তিবান্ মানুষ ঈশ্বরের এই রূপকে অশ্রদ্ধেয় বলিয়াই মনে করে। তাঁহার কঠিন শাস্তি বা লোভনীয় পুরস্কার দেওয়ার ক্ষমতা আছে, সেই জন্যই তাঁহার আদেশ আমরা মান্য করি, এই মত নীতিবোধের মৌলিক স্বরূপ যে ইহা স্বেচ্ছাকৃত বাধ্যতা, ইহাই অস্বীকার করে। এবং ভগবান্ বাহির হইতে আমাদের শাসন করেন, এই বালসুলভ মত গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ভগবান্ স্বেচ্ছাচারী মহাশক্তিমান উৎপীড়ক হইলে, মানুষ তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা

দিতে পারিত না। ভগবান্ যুক্তি ও নীতির পরিপূর্ণ আদর্শ বলিয়াই, মানুষের নৈতিক সত্তা তাঁহার কাছে স্বেচ্ছায় নতি স্বীকার করে।

কেহ কেহ বলিবেন, সমাজ বা রাষ্ট্রের শাসনই নৈতিক বাধ্যতার মূল। সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসন-পীড়নের প্রভূত ক্ষমতা আছে। ব্যক্তি তাই ভীত হইয়াই সমাজ বা রাষ্ট্রের গৃহীত আদর্শকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এখানেও নৈতিক বাধ্যতার মূল, শাস্তির ভয়, পুরস্কারের লোভ। নৈতিক আদর্শ রক্ষায় সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা সহায়ক ইহা সত্য, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের এই পীড়ন ও তোষণের প্রচুর ক্ষমতা আছে বলিয়াই আমরা নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করি ইহা সত্য নয়। এই মতে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে নিতান্ত বাহির হইতে দেখা হইতেছে। বাহিরের শাসন কখনও নীতিবোধ জাগ্রত বা উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না এবং ব্যক্তি সমাজের বা রাষ্ট্রের অনিচ্ছুক ভৃত্য মাত্র, এই মতও নিশ্চয়ই সত্য নয়। বাহিরের শক্তি অনিচ্ছুক বাধ্যতা আদায় করিতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত আন্তরিক ঔচিত্য-বোধ কখনও সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত মনে হয় যে নৈতিক আচরণের ব্যাপারে আমরা কখনও বাহিরের শক্তিকে বাধ্যতার হেতু বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি না।[৩]

বাহিরের শাসন কখনও আন্তরিক ঔচিত্যবোধ সৃষ্টি করিতে পারে না

২। **প্রেয়োবাদীদের মত—The Hedonistic view**—প্রেয়োবাদীদের মতে আত্মসুখের আকাঙ্ক্ষা এবং সাংসারিক সাবধানতাই সমস্ত নৈতিক কর্মের প্রেরণা যোগায়। আমরা নিজেকেই ভালবাসি, নিজের সুখই চাই,—ইহাই মানুষের প্রকৃতি। তবে মানুষ অপরের সুখের জন্য প্রয়াসী হয় কেন—অপরিমেয় আত্ম-তৃপ্তির পথে ছুটিয়া চলে না কেন? তাহার কারণও গভীর স্বার্থবুদ্ধি। বেন্থামের মতো প্রেয়োবাদী বলেন, সাংসারিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায়,—শুধু মাত্র নিজের সুখের সন্ধান করিয়া, কেহ বাস্তবিকপক্ষে সুখী হইতে পারে না। পরের সুখ সন্ধান করিলেই, নিজের সর্বাধিক স্বার্থরক্ষা হয়। তা ছাড়া ব্যক্তি যথেচ্ছভাবে নিজ স্বার্থবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইতে গেলে কতগুলি বাধা বা শাস্তির সম্মুখীন হয়। তাই সে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টাকে সীমিত করিতে, শাসন করিতে এবং

৩। In strictly moral matters...it seems clear that we cannot recognize any authority that is of the nature of force... External authority with superior power can create a *must*, but never an *ought*. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 258

অপরের সুখ সন্ধান করিতে বাধ্য হয়। এই সব বাধা বা শাস্তির ভয়, যাহা মানুষকে সৎপথে রাখে, তাহাদিগকে প্রেয়োবাদীরা Moral Sanctions বলিয়াছেন। বেন্থামের মতে এই বাধাগুলি সমস্তই বাহিরের—(১) বহির্জগতের প্রকৃতির নিয়মের বাধা (Physical sanctions)—অপরিমিত ভোজন করিলে উদরাময়ে কষ্ট পাইতে হয়। প্রকৃতিই আমাদের মিতাচারী হইতে বাধ্য করে।

স্থূল প্রেয়োবাদীদের মতে বাহিরের শক্তির নিকট হইতে শাস্তির ভয়েই মানুষ কর্তব্য করে

(২) রাষ্ট্রীয় শাসনের বাধা (Political sanctions)—ইচ্ছা করিলেই এখন যত খুসী গিনিসোনার গহনা তৈরী করিতে পারিবে না। চেষ্টা করিয়া ধরা পড়িলে, রাষ্ট্র শাস্তি দিবে। দেশের স্বার্থে, রাষ্ট্রের শাসনে ব্যক্তিকে সংযত হইতে হয়।

(১) বাহ্য প্রকৃতির শাসন
(২) রাষ্ট্রের শাসন

(৩) সমাজে নিন্দার বাধা (Social sanctions)—বিলাত ফেরৎ 'সাহেব' ছেলে, বিরক্তিকর হইলেও 'গেঁয়ো' বৃদ্ধ বাপকে পোষণ করিতে বাধ্য হয়—স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য বাপকে দরিদ্র আতুর আশ্রমে পাঠাইতে চেষ্টা করিলে, সমাজে নিন্দা হয়। তাহাতে সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হয়।

(৩) সমাজের শাসন

(৪) ধর্মের অনুশাসন (Religious sanctions)—ধর্মের অনুশাসন আছে, তাই মা মারা গেলে 'সাহেব' ছেলেকে মাথা মুড়াইয়া মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি করিতে হয়,—যদিও তাহাতে অনেক আরামের ব্যাঘাত হয়।

(৪) ধর্মের শাসন

মিলের প্রেয়োবাদ অধিকতর সংস্কৃত (refined)। তিনিও বেন্থামের মতো স্বীকার করেন যে, মানুষ গভীর স্বার্থপরতা বশতঃই সৎপথে চলিতে বাধ্য হয়। তিনি উপরোক্ত চারিটি বাহিরের শাসন (external sanctions) ছাড়াও, মানুষের অন্তরের বিবেকের শাসনও (internal sanction) মানুষের সৎপথে থাকিবার ও অন্যের উপকার করিবার প্রবৃত্তি যোগায় বলিয়া মনে করেন। মিলের মতে, অসৎপথে চলিলে মানুষ নিজের অন্তরেই অস্বস্তি বোধ করে—পীড়া বোধ করে—তাহা হইতে আত্মরক্ষার মানসেই মানুষ পরোপকার করে। যখন প্রচুর চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় সম্ভোগে রত আছি, তখন দ্বারে অভুক্ত, ভিখারীর কান্না আমাদের

মিল্ঃ বাহিরের শাসনের সঙ্গে সঙ্গে

অন্তর অস্বস্তিতে ভরিয়া দেয়—এক অনির্দেশ্য অপরাধবোধ আমাদিগকে পীড়া দিতে থাকে। বিবেকের সেই ধিক্কার এড়াইতে চাই বলিয়াই ভিখারীকেও নিজেদের সুস্বাদু খাদ্যের ভাগ দেই। তা ছাড়া, মিল্ মনে করেন, অপরের প্রতি সহানুভূতি মানুষের স্বাভাবিক আন্তর ধর্ম, সেই জন্যই পরের দুঃখ আমাদিগকে পীড়া দেয়। সুতরাং নৈতিক কর্মের দায় শুধু রাষ্ট্র বা সমাজের কাছে নয়, নিজের অন্তরের মানবতাবোধেরও কাছে।[৪]

অন্তরের পীড়াবোধকে সমস্ত কর্তব্যবুদ্ধির উৎস বলিয়া মনে করেন

বেন্থামের মতে, নৈতিকতার দায় সোজাসুজিভাবেই সাংসারিক স্বার্থবুদ্ধি। ইহার পিছনের তাড়না ভয় ও লোভ। মিলের মত অধিকতর গ্রহণীয় হইলেও তিনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন অন্তরের অস্বস্তি দূর করিবার আকাঙ্ক্ষায় সৎকাজ করিবার তাড়নাও মূলতঃ স্বার্থবুদ্ধিসঞ্জাত—ইহাকে তিনি বুদ্ধিমান্ লোকের স্বার্থবুদ্ধি—intelligent self-interest—আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু নৈতিক জীবনের দায় স্বার্থবুদ্ধি, তাহার তাড়না ভয় ও লোভ, এই মত নৈতিক কর্ম এবং সাংসারিক লাভজনক কর্মের মধ্যের প্রভেদটিকেই অস্বীকার করিতেছে, তাই এই মত অগ্রাহ্য। নৈতিক বুদ্ধি অন্ধ অনুভূতির উপর নির্ভরশীল নয়। তাহার মধ্যে আছে বিচার এবং আত্মমর্যাদাবোধ।

নৈতিক জীবনের দায় স্বার্থবুদ্ধি, এই মত অগ্রহণযোগ্য

হারবার্ট স্পেন্সার প্রমুখ ক্রমবিকাশভিত্তিক প্রেয়োবাদীরাও মনে করেন সমাজে প্রথম অবস্থায় নীতিবোধ বাহিরের শাসন হইতেই আসে। শাস্তির ভয়ই কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণা যোগায়। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে, ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের সামঞ্জস্য ঘটিতে থাকে। কাজেই পূর্বে যাহা ছিল, বাহিরের শাসনের বাধ্যতা, তাহা অন্তরের স্বেচ্ছাকৃত বাধ্যতায় পরিবর্তিত হয়।[৫] কিন্তু বাহিরের যে শাসন, তাহা হইল শাস্তিভিত্তিক। তাহা কি করিয়া অন্তরের স্বেচ্ছাকৃত বাধ্যতায় পরিবর্তিত হয়, তাহা বুঝা কঠিন। তাই এই মতও গ্রহণীয় নয়।

হারবার্ট স্পেন্সারের মতে, যাহা ছিল বাহিরের শাসন তাহা অন্তরের শাসনে পরিণত হইয়াছে

৪। The ultimate source of all morality and ground of obligation is the pain, more or less violent, attendant on the violation of duty. Mill—Utilitarianism, Ch. III, P. 41

৫। "Because man learned his duty under the prescription of political, religious and social authorities, it is thought that fear of punishment is the real meaning of obligation". H. Spencer

অন্তর্দৃষ্টিবাদীদের মত—The Intuitionist view—ইঁহারা প্রেয়োবাদীদের মতো নৈতিক বুদ্ধিকে স্বার্থবুদ্ধির সহিত অভিন্ন করিয়া দেখেন না এবং নৈতিক আচরণের দায় বাহিরের শাসন, এই মতও গ্রহণ করেন না। ইঁহারা ঠিকই মনে করেন, নৈতিক আচরণকালে আমাদের দায় নিজের অন্তরের শুভবুদ্ধির কাছেই। ইহারই নাম বিবেক।

অন্তর্দৃষ্টিবাদীদের মত : অন্তরের শুভবুদ্ধিই প্রত্যক্ষভাবে শুভকর্মের প্রেরণা জোগায়

কেহ কেহ বলিবেন, বিবেক অন্তরেন্দ্রিয়ের ন্যায়। ইহার সাহায্যে আমরা তৎক্ষণাৎ কোন কর্মের নৈতিকতা বোধ করিতে পারি এবং সে অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হই।

বাট্‌লারের মতে নৈতিকবোধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়, ইহা যুক্তিবিচারলব্ধ। মানুষের বৈশিষ্ট্য হইতেছে, যুক্তি ও বিচারের ক্ষমতা। মানুষের কাছে এই যুক্তির দাবি অপ্রতিরোধ্য। নৈতিক বিচারলব্ধ বুদ্ধিই মানুষকে সৎকর্মের প্রেরণা দেয়।

বাট্‌লারের মতে, এই নৈতিক বোধ যুক্তি-বিচারের ক্ষমতানির্ভর, বিবেক অন্ধ শক্তি নয়

নৈতিক বুদ্ধি এবং নৈতিক দায় অভিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন। যাহাই নৈতিক কর্ম বলিয়া বিবেকবুদ্ধি স্বীকার করে, তাহাই কর্তব্য বলিযাও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্বীকার করে। মিল্‌ বলিয়াছিলেন, আমরা অন্যায় কর্ম করিলে অস্বস্তি বোধ করি, ইহা আমাদেব পীড়া দেয়। এই পীড়নের হাত এড়াইতে চাই বলিয়াই সৎ কর্মে প্রবৃত্ত হই।[৬] কিন্তু বাট্‌লারের মতে বিবেকের ক্ষমতা আরো অনেক বেশী। মানব-প্রবৃত্তিব পরিচালনা ও শাসনের ভার বিবেকের উপর ন্যস্ত। মানুষ এই বিবেকের শাসনই স্বেচ্ছায় স্বীকার করে, কারণ ইহা তাঁহার স্বীয় স্বভাবেরই শাসন। বাহিরের শাস্তির ভয়, বা অন্তরের অস্বস্তির পীড়ন, নীতির পথে চলিবার হেতু নয়। বিবেক মানুষের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিয়াই তাহাকে নির্ভুল পথ দেখাইতে পারে, এবং ইহা মানুষের স্বভাবজাত বলিয়াই,—ইহার প্রতি বাধ্যতা স্বেচ্ছাকৃত। এই বিবেক বা শুভবুদ্ধির যে স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে সেই পরিমাণ ক্ষমতা যদি ইহার থাকিত, তবে মানুষ কখনই অসৎপথে যাইত না এবং তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইত।[৭]

নীতিবুদ্ধি মানুষের স্বভাবজাত, তাই ইহার প্রতি বাধ্যতা স্বাভাবিক ও স্বেচ্ছাকৃত

৬। The force of conscience lies simply...in its sting, in its power of making a nuisarce. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 265

৭। Your obligation to obey this law, is its being the law of your nature That your conscience approves of and attests to such a course of a ction, is itself alone an obligation. Conscience does not only offer its elf to shew us the way we should walk in, but it likewise carries its own authority with it, that it is our natural guide...Had it strength as it has manifest authority, it would absolutely govern the world. Bishop Butler—Sermon II & III

যখন আমরা প্রবৃত্তির বশে পাপের পথে পদক্ষেপ করি, তখন বাস্তবিকপক্ষে আমাদের স্ব-ভাব, স্বীয় অন্তঃপ্রকৃতির (innate nature) বিরুদ্ধেই কাজ করিতেছি।

মার্টিন্যুও বিবেকের শাসনই আমাদের নৈতিক কর্মের ভিত্তি, একথা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার মতে, মানুষ নৈতিক কর্মের যে দায় বোধ করে তাহা নিজের কাছে নয়, তাহা ভগবানের কাছে। যে কর্ম নীতিসঙ্গত, তাহা ভগবানের আদেশ বলিয়াই নীতিসঙ্গত। আমরা যখন নীতির পথ অনুসরণ করি, তখন বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরের আদেশই পালন করি। বিবেক সেই ঈশ্বরেরই বাণী। যেখানে 'দায়' একথা বলি, তখন দুই জনের মধ্যে সম্বন্ধ সূচিত হয়। আমি নিজের কাছে দায়ী, ইহা হইতে পারে না। সসীম মানুষ অসীম ভগবানের কাছেই তাহার কর্মের জবাবদিহি করিতে বাধ্যতা বোধ করে ইহারই নাম নৈতিকতার দায়।[৮]

মার্টিন্যুও আন্তরিক বিবেকবুদ্ধির শাসন স্বীকার করেন ; কিন্তু বিবেকের দায়

কিন্তু ভগবান যদি মানুষ হইতে পৃথক বাহিরের কোন শক্তি হইত, এবং মানুষ তাঁহারই ভয়ে সৎপথে চলিত, তবে নৈতিক জীবনের কোন মর্যাদা থাকিত না। তাই মার্টিন্যু অপেক্ষা বাটলারের মতই অধিকতর সত্য মনে হয়। নৈতিকতার দায় মানুষের নিজ স্বভাবেরই কাছে। ইহা অন্তরের প্রেরণা, বাহিরের তাড়নাপ্রসূত নয়।

মানুষের কাছে নয় ভগবানের কাছে

৩। **যুক্তিবাদীদের মত**—**The Rationalistic view**—বাটলারের মতের সঙ্গে যুক্তিবাদী মতের অনেকখানি মিল আছে। কাণ্টও স্বীকার করেন যে বিচারবুদ্ধিই মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং এই বিচারবুদ্ধিই মানুষকে নৈতিক বিধির (moral law) অনুশাসন মানিতে প্রেরণা দেয়। নৈতিক বিধি বহিরাগত কোন শক্তির শাসন নয়—ইহা মানুষের স্বভাবেরই শ্রেষ্ঠ রূপ। ইহা আত্মশাসন—আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-determination)। নৈতিক বিধির আদেশ শর্তনিরপেক্ষ (categorical imperative)। নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য ধন নয়, জন নয়, অর্থ নয়, যশঃ নয়। ইহার উদ্দেশ্য মানুষের অন্তর্নিহিত যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন। নৈতিক বিধির শাসন অন্ধ নির্বিচার বাধ্যতা দাবি করে না। ইহা উদ্দেশ্যাভিমুখী (teleological)। ইহার উদ্দেশ্য কার্যকরী যুক্তিবুদ্ধির (practical reason) সুপ্রতিষ্ঠা। মানুষ পশু হইতে পৃথক, কারণ পশু অন্ধ প্রবৃত্তির শাসনেই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত, অবশ্য তাহার কর্মের তাড়নাও তাহার নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারী।

কাণ্ট : বিচারবুদ্ধিই মানুষের বৈশিষ্ট্য—বিবেকের শাসন হইতেছে, স্বীয় স্বভাবের শাসন

৮। Martineau—Types of Ethical Theory, Ch. II

পশুর আচরণও তাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের কার্য তাহার অন্তঃস্থিত কার্যকরী যুক্তিবুদ্ধিকে অনুসরণ করিয়া, শুভ উদ্দেশ্যের দিকে চালিত হয়। যখন মানুষ নিজস্ব প্রকৃতির চালনা স্বীকার করে, তখনই সে স্বাধীন,—তখনই সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু যুক্তিশাসন অনুসারী তাহার স্বভাব তাহাকে সর্বমানুষের সঙ্গে যুক্ত করে। প্রবৃত্তি মানুষকে পৃথক করে। সে যখন অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় চলে, তখন সে মুহূর্তের সুখের ক্ষুদ্র সীমায় খণ্ডিত। তখন সে স্বভাবচ্যুত শুধু নয়, সে বিশ্বমানবের সঙ্গচ্যুতও বটে। যাহা নৈতিক কর্ম—তাহা একজনের জন্যই নহে, তাহা সার্বজনীন (universal)। তাহার দাবি সর্বমানুষেরই কাছে।

৪। **সম্পূর্ণতাবাদীদের মত—The Perfectionistic view—**নৈতিক আদর্শের দাবি মানুষের স্বভাবের কাছে। কিন্তু যুক্তিবিচার বুদ্ধিই কি মানুষের সম্পূর্ণ স্বভাব ?

সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিবার স্বাভাবিক আকুতিই নীতিবোধের ভিত্তি

মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিবার জন্য স্বাভাবিক আকুতি আছে। মানুষ সমাজের শাসন, রাষ্ট্রের শাসন, আপন অন্তরের শাসন মানিয়া নেয়,—কারণ সে বিশ্বাস করে এই বাধ্যতার মধ্য দিয়াই সে নিজের সর্বাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারিবে। মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য তাহার দেহের প্রবৃত্তিকেও স্বীকার করিতে হইবে। তাহার দাবিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলে, মানুষের সম্পূর্ণ স্বভাবের প্রতি সুবিচার করা হয় না। আদর্শ

প্রবৃত্তি ও যুক্তিবিচারের সামঞ্জস্য প্রয়োজন

নৈতিক জীবন প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার দ্বারা নয়, যুক্তিবিচার দ্বারা তাহার শাসন ও নিয়ন্ত্রণে। প্রবৃত্তি এবং যুক্তিবিচারের সুসামঞ্জস্যই আদর্শ মানুষের লক্ষ্য। সেই 'আদর্শ-আমি'—যে সুসম্পূর্ণ মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা আমার আমার মধ্যে আছে (the Ideal Self)—সেই আমিই, এই অসম্পূর্ণ 'বর্তমান আমি'কে (the Actual Self) আহ্বান জানায়; সে ডাকিয়া বলে, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্ নিবোধত—তুমি সত্যিকার যাহা (the Absolute Self) তাহাই তুমি হও।" কাজেই নৈতিক জীবনের দায়, সেই 'আদর্শ সুসম্পূর্ণ, সুসমঞ্জস আমি'র কাছে। ইহা বাহিরের কোন শক্তির নিকট আনুগত্য নয়, পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শের কাছেই আনুগত্য।[১]

১। "It is the very essence of moral duty to be imposed by a man on himself. The moral duty to obey a positive law, whether a law of the State or of the Church, is imposed not by the author or enforcer of the positive law, but by that spirit of man which sets before him the ideal of a perfect life and pronounces obedience to the positive law to be necessary to its realization. Green—Prolegomena to Ethics, P. 354

প্রকৃতির নিয়ম, রাষ্ট্রের আইন ও নৈতিকতার দাবি—The law of Nature, the law of the State & Moral law—যাহাকেই বলি নিয়ম বা আইন বা বিধি, তাহারই শাসন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে। তবে প্রকৃতির নিয়ম, রাষ্ট্রের আইন এবং নীতির বিধির শাসনের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী একই জাতীয় সমস্ত দ্রব্য, অনুরূপ অবস্থায়, একই প্রকার ক্রিয়া করে। কোন জড় পদার্থই নিরালম্ব অবস্থায় আকাশে থাকিতে পারে না, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে তাহারা সকলেই মাটিতে পড়ে। জড় বস্তুর এই ক্রিয়া ব্যাতক্রমহীন—ইহা ঘটিবেই ঘটিবে। আমরা উপমাত্মক ভাবে বলি, প্রকৃতির নিয়মের শাসন। কিন্তু বাস্তবিক এখানে কোন জোর জবরদস্তি বা শাস্তির কথা নাই! প্রকৃতির আইনের অর্থ হইল, 'এই বস্তুগুলির, এই অবস্থায়, এই প্রকার ব্যবহার দেখা যায়—ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই'—It is a statement of how things actually behave, so we may express the natural law as, Is. অবশ্য প্রকৃতির নিয়মেরও শাসন আছে, কারণ তাহা অমান্য করিলে তাহার জন্য মূল্য দিতে হয়। স্বাস্থ্যের প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহার জন্য রোগভোগ রূপ 'শাস্তি' পাইতে হয়।

প্রকৃতির নিয়ম যাহা ঘটে তাহা সম্বন্ধে

এই নিয়ম ব্যতিক্রম-হীন, সার্বিক এবং অলঙ্ঘনীয়; ইহার ভাষা—Is

রাষ্ট্রের আইনের শাসন অত্যন্তই প্রত্যক্ষ। রাষ্ট্রের ক্ষমতা আছে। তাহার আইন সেই জন্যই সবাইকে মানিতে হয়, না মানিলে রাষ্ট্র শাস্তি বিধান করে। সেই জন্যই এই আইনের ভাষা হইতেছে—'Must'.

রাষ্ট্রের আইন মনুষ্য-কৃত ও সার্বিক, ইহার লঙ্ঘনে শাস্তি ভোগ করিতে হয়; ইহার ভাষা—Must

কিন্তু নৈতিক বিধির ক্ষমতা (authority) কোথায়? প্রেয়োবাদীরা এই ক্ষমতার মূল রাষ্ট্র, সমাজ বা ভগবানের শাস্তি বিধানের ক্ষমতার মধ্যে খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন সিমেল্ বলিয়াছিলেন, আমরা নৈতিক বিধি মানি, কারণ ইহার পশ্চাতে আছে, দলবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠের (compact majority) সমর্থন। কিন্তু পূর্বের আলোচনা হইতেই ইহা বুঝা যাইবে যে, নৈতিক বিধি আমরা বাহিরের কোন শক্তির তাড়নায়, বা শাস্তির ভয়ে মানি, এ কথা সত্য নয়। আমাদের মনুষ্যত্ব—আমাদের স্ব-ভাবই এই শুভবুদ্ধির মূল। নৈতিক বিধির যে শাস্তির ক্ষমতা, তাহা আমাদের অন্তরের বিবেকেরই দংশন। নৈতিক বিধি সর্বদাই একটি কল্যাণ-আদর্শ অনুসারী

নৈতিক বিধি মনুষ্য-সৃষ্ট নয়, বাহির হইতে চাপানোও নয়, ইহা মানুষের স্বভাবজাত বাধ্যতা; ইহার ভাষা—Ought

(it tends towards a worthy end) এবং ইহার শাসনের ভাষা **'Must'** নয়—**Ought**—'করিতেই হইবে' নয়—'কর্তব্য', 'করা উচিত'।

হয়তো মনে হইতে পারে, নৈতিক বিধির মধ্যে শাস্তির ভয় যদি নাই থাকিল, তবে মানুষ ইহাকে মানিবে কেন? রাষ্ট্রের আইন নির্দিষ্ট, এবং তাহার শাস্তির বিধানও সুস্পষ্ট, তাই মানুষ তাহাকে মানিতে বাধ্য হয়। তাই প্রাচীন নীতিবিদ্‌রা অনেকে নৈতিক বিধির মধ্যে বাধ্যবাধকতা, শাস্তির ভয় না থাকিলে মানুষ তাহা মানিবে না বলিয়া, মনে করিতেন। তাই প্রত্যেক ধর্মেই স্বর্গ-নরকের ব্যবস্থা আছে, যাহাতে মানুষ লোভে বা ভয়ে সৎপথে চলিতে পারে। কিন্তু বর্তমানের ভাববাদী নীতিবিদ্‌রা (Idealists) বলেন, নীতির শাসন, আত্মশাসন। মানুষ বিচারসম্পন্ন নৈতিক সত্তা, তাই তাহার অন্তরের শাসনই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। ছোট শিশু যখন প্রথম আঁকিতে শেখে, তখন পদে পদে অঙ্কনশিক্ষক তাহাকে তিরস্কার-পুরস্কার দ্বারা চালনা করেন—তবেই সে নির্ভুল ভাবে আঁকিতে শেখে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ যে শিল্পী তাঁহার তো বাহিরের কোন তাড়না নাই, তিনি তো স্বাধীন। কিন্তু স্বাধীন বলিয়াই কি তিনি যথেচ্ছাচারী? তাঁহার শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি স্বেচ্ছায় বন্ধন স্বীকার করেন, মানিয়া নেন তাঁহার শিল্পাদর্শের অদৃশ্য অথচ অলঙ্ঘনীয় কঠিন বিচার ও শাসন। নীতিবিদের কাছেও একথা সত্য। নীতির আদর্শের নির্দেশও তাঁহার কাছে নির্মম, অলঙ্ঘনীয়। ইহা মানুষের অন্তরের শাসন বলিয়াই ইহার মর্যাদা ও শক্তি অসামান্য।[১০]

নীতিরও শাসন আছে, কিন্তু তাহা 'আত্ম-শাসন

Conscience and Prudence—'বিবেক আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের বাণী'—এই মত অনুযায়ী, আমাদের নীতিবোধ একটি রহস্যময় শক্তি। আধুনিক কালে বিবেক বা নীতিবোধকে এই দৃষ্টিতে দেখা হয় না। ইহা একটি পৃথক শক্তি নয়। আমাদের নৈতিক অনুভূতি (moral sentiments) এবং যুক্তিবিচার ইত্যাদি বুদ্ধির ক্রিয়ার সহিত আমাদের নীতিবোধ অবিচ্ছিন্ন। এবং পরিণত নীতিবুদ্ধি বা বিবেক দ্বারা, আমরা যখন কোন ক্রিয়াকে ভাল বা মন্দ বলি, তখন তাহা ব্যক্তি-স্বার্থভিত্তিক নয়—তাহা

নীতিবোধ হইতেছে বিবেকের বাণী

১০। The moral standard is absolute—we are "bound to choose what is right, in the scorn of consequences", though it may be more difficult for us to say at any point, what precisely is right. The authority, indeed, must come home to us with a far more absolute power, when we recognise that it is our own law, than when we regard it as an alien force, Mac-Kenzie—A Manual of Ethics, P. 271

'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়'। তাহার নৈতিক মূল্য সাংসারিক লাভ-লোকসানের দাঁড়ি-পাল্লা দিয়া মাপা হয় না। যাহা নীতিগতভাবে ন্যায়, তাহার নিজস্ব মূল্য ও মর্যাদা আছে। যাহা ব্যক্তির পক্ষে শুভ বলিয়া বিবেক আমাদের নির্দেশ দেয়, তাহাকে আমরা সকলের পক্ষে শুভ বলিয়া,—বস্তুগত ভাবে সত্য (objectively valid) বলিয়াই বিশ্বাস করি।

বিবেক ব্যক্তিগত কল্পনা মাত্র নয়, ইহা বস্তুগত সত্য

সংসারে যাঁহারা সাবধানী মানুষ, তাঁহারা মনে করেন, আমাদের আচরণের পরিমাপ হইবে, সংসারের সুখসুবিধা দ্বারা। এই নীতিকে আমরা বলিতে পারি, সাংসারিক সাবধানতা (prudence)। তাঁহাদের মতে, আমাদের সকল কাজের পিছনে থাকে, এই সাবধানী হিসাব করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কোন কাজেরই নিজস্ব মূল্য নাই। তাহার মূল্য তাহার ফলাফল দ্বারা নির্ণীত। ভোগবাদীরা বলিবেন, সেই কাজই ভাল—যাহার ফলে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, যাহাতে অশান্তি সৃষ্টি হয় না। সেই কাজটি কি, তাহা নির্ধারণ করিতে হইলেই চাই, ধীর সাবধানতা। সক্রেটিস্ এই সাবধানতাকে শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। সাইরীনী নগরীর পণ্ডিতদের (Cyrenaics) মতে (বিশেষতঃ অ্যারিস্টিপ্পাস্), ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইলেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সুখ অর্জন করিতে পারে। কিন্তু এপিকিউরাসের অনুগামীরা (Epicureans) ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া, কখনও সত্যিকারের সুখশান্তি পাওয়া যায় না। কাজেই সুখপ্রাপ্তিই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও সাবধানে প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। পরবর্তী যুগের প্রেয়োবাদীরাও (সিজ্‌উইক্, মিল্ ও বেনথাম্) এই সাবধানতার কথা স্বীকার করিয়াছেন। বর্তমানের সুখভোগ যদি ভবিষ্যতে অধিকতর সুখভোগের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তবে বিবেচক সাবধানী মানুষ বর্তমানের প্রলোভনকে জয় করিবেন। মিল্ এবং বেন্থামের মতও অনুরূপঃ কেবলমাত্র নিজের সুখের সন্ধান করিলে, বাস্তবিক সুখ পাওয়া যায় না। বহুর সুখের জন্য চেষ্টিত হইলেই বাস্তবিক পক্ষে নিজের স্বার্থরক্ষা সব চেয়ে ভালভাবে হইতে পারে। সেই জন্যই আদর্শ হইতেছে, বহুজনের সুখ (Utilitarianism),—কেবলমাত্র নিজের সুখ (egoism) নহে। কাজেই ভোগবাদীদের কাছে নৈতিক সৎগুণ এবং সাংসারিক সুবিধার হিসাব (virtue & prudence) সমার্থবাচক।[১১]

বিবেক ও সাংসারিক সাবধানতা

প্রেয়োবাদীদের মতে, নীতিবোধ হইতেছে সাবধানতা

১১। Seth—A Study of Moral Principles, P. 139-40

কিন্তু নৈতিক গুণ ও সাংসারিক বিচক্ষণতা এক জিনিস নয়। প্রেয়োবাদীদের মতে অন্যায় অর্থ, কর্মের ফলাফল সম্বন্ধে হিসাবে ভুল! চোর ও সাধু দুজনেরই উদ্দেশ্য এক, সুখ আহরণ। উদ্দেশ্য বিষয়ে তাহাদের কোন প্রভেদ নাই,—প্রভেদ উপায়-নির্বাচনে। চোর সেখানে ভুল করিয়াছে, সে যথেষ্ট সাবধান হয় নাই।[১২]

এই মত গ্রহণযোগ্য নয়

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এ মতের মধ্যে যতই পাণ্ডিত্য থাক না কেন, ন্যায়-অন্যায়বোধ শুধুই সাংসারিক সুখ-সুবিধার হিসাব মাত্র, এই মত, সাধারণ সুস্থ মানুষের নীতিবোধকে পীড়া দেয়। ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ শুধুমাত্র বাহিরের ফলাফল-নির্ভর নয়। অন্তরের শুদ্ধ বিবেক নীতি এই প্রভেদের ভিত্তি।[১৩] বিবেকের মধ্যে আছে অন্তরের শুদ্ধ বিচার, আত্মশাসন এবং নিষ্কাম কর্ম, আর সাংসারিক সাবধানতার মধ্যে আছে পাটোয়ারী বুদ্ধি, স্বার্থচিন্তা এবং সর্বাপেক্ষা অধিক লাভের লোভ।

বিবেক ও সাবধানতার মধ্যে প্রভেদ

সংক্ষিপ্তসার

আমরা যখন কোন কর্মকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করি, তখনই ইহাও স্বীকার করি যে, এই কাজ আমার করণীয়। ইহাকেই বলা হয় নৈতিক কর্মের দায়। এই আদেশের স্বরূপ কি? ইহার উৎসই বা কোথায়? এই সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। বেন্থাম্ প্রমুখ প্রেয়োবাদীরা বলেন, আমরা কতগুলি শক্তির শাসনে কর্তব্যকর্ম করিতে বাধ্য হই। ন্যায়ের পথে চলিতে বাহ্যপ্রকৃতি, সমাজ বা রাষ্ট্রের নিয়ম বা ধর্মের অনুশাসন আমাদিগকে বাধ্য করে। এগুলি বাহ্য শাসন। কিন্তু মিলের মতে, আমাদের 'অন্তরের মধ্যেও স্বাভাবিক সহানুভূতি ও মানব-ভ্রাতৃত্ববোধ আমাদের পীড়া দেয়, সেজন্য আমরা ন্যায়ের পথে চলি, শুভকর্মে রত হই।

১২। The difference between virtue and vice is reduced to one between prudence and imprudence. The intellectual process may be more or less correct, the vision of the consequences may be more or less clear, but, in as much as the moral or practical source of the action is always found in the same persistent and dominant desire for pleasure the intrinsic value of the action remains invariable. Seth—A Study of Ethical Principles

১৩। Of such a theory must we not say with Green, that "though excellent men have argued themselves into it, it is a doctrine which nakedly put, offends the unsophisticated conscience" ?... For the very essence of morality is that the distinction between good and evil is a distinction of principle, and not merely of result, an intrinsic and essential, not an extrinsic and contingent distinction. Ibid—P. 141

হারবার্ট স্পেন্সার বলেন, ক্রমবিকাশের নিয়মে যাহা ছিল বাহ্য শাসন, তাহা অন্তরের শাসনে পরিণত হয়। অন্তর্দৃষ্টিবাদীদের মতে, নৈতিক দায় বাহ্যশাসনজনিত নয়, তাহা অন্তরের বিবেকের তাড়না। কাহারও মতে, বিবেক বা শুভবুদ্ধি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অনুরূপ। আবার, কেহ কেহ মনে করেন, বিবেক অন্ধ প্রকৃতিচালিত নয়, তাহা স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধিসঞ্জাত। কেহ কেহ বলিবেন, মানুষ বিচারসম্পন্ন জীব, ইহাই তাহার স্বভাব। কাজেই যখন মানুষ বিচার-বুদ্ধি দ্বারা চালিত, তখন নিজ স্বভাব দ্বারাই সে চালিত। আবার কেহ কেহ বলেন, এই বিবেক-বুদ্ধি আমাদের অন্তরে ভগবানেরই আদেশ। নৈতিকতার দায় কোন সসীম মানুষের কাছে নয়, অসীম সর্বশক্তিমান্ ভগবানেরই কাছে। কান্টের মতে, বিবেকের আদেশ শর্তসাপেক্ষ নয়—তাহা মানুষের স্বাভাবিক শুভবুদ্ধিপ্রসূত। বিবেকের শাসন বাস্তবিক পথে আত্মশাসন। সম্পূর্ণতা-বাদীদের মতে, নৈতিক সম্পূর্ণতায় বিকশিত হইয়া উঠিবার স্বাভাবিক আকুতিই নীতিবোধের ভিত্তি। আমাদের অন্তরের 'আদর্শ আমি' 'বাস্তব অসম্পূর্ণ আমি'কে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবার আহ্বান জানায়। তাহারই নাম বিবেক বা নীতির দায়।

নৈতিকতার দায় হইল, নৈতিক আদর্শ বা নীতির নিয়মকে জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ। নীতির নিয়ম, প্রকৃতির নিয়ম ও রাষ্ট্রের আইন হইতে ভিন্ন। সব নিয়ম বা lawই সার্বিক, সকলের উপর প্রয়োজ্য (universally applicable)। কিন্তু রাষ্ট্রের আইন মনুষ্যকৃত, ইহা পরিবর্তনশীল, ইহা লঙ্ঘন করা চলে। প্রকৃতির নিয়ম কৃত্রিম নয়, ইহার ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন সম্ভব নয়,—ইহা লঙ্ঘন করাও চলে না। কিন্তু রাষ্ট্রের আইন বা প্রকৃতির নিয়মের শাসন হইতেছে বাহিরের। নীতির নিয়ম বা বিধি মনুষ্যসৃষ্ট নয়, পরিবর্তনশীল নহে, তবে তাহা লঙ্ঘন করা চলে। কিন্তু সে আইনের শাসন বাহিরের নয়, তাহা মানুষের স্বভাবজাত। তাই নীতির শাসন যখন মানুষ লঙ্ঘন করে, তখন সে নিজ স্বভাবের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে—এবং স্বীয় অন্তরের বিবেক দ্বারা ধিকৃত হয়। প্রকৃতির নিয়মের ভাষা হইল Is, রাষ্ট্রের আইনের ভাষা হইল Must এবং নৈতিক বিধির ভাষা হইল Ought।

নীতিবোধ হইল, অন্তরের স্বাভাবিক বাণী—ইহার মধ্যে লাভ-লোকসান ও স্বার্থের হিসাব নাই। কিন্তু সাবধানতার ভিত্তি হইল স্বার্থ ও লাভ-লোকসানের হিসাব। বিবেক কিন্তু কাল্পনিক জিনিস নয়—ইহা সার্বজনীন, সুতরাং ইহা বস্তুগত ভাবে সত্য। বিবেকের মধ্যে আছে, অন্তরের শুদ্ধ বিচার ও আত্মশাসন,—আর সাবধানতার মধ্যে আছে সাংসারিক লাভ-লোকসানের হিসাব ও স্বার্থচিন্তা।

Questions

1. What is the nature of moral obligation ? What is the source of this obligation ? Critically examine the different views on this matter.

2. What are the moral sanctions ? Distinguish between Bentham and Mill regarding their views on the nature of moral sanctions.

3. To whom is the moral obligation due ? Discuss the different theories.

4. What is conscience ? What is its nature ? Distinguish between conscience & prudence.

ষষ্ঠ অধ্যায়

নৈতিক আদর্শ—বাহ্য বিধিনিষেধ

External law as Moral Standard

[Moral standard as external law—the law of the tribe, the law of the society, law of the State, the injunctions of religion—their efficacy—their inadequacy as the highest moral standard]

নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলিয়াছি। একটি দৃষ্টিভঙ্গী হইল নৈতিক আদর্শের ন্যায়পরতার (rightness) দিক হইতে। যাহা আইন-সঙ্গত বা বিধি-অনুসারী, তাহাই ন্যায়—তাহাই মানুষের আচরণের আদর্শ।

নৈতিক আদর্শ বিকা-শের তিনটি স্তর

ম্যুইরহেড্ বলেন; নৈতিক আদর্শের বিকাশের একটি ক্রম আছে। তাহার তিনটি স্তর। **প্রথম স্তরে** বাহিরের আইনকানুন (রাষ্ট্রের আইন, সমাজের বিধি ইত্যাদি) দ্বারাই মানুষের আচরণের বিচার হয়। ইহা সাধারণ মানুষের বিচার। নির্দিষ্ট কিছু বিধিনিষেধ দেওয়া থাকিলে. আচরণ সহজ হয়—তাহার বিচারও সহজ হয়। চুরি করা অন্যায়—কারণ, ইহা বে-আইনী। এ প্রকার বিচার, সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য। কিন্তু মানুষ যখন চিন্তা করিতে শেখে, তখন সে বাহিরের আইনকানুনের বিচারে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সে প্রশ্ন করে, "কেন রাষ্ট্রের আইন মানিব? ইহার শক্তির উৎস (seat of authority) কোথায়?" তখন আদর্শ বিকাশের **দ্বিতীয় স্তর** দেখা দেয়। মানুষ তখন নিজের অন্তরে নৈতিক বিধির সমর্থন খোঁজে। সে বাহিরের আইনের দাসত্বমুক্ত হইয়া, বিবেকের আদেশকে মর্যাদা দান করিতে শেখে। সে তখন বলে, "যাহা আমার বিবেকের অনুশাসন পালন করে, তাহাই সঙ্গত, তাহাই ন্যায়।" কিন্তু গভীরতর চিন্তার ফলে, ইহার পরও আর এক উন্নত স্তরে মানুষ উপনীত হয়। তখন সে বুঝিতে শেখে,—শুধু আদেশ পালন, শুধু আইন অনুসরণই মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইতে পারে না। মানুষ বিচারসম্পন্ন প্রাণী, তাহার সমস্ত ক্রিয়াই কোন না কোন উদ্দেশ্য-সাধনের আকাঙ্ক্ষায়। তাই **উচ্চতম** চিন্তার **স্তরে** মানুষ বোধ করে যে, নৈতিক-

আদর্শও বাঞ্ছনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হওয়া প্রয়োজন। সে তখন প্রশ্ন করে, কি মানুষের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, তাহার পরমপুরুষার্থ ?[১]

এ অধ্যায়ে আমরা ম্যুইরহেড্-নির্দেশিত প্রাথমিক স্তরে সাধারণ মানুষের মতানুযায়ী নৈতিক আদর্শের কথা বিবেচনা করিব। এই মত অনুযায়ী, কোন কাজ ন্যায় কি অন্যায়, তাহা বিচার করিতে হইলে, বুঝিতে হইবে, তাহা প্রচলিত বিধি বা আইন অনুসরণ করিতেছে, না লঙ্ঘন করিতেছে। এই প্রচলিত আইন ব্যক্তির কাছে বাহির হইতেই আসে—সমাজের ইচ্ছা, রাষ্ট্রের আইন বা ধর্মের নির্দেশ হিসাবে। বাহিরের আইন বা আদেশকে নৈতিক আচরণের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিলে, ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, নৈতিকতা কোন আচরণের অন্তর্নিহিত গুণ নহে, বাহিরের কোন শক্তির ইচ্ছাই ইহাকে নীতিগুণসম্পন্ন করিয়াছে। বৃহত্তর শক্তির ইচ্ছা বা আদেশই স্থির করে, কোন্ কাজ ন্যায় এবং কোন্‌টি অন্যায়। অধিকতর ক্ষমতাপন্ন কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা অননুমোদনই, তাহা হইলে নৈতিক আদর্শের মাপকাঠি।[২]

প্রথম স্তর—বাহিরের আইনের শাসনই আচরণের আদর্শ

মানব সমাজের উন্নতির বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী এই নৈতিক আদর্শের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়।

(১) গোষ্ঠীর প্রথাই নৈতিক আদর্শ—The Law of the Tribe as Ideal—অসভ্য বনচারী বা গুহাবাসী মানুষ ছোট ছোট পারিবারিক সম্বন্ধযুক্ত গোষ্ঠীতে একত্র হইয়া বাস করিত। তাহাদের একজন দলপতি থাকিত, শৌর্যে, বীর্যে, বুদ্ধিতে সেই ছিল প্রধান। তাহার নেতৃত্বে গোষ্ঠীটি চালিত হইত, তাহার আদেশ সকলকে মানিতে হইত। সম্ভবতঃ মানুষের নৈতিক চেতনার সর্বাপেক্ষা পুরাতন বাস্তব রূপ দলপতির নির্দেশ অনুসরণ। আত্মরক্ষার তাগিদেই গোষ্ঠীর কতগুলি অলিখিত, কিন্তু প্রচলিত বিধি, দলের সকলকে মানিয়া চলিতে হইত। ইহার লঙ্ঘন সহ্য করা হইত না। কাজেই বাল্যকাল হইতেই ব্যক্তি বুঝিতে শিখিত,—দলপতির আদেশ, দলের আচরিত প্রথা অনুসরণ নিরাপদ, তাহা অনুমোদিত আচরণ—তাহার ফল

গোষ্ঠীর প্রথাই নৈতিক আদর্শ

১। Muirhead—Elements of Ethics

২। There is nothing naturally and essentially right in actions : that whatever is right or wrong must be made to be so, by the will and command of some higher power ; and that law therefore, is not only a standard of conduct, but is the *moral standard* proper. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 166

শুভ এবং তাহা ন্যায়। অন্যদিকে দলপতির আদেশ লঙ্ঘনে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হয়,—তাহা দল কর্তৃক তিরস্কৃত, কাজে এই বোধ সহজেই জন্মে যে, তাহা অন্যায়।

অসভ্য মানুষের বিপদসংকুল জীবনের পক্ষে এই আদর্শই স্বাভাবিক ও সুফল-প্রসূ ছিল। কিন্তু সভ্যতাব সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার দ্বারা মানুষ দেখিল যে, দলপতির নির্দেশ অভ্রান্ত নয়,—তাহার বিভিন্ন আদেশ অনেক সময় বিরুদ্ধ ও বিপরীতধর্মী, কখনও কখনও দলের বা দলপতির আদেশ ব্যক্তির নিজস্ব প্রবৃত্তি, স্বার্থ ও চিন্তার বিরোধী। সভ্যতার বিকাশের ফলে মানুষের জীবন যতই তাহার নিজ গোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত হইতে থাকিল, জীবনের নিরাপত্তা বাড়িল, বুদ্ধিবিচারের উন্মেষ হইল, ততই মানুষ বুঝিত শিখিল, এই আদর্শ নির্ভরযোগ্য নয়।

এ আদর্শ অসভ্য অপ-বিণত মানুষের উপ-যোগী

দলপতিব আদেশ পালন, শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসাবে, পরিণত সভ্য চিন্তাশীল মানুষ কখনও গ্রহণ করিতে পাবে না। এই আদর্শ অত্যন্ত নিম্নস্তরের, ইহার ভিত্তি ভয় বা লোভ। দলপতির আদেশ হুকুম করে, 'ইহা করিতেই হইবে' (must)। ইহা মানুষের অন্তরের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বুদ্ধি দ্বারাও অন্ধ আদেশ নির্বিচারে পালনের নৈতিকতা প্রমাণিত হয় না।

এ আদর্শ নিম্নস্তবেব

(২) নৈতিক আদর্শ হিসাবে সমাজের মত—The Law of the Society as Ideal—সভ্যতার অগ্রগমনের ফলে গ্রাম, নগর পত্তন হইলে, ব্যক্তি বৃহত্তব গোষ্ঠিজীবনেব অঙ্গীভূত হয়। দলপতির খামখেয়ালী আইনেব স্থান অধিকার করে, সমাজের নির্দিষ্ট প্রথা—বিধি, মতামত। এ সমস্ত সামাজিক প্রভাব দ্বারা ব্যক্তি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত—তাহার দৃষ্টিভঙ্গী, রুচি সমাজের ইচ্ছা দ্বারা গঠিত। এবং কোন কোন পণ্ডিতের মতে, সামাজিক শাসন-নিয়ন্ত্রণই নৈতিক জীবনের মাপকাঠি। বাড়ীর সামনে রাস্তার উপর আবর্জনা ফেলিলে তাহা অন্যায়, কারণ সমাজের চোখে এই আচবণ নিন্দনীয়। আমরা যে অসৎপথে যাই না,—তাহার কারণ ইহা নয় যে, অসৎ প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে নাই,—তাহার কারণ, আমরা সমাজের নিন্দা-ভ্রূকুটিকে ভয় করি।[৩] কবি দুঃখ করিয়াছেন,

সমাজেব মতই নৈতিক আদর্শ

৩। A moral act is an act prescribed by the social authority, and *rendered obligatory upon every citizen. Its morality is constituted by its* authoritative prescription and not by fufilling the primary ends of the social institution.—Bain

"করিতে পারিনা কাজ
সদা ভয়, সদা লাজ
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে।"

কিন্তু নৈতিক আদর্শ হিসাবে এই আদর্শকে উচ্চমূল্য দেওয়া যায় না। বড়জোর বলা যায়, ইহা লৌকিক আদর্শ, সাধারণ মানুষের বিচারের রীতি। খামখেয়ালী দলপতির ইচ্ছার চেয়ে, সামাজিক প্রথা-আচারের প্রতি আনুগত্যের দাবি প্রবলতর,—কারণ, সামাজিক প্রথা-আচার কোন একজন ব্যক্তির হুকুমে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বহুকালের পরীক্ষায় ইহারা সমাজজীবনের কোন না কোন প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী বলিয়াই, গৃহীত এবং বংশানুক্রমে আচরিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও, সামাজিক প্রথা-আচারও কালক্রমে পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রথা-আচার অনুসৃত। অনেক সময় তাহারা সম্পূর্ণ বিপরীত। ইয়োরোপে ভদ্র বিবাহিতা নারী পরপুরুষের সঙ্গে যুগ্মনৃত্যে রত হইলে, তাহাতে নিন্দার কিছু নাই—বরং ইহাই তাহাদের সামাজিক আচার। কিন্তু আমাদের দেশে উগ্র প্রগতিবাদী ছাড়া, অন্য সকলে এই প্রকার আনন্দানুষ্ঠানকে নিন্দনীয় বলিয়াই মনে করিবে। কাজেই সামাজিক আচার বা মতামতকে নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

এ আদর্শও খুব উচ্চ নয়

এই আদর্শেরও মূল শক্তি হইতেছে,—ভয় বা লোভ। আমরা সামাজিক আচার মানিয়া চলি, যেহেতু তাহা না করিলে নিন্দা হয়। নৈতিক আচরণ ভয়-প্রসূত নয়—তাহা স্বেচ্ছাকৃত।

এই আদর্শের মূল শক্তি হইল ভয়

বাহিরের আদেশ কোন কর্মকে নৈতিক গুণসমন্বিত করিয়া তোলে, এই মত সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। কোন ক্রিয়ার নৈতিক গুণ সেই ক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত। সমাজ অনুমোদন করিয়াছে বলিয়া, কোন কাজ ভাল বা মন্দ, ন্যায় বা অন্যায় হইল, এমন নয়। বরং বিপরীতভাবে বলা যায়, কোন ক্রিয়া বা আচারের নৈতিক গুণ আছে বলিয়াই, সেই আচার সমাজে আদৃত ও আচরিত।

বাহিরের কোন আদেশ কোন আচরণকে নৈতিক গুণসম্পন্ন করিতে পারে না

কখনো কখনো সমাজের প্রথা-আচার ব্যক্তির নীতি-বোধকে পীড়া দিতে পারে। সেক্ষেত্রে কোন সাহসী ব্যক্তি সমাজের প্রথা-আচার পরিবর্তনের জন্য চেষ্টিত হইতে পারে, এবং সামাজিক প্রথার বিরোধিতাই তাঁহার পক্ষে তখন কর্তব্য। অর্থাৎ সামাজিক

প্রথা কোন ক্রিয়ার নৈতিকতা নির্ধারণ করে না, বরঞ্চ সামাজিক প্রথাকেই নৈতিক আদর্শের সমর্থন খুঁজিতে হয়। সামাজিক প্রথা অপেক্ষা নৈতিক আদর্শের মূল্য উচ্চতর, এবং নৈতিক আদর্শের সমর্থন মিলিলে, তবেই তাহা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের নিকট আচরণীয় বলিয়া স্বীকৃত হয়।

এইসব প্রথা-আচার পরিবর্তনশীল

সামাজিক আচার বা মতামত মানুষের প্রকাশ্য আচরণেরই শুধু বিচার করিতে পারে, কিন্তু নৈতিক আদর্শদ্বারা মানুষের আন্তরিক ইচ্ছা-অভিপ্রায়কেও বিচার করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য আচরণের মূল্য এই জন্যই,—যেহেতু ইহা মানুষটির চরিত্রের পরিচয় বহন করে।

ইহার বিচার বাহ্য আচরণের

(৩) রাষ্ট্রের আইনই নৈতিক আদর্শ—Political Law as standard—হবস্, বেইন্ ইত্যাদি দার্শনিকের মতে রাষ্ট্রের আইন দ্বারাই মানুষের আচরণের নৈতিকতা বিচার্য। গোষ্ঠিপতির ইচ্ছা বা সমাজের মতামত বিচারের নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়। কিন্তু উন্নত রাষ্ট্রে আইনকানুন বিধিবদ্ধ, তাহাতে খামখেয়ালীপনার স্থান কম। স্থানীয় আচার-প্রথার মধ্যে বৈষম্য থাকিতে পারে। সুতরাং শেষ বিচার রাষ্ট্রের আইন দ্বারাই নির্ভরযোগ্যভাবে সম্ভবপর।[৪] মানুষের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি ইত্যাদি চোখে দেখা যায় না, তাহাদের নৈতিক বিচার ভগবানই কেবলমাত্র করিতে পারেন। কিন্তু মানুষের আচরণ প্রকাশ্য। তাহাদ্বারা অপরের ক্ষতি সাধিত হইতে পারে, বা উপকার হইতে পারে। রাষ্ট্র তাহা বিচারের মালিক। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি দেশের আইন মানিয়া চলিতেছি, যতক্ষণ তাহা লঙ্ঘন না করিতেছি, ততক্ষণ আমার আচরণ রাষ্ট্রের অনুমোদিত, তাহা ন্যায়। রাষ্ট্রের আইনই আচরণের নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি।

রাষ্ট্রের আইনই নৈতিক আদর্শ

কিন্তু রাষ্ট্রের আইনের অনুমোদনই কোন নীতিবিরুদ্ধ কাজকে নৈতিকগুণ-সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে, রাষ্ট্রের আইনও উচ্চতর নৈতিক আদর্শের অনুমোদনের অপেক্ষা রাখে। কখনো কখনো নৈতিক বুদ্ধির বিরুদ্ধ বলিয়া, সংস্কারকামী বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, উৎপীড়ন সহিয়াও রাষ্ট্রের অন্যায় আইন লঙ্ঘনে চেষ্টিত হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীজীর মতো শান্ত সাধুপুরুষ ইংরেজের আমলের লবণ আইন ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহা ভঙ্গ করিবার

রাষ্ট্রের আইনের অনুমোদনই অনৈতিক আচরণকে নৈতিক গুণসম্পন্ন করিতে পারে না

৪। The Civil Law alone is the Supreme Court of Appeal in all cases of right and wrong. Hobbes—Leviathan

জন্য মানুষকে পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার কারণ, ইংরেজের এই আইন ছিল, নৈতিক-আদর্শ বিরোধী,— তাহা পীড়নের যন্ত্র মাত্র।

রাষ্ট্রের আইনও পরিবর্তনশীল। তাহা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন। কাজেই তাহা সর্বমানবের নৈতিক আচরণের মাপকাঠি হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না।

ইহার মূল ভয়

রাজার আইন মানুষ মানে ভয়ে; আইন না মানিলে জেল, জরিমানা, শাস্তি পাইতে হয়। কিন্তু নৈতিক বিধির আবেদন মানুষের অন্তরের শুভবুদ্ধির কাছে; তাহার কাছে মানুষ অনুগত হয় স্বেচ্ছায়।

যাহা বিচার দ্বারা অনুমোদিত নয়, তাহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইতে পারে না

বাহিরের কোন আইন—তাহার পিছনে যত বড় শক্তিই থাকুক না কেন, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং মর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষের স্বাধীন আনুগত্য দাবি করিতে পারে না। রাষ্ট্রের আইনের সম্পর্কেও প্রত্যেক মানুষের এই প্রশ্ন করিবার অধিকার আছে, কেন এই আইন মানিয়া চলিব? ইহা কি উদ্দেশ্য সাধন করে? অর্থাৎ, কোন সঙ্গত মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হইলে, তবেই আইনের মূল্য। প্লেটো এই প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন। রাষ্ট্রের শাসনাধীনেই ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ এবং সম্পূর্ণ আত্মবিকাশ সম্ভবপর,—সেই জন্যই ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্রের আইন মানিয়া চলা শুভ ও ন্যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রের আইনের নিজস্ব মূল্য বা মর্যাদা নাই—তাহা নিজে নৈতিক আদর্শ হইতে পারে না। তাহার মূল্য এই জন্য যে, তাহা উচ্চতর মূল্য বা উদ্দেশ্যের সহায়ক।

রাষ্ট্রের আইনকেও উচ্চতর নৈতিক বিধির সমর্থন খুঁজিতে হয়

রাষ্ট্রের আইন মানুষের বাহ্য আচরণেরই বিচার করিতে পারে, কিন্তু মানুষের আচরণের পশ্চাতে যে ব্যক্তি-চরিত্র, তাহার বিচারের ক্ষমতা রাষ্ট্রের আইনের নাই।

(৪) ধর্মের অনুশাসন নৈতিক ক্রিয়ার আদর্শ—The Law of God as Ideal—যাঁহারা পেইলীর মত ভগবদ্ভক্ত, অথবা দেকার্তে বা লকের মত ভগবদ্বিশ্বাসী দার্শনিক, তাঁহারা নৈতিক আদর্শের মূল খুঁজিয়াছেন ভগবদিচ্ছায়।

ধর্মের অনুশাসন পালনই আদর্শ আচরণ

ভগবানই সমস্ত নীতির উৎস, তিনি নৈতিকতার ঊর্ধ্বে—তাঁহার ইচ্ছাই নীতি। যাহা তাঁহার ইচ্ছা বা আদেশ-অনুসারী, তাহাই শুভ ও ন্যায়। তিনি সর্বনিয়ন্তা, সর্ব বিশ্বজগতের বিধাতা—তিনি সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত ন্যায়ের মূল। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা বা আদেশ মানুষ জানিবে কি প্রকারে? ঈশ্বর অনুগ্রহ বশতঃ, পবিত্রচরিত্র কিছু মানুষের মুখ

দিয়া, নিজ মঙ্গলময় ইচ্ছা প্রকাশ করেন,—ইহারা ধর্মনেতা। হিন্দু বলিবেন, ভগবানই মানুষের রূপ নিয়া যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন—'ধর্মসংস্থাপনার্থায়'। মুসলমান বিশ্বাস করেন, মুহম্মদই আল্লার রসুল, তাঁহার বাণী-প্রচারক। খ্রীষ্টান বলিবেন, যীশুখ্রীষ্টই ভগবানের 'প্রিয় পুত্র'। ভগবান আপন মঙ্গল-অভিপ্রায় এই ধর্মনেতাদের মধ্য দিয়া, এবং ধর্মশাস্ত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ করেন এবং প্রচার করেন। বেদ, বাইবেল কোরান, জেন্দ-আবেস্তার অনুসরণই নৈতিক জীবন লাভের উপায়। তাহাদের অনুশাসনই নৈতিকতার আদর্শ।

হিন্দুদর্শন বলে, বেদে যে বিধিনিষেধ আছে তাহার অনুসরণই নৈতিক জীবন লাভের একমাত্র উপায়, কারণ এই বিধিনিষেধ ভগবানেরই আদেশ। তিনিই ন্যায়-অন্যায়ের শেষ বিচারের মালিক (final moral authority),—ন্যায়-অন্যায়বোধ তাঁহারই সৃষ্টি। যাহা বেদোক্ত বিধি অনুমোদিত, তাহাই ন্যায়; যাহা বেদে নিষিদ্ধ, তাহাই অন্যায়। ইহাই মানুষের আচরণের সর্বশ্রেষ্ঠ মাপকাঠি।

ভগবান ইচ্ছা করিলে সত্যকে মিথ্যা ও অন্যায়কে ন্যায়ে পরিবর্তিত করিতে পারেন

দেকার্তের মতে, সত্য, সুন্দর, মঙ্গল এই সমস্ত আদর্শের স্রষ্টা, ভগবান। তিনি সর্বশক্তিমান্, সুতরাং তাঁহার কাছে অসম্ভব কিছু নাই। তাঁহার ইচ্ছা হইলে সত্য মিথ্যা হইতে পারে—মিথ্যাও সত্য হইতে পারে। যাহা ন্যায়, তাহা তাঁহার ইচ্ছানুক্রমেই ন্যায়; যাহা অন্যায়, তাহাও তাঁহার ইচ্ছানুসারেই অন্যায়।[৫] লক্‌ও অনুরূপ যুক্তিই দিয়াছেন—তাঁহার মতে, নৈতিকতার দৃঢ় ভিত্তি ভগবানের ইচ্ছা ও আদেশই কেবল মাত্র হইতে পারে।[৬]

ভগবান্ সমস্ত আদর্শেরই উৎস, সমস্ত আদর্শের পূর্ণতা

সমস্ত সত্য, সমস্ত আদর্শের উৎস ভগবান এবং সমস্ত আদর্শ তাঁহারই মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু ভগবান সত্য ও অসত্যের ঊর্ধ্বে, তিনি ইচ্ছা করিলে সত্যকে অসত্য এবং ন্যায়কে অন্যায়ে পরিবর্তন করিতে পারেন, এই মত ভগবানকে খামখেয়ালী, স্বেচ্ছাচারী শক্তিতে পরিণত করে। বরং একথাই বলা উচিত—যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, যাহা মহৎ তাহাই ভগবান্। সমস্ত বিধি, সমস্ত শৃঙ্খলাও তাঁহারই প্রকাশ। তিনি সর্বশক্তিমান্ বলিয়াই স্বতঃ-বিরোধিতা সহ্য করেন না, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না।[৭] তিনিই সর্ববিশ্বব্যাপী বিধি,

৫। Descartes—Discourses

৬। The true ground of morality can only be the will and law of God —Locke.

৭। We would agree that there is need of qualifying the idea of absolute or abstract omnipotence by the recognition of limiting conditions...the divine limitation must be self-limitation, though it is none the less real limitation, on that account. Edwards—The Philosophy of Religion, P. 247

তিনিই মঙ্গলশক্তি। এই ভাবটি আমরা স্পিনোজায় পাই—কাণ্ট ও হেগেলেও পাই।

ভগবানের অভ্রান্ত ইচ্ছাই যখন সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশিত, তখন বিভিন্ন শাস্ত্রের অনুশাসনের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকা উচিত নয়। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রের অনুশাসন অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরুদ্ধ, এবং প্রত্যেক মানুষই যখন নিজ নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করে, তখন সমস্ত মানুষের জন্য সার্বজনীন নৈতিক আদর্শ বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যাইতে পারে না।

ইহা অবশ্যই সত্য যে, সমাজের নিন্দা, আইনের শাসন যেমন মানুষকে অসৎপথে যাইতে বাধা দেয়, তেমনি নরকের ভয় ও স্বর্গের লোভ মানুষকে সৎপথে থাকিতে উৎসাহ দেয়। কিন্তু এ প্রকার নৈতিক জীবন তো দাসের জীবন। ভগবানকে যদি বাহিরের শক্তি বলিয়া কল্পনা করা যায়, এবং পরলোকে ভগবানের শাস্তির ভয়েই মানুষ নীতির পথ অনুসরণ করে ইহা বলা যায়, তাহা হইলে ইহাই মানিতে হয় যে, স্বার্থই নৈতিক জীবনের ভিত্তি। মানুষের নিজের অন্তরে নীতির পথে চলিবার স্বতঃই কোন আগ্রহ নাই, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই অশ্রদ্ধাপূর্ণ মত আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করি না।

বাহিরের কোন শাসনই নৈতিক জীবনের ভিত্তি হইতে পারে না

যদি অবশ্য স্বীকার করা যায় যে, ঈশ্বর বাহিরের কোন স্বেচ্ছাচারী প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি নন, আমাদেরই বিচারভিত্তিক শুভবুদ্ধি, তাহা হইলে এ মত গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

মানব সভ্যতা বিকাশের প্রথম স্তরে, অপরিণত মানুষ বাহিরের কোন শাসনকেই আচরণের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। নৈতিক বিচারবুদ্ধি পরিণত হইলে, তবেই মানুষ অন্তরের বিচারসম্মত বিবেককে আচরণের মাপকাঠি হিসাবে সম্মান করিতে শেখে। প্রথম অবস্থায় ক্ষুদ্র গোষ্ঠিজীবনের প্রথা অনুসারেই ব্যক্তি নিজ আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। প্রথা অনুসরণ নিরাপদ, বিপরীত আচরণের ফল শাস্তিভোগ। কিন্তু ক্রমেই মানুষ এই সব প্রথার পরস্পরবিরোধিতা লক্ষ্য করিল। বুদ্ধিবিচার বিকাশের সঙ্গে এ প্রথাগুলি সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে এই বাহ্য প্রথাগুলি তাহাদের প্রাচীন মর্যাদা হারাইল। পরবর্তী স্তরে, সমাজের শাসনকেই মানুষ আচরণের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করিল। কিন্তু ক্রমে মানুষ দেখিল, সমাজের বিধিও পরিবর্তনশীল। অনেক প্রথা নীতিবিরুদ্ধ। এইগুলি মানুষের বাহ্য আচরণেরই বিচার করিতে

পারে—মানুষের আন্তরিক দিকের বিচারে ইহারা অক্ষম। বাহিরের কোন আদেশ, কোন আচরণকে নৈতিক গুণসম্পন্ন করিতে পারে না। ইহারও পরবর্তী স্তরে, সভ্য মানুষ রাষ্ট্রের আইনকেই আচরণের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিল। কিন্তু রাষ্ট্রের আইনও পরিবর্তনশীল। ইহা বাহিরের শাসন—আন্তরিক বিচারসঞ্জাত নয়। এ সব শাসনের মূলে থাকে ভয়। রাষ্ট্রের শাসনও বিবেকবিরুদ্ধ হইতে পারে। রাষ্ট্রের আইনকেও তাই নীতির আইন মানিতে হইবে। ইহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইতে পারে না। আবার কেহ বলিলেন, ধর্মের অনুশাসনই আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাপকাঠি। ইহাও বাহ্যশাসন। বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসনের মধ্যেও বৈপরীত্য আছে। ভগবান ইচ্ছা করিতে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায় করিতে পারেন না। ভগবান সমগ্র শ্রেষ্ঠ আদর্শের উৎস, তিনি খামখেয়ালী শাসক হইতে পারেন না। এই শাসনও বাহিরের শাসন এবং বাহিরের কোন শাসনই নৈতিক জীবনের ভিত্তি হইতে পারে না। এই আদর্শগুলি তাই বিচার-সম্পন্ন মানুষ শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ কবিতে পারে না।

Questions

1. Describe moral ideals as external law. Why are these ideals inadequate and unsatisfactory ? Discuss.

সপ্তম অধ্যায়

নৈতিক আদর্শ

Moral Standards

[Moral standard—Ideal must have reference to the actual—the nature of man—Different views—major ethical ideals—Hedonism, Rationalism, Intuitionism—their synthesis in Perfectionism—the Hindu Ideal—the Purusharthas.]

নীতিবিদ্যার কাজ মানুষের আচরণের নৈতিক গুণবিচার, তাহা ন্যায় বা অন্যায়, ভাল বা মন্দ তাহা নির্ধারণ করা। কিন্তু যেখানেই আমরা কোন গুণ বিচার করিতে চাই, সেখানেই একটি আদর্শ সামনে রাখিতে হয়,—যাহার সহিত তুলনা করিয়া গুণটির মূল্য নির্ধারণ করিতে হয়। অর্থাৎ, গুণবিচার করিতে হইলে, একটি মাপকাঠি চাই, যাহা দ্বারা তাহার পরিমাপ করা যায়। সম্প্রতি সোনার বাজারে বিষম আলোড়ন শুরু হইয়াছে। সরকার আদেশ দিয়াছেন, এখন হইতে ১৪ ক্যারাটের সোনা দিয়াই গহনা তৈরী করিতে হইবে। এই '১৪ ক্যারাট' ব্যাপারটা কি? কেনই বা ইহার বিরুদ্ধে এত আন্দোলন? 'ক্যারাট' হইল স্বর্ণের বিশুদ্ধতা মাপিবার একক (unit)। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ স্বর্ণের মাপ হইল ২৪ ক্যারাট। ইহাতে কোন খাদ নাই। কিন্তু এ সোনার রং উজ্জ্বল পীত এবং ইহা অপেক্ষাকৃত নরম। তাই ২৪ ক্যারাটের সোনা দিয়া খুব সূক্ষ্ম কারুকার্যপূর্ণ অলংকার প্রস্তুত হয় না। সেজন্য বাংলাদেশে স্বর্ণ-অলংকারের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত আদর্শ হিসাবে 'গিনি সোনা'ই প্রশস্ত ছিল,—ইহার বিশুদ্ধতা ২২ ক্যারাট। ইহাতে তামা ও রূপার খাদ মিশ্রিত থাকিত। ইহা দেখিতে রক্তাভ পীত, বিশুদ্ধ স্বর্ণ অপেক্ষা নয়নলোভন, অধিকতর কঠিন, সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। আবার জড়োয়া গহনার জন্য আরও কঠিন ধাতু প্রয়োজন—সুতরাং তাহার জন্য আরো বেশী পরিমাণ রূপার খাদ মিশ্রণ প্রয়োজন। এই কাজের জন্য 'আদর্শ' সোনা হইতেছে, ১৮ ক্যারাট। আর আজ সরকার বলিতেছেন, দেশরক্ষার প্রয়োজনে, বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য স্বর্ণ আবশ্যক। তাই অলংকারে স্বর্ণের পরিমাণ কমানো প্রয়োজন। তাই বর্তমান প্রয়োজনে, যে সোনা 'আদর্শ'

যে কোন গুণ বিচার করিতে হইলে, একটি মাপকাঠি বা আদর্শ প্রয়োজন

হিসাবে সরকার স্থির করিয়াছেন, তাহা হইতেছে ১৪ ক্যারাট! কাজেই দেখা যাইতেছে **দ্রব্যের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য অনুসারেই আদর্শ স্থির হয়।** সে অনুযায়ীই মাপকাঠি স্থির হয়। সেই মাপকেই বলে 'ভাল', 'মন্দ'। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে ২৪ ক্যারাটই স্বর্ণের আদর্শ; যদি টেকসই কারুকার্যময় অলংকার গঠন উদ্দেশ্য হয়, তবে ২২ ক্যারাট; যদি জড়োয়া গহনা করিতে হয়, তবে 'আদর্শ' ১৮ ক্যারাট। আর দেশরক্ষা যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে আদর্শ হইতেছে—১৪ ক্যারাট।[১]

দ্রব্যের [illegible] এবং কি কাজের জন্য ইহার ব্যবহার তাহা দিয়াই ইহার আদর্শ নির্ণীত হয়

সোনা বা হীরা মাপিবার জন্য ক্যারাটের মাপ। কিন্তু রূপা বা পিতল বা লোহার আদর্শ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্যারাটের মাপ অচল। দ্রব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী তাহার মাপ বা আদর্শ। কাপড় কিনিবার সময় মাপকাঠি হইল গজ বা মিটার। আবার আলু, কয়লা মাপিবার বেলায় তাহা কিলো, আবার দুধ, তেল মাপিবার একক হইতেছে লিটার। আমরা গজকাঠি দিয়া দুধের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করি না, আবার ল্যাক্টোমিটার দিয়া আমের উৎকর্ষ বিচার করিতে পারি না। কাজেই বস্তুভেদে তাহার 'আদর্শ'ও ভিন্ন হইতে বাধ্য। বাঘের পক্ষে 'অহিংসা পরমোধর্ম', আদর্শ হিসাবে হাস্যকর। গরুর পক্ষে দৌড়ে বাজী-জেতা আদর্শও, তেমনি সম্পূর্ণ নিরর্থক। ছাগল দিয়া চাষের কাজ চলে না, সে জন্য ছাগলকে 'অপদার্থ' বলিয়া গালি দিলে অন্যায় হইবে। আবার আদর্শ বিচারকালে পরিণতির স্তরটিও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। নবজাত শিশুর পক্ষে, সাত পাউণ্ড ওজন সুস্থতার 'আদর্শ' বলিয়া গৃহীত হইবে, কিন্তু পঁচিশ বৎসরের নবযুবকের স্বাস্থ্য পরিমাপের 'আদর্শ' ইহা নিশ্চয়ই নয়।

দ্রব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী, তাহার মাপকাঠিও ভিন্ন

মানুষের আচরণের আদর্শ নির্ধারণের বেলায় এই কথাগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। কোন দ্রব্যের আদর্শ হইতেছে যখন তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ও স্বভাব পূর্ণ-বিকশিত হয়। শ্রীমতী মীরা অরোরার ১৬ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ডালিয়া ফুল,

---

১। Carat—name given to the standard of weight for precious stones and to the standard of fineness of gold. The carat weight is equal to 3.17 grains troy, or four diamond or carat grains. As a standard of purity and fineness of gold, the pure metal is said to be 24 carat, but standard gold for coinage, wedding rings and so on contains a small percentage of base metal and is termed 22 carat or 'guinea gold'.

The New Standard Encyclopaedia

এ বৎসর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাইয়াছে। এ পুরস্কার শ্রেষ্ঠ ডালিয়া ফুলেরই জন্য। কেহ যদি বলেন, 'ইহা তো গোলাপ ফুলের মত সুগন্ধ নয়, সুতরাং ইহার দাম নাই', তাহা হইলে সবিনয়ে তাঁহাকে এ কথাই বলিব, যে ডালিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব সব চেয়ে বড় ও সুগঠিত ডালিয়া ফুল হইয়া ফুটিয়া ওঠাতেই—গোলাপ হইয়া ফুটিয়া ওঠাতে নয়। বাঘের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সবচেয়ে বলবান্, হিংস্র, সতেজ বাঘই হওয়া,—হাতী হওয়া, নয়।

মানুষের আচরণের 'আদর্শ' নির্ধারণ-কালে মানুষের প্রকৃতিটি কেমন তাহা জানা অবশ্য প্রয়োজন

তাই তো শিখগুরু বলিয়াছিলেন

"বাঘের বাচ্চাকে
বাঘ না করিনু যদি কী শিখানু তারে?"[২]

কিন্তু বাস্তব এবং আদর্শের (the actual and the ideal) মধ্যে প্রভেদ আছে। আদর্শ আপনা হইতেই স্থাপিত হয় না, তাহার জন্য তপস্যা করিতে হয়, অনন্যমনা হইয়া প্রয়াস করিতে হয়। যাঁরা তাহার ডালিয়ার জন্য প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে, যেহেতু অধ্যবসায় দ্বারা একাগ্র যত্ন দ্বারা সেই ফুলটির মধ্যে যে সম্ভাবনা ছিল, তাহাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে: ইহারই নাম সুশিক্ষা। গুরু শিষ্যের মধ্যের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হন,—সে সত্যিকারের যাহা, তাহাই সে হইয়া উঠুক ইহাই শিক্ষকের সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত প্রযত্নের উদ্দেশ্য। তথাপি আদর্শকে আমরা কখনও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারি না। যাহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহার জন্য আমরা প্রয়াস করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে অতিক্রম করিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে আকুতি আছে, সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব স্বভাবে বিকশিত হইয়া উঠিবার। মানুষের বেলায় ইহা আরও অনেক বেশী সত্য। তাহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা শুধু একটা 'বোবা কান্না' নয়,—সে ভুলের মধ্য দিয়া, প্রলোভনের মধ্য দিয়া, স্খলনপতনের মধ্য দিয়াও, 'মানুষ' হইয়াই উঠিতে চায়। সেই 'মানুষ' হওয়ার মানে কি? ইহার অর্থ হইল, মানুষ তাহার অন্তরতম স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাই হইয়া উঠিতে চায়। ইহাতেই তাহার সম্পূর্ণতা, ইহাতেই তাহার সার্থকতা—শ্রেষ্ঠ আত্মবিকাশ। "আমরাও কেবল ব্রহ্মই হতে পারি আর কিছুই হতে পারিনে। আর কোন হওয়াতে তো আমরা সম্পূর্ণ হইনে। সমস্তই আমরা পেরিয়ে যাই; পেরোতে পারি নে ব্রহ্মকে। ছোটো সেখানে বড় হয়।

আদর্শে পৌঁছিবার জন্য আমাদের নিরন্তর প্রয়াস, কিন্তু আদর্শকে আমরা অতিক্রম করিতে পারি না

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শেষ শিক্ষা

কিন্তু, তার বড় হওয়া শেষ হয় না, এই তার আনন্দ।" এই তপস্যারই নাম নৈতিক জীবন। ইহারই পরিণতি ধর্মে—"তবে কি ব্রহ্মেতে আমাতে তফাৎ নেই? মস্ত তফাৎ আছে। তিনি ব্রহ্ম হয়েই আছেন, আমাকে ব্রহ্ম হতে হচ্ছে। তিনি হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠছি—আমাদের দুজনের মধ্যে এই লীলা চলছে। হয়ে থাকার সঙ্গে, হয়ে ওঠার নিয়ত মিলনেই আনন্দ।"[৩] এই মিলনের আনন্দের নামই ধর্ম।

মানুষের আচরণের আদর্শ নির্ধারণ, নীতিবিদ্যার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজেই গোড়াতেই এই প্রশ্নটির আলোচনা প্রয়োজন,—মানুষের প্রকৃতি কি? কি তাহার স্বভাব? এই প্রশ্নের সদুত্তরের উপরই তাহার 'আদর্শ' কি হওয়া উচিত, তাহা নির্ভর করিবে। এই সম্পর্কে আমরা প্রধানতঃ দুইটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। দুইদল পণ্ডিত, মানুষের প্রকৃতির দুইটি বিভিন্ন দিককে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

মানুষের প্রকৃতি কি? সেই সম্বন্ধে দুইটি বিপরীত মত

ইহাদের মধ্যে প্রথম দল বলেন যে, মানুষের সংজ্ঞার্থ হইতেছে যে, 'মানুষ যুক্তি বিচারসম্পন্ন প্রাণী'—Man is a rational animal। এই সংজ্ঞার্থের (definition) শেষ অংশটাই মানুষের প্রকৃতির নির্দেশ করিতেছে। মানুষের প্রকৃত পরিচয়, সে 'প্রাণী'—তাহার প্রাণ আছে। এখানে সে অন্য সমস্ত প্রাণ-সম্পন্ন জীবের সগোত্র, ইহাই তাহার প্রকৃতি, তাই সে বৃহৎ জীবজগতের অধিবাসী। তাহার বিচারক্ষমতা নিতান্তই আকস্মিক আগন্তুক গুণ। তাই দেখি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন যে দার্শনিক, তিনিও পঠন-পাঠনের সময়টুকুর বাহিরে, কামক্রোধ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত—তাহারও লোভ আছে গাড়ী, বাড়ী, নারীর প্রতি; তিনিও দৈহিক আরাম চান, দৈ-সন্দেশ, পাকা আম দেখিয়া লালায়িত হন, বাজারে গিয়া দরদস্তুর করেন, প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করেন! কাজেই বিচারবুদ্ধি হইতেছে মানুষের বাহিরের চকচকে পালিশ মাত্র। স্বার্থে আঘাত কর, দেখিবে দার্শনিকপ্রবর ক্রোধে আত্মহারা হইয়াছেন, তাঁহাকে চাটুবাক্য দ্বারা তুষ্ট কর, হয়তো দেখিবে টেস্ট পরীক্ষার ফাঁড়াটা কাটিয়া গিয়াছে! তাই ইংরেজী প্রবাদ বলে সাধুবরের বাহিরের গিল্‌টিটা তুলিয়া ফেল, দেখিবে নীচে লুব্ধ পশুর লালা ঝরিতেছে,—**Scratch a saint, and you will find the beast!**

একদল বলেন, মানুষ প্রাণী, ইহাই তাহার প্রধান পরিচয়

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—হওয়া

প্রাণীর বা জীবের প্রধান লক্ষণ কি? সে সুখ খোঁজে, দুঃখ এড়ায়। ইন্দ্রিয়ভোগ, প্রবৃত্তি বা আবেগই তাহাকে চালিত করে। এ বিষয়ে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তবে মানুষের পক্ষে কি সব চেয়ে ভাল? কি তাহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ? সুখভোগের আকাঙ্ক্ষাই যদি মানুষের প্রকৃতি হয়, ইহাই যদি তাহার স্বভাব হয়, তবে মানুষের আদর্শ, সর্বাপেক্ষা তৃপ্তিকর, সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সুখ আহরণ। যাঁহারা সুখভোগকেই মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহারা ভোগবাদী বা প্রেয়োবাদী (Hedonists) বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহাদের আদর্শের নাম ভোগবাদ বা প্রেয়োবাদ (Hedonism)। প্রাচীন গ্রীক্ দেশে সাইরেনেয়িক্ (Cyrenaics) এবং তৎপর এপিকিউরিয়ান্‌রা (Epicureans) এই মতের সমর্থক ছিলেন। ভারতবর্ষে চার্বাকও ভোগপন্থী। বর্তমানকালে এই মতকে যুক্তিদ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন মিল্, বেন্‌থাম্, হারবার্ট স্পেন্‌সার ও সিজ্‌উইক্ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ।

প্রাণীর প্রধান লক্ষণ সে সুখ অন্বেষণ করে

কাজেই সবচেয়ে বেশী সুখ আহরণের চেষ্টাই মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত। ইহারা প্রেয়োবাদী

অন্যদিকে আব একদল বলেন, মানুষের সংজ্ঞার্থ—Man is a rational animal—এই সংজ্ঞার্থের প্রথম অংশটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ অন্যান্য প্রাণী বা পশুজগৎ হইতে পৃথক, তাহার যুক্তি-বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতা দ্বারাই। ইহাই মানুষের বৈশিষ্ট্য—differentium ; ইহাই তাহার সার্থক পরিচয়। এই বিচারবুদ্ধি আছে বলিয়াই যখন সে সুখের সন্ধান করে, তখনও পশুর মত প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে পারে না। সে বিচার করে, বিবেচনা করে, যুক্তিবুদ্ধি দ্বারা তাহার পথ নির্ধারণ করে। অন্ধ প্রবৃত্তি বলে, 'ভোগ করো, ফলাফল চিন্তা ক'রো না।' কিন্তু বিচারবুদ্ধি বলে, 'সংযত হও, শ্রেয়ঃ চিন্তা করো।' মানুষ বিচারবুদ্ধিশীল প্রাণী, কাজেই তাহার আদর্শ ভোগের নয়, ত্যাগের—তাহার আদর্শ, লাভের হিসাব না করিয়া, কর্তব্য করিয়া যাওয়ায়। প্রাচীন গ্রীসে এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সিনীক্ (Cynics) এবং স্টোয়িক্ পণ্ডিতেরা (Stoics)। পরবর্তী ইয়োরোপে এই আদর্শের সমর্থক শ্যাফ্‌টেসব্যারী, বাট্‌লার প্রমুখ অন্তর্দৃষ্টিবাদীরা ও যুক্তিবাদীরা। এবং এই দলের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হইতেছেন কাণ্ট।

অন্যদল বলেন, বিচার-বুদ্ধিই মানুষের বৈশিষ্ট্য

তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাই ভোগ নয়, ত্যাগ

প্রেয়োবাদী এবং যুক্তিবাদী দুই দলই দাবি করিতে পারেন যে তাঁহাদের মতে মানুষের পরিপূর্ণ আত্ম-বিকাশই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কিন্তু প্রেয়োবাদীরা যে 'আত্ম'র

বিকাশ কাম্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইতেছে—আবেগ-আকাঙ্ক্ষা-চালিত আত্ম (Sentient self)। এই আদর্শকে তাই বলা যায়—The Ethics of Sensibility। অপর দিকে যুক্তিবাদীরা যে 'আত্ম'র বিকাশে আগ্রহী, তাহা হইতেছে বিচারবুদ্ধি-চালিত আত্ম (Rational Self)। তাঁহাদের আদর্শকে তাই বলা যায়—The Ethics of Reason।

এই দুই মতবাদেরই আবার একাধিক উপদল আছে। উগ্র প্রেয়োবাদীরা বলিবেন, সুখ অনুসরণই যখন মানুষের আদর্শ, তখন আবেগ-আকাঙ্ক্ষার পথেই মানুষ সর্বাপেক্ষা নিবিড় এবং সর্বাপেক্ষা অধিক সুখ পাইতে পারে। সুতরাং, স্থূল ইন্দ্রিয়জ সুখই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত। যেখানেই বিচার-বিবেচনা, সেখানেই সুখের পথে বাধা। সাইবেনেয়িক্‌স্‌রা এই স্থূল প্রেয়োবাদের—Gross Hedonismএর সমর্থক।

উগ্র প্রেয়োবাদীরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই আদর্শ বলেন

কিন্তু এপিকিউরিয়ান্‌রা বলেন যে, সুখ সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে পাইতে হইলেও, প্রবৃত্তিকে সংযত করা দরকার। অপরিমিত ভোগ সর্বদাই ক্ষয়কারী, এবং ক্লান্তিদায়ক। তাই নির্বোধের মত স্থূল ইন্দ্রিয়সুখের অসংযত তৃপ্তি বাস্তবিকপক্ষে সুখশান্তি দিতে পারে না। তাই সংযত হইয়া পরিমিত ভোগই মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত। পরবর্তীকালে মিল্‌ও বলিয়াছিলেন যে, সব সুখ সমান মূল্যবান্ নয়। রসনার তৃপ্তি তীব্রতর হইতে পারে, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী। ইহা পশুর আদর্শ হইতে পারে। কিন্তু মানুষের মর্যাদাবোধ আছে, কাজেই সে শূকরের মত কর্দমপঙ্কে অবগাহন করিয়া সুখ পাইতে পারে না। তাহার সুখের বস্তু এমন পরিমার্জিত হওয়া প্রয়োজন,—যাহাতে তাহার মন ও বুদ্ধিরও পরিতৃপ্তি মিলিতে পারে। এই জাতীয় সুখই শ্রেষ্ঠ সুখ, মনুষ্যোচিত সুখ। এই মতবাদকে পরিমার্জিত ভোগবাদ (Refined Hedonism) বলা যায়।

পরিমার্জিত ভোগবাদীরা বলেন, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির দ্বারা শ্রেষ্ঠ সুখ ভোগ করিতে হইলেও বিচার ও সংযম প্রয়োজন

আর একদল প্রেয়োবাদী ব্যক্তির নিজস্ব সুখকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করেন। তাঁহারা হইলেন আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদী (Egoistic Hedonists), স্থূল প্রেয়োবাদীরা সকলেই এই দলে।

স্থূল ভোগবাদীরা আত্ম-সুখকেই আদর্শ মনে করেন

কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদ কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। আধুনিক ভোগবাদ বলে বহুর সুখ,—সমাজের কল্যাণই মানুষের

শ্রেষ্ঠ আদর্শ। বর্তমান যুগের মানুষ সমাজ-সচেতন, এবং সমাজের কল্যাণকে উপেক্ষা করিয়া, ব্যক্তি নিজ স্বার্থ কখনও রক্ষা করিতে পারে না,—কখনও বাস্তবিকপক্ষে সুখী হইতে পারে না, ইহাই বর্তমান মানুষের সুচিন্তিত অভিমত। এই আদর্শকে সমাজ-সুখবাদ বা Altruistic Hedonism, অথবা উপযোগবাদ বা Utilitarianism বলা হয়।

আবার উপযোগবাদীরা বলেন, ব্যক্তির সুখ নয়, বহুর সুখই আদর্শ

অন্যদিকে যুক্তিবাদীদের মধ্যেও 'গরম' ও 'নরম' এই দুই দল আছে। গরমপন্থীরা মানুষের আদর্শ নির্ধারণকালে, একমাত্র তাহার যুক্তিমত্তার দিকটাই মনে রাখেন। মানুষের যে দেহ আছে, আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি আছে, ইহা তাঁহারা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। সুতরাং তাঁহাদের আদর্শ হইতেছে, কেবলমাত্র যুক্তিবিচারের অনুসরণ, শুদ্ধ ধ্যান ও চিন্তাব জীবন, যেখানে কামনা-বাসনাব কোন ছোঁওয়া থাকিবে না। কাণ্ট এই মতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। কিন্তু নরমপন্থীরা মানুষের জীবনে আবেগ-আকাঙ্ক্ষার স্থান আছে, ইহা অস্বীকার করেন না। তবে, তাঁহাদের মতে, যুক্তিবিচার, আকাঙ্ক্ষা-আবেগের সীমা নির্দেশ করিয়া দিবে, তাহাদের নিয়ন্ত্রিত কবিবে। যুক্তির নিয়ন্ত্রণে প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা শ্রেয়াভিমুখী জীবনের অঙ্গ হইয়া সেই আদর্শ জীবনকে কাঙ্ক্ষণীয় করিয়া তুলিবে।

যুক্তিবাদীদের মধ্যে উগ্রদল বলিবেন, শুদ্ধ যুক্তি-বিচার অনুসরণই আদর্শ ; সেখানে সমস্ত আবেগ-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। মধ্যপন্থীবা আবেগ-আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন, সম্পূর্ণ উচ্ছেদ নয়

প্রেয়োবাদ ও যুক্তিবাদ দুইই ক্রমশঃ পবস্পরের সম্মুখীন হইতে থাকে। এই দুইটি মতেরই উগ্ররূপ একদেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ। এই দুইটি মতই মানুষের জীবনের একটি দিককেই তাহাব সমগ্র জীবন বলিয়া ভুল করে। মনুষ্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটি মতই অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত। মানুষের জীবনে ইন্দ্রিয়ভোগ, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার অনেকখানি স্থান আছে, কিন্তু তাহাই মানুষের সবখানি নয়। মানুষের প্রকৃতির এই উল্লেখযোগ্য অংশের সম্পূর্ণ বিকাশ সমগ্র মানুষের আদর্শ হইতে পারে না। আবার মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, তাহার যুক্তি ও বুদ্ধি, ইহাও সত্য। কিন্তু মানুষ শুধু দেহকামনাহীন, রক্তমাংসের উত্তাপহীন, শুদ্ধ বিচারবুদ্ধিশীলই থাকিবে, বাসনা-কামনার লেশ মাত্র তাহাতে থাকিবে না, ইহা অবাস্তব দাবি। তাই উগ্র যুক্তিবাদও গ্রহণীয় নয়।

প্রেয়োবাদ ও যুক্তিবাদ এই দুই মতই একদেশ-দর্শী—দুইয়ের সমন্বয় প্রয়োজন।

মানুষের সম্পূর্ণ সংজ্ঞার্থই আবার আমরা স্মরণ করি,—মানুষ বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন প্রাণী—Man is a rational animal। মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন,

ইহা যতখানি সত্য—'মানুষ প্রাণী' একথাও ততখানিই সত্য। কাজেই সমগ্র মানুষের আদর্শ এমনই হইতে হইবে, যাহাতে তাহার বিচারবুদ্ধি ও প্রাণীত্ব এই দুই অংশেরই সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়। এমন আদর্শ প্রেয়োবাদ এবং যুক্তিবাদের সুসমন্বয়েই কেবল মাত্র সম্ভব। সেই সুসঙ্গত শ্রেষ্ঠ আদর্শের নাম সম্পূর্ণতাবাদ, পরিপূর্ণ বিকাশবাদ বা Perfectionism অথবা Eudaemonism। প্রাচীনকালের আরিস্টটল এবং বর্তমান যুগের গ্রীন্, সেথ্, ম্যাকেঞ্জী প্রমুখ মানুষের এই পরিপূর্ণ আদর্শের সমর্থক। এই আদর্শের উদ্দেশ্য সমগ্র ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা, ইহাকে তাই বলা যায়—Ethics of Personality।[8]

সেই সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সম্পূর্ণতাবাদ

আর একভাবেও নৈতিক আদর্শগুলির শ্রেণীবিভাগ করা যায়। নীতিবিদ্যার আদর্শ-নির্দেশক দুইটি কথা—একটি হইল the Good—শুভর আদর্শ; আর একটি হইল the Right—ন্যায়ের আদর্শ। প্রাচীন নীতিবিদ্‌রা নৈতিক আদর্শ স্থির করিবার সময়, কি সব চেয়ে শুভ বা মঙ্গলময়, তাহা নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ আদর্শ সর্বদাই উদ্দেশ্য (the end) দ্বারা নির্ধারিত। কোন আচরণের নৈতিকতা বিচার করিতে হইলে, এই প্রশ্ন করিতে হয়, কি উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য এই আচরণ? আমরা দেখিয়াছি যে, এ সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন উত্তর হইতে পারে। একদল বলিবেন, আদর্শ আচরণের উদ্দেশ্য হইতেছে সুখলাভ (pleasure), এই মতবাদেরই নাম প্রেয়োবাদ বা Hedonism। অন্যদল বলিবেন, আচরণের উদ্দেশ্য বিচারবুদ্ধির অনুসরণ,—ভোগ নয়, ত্যাগ। ইহাদের বলা হইয়াছে যুক্তিবাদী বা Rationalists। আমরা দেখিলাম সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ এই দুই অসম্পূর্ণ মতের সুসমন্বয়ে।

নৈতিক আদর্শের আর এক প্রকার শ্রেণী-বিভাগ

এক শ্রেণীর উদ্দেশ্য—the Good। আর এক শ্রেণীর উদ্দেশ্য—the Right

আবার বর্তমান যুগের রাষ্ট্রচিন্তায় অভ্যস্ত মানুষ বলিবেন, আদর্শ আচরণ হইতেছে যাহা ন্যায় (right)। ন্যায় হইতেছে যাহা নিয়মানুসারী (according to law)। কেহ কেহ এই আইনকে সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রকাশিত ইচ্ছা (expresse will of society or the state) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ন্যায়সঙ্গত কাজ হইতেছে, যাহা সমাজ বা রাষ্ট্রের আইনকে অনুসরণ করে। বেনথাম্‌কে আমরা এই মতের সমর্থক বলিতে পারি। সম্পূর্ণভাবে না হইলেও মিল্‌ও এই মতের সমর্থক। আবার কাহারও

এই দুই বিরোধীদলেরও সমন্বয় প্রয়োজন

৪। Seth—A Study of Ethical Principles, P. 79-82

কাহারও মতে এই আইন বা বিধি অন্তরের। স্যাফ্‌টেস্‌ব্যরী, বাট্‌লার ইত্যাদি এই মত অনুমোদন করেন—কাণ্টও বহুলাংশে এই মতের সমর্থক। ইঁহারা অন্তর্দৃষ্টিবাদী (Intuitionists)। কিন্তু আদর্শকে শুভ উদ্দেশ্যের দিক হইতেই বিচার করিলেও আমাদের এই সিদ্ধান্তেই পৌছিতে হয় যে, সমস্ত আচরণকে একটি কেন্দ্রীয় এবং চূড়ান্ত নীতি দ্বারাই সুসংহত করিতে হইবে। আচরণের সেই কেন্দ্রবিন্দু হইতেছে এমনি একটি উদ্দেশ্য, যাহা নিজের মূল্যেই মূল্যবান,—যাহাকে আমরা বলিতে পারি পরমপুরুষার্থ—Summum Bonum, the Highest Good। নীতিবিদ্যাব উদ্দেশ্য এই পরমপুরুষার্থের সন্ধান। যাহা সেই পরমপুরুষার্থ সাধনে সহায়ক, তাহাই নৈতিক আদর্শ। আইন বা বিধিব নিজস্ব কোন মূল্য থাকিতে পারে না—তাহারা উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বলিয়াই, তাহারা বুদ্ধিসম্পন্ন ও আত্মমর্যাদাশীল মানুষেব আনুগত্য দাবি করে। কজেই দেখা যায়, আমরা 'ন্যায'-এর্ (the Right) দিক হইতেই আলোচনা শুরু করি, অথবা 'শুভ'-এব (the Good) দিক হইতেই আলোচনা করি, নৈতিক আদর্শ একই রূপ ধারণ করে।

কাহারও মতে, আদর্শের আইন,—বাহিরের শাসন

আবার কেহ বলিবেন, ইহা আন্তরিক

শ্রেষ্ঠ আদর্শ—পরম পুরুষার্থের সন্ধান

মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষেব পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যই। বিভিন্ন নৈতিক আদর্শের যে আপাতবিরোধ দেখা যায়, তাহার হেতু হইল, কেহ মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য আর কেহ বা অন্য বৈশিষ্ট্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া (যথা, প্রবৃত্তি ও বিচারবুদ্ধি, ভোগ ও ত্যাগ) তাহার পরিপূর্ণতাকেই মানুষের আদশ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের আদর্শ সমগ্র মানুষেরই পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক হওয়া চাই। তাহা না হইলে, সে আদর্শ অবাস্তব হয়। প্লেটো, আরিস্টটল বা হেগেল প্রমুখ শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরা এই সম্পূর্ণ বিকাশের আদর্শকেই (Perfectionism) মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহাদের চিন্তায় আপাতবিপরীত বিভিন্ন নৈতিক আদর্শের সুসমন্বয় ঘটে।[৫]

শ্রেষ্ঠ আদর্শ—জীবন্ত মানুষের সম্পূর্ণ বিকাশ

৫। Beside the opposing schools, we find throughout the course of ethical speculation, another point of view, which may be described as that which lays the emphasis on the concrete personality of 'man', rather than on any such abstract quality as reason and passion. This point of view does not usually appear in opposition to the other two, but rather as a view in which they are reconciled and transcended. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 156

ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থ—ভারতীয় দর্শন স্বীকার করে যে, মানুষ ইতর প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ,—সে অন্ধভাবে কাজ করে না। তাহার কাজ সর্বদাই কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। মানুষেব কর্মের উদ্দেশ্যগুলিকে চারিটি প্রধান দলে ভাগ করা যায়—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ভারতীয় দৃষ্টিতে সমস্ত সাংসারিক কর্মের মধ্য দিয়া মানুষ কামের তৃপ্তি খোঁজে। সে ভালবাসা চায়, ভালবাসিতে চায়, যশ চায়, মান চায়। ইহাকেই বলা হইয়াছে কাম। ইহার মধ্য দিয়াই ঘটে আবেগের গভীব তৃপ্তি (deep emotional satisfaction)। আবার মানুষ জীবনে খোঁজে অর্থ, বিত্ত, সাংসারিক প্রতিষ্ঠা—ইহাকে বলিতে পারা যায়—economic satisfaction। ইহার প্রকাশ হইল বাড়ী, গাড়ী, শাড়ী, গহনার বৈভবে। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে এই ভোগ নিন্দনীয় নয়। বরঞ্চ গৃহীর পক্ষে এই ভোগ কর্তব্য। ভারতীয় ঋষি কিন্তু ভোগকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। কাম ও অর্থ বৈধ হওয়া চাই।

যে কাম ও অর্থ ধর্মকে লঙ্ঘন করে তাহা সর্বথা পরিত্যাজ্য। ধর্মানুসরণে ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ হয়। ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা চন্দ্রলোক, দেবলোক ইত্যাদি উৎকৃষ্ট ধাম প্রাপ্তি হওয়া যায়। কিন্তু ইহারা জীবনের শেষ উদ্দেশ্য নয়। শেষ উদ্দেশ্য হইতেছে, মোক্ষ অথবা সংসারচক্র হইতে,—পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তি। ভারতীয় দর্শন অনুসারে অবিদ্যা মোহ ছেদন না হইলে, মোক্ষ লাভ হয় না। শঙ্কর বেদান্ত মতে, বিশুদ্ধ জীবন যাপন এবং শাস্ত্রানুসরণ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই ব্যক্তি তাহার শ্রেষ্ঠ বিকাশ লাভ করে—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। তখনি সে শ্রেষ্ঠ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বলিতে পারে,—সোঽহং—আমিই সেই ব্রহ্ম। ইহাই অদ্বৈতবাদ। যাঁহারা ভক্তিমার্গের পথিক তাঁহারা এই ব্রহ্মপ্রাপ্তিকেই শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ উত্তীর্ণ হইয়া পরাভক্তির অবস্থাকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়াছেন। এই অহেতুকী ভক্তির অবস্থা ভগবৎ-আশীর্বাদ ব্যতীত কেবলমাত্র ব্যক্তির নিজ চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত হইতে পারে না।

ব্রহ্মপ্রাপ্তির অবস্থা অথবা পরাভক্তির অবস্থা অবশ্য নৈতিক জীবনের উর্ধ্বে। কারণ সে অবস্থার ব্যক্তির কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়, তাহার কর্ম তখন সম্পূর্ণভাবে ভগবদ্‌চালিত, তাহা ন্যায়-অন্যায়ের উর্ধ্বে। অবশ্য এই জীবন লাভ করিতে হইলে, প্রথমে নৈতিক জীবনের শাসন-নিয়ম নিশ্চয়ই মান্য করিতে হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণের আদর্শ নির্ণয় করে। আদর্শ হইল মাপকাঠি, যাহা দিয়া কোন গুণের উৎকর্ষ পরিমাপ করা যায়। কোন দ্রব্যের আদর্শ নির্ণয় করিতে হইলে, দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ণয় করা প্রয়োজন, এবং কি কাজের জন্য ইহা দরকার, তাহাও জানা দরকার। আদর্শকে সম্পূর্ণ কখনোই আয়ত্ত করা যায় না, কিন্তু বাস্তবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আদর্শ নির্ণয় করা যায় না। মানুষের আচরণের আদর্শ স্থির করিতে হইলে, প্রথমেই স্থির করা দরকার, মানুষের প্রকৃতিটি কি?

মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত মত আছে। একটি মত হইল যে, মানুষ পশুর সমগোত্রীয় এবং অন্য সব প্রাণীর মত মানুষেরও বিশেষত্ব হইতেছে সুখ অন্বেষণ। আর দ্বিতীয় মত হইল যে, মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী এবং বিচারবত্তা (rationality) মানুষের বিশেষ লক্ষণ। মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রেয়োবাদীরা প্রথম মত গ্রহণ করেন এবং তাহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, সুখ-অন্বেষণই মানুষের আচরণের আদর্শ হওয়া উচিত। অন্যদিকে যুক্তিবাদীরা মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় মত গ্রহণ করেন, এবং তাহারা বলেন, মানুষের আচরণের আদর্শ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সুখভোগ নয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বা আত্মত্যাগ।

দুই দলের মধ্যেই উগ্রপন্থী ও মধ্যপন্থী আছেন। উগ্র প্রেয়োবাদীরা স্থূল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলেন। তাঁহারা বলেন, সব চেয়ে বেশী পরিমাণ সুখসংগ্রহ জীবনের উদ্দেশ্য, এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পথেই ইহা সম্ভব। ইহারা হইলেন সাইরেনেয়িকস বা স্থূল সুখবাদীদের দল। অন্যদিকে পরিমার্জিত প্রেয়োবাদীরা বলেন যে, বিচার ও সংযম ব্যতীত ইন্দ্রিয়-সুখভোগ তৃপ্তিকর হয় না।

আবার স্থূল সুখবাদীদের একদল বলেন, ব্যক্তির নিজ সুখই আদর্শ হওয়া উচিত। অন্যদিকে উপযোগবাদীরা বলেন, ব্যক্তির সুখ নয়, বহুজনের সুখ ও কল্যাণই শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

চরম যুক্তিবাদীরা মনে করেন, নৈতিক জীবনে আবেগ-আকাঙ্ক্ষার কোন স্থান নাই। মধ্যপন্থীরা আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার উচ্ছেদের পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন।

প্রেয়োবাদ ও যুক্তিবাদ দুইই একদেশদর্শী। দুইয়ের সমন্বয়েই সম্পূর্ণ আদর্শ। আবেগ-আকাঙ্ক্ষা জীবনের মূল, তাহাদের উচ্ছেদ সম্ভব নয়। বিচারবুদ্ধি তাহাদের সীমা নির্দেশ করিয়া দেয়, তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করে। সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশই মানবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এই মতের নাম সম্পূর্ণতাবাদ।

কেহ কেহ বলেন, শুভের অনুসরণ শ্রেষ্ঠ আদর্শ; আবার অন্য একদল বলেন, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ আদর্শ। পথ বিভিন্ন হইলেও শেষ উদ্দেশ্য এক,—তাহা হইল সমগ্র মনুষ্যত্বের বিকাশ।

কেহ কেহ বলেন, নীতির শাসন বাহির হইতে আসে (যথা, সমাজ বা রাষ্ট্র)। আবার অন্তর্দর্শনবাদীরা বলিবেন, নীতির শাসন বিবেকের শাসন, তাহা আন্তরিক।

যাহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহা হইবে নিজের মূল্যেই মূল্যবান্—Summum Bonum। তাহাতে শুভ ও ন্যায়ের সমন্বয় ঘটিবে।

ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থ হইতেছে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ। মোক্ষ বা সংসারচক্র হইতে মুক্তিই শেষ উদ্দেশ্য—পরমপুরুষার্থ। ভক্তিবাদীদের মতে তাহার চেয়েও শ্রেষ্ঠ আদর্শ—অহেতুকী ভক্তি।

Questions

1. What is the meaning of ethical ideals ? Indicate the broad distinction between ethical ideals. What is the basis of these distinctions ?

2. What is the relation between the actual and the ideal ? Why is it necessary to know the actual to determine the ideal ?

3. What are the Purusarthas ? What is the highest ideal according to Shankara ? Critically discuss his view.

অষ্টম অধ্যায়

অন্তর্দৃষ্টিমূলক নৈতিক আদর্শ

Intuition as the ethical standard.

[Intuition as moral standard—Conscience as moral sense or moral sentiment—Aesthetic school of Shaftesbury, Ruskin—Philosophical Intuitionism of Butler & Cudworth—Martineau's springs of action—the Dianoetical theory—General Criticism.]

কোন কোন নীতিবিদ্ বলেন, নৈতিকতার মাপকাঠি, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব বিবেক। কোন্ কাজ ভাল, কোন্ কাজ মন্দ, তাহা প্রত্যেক মানুষ নিজের অন্তরেই জানে। ইহার জন্য সমাজের মতামত বা রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী কাজটি হইল কিনা, তাহার তুলনা বা বিচার নিষ্প্রয়োজন। কোন কাজের নৈতিক গুণ বাহিরের শক্তির আদেশ বা অনুমোদনের উপর নির্ভর করে না, অথবা তাহা কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে, তাহার উপরও নির্ভর করে না। কোন কাজের নৈতিক গুণ তাহার নিজেরই অন্তর্নিহিত গুণ, এবং প্রত্যেক মানুষকে ভগবান সেই শক্তি দিয়াছেন, যাহা দ্বারা সে তৎক্ষণাৎ কোন কাজের নৈতিক মূল্য বুঝিতে পারে। এই জ্ঞান অন্তর্দৃষ্টিমূলক। কাজেই আমরা এখানে নৈতিকতার নূতন আর একটি আদর্শ বা মাপকাঠি পাইলাম।

কেহ কেহ বলেন, কোন্ কাজ ভাল, কোন্ কাজ মন্দ, তাহা মানুষের অন্তরই জানে

বিবেকই কর্তব্য-কর্মের মাপকাঠি

বিবেকের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পূর্বে আমরা বিবেচনা করিয়াছি ; কাহারও মতে, এই নৈতিক বোধের শক্তি (moral faculty) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মতো তৎক্ষণাৎ-লভ্য। তবে প্রভেদ এই যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাওয়া যায় বাহ্য পর্যবেক্ষণ দ্বারা, আর বিবেক দ্বারা কোন কার্যের নৈতিক মূল্য জানিতে পারা যায়, অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে। আবার কেহ কেহ বলিবেন, বিবেক এক প্রকারের প্রত্যক্ষ অনুভূতি—সুখ-দুঃখের অনুভূতির মতো ইহাও তৎক্ষণাৎ অন্তরে উদয় হয়। বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা এই বোধ বা অনুভবের স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। প্রত্যেক মানুষই নিজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানে ইহার রূপ। ইহা তাই একটি রহস্যময় শক্তি। এজন্য সিজউইক্ এই জাতীয় মতবাদকে অ-দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টিবাদ (unphilosophical Intuition-

ism) বলিয়াছেন।[১] ম্যুইরহেড্ এই নৈতিক আদর্শের নিম্নলিখিত কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন : (১) বিবেকের স্বরূপ বিশ্লেষণলব্ধ নয়—"যে জানে সে আপনি জানে, হয়না তাকে বোঝাতে।" (২) বিবেক আমাদের তৎক্ষণাৎ বলিয়া দেয় কাপুরুষতা বা প্রতারণা নিন্দনীয়। তদ্রূপ, বিবেক আছে বলিয়াই আমরা তৎক্ষণাৎ জানি সত্যবাদিতা, সাহস বা সংযম প্রশংসনীয়। (৩) ইহা বিনা বিচারে আমাদের আনুগত্য দাবি করে, ইহার শাসন অন্তরে অমান্য করা অসম্ভব। কার্যতঃ যেখানে বিবেকের আদেশ লঙ্ঘন করি, সেখানে বিবেকের ধিক্কার আমাদের অনুসরণ করে। (৪) ইহার শাসন-অধিকার সর্বদেশে সর্বকালে সর্বমানুষের উপর সমান। নিতান্ত অসভ্য বর্বর মানুষও নিজের অন্তরে বিবেকের আদেশ শুনিতে পায়, কাজেই বিবেক কোন ব্যক্তিবিশেষের মতামত বা রুচি নয়—ইহার শক্তি সর্বমানবীয়।[২]

বিবেক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অনুরূপ

ইহা তৎক্ষণাৎ কর্মের ন্যায়-অন্যায় নির্দেশ করে

ইহা বিনা বিচারে আনুগত্য দাবি করে ; অন্যায় করিলে ইহা দংশন করে

ইহার অধিকার সর্বদেশে, সর্বমানুষের উপরে

কিন্তু বিবেক যদি বিচার-বিশ্লেষণ-অনির্ভর রহস্যময় শক্তি হয়, তবে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে ইহা নৈতিক আদর্শ কখনোই হইতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে বর্তমান মনোবিদ্যা মনের কতগুলি বিচ্ছিন্ন নির্দিষ্ট শক্তির (mental faculties) অস্তিত্বই অস্বীকার করে। অন্তর্দৃষ্টি বিচার-বুদ্ধি-বিবেচনা হইতে পৃথক একটি বিচ্ছিন্ন শক্তি নয়। যাহাকে বিবেকের অন্তর্দৃষ্টি বলা হয়, তাহা বাস্তবিকপক্ষে অবচেতন, অবিশ্লেষিত, অকথিত, অস্পষ্ট বিচারবুদ্ধিই।

কিন্তু বিবেক যদি বিচারবুদ্ধি-বর্জিত শক্তি হয়, তবে তাহা বুদ্ধিমান মানুষের আদর্শ হইতে পারে না

বিবেক যদি প্রত্যেক ব্যক্তির অনুভূতি-নির্ভর হয়, তাহা হইলে তাহা সার্বজনীন নৈতিক আদর্শ হিসাবে কখনও গৃহীত হইতে পারে না। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অনুভূতির প্রভেদ ঘটে, এমন কি বিভিন্ন অবস্থায় একই ব্যক্তির নৈতিক বোধের তারতম্য হয়।[৩] বিচারবুদ্ধিই কেবলমাত্র সর্বজন-গ্রাহ্য হইতে পারে, এবং তাহাই কেবল আদর্শ হিসাবে গৃহীত হইতে পারে।

১। Sidgwick—History of Ethics

২। Muirhead—Elements of Ethics, P. 79

৩। The moral notions which have seemed equally innate, self-evident and authoritative to those who held them have varied enormously with different races, different ages, different individuals—even with the some individual at different periods of life. Rashdall—Theory of Good and Evil, Bk. I Ch. 4

গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের সময় ছাত্রদের সমস্ত বিদ্যালয় 'গোলামখানা' হইতে বাহির হইবার আহ্বান জানাইলেন। রবীন্দ্রনাথ ইহাতে আপত্তি করিলেন। গান্ধীজী নিজ কর্মের সমর্থনে বলিলেন, ইহা তাঁহার অন্তরের বিবেকের আহ্বান। রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন—বিবেকের আহ্বান যুক্তি-বিরোধী হইতে পারে না।

বিবেক অনুভূতি হইলে, ইহা সার্বজনীন হইতে পারে না

কোন ব্যক্তির বিবেক উপযুক্ত শিক্ষা বা বিচারের অভাবে অপরিণত, এমন কি বিকৃতও হইতে পারে। বস্তির কদর্য পরিবেশে যে দরিদ্র ছেলেমেয়ে মানুষ হইয়াছে, চুরি করাতে সে বিবেকের দংশন বোধ করে না। তাই বলিয়া কি বলা যায় যে, চুরি করা অন্যায় নয়? নিজের বিবেকবিরুদ্ধ কাজ যে করে, সে নিশ্চয়ই অন্যায় করে, কারণ সে নিজদ্বারা স্বীকৃত ন্যায় ও সততার আদর্শের বিরুদ্ধেই কাজ করিতেছে। কিন্তু বিকৃতবুদ্ধি বা অপরিণত বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাহার বিকৃত বা অপরিণত বিবেকানুযায়ী কাজ করিলে, তাহা অন্যায় হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।[৪]

নৈতিক আদর্শ, আদর্শ হিসাবে গ্রাহ্য হইতে হইলে, একটি বিচার-সহ সাধারণ নীতির উপর নির্ভরশীল হওয়া চাই। যাহা সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাপার, তাহা সার্বজনীন আদর্শ হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না।

বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আদর্শ অন্ধ ব্যক্তিগত অনুভূতি মাত্র হইতে পারে না। তাহা কোন বিচারগ্রাহ্য শুভ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হইতে হইবে—**must contribute to some rational end.** শুভ উদ্দেশ্য কোন্‌টি, তাহা অনুভূতি দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না, ইহা প্রত্যক্ষ বোধও নয়। ইহা জ্ঞানেই যুক্তিবিচার দ্বারাই কেবলমাত্র পাওয়া যাইতে পারে

শ্রেষ্ঠ আদর্শ শুভ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হওয়া চাই এবং বিচারসহ হওয়া চাই

নীতিবোধকে যদি শ্রেষ্ঠ অনুভূতি বলিয়া দাবি করা হয়, তবে কোন হিসাবে দাবি এই জন্যই স্বীকৃত হইতে পারে যে, নৈতিক অনুভূতির নীতিবোধ অনিয়ন্ত্রিত অনুভূতি মাত্র নয়,—ইহা বুদ্ধিদীপ্ত এবং অন্ততঃ তা ছাড়া যুক্তি-নির্ভর।

৪। "His (the idiot's or depraved person's) conscience may be, in Ruskin's phrase, "the conscience of an ass." The man who does not act conscientiously certainly acts wrongly: he does not conform even to his own standard of rightness. But a man may act conscientiously and yet act wrongly, on account of some imperfection in his standard. MacKenzie— A Manual of Ethics, P. 149

উপরোক্ত মতে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ নীতিবোধবাদী (Moral Sense School) বলা হয়। ইহারই অনুরূপ একটি মত যে, নৈতিক চেতনা বাস্তবিক পক্ষে রুচিবোধ বা সৌন্দর্যানুভূতি। রাস্কিন্ এই মতকে সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, ভদ্র মানুষের মধ্যেই একটি সুকুমার নীতিবোধ আছে,—অন্যায় বা ইতর কোন কাজ, তাহার সেই আন্তরিক রুচিবোধকে পীড়া দেয়। যাহা অন্যায়, তাহা অসুন্দর—যাহা ন্যায় তাহা শোভন, তাহা সুসঙ্গত, তাহা সুন্দর। ন্যায় কার্যের মধ্যে একটি সুষম পরিমিতিবোধ আছে, তাহা অন্তরকে স্বতঃই আকর্ষণ করে। যখন দেখি কোন যুবক একটি শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য প্রজ্বলিত গৃহের মধ্যে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিল, তখন স্বতঃই আমাদেব অন্তর এই প্রশংসাবাণী নীরবে উচ্চারণ করে, "কি সুন্দর, কী মহৎ, এই আত্মত্যাগ।" এই প্রশংসা বিচারবুদ্ধির বিশ্লেষণ সাপেক্ষ নয়,—ইহা স্বতঃস্ফূর্ত অন্তর্নিস্ত। যাহা শোভন ও সুন্দর তাহাই সুসমঞ্জস, সুসঙ্গত।

নৈতিক চেতনা বাস্তবিকপক্ষে রুচিবোধ বা সৌন্দর্যানুভূতি ; ইহা বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ নয়

যাহা সুসমঞ্জস ও সুসঙ্গত তাহাই সত্য এবং যাহা সত্য ও সুন্দব তাহাই প্রীতিপ্রদ ও মঙ্গলদায়ক।[৫] স্যাফ্‌টেস্‌ব্যরীও (Shaftesbury) রাস্কিনেবই অনুগামী। "কোন কাজ সম্পর্কে চিন্তা করিলেই আমাদের হয় প্রীতিপ্রদ, না হয় অপ্রীতিপ্রদ কোন অনুভূতি জাগে। অনুভূতি অনুযায়ীই আমরা সেই কাজের দোষগুণ বিচার করি, এবং ইহাকে ভাল বা মন্দ বলি। বাস্তবিক পক্ষে যাহা সুন্দর, তাহাই মঙ্গলদায়ক।"[৬] কবি কীট্‌সেব বাণীও তুলনীয—

স্যাফ্‌টেস্‌ব্যবী ও বাস্কিন্

> "Beauty is truth, truth beauty"—that is all
> Ye know on earth, and all ye need to know"
>
> Keats—Ode to a Grecian Urn

অকাথ্য কিন্তু বিবেক বিচারবুদ্ধি-র্বা

হয়, তবে তা ভত্ত্ব হিসাবে, সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের অভিন্নতা স্বীকার্য, কিন্তু সাংসারিক মানুষের ক এবং বাস্তব জগতের কাজে, সুন্দরকেই নৈতিক জীবনের আদর্শ

৫। "What is beautiful, is harmonious, and proportionable; what is harmonious and proportionable is true; and what is beautiful and true is agreeble and good." Ruskin—Crown of Wild Olives

৬। 'On contemplating actions, we experience a feeling of an agreeable or disagreeable kind and discerning the character or quality of these actions by means of this feeling which they awaken, we pronounce them to be good or bad. Beauty and good are one and the same. Shaftesbury

বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সৌন্দর্যবোধ দেশে দেশে, কালে কালে, এমন কি একই ব্যক্তিতে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন। তা ছাড়া, সৌন্দর্যবোধ জন্মগত নয়, ইহা শিক্ষাসাপেক্ষ—অনুশীলনসাপেক্ষ। সমাজ-পরিবেশের উপর সৌন্দর্যের সংজ্ঞা এবং মান নির্ভর করে। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভাল-লাগা মন্দ-লাগা দিয়া, সৌন্দর্যের বিচার চলে না। কাজেই বিশুদ্ধ নৈতিক মান হিসাবে ইহা নির্ভর-যোগ্য নয়। কাজেই স্যাফ্‌টেস্‌ব্যরী বা হাচিসন্ (Hutcheson) সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে সমাজকল্যাণকে যুক্ত করিয়া, নৈতিক আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কোন অন্ধ অনুভূতি, তাহা সে যতই তীব্র হোক না কেন—নৈতিক মান হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে না। নৈতিক আদর্শ সর্বদাই কোন যুক্তিসঙ্গত শুভ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন।

সৌন্দর্যবোধ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তিতে পৃথক।

ইহা শিক্ষা-সাপেক্ষ-সমাজ-পরিবেশনির্ভর। হাচিসন্ সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে সমাজ মঙ্গলকে যুক্ত করিলেন

সৌন্দর্য এবং নৈতিকতা আদর্শ বা মূল্যনির্দেশক (indicative of value)। তাহাদের মূল্য তাহাদের বস্তুগত সত্যতার (objective validity) উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সৌন্দর্যের মাপকাঠি অনেকাংশেই ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক গঠন, শিক্ষা, সমাজ-পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। সেই জন্য র‍্যাস্‌ডাল্ সৌন্দর্যবোধ এবং নৈতিক বিচারকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন না। এবং তাঁহার মতে, আমরা জীবনের সমস্ত বিষয়কে নৈতিকতার উচ্চতম বিচারাধীন করিতে পারি। তাই সৌন্দর্যবোধ, সুখবোধ ইত্যাদি সমস্ত অভিজ্ঞতাই ন্যায়-অন্যায়ের নৈতিক মান দ্বারা বিচারসাপেক্ষ। তাই নৈতিক বিচারের মানই শ্রেষ্ঠ মান।[৭]

সৌন্দর্য ও নৈতিকতা দুই-ই মূল্যনির্দেশক, তবে র‍্যাসডালের মতে নীতিবোধ রুচিবোধ হইতে উচ্চতর

প্রত্যক্ষ নীতিবোধ অথবা স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্যবোধ নৈতিকতার বাস্তব মান হিসাবে নিতান্ত অনির্ভরযোগ্য। একে তো বিভিন্ন ব্যক্তির নীতিবোধ বা সৌন্দর্যবোধে অনেক সময় কোন মিল নাই, তা ছাড়া অনেক সময় এই প্রত্যক্ষ নীতিবোধ বা সৌন্দর্যবোধের দোহাই দিয়া প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করিতে পারে। মধ্যযুগে তথা-

এই সমস্ত মানই অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য

৭। Aesthetic judgments do seem to be more intimately connected with, and inseparable from sensations which presuppose a particular physiological organisation than the most fundamental judgments......there can be no department of human life, no kind of human consciousness or experience, upon which the moral reason may not pronounce its judgments of value. Rashdall—Theory of Good and Evil, Vol. I, Bk I, Ch.

কথিত ধার্মিক মানুষেরা তথাকথিত অবিশ্বাসীদের (heretics) পোড়াইয়া মারিবার স্বপক্ষে তাঁহাদের অন্তর্নিহিত নীতিবোধ বা রুচিবোধের দোহাই-ই দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই অমানুষিক কাজে যাঁহারা রত হইয়াছিলেন, তাঁহারা "পরিচ্ছন্ন বিবেকেই" (with a clean conscience) এই নারকীয় দৃশ্য উপভোগ করিয়াছিলেন।

জটিল বহু সমস্যার ক্ষেত্রে, এই প্রত্যক্ষ নীতিবোধ বা সৌন্দর্যানুভূতি কোন নির্দিষ্ট পথ দেখাইতে পারে না। এমন কি কখনো কখনো একই মুহূর্তে দুই বিপরীত নীতিবোধ মানুষের মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করিতে পারে। দরিদ্র ভিখারী তোমার ঘরে চুরি করিতে আসিয়া, ধরা পড়িল। চৌর্যকর্ম কুৎসিৎ, তাহা তোমার রুচিকে পীড়া দেয়—তোমার নীতিবুদ্ধি বলে, ওকে পাড়ার ছেলেদের 'পাইকারী মার' খাইতে দাও, অথবা পুলিসে ধরাইয়া দাও। আবার উহার করুণ বিশুষ্ক ক্ষুধাক্লান্ত মুখ দেখিয়া তোমার অন্তরের স্বাভাবিক মানবতাবোধ বলে, "ওকে দুদিনের চাল ডাল আর দুটি টাকা দিয়া, নিঃশব্দে ছাড়িয়া দাও, বাড়ী যাইতে দাও।" ইহা খুবই স্পষ্ট যে এ জাতীয় জটিল সমস্যার সুসমাধান—বুদ্ধি, বিচার, যুক্তির সাহায্যেই সম্ভবপর।[৮]

জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে এই আদর্শ পথ দেখাইতে পারে না

যাহাকে অন্তর্দর্শন বা হৃদয়ের অনুভূতি বলা হয়, তাহা নৈতিক আদর্শরূপে তখনই গৃহীত হইতে পারে, যখন বুদ্ধিদীপ্ত কোন মৌল নীতিদ্বারা ইহা সমর্থিত হয়।[৯]

অন্তর্দর্শনবাদীদের (Intuitionists) আর একদল, নীতিবোধকে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ, অথবা স্বতস্ফূর্ত অনুভূতিনির্ভর বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, নীতিবোধের মধ্যে যুক্তিবিচারের স্থান আছে, তাহা সম্পূর্ণ অন্ধ বা তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা নয়। এ দলে বাট্‌লার, কাড্‌ওয়ার্থ, ক্লার্কের নাম করা যাইতে পারে। মার্টিন্যুর কিঞ্চিৎ বিভিন্ন এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মতকেও এই দলে ফেলা যায়। ইঁহারা সকলেই কিন্তু একটি পৃথক নৈতিকবুদ্ধি (moral faculty) স্বীকার করেন। কিন্তু এই নৈতিকবুদ্ধির বিশ্লেষণে এবং প্রকৃতি বিচারে, তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইঁহারা নীতিবুদ্ধি বিচারসাপেক্ষ মনে করেন, সুতরাং সিজ্‌উইক্ ইঁহাদের মতকে দার্শনিক অন্তর্দর্শনবাদ (Philosophical Intuitionism) বলিয়াছেন।

বাট্‌লার, কাড্‌ওয়ার্থ প্রমুখ পণ্ডিতেরাও নীতিবোধকে অন্তর্দর্শন-গ্রাহ্য বলিলেন, কিন্তু স্বীকার করিলেন যে ইহা বিচারসাপেক্ষ

৮। Lillie—An Introduction to Ethics, P. 120

৯। ...Moral sense must not be regarded as a blind faculty, laying down principles for our guidance which are not capable of any further analysis or justification. In fact, it is only by such justification and explanation, that we can distinguish what is permanent and reliable in the decisions of conscience from what is variable and untrustworthy. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 187

বাট্‌লার নীতিবোধকে 'বিবেক' নাম দিয়াছেন। তাঁহার মতে, তর্কভিত্তিক যুক্তিবিচারের (Logical judgment) সঙ্গে মিল থাকিলেও বিবেক বা নৈতিক বুদ্ধি একটি পৃথক শক্তি। মানুষের বিভিন্ন মানসিক শক্তি ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মতো, উচ্চনীচ শাসন শক্তিতে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে যেমন, মানবমনের শাসনতন্ত্রেও তেমনি, যে শক্তির স্থান ঊর্ধ্বে, তাহা নিম্নতর শক্তিগুলিকে সংহত করে, শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম ইত্যাদি নিম্নস্তরের শক্তি। ইহারা অন্ধ, ইহারা নির্বিচারে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি দাবি করে। কিন্তু ইহাদের পরিচালনার জন্য আত্মসুখ-কামনা, (self-love), পরের প্রতি দরদ (benevolence) ইত্যাদি ঊর্ধ্বতর শক্তি আছে। এই উচ্চতর শক্তিগুলি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামের মত 'বিশেষ' আকাঙ্ক্ষা (particular passions) নয়। তাহাদের মধ্যে আছে, বিশেষ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সামান্য নীতি (general principles) দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। কিন্তু বিশেষ আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মসুখ-কামনা রূপ সামান্য নীতিরও ঊর্ধ্বে আছে, সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক শক্তি, তাহারই নাম বিবেক। ইহা আত্মসুখকামনার পরিপন্থী নয়, তাহার নিয়ন্ত্রক। ইহা একদিকে অন্তর্দৃষ্টি-নিভর, কারণ ইহার নির্দেশ স্বয়ংভাস্বর (luminous to the understanding)। অন্যদিকে ইহা সত্য ও ন্যায়ের নীতি সম্বন্ধে চিন্তারই রূপ (it is the principle of reflection upon the law of rightness)। বিবেকানুমোদিত কাজ যেমন সত্য ও ন্যায়ের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তেমনি তাহা ব্যক্তির সুখবর্ধক এবং স্বার্থানুসারীও বটে। "প্রীতিপ্রদ বিচারসম্মত" (sweet reasonableness) বলিয়াই, বেনে অথচ বুদ্ধিমান ইংরেজের-কাছে বাট্‌লারের মত অত্যন্ত সমীচীন মনে হইয়াছে। নৈতিক আদর্শ মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় হইতে গেলে, কোন বিচারগ্রাহ্য শুভ উদ্দেশ্যের সহায়ক হওয়া প্রয়োজন। ইহা একটি রহস্যময় শক্তি যাহার বিশ্লেষণ সম্ভবই নয়, এই মত গ্রহণযোগ্য নয়।

বাট্‌লার বিবেককে যুক্তিবিচারের অনুরূপ বোধ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহা বিচারবিবেচনা হইতে পৃথক এক শক্তি

বিবেকানুমোদিত কাজ বিচারসঙ্গত ও ব্যক্তির সুখবর্ধক

মার্টিন্যুও নৈতিক আদর্শকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক মনস্তত্ত্বের উপর দাঁড় করাইয়াছেন।

মার্টিন্যু মানুষের ক্রিয়ার পশ্চাতে যে অনুভূতিগুলি, প্রবৃত্তির বেগ সংযোগ করে, তাহাদিগকে springs of action বলিয়াছেন। তিনি এই কর্মের প্রেরণাগুলিকে সরল, জটিল, জটিলতর, জটিলতম হিসাবে সাজাইয়াছেন। ইহাদের

নৈতিক মূল্যভেদ আছে। তাঁহার মতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম ইত্যাদি হইতেছে স্থূলতম প্রাথমিক কর্মপ্রেরণা—Primary springs of action। তাহারা অন্ধ আবেগ এবং তাহাদের মধ্যে কোন বিচার-বিবেচনা নাই। এই জন্মগত সহজ সংস্কারগুলির ভিত্তিতেই, অভিজ্ঞতা এবং বিচারের ফলে, মাধ্যমিক কর্মপ্রেরণাগুলির সৃষ্টি হয়। এ প্রেরণাগুলিরও উদ্দেশ্য কোন না কোন প্রাথমিক আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি, তবে এখানে কোন্ দ্রব্য বা কর্ম এই উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত, সেই বোধ থাকে। ক্ষুধাতৃপ্তির জন্য নির্বিচারে খাদ্যগ্রহণ হইল, প্রাথমিক প্রেরণাসঞ্জাত ক্রিয়া। কিন্তু জিহ্বার তৃপ্তির জন্য যখন বিশেষ কোন খাদ্য গ্রহণ করা হয়, তখন তাহা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ এবং এই ক্রিয়া মাধ্যমিক প্রেরণাসঞ্জাত। তিনি primary springs of actionকে Primary Propensions (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম ইত্যাদি), Primary Passions (রাগ, ভয় ইত্যাদি), Primary Affections (মাতৃস্নেহ, আত্মীয়-প্রীতি ইত্যাদি), Primary Sentiments (সৌন্দর্যবোধ, বিস্ময়, নীতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা)—এই চার ভাগে ভাগ করিলেন। অনুরূপভাবে Secondary springs of actionকেও Secondary Propensions (ভোজনবিলাস, খেলাধুলার আনন্দ), Secondary Passions (দ্বেষ, নিন্দা, সন্দেহ ইত্যাদি) এবং Secondary Sentimentsএ (জ্ঞানচর্চা, কলাচর্চায় আনন্দ, ধর্মানুষ্ঠানে আগ্রহ) ভাগ করিয়াছেন।

মার্টিন্যুর springs of action

প্রাথমিক সহজ প্রবৃত্তি-জাত ক্রিয়ার মধ্যে বিচার-বিবেচনা নাই

মাধ্যমিক কর্মপ্রেরণা

ইহার পর বিভিন্ন কর্মপ্রেরণার সংযোগে তিনি জটিলতর কর্মপ্রেরণার (compound springs of action) ব্যাখ্যা করিলেন।

জটিলতর কর্মপ্রেরণা

ইহার পর তিনি নৈতিক মূল্য হিসাবে সর্বনিম্নে রাখিলেন ঘৃণা, বিদ্বেষ ইত্যাদি Secondary passionsকে এবং সর্বোচ্চে স্থান দিলেন নৈতিক-বিচারপ্রসূত শ্রদ্ধাভক্তিকে।[১০] এবং তাঁহার মতে, কোন জটিল অনুভূতির নৈতিক মূল্য নির্ভর করে তাহার সরল উপাদানগুলির নৈতিক মূল্যের যোগফলের

সর্বোচ্চ স্থানে আছে নৈতিক বিচারপ্রসূত শ্রদ্ধাভক্তি

১০। The springs of action have a fixed and unalterable order of moral worth, and form a hierarchy of rank, rising one above another, in a scale of moral worth, from the secondary passions or acquired repulsions (malevolent impulses) at the bottom, to the moral sentiment or reverence at the top. Martineau—Types of Ethica Theory, Vol II, P. 230

উপরে।[১১] মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে যাহা জটিলতর, নৈতিক দিক হইলেও তাহার মূল্য উচ্চতর, মার্টিন্যু যে ভাবে বিভিন্ন অনুভূতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক সন্দেহ নাই, তবে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা অনুভূতিগুলিকে টুকরা টুকরা জোড়া দিয়া, অধিকতর জটিল অনুভূতির সৃষ্টি হয়, ইহা বিশ্বাস করেন না। এবং কোন অনুভূতির নৈতিক মূল্য যোগ-বিয়োগ দ্বারা স্থির করা যায়, এই মত নিতান্তই কৌতুকাবহ। তাহা হইলেও এই জন্যই এখানে মার্টিন্যুর মতের উল্লেখ করা হইল যে, নৈতিক আদর্শ অন্ধ অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ বোধের উপর নির্ভরশীল নয়, তাহা অভিজ্ঞতা ও বিচারের অপেক্ষা রাখে, ইহা মার্টিন্যুরও স্বীকৃত।

নৈতিক আদর্শ ধ্রুব, অপরিবর্তনীয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য—The Dianoetic theory—ক্লার্ক (Clarke) ও কাড্ওয়ার্থ (Cudworth) বিশেষভাবে এই মতকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

ক্লার্ক মনে করেন, কতগুলি দ্রব্যের সম্বন্ধ চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়, যেমন, আগুনের সঙ্গে উত্তাপের সম্পর্ক। বাহ্য জগতেও যেমন, বিভিন্ন সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও তেমনি অভ্রান্ত অপরিবর্তন বিধি আছে। চিন্তার জগতেও আবার তাই ৩×২র ফল, কোন অবস্থায়ই ৭ হইতে পারে না। অংশ কখনো সমগ্র হইতে বড় হইতে পাবে না; সমাজ-জীবনেও কতগুলি স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে,—যেমন পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নী, স্বামী-স্ত্রী। এই সম্বন্ধগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে কতগুলি কর্তব্য ও দায়িত্ব, কতগুলি নৈতিক অধিকার এবং ঋণ স্বাভাবিক ভাবে সংযুক্ত। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে জাগ্রত নীতিবুদ্ধি আছে, তাহা দ্বারাই আমরা জানিতে পারি—কোন্ সম্বন্ধে, কোন্ আচরণ সঙ্গত ও স্বাভাবিক।[১২] সমাজে আমরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন সম্বন্ধে যুক্ত, এবং প্রত্যেকেরই বিভিন্ন সম্পর্কে, বিভিন্ন অবস্থায়, কতগুলি নির্দিষ্ট কর্তব্য আছে, নির্দিষ্ট প্রাপ্য মর্যাদাও আছে। অন্যের প্রাপ্য মর্যাদা যদি কেহ লঙ্ঘন করে, নিজ কর্তব্যে অবহেলা করে, তাহা হইলে সে তাহার স্বধর্ম হইতে চ্যুত হয়। এই কর্তব্য এবং অধিকার সমাজ সৃষ্টি করে নাই, রাষ্ট্রও সৃষ্টি করে

ক্লার্ক, কাড্ওয়ার্থের নৈতিক আদর্শ ধ্রুব কিন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য

ইহা কোন বাহ্য শক্তির আদেশ নয়, স্বার্থবুদ্ধি-চালিত নয়

১১। ...Composite impulses can owe their moral worth and rank to nothing else than the constituents of their formation, and that worth must be proportioned to the aggregate value of these constituents.

Ibid—Vol. II, P. 235

১২। Morality depends on the fitness or unfitness of the relation in which we stand to each other and the rest of the universe.

নাই—এমন কি ইহারা ভগবানের আদেশনিরপেক্ষ। ইহারা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় এবং অভ্রান্ত। আগুনে হাত দিলে, যেমন হাত পুড়িবেই, তেমনি কর্তব্য অবহেলা করিলেও তাহার মার্জনা নাই। আমাদের আংকিক বিচারবুদ্ধি যেমন তৎক্ষণাৎ বলিয়া দেয়, ২×৩=৭ ইহা ভুল, তেমনি আমাদের অন্তরের নৈতিক বুদ্ধিও আমাদের তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দেয় যে, পরস্বাপহরণ মার্জনাহীন অন্যায়। এই বিচার অন্ধ অনুভূতি নয়, যদিও ইহা তৎক্ষণাৎ আমরা বুঝিতে পারি। আংকিক বিচার যেমন স্বচ্ছ বুদ্ধিগ্রাহ্য, নৈতিক বিচারও তাই। একদিকে যেমন নৈতিক আদর্শ **বাহ্য কোন শক্তির আদেশসৃষ্ট নয়,** তেমনি ইহা স্বার্থবুদ্ধি-চালিত নয়।[১৩] **লাভ-লোকসানের বিবেচনার ঊর্ধ্বে এই বিচার।** কিন্তু যদিও ইহা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি, তথাপি ইহা স্বচ্ছ বুদ্ধিচালিত বিচারের স্বগোত্র। এই জ্ঞানই আমাদের স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ দেয়, কোন্ সম্পর্কে এবং কোন্ অবস্থায়, কোন্ আচরণ সঙ্গত ও শোভন (fit and reasonable)। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট্‌ও মোটামুটি এই মত পোষণ করেন।[১৪]

কাড্‌ওয়ার্থ ইহা বিশ্বাস করেন যে ন্যায় ও অন্যায়ের প্রভেদ চিরন্তন। এই প্রভেদ ব্যক্তি-নির্ভর নয়, অবস্থা-নির্ভর নয়। এই প্রভেদ ঈশ্বরের আদেশের ফলে হয় নাই। সমাজ বা রাষ্ট্রের শাসনেও হয় নাই। ভগবানও এই প্রভেদকে লঙ্ঘন করিতে পারেন না—কারণ নীতিবত্তা তাঁহারই স্বভাব। সমস্ত আদর্শ, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত অস্তিত্বের তিনিই তো উৎস। মানুষ তাহার অন্তঃস্থিত নীতিবুদ্ধি, সেই উৎস হইতেই প্রাপ্ত হয়। মানুষের মধ্যে ভগবৎসত্তারই প্রতিফলন, তাই মানুষ তাহার নীতিবুদ্ধি দ্বারা সেই চিরন্তন নৈতিক ধারণা, আদর্শ, কর্তব্য স্পষ্ট করিয়াই জানিতে

১৩। "the *eternal and necessary differences make it fit and reasonable,* for creatures so to act; they cause it to be their duty or lay an obligation upon them so to do, even separate from the consideration of these rules being the positive will or command of God; and also antecedent to any respect or regard, expectation or apprehension of any private and personal advantage or disadvantage, reward or punishment."

১৪। The Greek Stoics had suggested that the moral law was both a law of nature and a law of reason......In the eighteenth century we find two schools of thoughts as to the laws underlying morality. For the one school, the moral law is a law of human nature to be revealed by study of man's psychological constitution... ..The other school emphasised the view that the moral law is a law of reason. We find this view in the Cambridge Platonists, Clarke and Wollaston, among English philosophers and in Kant, the German philosopher. Lillie—An Introduction to Ethics, P. 97

পারে। নৈতিক জীবনযাপন তাই অন্ধ অনুভূতির ফল নয়, ইহার ভিত্তি বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানের উপর। তাই কাড্‌ওয়ার্থের মতে সত্যজ্ঞান ও নীতিবুদ্ধি অবিচ্ছিন্ন।[১৫]

এই মতগুলির মধ্যে এই মূল্যবান সত্য আছে যে, নৈতিক আদর্শ কাহারও খেয়াল-খুসীর উপর নির্ভর করে না। আমাদের উপর কোন বাহ্যশক্তি ইহা চাপাইয়া দেয় না। নৈতিক আদর্শের ভিত্তি আমাদের অন্তঃস্থিত কল্যাণবুদ্ধি। তাহারা কোন সাময়িক বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় নয়। তাহাদেব মধ্যে এক চিরন্তনতা ও অভ্রান্ততা আছে বলিয়াই, নৈতিক আদর্শের দাবি অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। এই আদর্শকে লঙ্ঘন করিলে পীড়া বোধ কবি, কারণ তাহা আমাব অন্তঃপ্রকৃতিরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

অন্তর্দৃষ্টিবাদীরা নৈতিক আদর্শ কি ভাবে জানি তাহাবই আলোচনা কবিযাছেন ; কিন্তু সেগুলি কি তাহা আলোচনা কবেন নাই

(১) কিন্তু সমস্ত **অন্তর্দৃষ্টিবাদীদের মতের বিরুদ্ধে** এই কথা বলা চলে, যে **তাঁহারা নৈতিক আদর্শ বা মৌলনীতি (Moral Principles) কি ভাবে আমরা জানিলাম,** কি ভাবে আমরা বিশ্বাস করিলাম, **এই মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নেরই আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই মূলনীতি কি?** কি ভাবে, **কোন্ আদর্শ বা মাপকাঠি অনুযায়ী আমরা ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ করিব, সেই প্রধান প্রশ্নের উত্তর আমরা তাঁহাদের আলোচনায় পাই না।**[১৬]

নৈতিক আদর্শ সর্বদাই কোন শুভ উদ্দেশ্য সংসাধক

(২) নৈতিক আদর্শকে কেবল মাত্র অভ্রান্ত বিধি হিসাবে দেখিলে, তাহার শক্তি, বা আমাদের কাছে তাহার আনুগত্যের দাবি, উপযুক্তভাবে ব্যাখ্যাত হয় না। বিচারগ্রাহ্য শুভ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বলিয়াই, নৈতিক আদর্শকে আমরা মান্য করি। যদি বলা হয়, কোন বিশেষ সম্পর্কে, বা বিশেষ অবস্থায়, কোন আচরণ সঙ্গত এবং শোভন, তাহা হইলে প্রশ্ন থাকে কেন সেই বিশেষ অবস্থায় সেই

১৫। The distinctions of the good and evil are essential and eternal. These distinctions are independent of mere arbitrary will, whether human or divine. Human reason intrinsically discovers or apprehends the eternal truths, principles, categories or intelligible ideas which are universal, necessary, self-evident and unquestionable. In moral judgment we apply the principle or category apprehended through reason to a particular case. Cudworth—Eternal and Immutable Morality

১৬। The real question of Ethics is not as Intuitionists have stated and answered it: How do we come to know moral distnictions? But, what are these ideals—the single criterion which shall yield such distinctions? Seth—A Study of Ethical Principles, P. 182

আচরণ সঙ্গত ও শোভন? কোন কাজ সঙ্গত ও শোভন বলিয়াই, তাহা আমাদের নৈতিক কর্তব্য, ইহা না বলিয়া ইহাই বরং বলা উচিত, ইহা নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী বলিয়াই, ইহা সঙ্গত ও শোভন। এবং নৈতিক আদর্শ তাহাই হইতে পারে, যাহা আমাদের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক।[১৭]

অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ নয়, তাহাও বিচার দ্বারা সমর্থনের অপেক্ষা রাখে

(৩) যাহাকে অন্তর্দৃষ্টি বলা হইতেছে, তাহা অন্ধ অনুভব বা সহজাত সংস্কার নয়। তাই ক্লার্ক ও কাড্‌ওয়ার্থ দুজনেই স্বীকার করিয়াছেন,—দুজনেই বলিয়াছেন, ইহা বুদ্ধির বিচারের সগোত্র। কিন্তু তথাপি তাঁহারা নৈতিক বিচারকে বুদ্ধির বিচার হইতে পৃথক এক শক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মনের এ প্রকার পৃথক পৃথক শক্তির কল্পনা আধুনিক মনোবিদ্যার সম্পূর্ণ বিরোধী। মনের বহুবিচিত্রতা সত্ত্বেও, ইহা একই অখণ্ড শক্তি। নীতির বিচার এবং বুদ্ধির বিচারকে পৃথক করিয়া দেখা যায় না।

বিবেকের নির্দেশের মধ্যে বিরোধ

(৪) যে নৈতিক বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানকে আদর্শের মৌলনীতি বলা হইল, তাহাদের মধ্যেও কখনো কখনো বিরুদ্ধতা দেখা যায়। মাতৃস্নেহ ও দেশপ্রেম এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে,—পিতার প্রতি কর্তব্য এবং মাতার প্রতি কর্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য থাকিতে পারে। এ অবস্থায় অন্তর্দৃষ্টি সম্পূর্ণ অসহায়। মার্টিন্যু বিভিন্ন অনুভূতিকে নৈতিক মূল্য দিয়া উচ্চনীচ এ ভাবে সাজাইয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে পরস্পরের বিরোধের ক্ষেত্রে সর্বদাই উচ্চতর অনুভূতিকে মর্যাদা দান করিতে হইবে। জটিল মানব-সম্বন্ধের ক্ষেত্রে এমন ধরাবাঁধা নিয়ম দিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করা যায় না। মানুষ অংকশাস্ত্রের নির্ভুল নিয়ম দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে, কতগুলি নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ নির্দেশ থাকিলে সুবিধা হয় সত্য,—কিন্তু বিধিনিষেধের চেয়েও মানুষ অনেক বড়। বিচারবুদ্ধিগ্রাহ্য শুভ উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল, অল্প কয়েকটি আদর্শই শুধু স্বাধীন মানুষকে জটিল জীবনের পথ দেখাইতে পারে।

(৫) নৈতিক আচরণ নির্ধারণকালে শুধু কয়েকটি অভ্রান্ত চিরন্তন নীতিই একমাত্র মাপকাঠি,—সর্বক্ষেত্রে সর্ব অবস্থায় সেই মাপকাঠি দ্বারাই আচরণের

১৭। Fitness, in any sense in which it can serve as the basis of moral theories, must be the fitness for something i.e. it must involve some reference to some end or ideal. It is not fitness that makes an action moral, but it is its morality that makes it fit. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 176

ন্যায়-অন্যায় বিচার করিতে হইবে—ইহা তর্কশাস্ত্র অনুযায়ী দাবি হইতে পারে, কিন্তু মানুষের জটিল সমাজজীবনে সর্বদাই এই দাবি গ্রাহ্য নয়। মানুষের আচরণের ন্যায়-অন্যায় দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থা নিরপেক্ষ নয়। মিথ্যা কথা নৈতিক বিধিবিরুদ্ধ, তাই সর্বক্ষেত্রেই ইহা অন্যায়,—একথা ব্যতিক্রমহীন সত্য নয়। এমন অবস্থা কল্পনা করা কঠিন নয়, যখন রোগীর মঙ্গলের জন্যই চিকিৎসককে মিথ্যা কথা বলিতে হয়। এমন অবস্থাও অসম্ভব নয় যখন নরহত্যাও কল্যাণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্ষমণীয় হইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে আইন, নীতির ক্ষেত্রে, এই ব্যতিক্রম স্বীকার করিয়া লয়—নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য অনন্যোপায় হইয়া দুর্বৃত্তের প্রাণহনন করিলে, তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষের জন্যই আইন, বিধি, ব্যবস্থা—আইনের জন্য মানুষ নয়।[১৮] কাণ্টের আদর্শ আলোচনাকালে এ কথাটির বিশদ বিবেচনা প্রয়োজন হইবে।

চিরন্তন কয়টি নীতি দ্বারা সমস্ত আচরণের বিচার চলে না, অবস্থাও বিবেচনা করিতে হয়

সংক্ষিপ্তসার

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, নৈতিক ক্রিয়ার মাপকাঠি কোন ব্যক্তির শাসন নয়, ইহা অন্তরের অন্তর্দৃষ্টি। বিবেকই আমাদের বলিয়া দেয়, কোন্ কাজ ন্যায়, কোন্ কাজ অন্যায়। ইহার জন্য কোন বিচার-বিবেচনা-বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয় না।

ইঁহাদের মধ্যে একদল, বিবেককে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অনুরূপ বোধ বা অনুভূতি বলিয়া মনে করেন (moral sense theory, moral sentiment theory)। সিজউইক্ এই মতগুলিকে অ-দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টিবাদ বলিয়াছেন। এই মতগুলির বিশেষত্ব হইতেছে যে ইহারা মনে করেন, বিবেক বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকেই, তৎক্ষণাৎ কোন্ ক্রিয়া ন্যায় বা অন্যায়, তাহা বলিয়া দেয়। বিবেকের শাসন বিনা বিচারেই আমাদের আনুগত্য দাবি করে। অন্যায় করিলে তৎক্ষণাৎ ব্যক্তির অন্তরে অনুশোচনা হয়। কিন্তু বিবেক ব্যক্তিগত কল্পনানির্ভর নয়, ইহার অধিকার সার্বজনীন।

১৮। The view takes insufficient account of the circumstances in which an action is done. It is surely more wrong to tell a lie in giving evidence in a court than in describing one's fishing expolits in the smoke-room after dinner...one factor in making an action good is that, it fits the circumstancs in which it is done, perhaps in some unique moral way that can only be known by intuition. General intuitions can obviously take no account of this unique factor in particular actions.

Lillie—An Introduction to Ethics, P. 130

মানুষ বিচারসম্পন্ন জীব। তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ, অন্ধ ও বিচারবর্জিত হইতে পারে না। বিবেক যদি একটি প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়, তবে তাহা সার্বজনীন হইতে পারে না। মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধিগ্রাহ্য ও কোন শুভ উদ্দেশ্য সংসাধক হওয়া চাই।

শ্যাফটেস্‌ব্যরী ও রাস্কিনের মতে, নীতিবোধ বাস্তবিকপক্ষে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি বা রুচিবোধ। অন্যায় কাজ অসুন্দর, পীড়াদায়ক। ন্যায় কাজ সুষম, সুন্দর। ইঁহাদের মতকে Aesthetic school বলা হয়।

এ মত কিন্তু অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। দেশে, দেশে, কালে কালে, সৌন্দর্যের আদর্শ ভিন্ন। তা ছাড়া বাস্তবিকপক্ষে সূক্ষ্ম রুচি বিচার-বিশ্লেষণ ও শিক্ষাসাপেক্ষ।

হাচিসন্ ও শ্যাফ্‌টেস্‌ব্যরী সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে সমাজমঙ্গলকে যুক্ত করিয়া শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শকে কোন না কোন শুভ উদ্দেশ্য সাধক হইতে হইবে এবং তাহা বিচারগ্রাহ্য হইতে হইবে।

ব্যাসডাল মনে করেন, রুচিবোধ হইতে নীতিবোধ উচ্চতর মূল্যনির্দেশক।

এসব প্রত্যক্ষ বোধ বা অনুভূতি জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে পথ দেখাইতে পারে না, তখন বিশ্লেষণ, বিচার-বিবেচনা অবশ্য প্রয়োজন হয়।

বাট্‌লার, কাড্‌ওয়ার্থ প্রমুখ পণ্ডিতেরাও বিবেককে নৈতিক আদর্শ-নির্দেশক মনে করেন, কিন্তু তাহা বিচার-বিশ্লেষণ নিরপেক্ষ, একথা বলেন না। তাঁহারা বিবেককে যুক্তিনির্ভর বলিয়া মনে করেন, তাই সিজ্‌উইক এই মতগুলিকে দার্শনিক অন্তর্দর্শনবাদ বলিয়াছেন।

বাট্‌লারের মতে বিবেক যে পথ নির্দেশ করে, তাহা বিচারসঙ্গত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা ব্যক্তির স্বার্থানুসারী ও সুখবর্ধকও বটে।

মার্টিন্যু বিবেকরূপ নৈতিক আদর্শ-নির্দেশক শক্তি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক মনস্তত্ত্বের উপর স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মানুষের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও জটিলতর কর্মপ্রেরণা আছে। নৈতিক অনুভূতিপ্রসূত কর্মপ্রেরণা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। এই নৈতিক অনুভূতি অন্ধ নয়, তাহা বিচারভিত্তিক এবং শুভ উদ্দেশ্যমুখী।

ইঁহারা বিবেককে যেন বুদ্ধির বিচারশক্তি হইতে পৃথক আর একটি রহস্যময় উচ্চতর শক্তি হিসাবে মর্যাদা দিলেন। কিন্তু এ প্রকার পার্থক্য যুক্তিযুক্ত নয়।

ক্লার্ক, কাড্‌ওয়ার্থ এবং কান্টও বিবেককে বুদ্ধির বিচার অপেক্ষা উচ্চতর স্থান দিয়াছেন। ইহাদের মতে বিবেকের নির্দেশ বাহ্য শক্তির আদেশ নয়, স্বার্থবুদ্ধিচালিত নয়। সত্যজ্ঞান ও নীতিবুদ্ধি অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু তাহারা অভিন্ন নয়।

অন্তর্দৃষ্টিবাদীরা কিভাবে নৈতিক আদর্শের বোধ আমাদের অন্তরে জন্মিল তাহাই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু সেই আদর্শ কি তাহা নির্দেশ করেন নাই। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ শুভ উদ্দেশ্য সংসাধক হইতেই হইবে। কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্য শুভ, তাহা যুক্তি-বিচার দ্বারাই স্থির করিতে হইবে। নৈতিক বিচার কোন রহস্যময় উচ্চতর শক্তি, একথা স্বীকার করা যায় না।

কোন নৈতিক আদর্শই ধ্রুব, অপরিবর্তনীয়, এমন দাবি করা যায় না। মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশের জন্যই নৈতিক আদর্শগুলির মূল্য। মানুষের প্রয়োজন-নিরপেক্ষ আদর্শের কোন দাম নাই।

Questions

1. What are the chief characteristics of the Intuitionistic moral ideals? Critically discuss the theory of conscience as propounded by Butler or Clarke.

2. Discuss critically the views of those who regard conscience as a faculty superior to intellectual reason.

নবম অধ্যায়

সুখলাভই জীবনের উদ্দেশ্য—মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদ

Psychological Hedonism

[Ideal determined by the actual. Nature of Man. Psychological Hedonism—Pleasure & pleasures. Paradox of Hedonism. Hedonistic Calculus unworkable - wrong psychological analysis of voluntary action—Psychological Hedonism does not necessarily lead to Ethical Hedonism.]

বাহ্য কোন বিধি বা আইনকে নৈতিক আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ যে এ মতবাদগুলি কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিধি বা আইন মান্য করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ অন্ধ হুকুমকে তাহার জীবনের নিয়ন্তা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই এ প্রশ্নের সদুত্তর প্রয়োজন,— নৈতিক আচরণ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে? সে উদ্দেশ্য এমন হওয়া প্রয়োজন, যাহা আমাদের বিচারবুদ্ধি শুভ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

নৈতিক আদর্শ শুভ উদ্দেশ্যসাধক এবং বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে

এই প্রশ্নের একটি সদুত্তর ইহা হইতে পারে যে, সমস্ত আচরণের উদ্দেশ্য হইতেছে সুখলাভ। যাহা আমাদের সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করে, তাহাই স্বভাবতঃ আমরা কামনা করি, এবং এই মাপকাঠি দিয়াই আমরা আচরণের শুভাশুভ বা ন্যায়-অন্যায় বিচার করি। এই মতবাদের সাধারণ নাম প্রেয়োবাদ বা Hedonism (গ্রীক্ শব্দ Hedone হইতে। Hedone মানে সুখ—pleasure)।

প্রেয়োবাদীরা বলেন, জীবনের উদ্দেশ্য হইল সুখলাভ

কোন বস্তুর আদর্শ হইতেছে তাহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিকাশ। গোলাপ ফুলের আদর্শ, ছোট কুঁড়ি নয়, সদ্যপ্রস্ফুটিত সুগন্ধবিশিষ্ট গোলাপ ফুলটিই তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ। গোলাপ ফুলের আদর্শ আকাশের চাঁদ নয়, কারণ গোলাপ ফুলের প্রকৃতির মধ্যে এই সম্ভাবনা লুক্কায়িত নাই। কাজেই মানুষের আদর্শ সম্পূর্ণবিকশিত মানুষ। কিন্তু মানুষ কে? কি তাহার প্রকৃতি?

কোন বস্তুর প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিকাশই তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, একদল পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা বলেন যে মানুষ প্রাণী। প্রাণ যাহার আছে, তাহারই আছে প্রাণকে রক্ষার ও তাহার বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। প্রাণের বিকাশ হয় কিসে? হয়, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতে,—সুখ-ভোগে। আকাঙ্ক্ষার যেখানে পরিতৃপ্তি হওয়া সম্ভব নয়, সেখানে দুঃখ। সমস্ত প্রাণীর মতো মানুষের ধর্ম হইল, সুখের অনুসন্ধান—এবং দুঃখ নিরাকরণ। ইঁহারা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন। সুতরাং ইঁহাদিগের মতবাদকে Psychological Hedonism—বা মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদ বলা হয়। আধুনিক যুগে এই মতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি—মিল্ ও বেন্থাম্।

যাঁহারা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষ মূলতঃ প্রাণী ও সুখভোগের আকাঙ্ক্ষাই তাহার স্বভাব, তাঁহাদের মতকে Psychological Hedonism বলা হয়

আবার মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তা দ্বারাও হিউম্ প্রমুখ দার্শনিক অনুরূপ সিদ্ধান্তেই পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার মতে, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই মানুষের জ্ঞানের ভিত্তি। তেমনি অনুভূতির ক্ষেত্রেও ভাল-লাগা মন্দ-লাগার মূল হইতেছে ইন্দ্রিয়ানুভূতি। আর আছে ক্ষুধা তৃষ্ণা কামের মত ইন্দ্রিয়জ কতগুলি সহজ সংস্কার। ইহারাই হইল মানুষের জীবনের মূল উপাদান।

মানুষের সমস্ত মানসিক প্রকৃতি এই মূল উপাদান কয়টি হইতে সংযোগের নিয়ম (Laws of Association) অনুসারে গড়িয়া ওঠে। মানুষের বিচারবুদ্ধিও আছে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না। বিচারবুদ্ধি বাস্তবিক পক্ষে, ইন্দ্রিয়ানুভূতিরই দাস। ইহার কাজ হইতেছে কি করিয়া সব চেয়ে বেশী সুখ পাওয়া যাইতে পারে, তাহার উপায় নির্ধারণ করা, ইংরেজী দর্শনে হবস্ (Hobbes) এই মত ইতিপূর্বে খোলাখুলি প্রচার করিয়াছিলেন যে, মানুষ সর্বদাই স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতে সুখ,—অতৃপ্তিতে দুঃখ। যাহা মানুষকে সুখ দেয়, তাহাতে তাহার স্বার্থ আছে। সেই স্বার্থ-সিদ্ধিতেই তাহার শুভ। প্রত্যেক মানুষের শুভ তাহার নিজ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। চিরন্তন শুভ বলিয়া কিছু নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষার কোন শেষ নাই, এবং সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তিও মানুষ কখনো লাভ করিতে পারে না।[১]

বিচারবুদ্ধি ইন্দ্রিয়ানুভূতির দাস

যাহারা মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে উপরোক্ত বা অনুরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহাদের সকলকেই মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদী (Psychological Hedonists)

১। Selection of Hobbes's writings--by Woodbridge, P. 43

বলা হয়। আবার যাঁহারা বলেন, সুখের সন্ধান, আনন্দের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিই মানুষের আচরণের শ্রেষ্ঠতার মাপকাঠি বা আদর্শ, তাঁহাদের নীতিগত প্রেয়োবাদী (Ethical Hedonists) নাম দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা নীতিগত ভাবে প্রেয়োবাদকে গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদের ভিত্তিতেই নৈতিক আদর্শকে স্থাপন করেন। একথা যদি স্বীকৃত হয় যে, মানুষের প্রকৃতিই হইতেছে সুখ আকাঙ্ক্ষা, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে মানুষের আদর্শ বা উদ্দেশ্য হইল, সব চেয়ে বেশী সংখ্যায়, এবং সব চেয়ে বেশী পরিমাণে সুখ সংগ্রহ করা এবং সব চেয়ে কম দুঃখ পাওয়ার জন্য চেষ্টিত হওয়া।[২]

আর যাঁহারা বলেন এই সুখ অন্বেষণই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাঁহাদের মতকে বলা হয় Ethical Hedonism

আধুনিক কালে বেন্থাম্ ও মিল্ মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদের বক্তব্য খুব স্পষ্টভাবেই উপস্থাপিত করিয়াছেন। বেন্থাম্ বলিয়াছেন, "প্রকৃতি মানুষকে দুই সম্রাটের শাসনাধীন করিয়াছে—ইহারা হইতেছে সুখ ও দুঃখ। তাঁহারাই কেবলমাত্র নির্দেশ দিতে পারে কি কাজ আমরা করিব, এবং কি কাজ আমাদের কর্তব্য। সুখ ও দুঃখই হইতেছে মানুষের সমস্ত কাজের প্রেরণার মূল, এবং সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য।"[৩]

বেন্থাম্

মিলের বক্তব্যও সমান সুস্পষ্ট : "কোন জিনিস আকাঙ্ক্ষা করা এবং তাহা বাঞ্ছনীয় বোধ করা, কোন জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করা, এবং ক্লেশকর বোধ করা, এই দুইই পরস্পর অচ্ছেদ্য—অথবা বলা যায়, তাহারা একই ঘটনার দুটি অংশ।"[৪] কাজেই তিনি সিদ্ধান্ত করিতেছেন, সুখই সর্বদা আমাদের কাম্য—সুখই আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার উদ্দেশ্যবস্তু।

মিল্

সমালোচনা—এই মতবাদ সাধারণ বুদ্ধিতে সত্য মনে হইলেও, ইহা কতগুলি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ইহা দেখাইয়াছেন যে, সুখ আমাদের উদ্দেশ্যবস্তু নয়, এবং সুখের আকাঙ্ক্ষাই কর্মের প্রেরণা নয়। অভাববোধ হইতে, আমরা সেই অভাব পরিপূরণে সমর্থ কোন দ্রব্যকে আকাঙ্ক্ষা করি। সেই আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য যখন লাভ করি, তখন অবশ্যই সুখ বোধ করি। কাজেই

সুখের আকাঙ্ক্ষাই কর্মের প্রেরণা নয়

২। MacKenzie-A Manual of Ethics. P. 210

৩। "Nature has placed man under the empire of pleasure and pain. His only object is to seek pleasure and to shun pain...it is for them alone to point out what we ought to do, as well as what we shall do." Bentham.

৪। Desiring a thing and finding it pleasant, aversion to it and thinking of it as painful, are phenomena entirely inseparable, rather, two parts of the same phenomenon. Mill—Utilitarianism

সুখের আকাঙ্ক্ষা হইতে আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই, একথা সত্য নহে। **সুখের আকাঙ্ক্ষাই কর্মের প্রেরণা নয়।** সুখ আসে, কর্মে সাফল্যের অন্তে। কর্মে প্রবৃত্ত হইবার গোড়াতেই সুখের আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রলুব্ধ করে, ইহা সাধারণতঃ সত্য নয়। খেলাধূলা বা জীবনের অধিকাংশ কাজের গোড়াতে সুখের আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে থাকে না। যখন ক্ষুধার্ত হই, তখন কতটা সুখ পাইব, এই হিসাব করিয়া, ভাত খাইতে বসি না। ক্ষুধা বা খাদ্যের অভাববোধই দ্রব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করে,—তাহাই কর্মে প্রবৃত্ত করায়।

সুখ পাইব এই হিসাব করিয়া সংসারে অধিকাংশ কাজ করা হয় না

আবার এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায় যে, যেখানে সুখের আকাঙ্ক্ষায়ই সুখের পশ্চাদ্ধাবন করি, তখন সুখ আলেয়ার মত মিলাইয়া যায়। **সুখ পাইতে হইলে, সুখকে ভুলিতে হয়।** ইহা খুবই সদুপদেশ, "কর্তব্য করিয়া যাও, সুখের অনুসরণ করিও না, সুখই তোমার অনুসরণ করিবে।" ইহাকেই বলে প্রেয়োবাদের আপাতবিরোধ—**Paradox of Hedonism.**

সুখ চাহিলে সুখ পাওয়া যায়না—**Paradox of Hedonism**

বাস্তবিক সুখ বা Pleasure কথাটির মধ্যে দ্ব্যর্থতা আছে; সুখ বলিতে সুখের অনুভূতি (agreeable feeling) যেমন বোঝায়, তেমনি সুখ-উৎপাদক দ্রব্যকেও বোঝায়। সাধারণতঃ ইংরাজীতে pleasures কথাটি বহুবচনে সুখ-উৎপাদক দ্রব্যকে বোঝায়, এবং ইহা অবশ্যই সত্য যে, এই প্রকার দ্রব্য আমাদের ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। তাই ইংরেজীতে বলি, We seek pleasures। কিন্তু একবচনে pleasure কথায় সুখানুভূতি বোঝায়। ইহা সত্য নয় যে সুখানুভূতি লাভই আমাদের সমস্ত উদ্যমের উদ্দেশ্য। তাই ম্যাকেঞ্জী বলিয়াছেন, **"the fact that we desire pleasures is no evidence that we desire pleasure".**

'সুখ' কথাটি দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জক; ইহা মানসিক অবস্থাও বুঝায় এবং এবং উদ্দেশ্যবস্তুও বুঝায়

যখন আমরা কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করি, তখন ইহা অবশ্যই সত্য যে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে সুখানুভূতি লাভ করি। সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণই সুখকর। কিন্তু তাহা হইতে একথা বলা চলে না যে, সুখানুভূতির আশায়ই সব বস্তুকে আকাঙ্ক্ষা করি। আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়াই কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য কল্পনায় সুখকর। কিন্তু ইহা সর্বদা সত্য নয় যে, কল্পনায় সুখকর বলিয়াই, দ্রব্যটি আকাঙ্ক্ষা করি।

আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে সুখ হয়, কিন্তু সুখের আকাঙ্ক্ষাই কর্মের হেতু নয়

মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদ চেষ্টিত কর্ম সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকে, তাহা মনস্তত্ত্বের দিক হইতে ভ্রান্ত।[৫] প্রেয়োবাদীদের মতে সুখ আকাঙ্ক্ষাই (desires) মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করায়। যখন মানুষের সম্মুখে একটি মাত্র তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, তখন মানুষ সেই আকাঙ্ক্ষার অনুসরণে কর্ম করে। কিন্তু কখনো কখনো মানুষের সামনে একাধিক বিপরীত আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত থাকে। তখন এই বিপরীত আকাঙ্ক্ষাগুলির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তখন এই আকাঙ্ক্ষাগুলি ব্যক্তিকে বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ করে, এবং যে আকাঙ্ক্ষা বলবত্তম তাহাই জয়যুক্ত হয়,—অর্থাৎ ব্যক্তি সেই তীব্রতম আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ীই কাজ করে। এই বিশ্লেষণ যথেষ্ট নাটকীয়, কিন্তু ইহা সত্য নয়। আকাঙ্ক্ষাগুলিই সক্রিয় শক্তি এবং ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় দর্শক, এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষ আকাঙ্ক্ষাগুলির দাস এবং সর্বদা তাহাদের দ্বারাই চালিত হয়, এ মত ভ্রান্ত। ব্যক্তি কোন আকাঙ্ক্ষাকে নির্বাচন করে বলিয়াই, তাহা বলবতী হয়। আমরা নিজের অন্তরে তাকাইয়া (introspection) যখন নিজ মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করি, তখন নিজ স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হই। আমরা বোধ করি, আকাঙ্ক্ষাগুলিকে আমরাই চালনা করি। এই স্বাধীন ইচ্ছা সম্পর্কে আমাদের প্রত্যয় আছে বলিয়াই মানুষ অন্যায় কাজের জন্য অনুশোচনা বোধ করে। চেষ্টিত ক্রিয়ার বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে এ সম্বন্ধে পূর্বে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রেয়োবাদ চেষ্টিত ক্রিয়ার যে বিশ্লেষণ দেয় তাহা ভ্রান্ত। আকাঙ্ক্ষা আমাদের "চালনা করে না, আমরাই আকাঙ্ক্ষাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করি

যখন খেলাধূলা করি, বিদ্যার্জন করি, অর্থোপার্জনে মন দেই—সর্বক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যের অনুসরণেই আনন্দ (pleasure of pursuit)। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে কি সুখ হইবে, কতটা সুখ হইবে, সে চিন্তা গৌণ। কাজেই আমাদের জীবনের অধিকাংশ কাজই প্রত্যক্ষভাবে সুখের অনুসরণে (pursuit of pleasure) নয়। মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদীরা মানুষকে যতটা 'হিসাবী' বলিয়া কল্পনা করেন, বাস্তবিক পক্ষে কোন মানুষই ততটা নয়। ইহা নিশ্চয়ই সত্য নয় যে, আমাদের মনের পকেটে সর্বদাই

৫। There is undoubtedly pleasure in the satisfaction of all desire. But that is a very different thing from asserting that the object is desired because it is thought of as pleasant, and in proportion as it is thought of as pleasant. The hedonistic psychology involves a hysteron proteron; it puts the cart before the horse. In reality, the imagined pleasantness is created by the desire, and not the desire by the imagined pleasantness. Rashdall—A Theory of Good & Evil, Vol. I, P, 15

খাতা ও পেন্সিল থাকে এবং কোন কাজ করিবার আগেই, আমরা হিসাব করিতে বসি; কতটা সুখ বা কতটা দুঃখ সেই কাজের ফলে পাইতে পারি। আর সুখ-দুঃখের সূক্ষ্ম হিসাব কি নিক্তির ওজনে করা যায়? তাই এ কথা বলা যায় যে, মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদীদের হিসাবের খাতার ধারণাটি খুব সত্য নয়—The hedonistic calculus does not work.

হিসাব করিয়া সুখের পরিমাণ নির্ধারিত হয় না

যাঁহারা প্রেয়োবাদকে নৈতিক আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদের ভিত্তিতেই তাঁহাদের মতকে স্থাপন করেন। এ বিষয়ে মিলের কুযুক্তিটি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মিল বলিয়াছেন, কোন দ্রব্য বাঞ্ছনীয় কিনা, তাহার একমাত্র প্রমাণ হইল যে মানুষ বাস্তবিক পক্ষে সেই দ্রব্যকে বাঞ্ছা করে।[৬]

নৈতিক আদর্শ হিসাবে প্রেয়োবাদের ভিত্তি মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদ

এখানে যুক্তির মধ্যে যে ফাঁকিটি আছে, তাহা এই,—'visible' কথার মানে হইতেছে, যাহা দেখা যায়, 'audible' কথার মানে হইতেছে, যাহা শোনা যায়, কিন্তু desirable কথার মানে হইতেছে যাহা আকাঙ্ক্ষা করা যায়,—যাহা আকাঙ্ক্ষা করা উচিত, যাহা বাঞ্ছনীয় বা কাঙ্ক্ষণীয় নয়। যাহা চোখে বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায়, তাহা visible, যাহা বাস্তবিক কানে শোনা যায়, তাহা audible, সুতরাং তাঁহার যুক্তি হইল, যাহা desire করা হয় (যাহা আকাঙ্ক্ষা করি), তাহাই desirable (যাহা আকাঙ্ক্ষা করা উচিত)! কোন পাপ কার্য না মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে? চোর পরের ধন আকাঙ্ক্ষা করে, লম্পট পরস্ত্রী আকাঙ্ক্ষা করে, প্রবঞ্চক পরের সম্পত্তি অপহরণের উদ্দেশ্যে অন্যকে প্রতারণা করে। কিন্তু তাই বলিয়া কি বলা যায়, যে এই কার্যগুলি বাঞ্ছনীয়?

যাহা আকাঙ্ক্ষা করি তাহাই কাঙ্ক্ষণীয় নয়

বাস্তবিক পক্ষে, ইহা যদি স্বীকৃতও হয় যে সুখের আকাঙ্ক্ষায়ই মানুষ সব সময় কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও ইহা প্রমাণিত হয় না যে, সুখ কামনা করাই মানুষের পক্ষে আদর্শ, ইহাই তাহার পক্ষে করা উচিত।

৬। এই যুক্তিটি উপমাত্মক এবং তাহার প্রকৃত তাৎপর্য বাংলায় প্রকাশ সম্ভব নয়, তাই ইংরেজিতে তাহা দিতেছি—"The only proof capable of being given that an object is visible, is that people actually see it. The only proof that a sound is audible, is that people hear it...In like manner, I apprehend, the sole evidence it is possible to produce that anything is desirable, is that people do actually desire it."

Mill - Utilitarianism

আমাদের নিজের মন যদি বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলেও দেখি, যখন কাজে প্রবৃত্ত হই, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সুখের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টভাবে মনের সামনে থাকে না। যখন ভোজনে প্রবৃত্ত হই, অথবা ব্যায়াম করি, অথবা সঙ্গীত শুনিতে আকাঙ্ক্ষা করি, তখন মন আকাঙ্ক্ষার বস্তুর কথাই ভাবে, তাহার প্রাপ্তিতে কি সুখ হইবে একথা ভাবে না।

প্রেয়োবাদের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি দুর্বল

মানুষ এতবড় স্বার্থপর নয় যে নিজের সুখের কথাই সে সব সময় চিন্তা করে। এমন কি ইতর জন্তুও সন্তানের জন্য স্বার্থত্যাগ করে, দুঃখ বরণ করে, এমন কি মৃত্যুর জন্যও অকাতরে প্রস্তুত হয়। মানুষের বেলায় তো একথা আরো সত্য। মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদীরা বলিবেন যে, মায়ের স্বার্থত্যাগ বাস্তবিক পক্ষে নিঃস্বার্থ নয়। মা সন্তানের নিকট ভবিষ্যৎ প্রতিদানের আশায়, অথবা প্রতিবেশীদের নিন্দার ভয়ে, অথবা "আমি কত ভাল, সন্তানের জন্য কত দুঃখ, ভোগ করিতেছি", এই প্রকার আত্মতৃপ্তি লাভের জন্য হয়তো দুঃখবরণ করেন। এ প্রকার ব্যাখ্যা অসম্ভব বলি না। কিন্তু নিশ্চয়ই এই সমস্ত ব্যাখ্যা অপেক্ষা, ইহাই সহজতর ব্যাখ্যা যে, মানুষ, এমনকি ইতর প্রাণীর মধ্যেও অন্যের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থপর—ইহা যতটা সত্য, মানুষ স্বভাবতঃ নিঃস্বার্থপর—ইহাও তাহার চেয়ে কম সত্য নয়। মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদ মানিলে, ইহা মানিতে হয় যে, পশুরাও সুখের আকাঙ্ক্ষা হইতে, সম্ভাব্য সুখ-দুঃখের হিসাব নিকাশ করিয়া কাজ করে। ইহা নিশ্চয়ই সত্য নয়।

স্বার্থবুদ্ধিই মানুষের, এমন কি পশুরও সমস্ত কর্মের মূল নয়

বহু মানুষ, অনেক সময় সুখের আকাঙ্ক্ষায় কাজ করে ইহা অস্বীকৃত নয়। কিন্তু **মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদীদের ইহা প্রমাণ করা প্রয়োজন যে, সব মানুষ, সব সময়, কেবলমাত্র সুখের আকাঙ্ক্ষা হইতেই কাজ করে**—ইহা ভিন্ন আর কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কোন বুদ্ধিমান্ মানুষই একথা স্বীকার করিবেন না।[৭]

সব মানুষ, সব সময় কেবলমাত্র সুখের আকাঙ্ক্ষা হইতে কাজ করে, ইহা সত্য নয়

সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা কোন জিনিস যখন আকাঙ্ক্ষা করি, তখন সে জিনিস আমাদের সুখ দিবে এজন্য তাহা আকাঙ্ক্ষা করি না। তাহাদের আকাঙ্ক্ষা করি বলিয়াই, তাহাদের প্রাপ্তিতে সুখ হয়। আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী কাজ করি, সেই জন্যই আমরা স্বার্থপর, প্রেয়োবাদীদের

৭। Lillie—An Introduction to Ethics, P. 36-37

একথা সত্য নয়। আমরা প্রতিবেশীর মেয়েটির রোগারোগ্য কামনা নিঃস্বার্থভাবেই করিতে পারি।[৮] মানুষ সর্বদা স্বার্থের হিসাব করিয়াই চলে, ইহা খুব কম মানুষের পক্ষেই সম্পূর্ণ সত্য।

সংক্ষিপ্তসার

যে কোন যুক্তিযুক্ত আদর্শ কোন না কোন শুভ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হওয়া চাই। শুধু মাত্র কোন হুকুমকে মানুষ নৈতিক আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে না।

প্রেয়োবাদীরা সাহস করিয়া বলেন যে, সুখলাভ একটি যুক্তিসঙ্গত শুভ উদ্দেশ্য। এই শুভ উদ্দেশ্য সাধনই মানুষের ক্রিয়ার আদর্শ।

মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। প্রেয়োবাদীরা বলেন, অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষও জীব এবং সমস্ত জীবেরই ইহা প্রকৃতি যে সে সুখ অন্বেষণ করে, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি খোঁজে। বিচারবুদ্ধি বাস্তবিক পক্ষে সুখ অন্বেষণে সহায়ক বলিয়াই মূল্যবান। যাঁহারা মানুষের প্রকৃতির এ প্রকার বিশ্লেষণ দ্বারা সুখভোগের আকাঙ্ক্ষাকেই মানুষের স্বভাব বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহাদের মতকে মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদ বা Psychological hedonism বলা হয়। এই মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা বলেন যে আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিই জীবনের নৈতিক আদর্শ, তাঁহাদের মতকে Ethical hedonism বলা হয়।

মিল্ ও বেন্থাম্ দুই জনেই মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদের মূল বক্তব্য খুব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; তাহা হইল এই যে মানুষ সব কাজের মধ্য দিয়াই সুখ আকাঙ্ক্ষা করে। সুখের আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখের প্রতি বিরূপতা মানুষের সমস্ত কাজের মূল প্রেরণা। সুখই সর্বদা আমাদের কাম্য, সমস্ত ক্রিয়ার উদ্দেশ্য।

সুখের আকাঙ্ক্ষা হইতেই সমস্ত কর্ম শুরু হয়, ইহা সত্য নয়। সুখ পাইব এই হিসাব করিয়াই অধিকাংশ কাজ করিতে বসি, ইহা সত্য নয়। 'সুখ' (pleasure) কথাটি দ্ব্যর্থবাচক ইহা দ্বারা একটি মানসিক অবস্থাও বুঝায় অথবা একটি উদ্দেশ্যবস্তুও বুঝায়। আমরা সুখের বস্তু আহরণের জন্য কর্ম করি সত্য, কিন্তু সুখরূপ মানসিক অবস্থা লাভ করিব, এমন আশা করিয়া সব কাজ করি না—We desire pleasures, but do not desire pleasure.

ইহা মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রমাণ যে, সুখের আকাঙ্ক্ষা হইতে কাজ করিলে সুখ পাওয়া যায় না। সুখ পাইতে হইলে সুখকে ভুলিতে হয়। ইহাকেই paradox of hedonism বলে।

আমরা যখন কাজ করি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তখন কতখানি সুখ পাওয়া যাইবে, তাহা চিন্তা করি না: উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে সুখ হয় সত্য, কিন্তু সুখের আকাঙ্ক্ষাই আমাদের কর্মের হেতু নয়।

৮। Broad—Five Types of Ethical Theory, P. 102

প্রেয়োবাদ বলে যে, যখন একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা মনকে আকর্ষণ করে, তখন তাহার অনুসরণেই ব্যক্তি কাজ করে। যখন একাধিক বিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা একই সময়ে মনের মধ্যে উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা (a tug of war) চলিতে থাকে। অবশেষে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আকাঙ্ক্ষাই জয়যুক্ত হয়। এই মত অনুসারে, ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষাগুলির দাস। আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই সে চালিত হয়। ব্যক্তি নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র। আকাঙ্ক্ষাগুলিই কর্মের শক্তি ও মূল প্রেষণা।

এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ভ্রান্ত। ব্যক্তিই শক্তির মূল, সে-ই কর্তা। আকাঙ্ক্ষাগুলিকে ব্যক্তিই চালনা করে। তাহাদের মধ্যে কোন্ আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, ব্যক্তিই তাহা বিচার-বিবেচনা দ্বারা নিজ চরিত্র অনুযায়ী তাহা স্থির করে। ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষার দাস নয়, নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্রও নয়।

মানুষের জীবন এত জটিল যে, সুখের পরিমাণ আগে হিসাব করা কখনই সম্ভব নয়। কাজেই সুখের পরিমাণ আগে হিসাব করিয়া আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই, ইহা সত্য মত নয়।

মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদই সমস্ত নৈতিক প্রেয়োবাদের (Ethical hedonism) ভিত্তি। নৈতিক প্রেয়োবাদ বলে, সুখলাভই সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। উহাই মানুষের নৈতিক আদর্শ—Man ought always to desire pleasure.

মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ভ্রান্ত। এবং ইহা সত্য হইলেও ইহার সহিত নৈতিক প্রেয়োবাদের অবশ্য ও নিয়ত সম্বন্ধ নাই। ইহা যদি সত্যও হয় যে আমরা সর্বদা সুখ আকাঙ্ক্ষা করি, তথাপি ইহা প্রমাণিত হয় না যে সুখ আকাঙ্ক্ষা করাই আমাদের উচিত। মিল্ এই অদ্ভুত যুক্তি দিয়াছেন যে, কোন দ্রব্যকে আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে ইহা কাঙ্ক্ষণীয়, ইহা আকাঙ্ক্ষা করিবার যোগ্য। এই যুক্তি হাস্যকর।

মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদ ইহা বিশ্বাস করে যে মানুষ সুখাকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ স্বার্থবুদ্ধি হইতেই সমস্ত কাজ করে। কিন্তু ইহা সত্য নয়। এমন কি ইতর প্রাণীও নিঃস্বার্থভাবে অনেক কাজ করে। মানুষ স্বার্থপর ইহা যতটা সত্য, মানুষ নিঃস্বার্থপর ইহা তার চেয়ে আরো বেশী সত্য।

Questions

1. What is Psychological Hedonism? Distinguish between Psychological Hedonism and Ethical Hedonism. Is there a necessary connection between the two?

2. What are the arguments in favour of Psychological Hedonism? Critically examine them.

3. What is the Paradox of Hedonism? Does it disprove Psychological Hedonism? Discuss.

4. Critically explain the statement "the fact that we desire pleasures is no proof that we desire pleasure."

দশম অধ্যায়

দার্শনিক প্রেয়োবাদ—ইন্দ্রিয়সুখই আদর্শ

Ethical Hedonism—Gross

[Pursuit of happiness, the ethical Ideal—Pleasures of the body—satisfaction of the Self—Aristippus, Charvaka, Omar Khayyam—Sensibility untroubled by reason—Life is momentary—wisdom lies in the enjoyment of the present moment—Criticism.]

সুখলাভই জীবনের নৈতিক আদর্শ—Ethical Hedonism

যাঁহারা সুখকেই জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন—তাঁহারা ইহাই প্রমাণ করিতে চান যে, মানুষ সর্বদা সুখ আকাঙ্ক্ষা করে, ইহাই তাহার স্বভাব, সুতরাং সুখলাভই তাহার সকল কর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ইহাই মানুষের আচরণের নৈতিক মাপকাঠি; যদি কোন আচরণের ফল হয় আনন্দদায়ক, তবেই কাজটি শুভ ও ন্যায়। যদি কোন আচরণের ফল হয় অপ্রীতিকর, দুঃখজনক, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাজ্য,—তাহা করা উচিত নয়।

মানুষের পক্ষে সুখই জীবনের আদর্শ

প্রশ্ন হইতে পারে, এ সুখ কি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির, না উচ্চতর কোন বৃত্তির তৃপ্তির। যাঁহারা সাহস করিয়া বলেন, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিই জীবনের উদ্দেশ্য—তাঁহাদের বলা হয় স্থূল প্রেয়োবাদী—Gross Hedonists। কিন্তু যাঁহারা বলেন, সূক্ষ্মতর আত্মিক তৃপ্তিই জীবনের উদ্দেশ্য, তাঁহাদের বলা হয় মার্জিত প্রেয়োবাদী—Refined Hedonists।

ইন্দ্রিয়সুখের তৃপ্তিই সমস্ত আচরণের মাপকাঠি—স্থূল প্রেয়োবাদ বা Gross hedonism

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, কাহার সুখটা উদ্দেশ্য,—ব্যক্তির নিজের, না সমাজের অপরের? একদল নির্লজ্জ ভাবেই বলিয়াছেন, আমার নিজের সুখলাভই উদ্দেশ্য; ইঁহারা হইলেন, আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদী (Egoistic Hedonists)। অধিকাংশ আধুনিক প্রেয়োবাদী অবশ্য বলেন যে, সমস্ত আচরণের উদ্দেশ্য,—বহুজনের সুখ,—সমাজের কল্যাণ। ইঁহারা হইলেন পরসুখবাদী—Altruistic Hedonists। সাধারণতঃ স্থূল প্রেয়োবাদীরা, আত্মকেন্দ্রিক সুখবাদী। পরসুখবাদীদের মধ্যে একদল স্থূল প্রেয়োবাদী, অন্যদল মার্জিত প্রেয়োবাদে বিশ্বাসী।

নিজসুখই কাম্য—egoistic hedonism

স্থূল আত্মসুখবাদ—Gross Egoistic Hedonism—সুখই যখন মানুষের কাম্য, তখন যে সুখের আকাঙ্ক্ষা জীবকে পাগল করে—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সুখই অনুসরণীয়। আর সুখ চাই মানেই হইল, আমার নিজের সুখ চাই। অ্যারিস্টিপ্পাস্ প্রাচীন গ্রীস্ দেশে, এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। প্রাণী যেখানে হৃদয়াবেগ অনুসরণ করিয়া চলে, সেখানেই সে সম্পূর্ণ সুখী। কিন্তু মানুষের বিচারবুদ্ধি তাহার সুখের পথে কণ্টক, এই বিচারবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ানুভূতির হাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই সর্বাপেক্ষা অধিক তৃপ্তি। ধার্মিক এবং পুরোহিতেরা মিথ্যাই মানুষকে স্বর্গের লোভ, এবং নরকের ভয় দেখান। এই স্বর্গ-নরক কে দেখিয়াছে? তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? এই বর্তমান মুহূর্তেই আমার নিশ্চিত অধিকার,—পরমুহূর্তে যে বাঁচিয়া থাকিব, তাহা কে বলিতে পারে? পদ্মপত্রে নীর যেমন অস্থির ও অস্থায়ী, "তদ্বদজীবনমতিশয়চপলম্"। কাজেই বর্তমান মুহূর্তে যে সুখ আমার আয়ত্তের মধ্যে আছে, তাহা ভোগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন, হিসাব করিয়া, সাবধানে চল, কিন্তু যতক্ষণ হিসাব করিব, ততক্ষণ যে অস্থির জীবন-যৌবন মুহূর্তে মুহূর্তে ক্ষয় হইয়া যাইবে। আমরা বহমান কালের সন্তান; অনন্তকাল আমাদের হাতে নাই, তাই কৃপণের মতো, সাবধানী, ভবিষ্যৎ-ভয়ে ভীত কাপুরুষের মতো বাঁচিয়া লাভ কি? এই মুহূর্তে যাহা নগদ পাওয়া যায়,—তাহাই আকণ্ঠ ভোগ করিয়া লও। সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন, সুখের শ্রেণীবিভাগ আছে—চিন্তা, বিচার, ধ্যানের সুখ মহত্তর,—দীর্ঘতর তাহার স্থায়িত্ব। কিন্তু অ্যারিস্টিপ্পাস্ বলিলেন, সব সুখেরই এক দাম, বরঞ্চ ইন্দ্রিয়জ সুখ তীব্রতর এবং তৎক্ষণাৎ-লভ্য। তাহা ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সুখের জন্য, যে নিজেকে বর্তমানে সুখভোগ হইতে বঞ্চিত করে, সে নিতান্ত নির্বোধ—নিতান্তই কৃপার পাত্র।[৯]

অ্যারিস্টিপ্পাস: হৃদয়াবেগ অনুসরণ করিয়া চলিলেই মানুষ প্রকৃত সুখী হইতে পারে

বিচার-বিবেচনা সুখের পক্ষে বাধা

জীবন অস্থির, চঞ্চল

বর্তমান মুহূর্তকে পরিপূর্ণ ভোগই বুদ্ধিমানের কাজ

ইন্দ্রিয়সুখই তীব্রতম ও সহজলভ্য

৯। The chief and only good of life ..is pleasure. And all pleasures are alike in kind, they differ only in intensity or degree. Socrates had taught that the pleasures of the soul are preferable to those of the body ; Aristippus finds the latter to be better, that is intenser, than the former... his scepticism of the future, in comparison with the certainty of the present, led him to reject the Socratic principle of calculation. If the momentary experience is the only certain reality, then the calculating wisdom of

অনুরূপ আদর্শ ভারতবর্ষে চার্বাক অ্যারিস্টিপ্পাসের বহুপূর্বে প্রচার করিয়াছিলেন। চার্বাকের, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতম্ পিবেৎ, যাবজ্জীবেৎ সুখংজীবেৎ—ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুত?" শ্লোক কে না জানে? স্বর্গ, নরক এই সব পুরোহিতদের কল্পনা মাত্র—মৃত্যুর পর দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেলে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না—কাজেই "Eat drink and be merry for tomorrow we may die"। চার্বাক আরো বলিয়াছেন, অবিমিশ্র সুখ কোথায়ও পাওয়া যায় না। দুঃখকে সম্পূর্ণ এড়াইতে আমরা পারিব না। তাই বলিয়া কাঁটার ভয়ে গোলাপ ফুল তুলিতে কুন্ঠিত হইব? ইহা শুধু নির্বোধেই করে। শুধু দেখিতে হইবে, অনাবশ্যক দুঃখভোগ যেন না করিতে হয়। সুখ জীবনের অনুকূল, দুঃখ জীবন-ক্ষয়কারী, তাই যথাসম্ভব দুঃখকে পরিহার করিতে হইবে।

চার্বাক

পারস্য দেশের কবি ওমর খৈয়ামের নামের সঙ্গেও এই ইন্দ্রিয়-ভোগবাদ জড়িত হইয়া আছে,—যদিও বর্তমানে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে সুরা-সাকীর স্বপ্নে বিভোর খৈয়ামের এই চিত্র, তাঁহার দার্শনিক মতামতের অত্যন্ত বিকৃত প্রতিফলন। 'কিন্তু ফিটজেরাল্ডের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈযাম এর অনুবাদ ইয়োরোপের কল্পনাকে এমন করিয়াই রঞ্জিত করিয়াছে যে, বহু পণ্ডিতজনের প্রতিবাদ সেখানে নিষ্ফল হইয়াছে। যাহা হউক, তাঁহার মনোহারী অনুবাদ হইতেই কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত করিতেছি,—

ওমর খৈয়াম

"Some for the Glories of this World ; and some
Sigh for the Prophet's Paradise to Come :
Ah ! Take the Cash, and let the Credit go
Nor heed the rumble of a distant Drum.

Socrates with its measuring line laid to the fleeting moments, is not the best method of life. Rather ought we to make the most of each moment ere it passes, for, even while we have been calculating its value, it has escaped us and the moments do not return. Ought we not, then, with a miser's jealousy to guard the interest of the moment, but take no thought for the morrow ?...To sacrifice the present to the future is unwarranted and perilous, the present is ours, the future may never be. The very fact that we are children of time, not of eternity, makes the claim of the present, even of the momentary present, imperious and supreme...A life of feeling, pure and simple, heedless and unthinking, undisturbed by reason—such is the Cyrenaic ideal. Seth—A Study of Ethical Principles, P. 83-84

Come, fill the Cup, and in the fire of Spring
Your Winter-garment of Repentance fling ;
The Bird of Time has but a little way
To fly—and lo ! the bird is on the wing.

Oh threats of Hell and hopes of Paradise !
One thing at least is certain—this life flies ;
One thing is certain and the rest is lies ;
The Flower that once has blown for ever dies."[১০]

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ভেদের চেষ্টা বৃথা

কি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য, তাহা সসীম মানুষের বুদ্ধি কখনও ভেদ করিতে পারে না। তাহা হইলে, অনাগত ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত হইয়া লাভ কি ? বর্তমানের জীবন হইতে যতটুকু আনন্দ ভোগ করিয়া নেওয়া যায় তাহাই করা উচিত। বসন্তের পুষ্পের যে কমনীয় বর্ণবিন্যাস তাহা তো দুদিনের জন্য, পূর্ণিমার চাঁদের ফুল্ল দ্যুতি তো কলায় কলায় ক্ষয় হইয়া যাইবে, তাহা হইলে মানুষের অপূর্ণ শক্তি দিয়া বিধাতার সৃষ্টির চিরন্তন রহস্যভেদের বৃথা চেষ্টা কেন ? যাহা বর্তমানে তোমার সম্মুখে বর্তমান আছে, প্রমত্ত হইয়া তাহাই ভোগ কর—আর সব, আর সবই নদীস্রোত যেমন করিয়া সমুদ্র অভিমুখে বহিয়া হারাইয়া যায়, তেমনি করিয়া হারাইয়া যাইবে। তিনিই নিজ জীবনের প্রভু, তিনিই আনন্দিত জীবন ভোগ করেন, যিনি দিনের শেষে বলিতে পারেন, "আজ দিনটি আমি সমস্ত প্রাণ দিয়া বাঁচিলাম, কাল যদি বিধাতা সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ঢাকিয়া দেন, তথাপি বিচলিত হইব না, কারণ যে আনন্দের মধু আমায় অন্তরে সঞ্চিত হইয়া রহিল তাহা তো বিধাতাও কাড়িয়া নিতে পারিবেন না।" এমনই পরিপূর্ণ আনন্দের গান গাহিয়াছিলেন হোরেস্।[১১]

বর্তমান মুহূর্তের সুখ-ভোগই একমাত্র কাম্য

হোরেস্

১০। Fitzerald (Tr.)—Rubaiyat of Omar Khayyam

১১। Spring flowers keep not always the same charm, nor beams the the ruddy moon with face unchanged; why harass with eternal designs a mind too weak to compass them ? Be careful to regulate serenely what is present with you; all else is swept along in the fashion of the stream which glides down to the Tuscan sea ..He will live master of himself, and cheerful, who has the power to say from day to day : I have lived ! to-morrow let the sire overspread the sky, with cloudy gloom; yet he will not render of no effect ought that lies behind, nor shape anew a thing not done what once the flying hour has borne away. Horace, Odes, iii. 29

ইংরেজী সাহিত্যে বায়রন ও জার্মানীতে হাইনেও এ প্রকার অকুণ্ঠিত ভোগবাদ প্রচার করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যেও আমরা ইহার প্রতিধ্বনি শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্নে' কমলের মুখে শুনিতে পাই এবং এই ক্ষণিকবাদের মোহ রবীন্দ্রনাথকেও কিছু কালের জন্য আচ্ছন্ন করিয়াছিল—

ক্ষণিকবাদ

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ, ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আগে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়, ফুটে আর টুটে পলকে
তাহাদেরি গান, গারে আজি প্রাণ, ক্ষণিক দিনের আলোকে।[১২]

রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু এই ক্ষণিকবাদ ও ভোগবাদের বাস্তব উপযোগিতা কতটুকু? বাস্তবিক কি বল্গাহীন উচ্ছৃঙ্খল সুখের অনুসরণ মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে?—নাকি ইহা আলেয়ার মত অন্ধকারে পথিককে বিভ্রান্ত করিয়া সর্বনাশের গহ্বরে পাতিত করে? যুগে যুগে এই সুখভোগের আলেয়া মানুষকে রহস্যময়ী লাস্যময়ী নারীর মত হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছে,—বারে বারে আগুনের স্পর্শে পতঙ্গের মতো হতভাগ্য অশান্ত মানুষের ডানা পুড়িয়াছে। 'সুরা ও সাকী' মুহূর্তের উত্তেজনা জাগাইতে পারে—কিন্তু তাহার পরেই আসে গভীর অবসাদ ও বিষণ্ণতা। এই পথে যাহারা পা দিয়াছে তাহারা কেহই বলে নাই যে, শেষ পর্যন্ত তাহারা সুখের সন্ধান পাইয়াছে! প্রকৃতির নিয়ম অমোঘ। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবেই। ইহার ব্যতিক্রম নাই।

সমালোচনা

এই ক্ষণিকবাদ ও বিচারহীন ভোগের আদর্শ আলেয়ার মতো অবাস্তব

অসংযত ভোগের ফল গভীরতর অতৃপ্তি ও অবসাদ

যাঁহারা বলেন, মানুষ আসলে পশুই, সুখানুসন্ধানই মানুষের প্রকৃতি, তাঁহারা ভ্রান্ত! কারণ চেষ্টা করিয়াও মানুষ পশুর স্তরে নামিতে পারে না। ইন্দ্রিয় সুখভোগের পথে মানুষ ক্লান্ত হয়—তাহার সুখশান্তি ঘুচিয়া যায়, কারণ মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই আছে ইহার বিরুদ্ধতা। যে ইন্দ্রিয়লালসার পথে অগ্রসর হয়, তাহার অন্তরের মর্যাদাবোধই তাহাকে ধিক্কার দেয়। কাজেই এ কথা অত্যন্ত সত্য—
No man as yet has succeeded in becoming a happy beast.

মানুষ ইচ্ছা করিলেও পশুর স্তরে নামিতে পারে না

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ক্ষণিকা।

It is repugnant to his very nature. মানুষ তাহার বিচারবুদ্ধিকে কখনও বিসর্জন দিতে পারে না। এমন কি, সুখের সন্ধানেও যখন সে রত, তখনও বিচারবুদ্ধিই তাহাকে পথ দেখাইতে পারে। প্রবৃত্তির ঘোড়ায় চাপিতে হইলেও, সংযমের লাগাম চাই।[১৩]

জড়বাদ এই ভোগবাদের ভিত্তি

জড়বাদ দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে দুর্বল

দার্শনিক দিক হইতে ভোগবাদের ভিত্তি হইতেছে জড়বাদ। জড়ই জীবন, মন, বুদ্ধি, নৈতিক চেতনার মূল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধ-শক্তি দ্বারা পরিচালিত। আত্মা, পরলোক, ধর্ম ও ঈশ্বরকে জড়বাদ অস্বীকার করে। দর্শনশাস্ত্র আলোচনা কালে দেখিবে যে, জড়বাদের ভিত্তি অত্যন্ত অদৃঢ়। সুতরাং ভোগবাদ দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে অগ্রাহ্য। যুগে যুগে ভোগবাদ মানুষের মনকে কেন আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার কারণ বুঝা কঠিন নয়। সুখের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। জীবনের দুঃখ-আঘাত যখন আমাদিগকে জর্জরিত করে, তখন সংসারের আঘাত এড়াইবার উদ্দেশ্যে, ভোগবাদের সহজ পথ আমরা খুঁজি। বাস্তবিক পক্ষে ভোগবাদ পলায়নী-বৃত্তিসঞ্জাত (escapism)—ইহার মূল ভীরুতা, কাপুরুষতা, সহজ পথ খুঁজিয়া প্রকৃতির মার এড়াইবার চেষ্টা। ইহার মধ্যে আছে জীবনের কঠোর বাস্তবতার কাছে পরাজয় স্বীকার।

ভোগবাদ বলিষ্ঠ সুস্থ মনের পরিচায়ক নহে,—ইহা পলায়নী-বৃত্তিসঞ্জাত

জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্বন্ধে বিশ্বাস হীনতার পরিণাম ক্ষণিকবাদ ও দেহ-সুখ-ভোগবাদ

যখনই জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়, যখনই মানুষ জগৎ ও জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা হারাইয়া ফেলে, তখনই মানুষ ক্ষণিকবাদ ও দেহ-সুখভোগবাদে গা ভাসাইয়া দেয়। সেই জন্যই বর্তমান সাহিত্যে এমন নগ্ন ভোগবাদের চিত্রণ। ইহা এই পীড়িত যুগেরই রুগ্ন মনের কুৎসিৎ প্রতিফলন। কিন্তু যে বলিষ্ঠ বীর বিশ্বাস করে যে জীবনের বর্তমান দুঃখই শেষ নয়, যে বিশ্বাস করে যে এই জগৎ একটা পাগলের সৃষ্টি,

১৩। An ethic of pure sensibility, an absolute Hedonism is impossible. A merely sentient good cannot be the good of a being who is rational as well as sentient; the true life of a being cannot be unreflective...even a successful sentient life implies the guidance and operation of thought. Accordingly, we find even the Cyrenaics admitting in spite of themselves, that prudence is essential to the attainment of pleasure. Seth—A Study of Ethical Principles, P. 88

খাপছাড়া দুঃস্বপ্ন মাত্র নয়,[১৪] সে কখনও বর্তমানের দুঃখের কাছে হার মানিয়া ক্ষণিক সুখলালসার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। সে নির্ভয়ে বলে,—আমি অমৃতের সন্তান, আমি হার মানিব না।

"আমি মৃত্যু চেয়ে বড়,
এই শেষ কথা ব'লে,
যাব আমি চ'লে।"[১৫]

মানুষ অমৃতের সন্তান,—তাহার পিপাসা বৃহতের জন্য

জীবনের কলুষ ও অমঙ্গল দুঃখ-বেদনায় নয়, তাহার কাছে আত্মসমর্পণে। মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ দুঃখ হইতে পলায়নে নয়, দুঃখকে অতিক্রমণে। দুঃখে পুড়িয়াই মানুষ খাঁটি সোনা হয়,—দুঃখকে জয় করিয়াই মানুষ মৃত্যুঞ্জয় শিব হয়—সত্যিকার মানুষের মর্যাদা লাভ করে। সুখের চেয়েও বড় আদর্শ সত্য, ও আত্মমর্যাদা।

সংক্ষিপ্তসার

মানুষ মূলতঃ পশুরই সগোত্র, এবং সুখান্বেষণই তাহার প্রকৃতি। কাজেই মানুষের পক্ষে সুখ অন্বেষণই শ্রেষ্ঠ আদর্শ: এই মত যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা হইলেন দার্শনিক প্রেয়োবাদী —**Ethical hedonists.**

এই দলের মধ্যে যাঁহারা বলেন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিই জীবনের উদ্দেশ্য তাঁহাদের মতকে বলে স্থূল ভোগবাদ—**Gross hedonism.**

আবার যাঁহারা বলেন, ব্যক্তির নিজের সুখই কাম্য, তাঁহাদের মতকে বলা হয় আত্মভোগবাদ —**Egoistic hedonism.**

ভারতবর্ষে চার্বাক, গ্রীসদেশে অ্যারিস্টিপ্পাস ও ইরানে ওমর খৈয়াম স্থূল আত্মভোগবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।

অ্যারিস্টিপ্পাস্ বলিয়াছিলেন, আমাদের সুখভোগের পথে মস্ত বাধা হইতেছে বিচার-বিবেচনা। হৃদয়াবেগকে বিনা দ্বিধায় অনুসরণ করিলেই পরিপূর্ণ সুখভোগ করা যায়। জীবন অস্থির ও ক্ষণস্থায়ী এবং ইন্দ্রিয়ের সুখ তীব্রতর ও সর্বাপেক্ষা সহজলভ্য। স্বর্গ-নরক পুরোহিতদের কল্পনা। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি বর্তমান মুহূর্তকেই পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিবেন। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সুখের জন্য যে বর্তমানের নিশ্চিত সুখকে উপেক্ষা করে সে নির্বোধ।

১৪। সে ব্রাউনিং-এর মতো দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে—Life has meaning, to find its meaning is my meat and drink", অথবা নীট্‌সের মত সদর্পে ঘোষণা করে—Life means for us constantly to transform into light and flame all that we are, or meet with. Nietzsche—The Joyful Wisdom, Preface

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মৃত্যুঞ্জয়

চার্বাক বলিলেন, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—যে ক'টাদিন বাঁচিবে, সুখেই বাঁচিবে, এই দেহ ভস্মীভূত হইলে তাহার পর আর কিছু নাই। তাই বর্তমান মুহূর্ত ক'টিকে পরিপূর্ণ ভোগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ বলিয়া কিছু নাই। তাই সুখভোগের পথে যদি কিছু কণ্টক থাকে তাহা সহ্য করাই বুদ্ধিমানের কাজ। গোলাপ ফুল তুলিতে হইলে কাঁটার খোঁচা কিছু খাইতেই হয়।

ওমর খৈয়াম‍ও বলিলেন, ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যভেদের চেষ্টা বৃথা। এইটুকুই নিশ্চিত করিয়া জানি যে, বর্তমান মুহূর্তের সুখ আমার করায়ত্ত, ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত; সুতরাং বর্তমান মুহূর্তে লভ্য সুরা ও সাকীই জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ।

সমস্ত দেশের কাব্য ও সাহিত্যে এই ক্ষণিক সুখবাদ স্বর্ণমৃগের মত কবি ও শিল্পীদের আকর্ষণ করিয়াছে। বিদেশী সাহিত্যে হোরেস্ ও হাইনে এবং বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে এই আপাত মনোহারী মতের ক্ষণিক অভ্যাস পাই।

কিন্তু এই মত বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা যায় না। আলেয়ার মতো ক্ষণিক সুখের মোহে মানুষ বিভ্রান্ত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে দেখা গিয়াছে অসংযত ভোগ অধিকতর অতৃপ্তি ও সর্বনাশের পথেই নিয়া যায়। মানুষ ইচ্ছা করিলেই বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া পশুর স্তরে নামিয়া যাইতে পারে না। তাহার অন্তরের মর্যাদাবোধই তাহাকে বাধা দেয়। এই ভোগ-বাদের পশ্চাতে আছে পরাজিতের মনোভাব এবং জীবনের কঠিন বাস্তবের সংঘাতের ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা। ইহা সুস্থ বলিষ্ঠ মনের পরিচায়ক নহে। মানুষ যখন জগৎ ও জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ও পরিণতি সম্পর্কে বিশ্বাস হারায়, তখনই সহজ ভোগের পথে গা ভাসাইয়া দেয়। যে জড়বাদ এই দেহভোগবাদের দার্শনিক ভিত্তি, তাহা নিতান্ত দুর্বল।

মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ জীবনের দুঃখ হইতে পলায়নে নয়, দুঃখকে অতিক্রমণে। সুখের মধ্যে আছে ক্ষুদ্রতা, দুঃখজয়েই মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব।

Questions

1. Give a critical estimate of gross ethical hedonism.

2. Can the ideal of "Eat drink and be merry, for tomorrow we may die" be regarded as a practical ideal for man? It not, why not?

একাদশ অধ্যায়

মার্জিত আত্মভোগবাদ

Epicureanism

[Ideal of Epicurus—a protest against crude hedonism. Indulgence of the senses dangerous. Need for restraint—Crude hedonism is foolish escapism—Not pursuit of pleasure but freedom from the shafts of fortune. Indifference to pain. The Stoic ideal. A higher ideal than that of Aristippus—Criticism]

মার্জিত আত্মভোগবাদ—Refined Egoistic Hedonism—Epicureanism—নগ্ন ইন্দ্রিয়ভোগবাদ মানুষের রুচিকে আহত করে। তাই প্রাচীন গ্রীস দেশে অ্যারিস্টিপ্পাসের স্থূল ভোগবাদের স্থান অধিকার করিয়াছিল, এপিকিউরাসের মার্জিত ভোগবাদ। **এপিকিউরাসও ব্যক্তির সুখকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন অন্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি জীবনে সর্বনাশই ডাকিয়া আনিতে পারে**—সুখশান্তি দিতে পারে না। সুখ পাইতে হইলে, ক্ষণিক প্রবৃত্তির উত্তেজনার কাছে আত্মসমর্পণ আত্মহত্যারই তুল্য। জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিয়া, সমগ্র জীবনের পক্ষে মঙ্গলদায়ক, যুক্তিনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির সংযত ভোগের পথে চলিলে, তবেই সুখ পাওয়া যাইবে।

নগ্ন ইন্দ্রিয়ভোগবাদ মানুষের রুচিকে আহত করে

যে নির্বোধ নির্বিচারে প্রত্যেক ক্ষণিক উত্তেজনার তৃপ্তি খোঁজে, অশান্তি তাহার চিরসঙ্গী। কিন্তু জীবনকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিয়া, চিন্তা-বিচার করিয়া, পরিমিতভাবে ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা সুফলপ্রসূ হইতে পারে। প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিই লক্ষ্য বটে, কিন্তু সে জন্য প্রয়োজন যুক্তি-বিচার দ্বারা প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণের। বহু ক্ষেত্রেই আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে, সুখ অর্জনের জন্য নহে, দুঃখ পরিহারের। যুক্তিবুদ্ধি এ ব্যাপারে বহুলাংশে সফল হইতে পারে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই এপিকিউরিয়ানরা সক্রেটিসের সংযম ও সাবধান বিচার বা Prudenceএর পথকেই নৈতিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এপিকিউরাস্ বলিয়াছিলেন যে, আদর্শ কাম্য জীবনের (the

এপিকিউরাস্ অ্যারিস্টিপ্পাসের স্থূল ভোগবাদের পরিবর্তে মার্জিত ভোগবাদ প্রবর্তন করিলেন

blessed life) আরম্ভ ও শেষ উদ্দেশ্য সুখলাভ।...যাহা সুখকর তাহাই জীবের পক্ষে শুভ, এবং এ জন্যই নির্বিচারে সুখের পশ্চাদ্ধাবন করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। সেই জন্যই অনেক আপাত সুখ পরিত্যাগ করিতে হয়, কারণ তাহাদের পরিণামে আছে অধিকতর দুঃখ ও অশান্তি। সেই জন্যই ফলাফল চিন্তা করিয়াই সুখের অনুসরণ করিতে হইবে। সুখী জীবন অবিচ্ছিন্ন মদ্যপান, ব্যসন ও ইন্দ্রিয়চর্চার জীবন নহে। ইহা হইল ধীর চিন্তা ও শান্ত বিচার দ্বারা চালিত সংযত জীবন।

সংযম ভিন্ন ইন্দ্রিয়-ভোগের পথেও সুখ পাওয়া যায় না

সেই জীবনের জন্য প্রয়োজন সেই সব কর্ম পরিহার, যাহাতে হৃদয়ের চাঞ্চল্য ও অশান্তি বৃদ্ধি পায়। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠগুণ তাই সাবধান পরিমিততা (prudence)। এই গুণ হইতেই অন্য সমস্ত গুণ, সমস্ত শুভের উদ্ভব। ইহা দার্শনিকের নিষ্ক্রিয় চিন্তাবিলাস হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইহা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, আমরা যদি সত্যিকারের আনন্দপূর্ণ জীবন যাপন করিতে চাই, তাহা হইলে, তাহা সাবধানী, শান্ত, সম্মানজনক ও সুবিচার-ভিত্তিক জীবন হইতে হইবে। আবার বিপরীত ভাবে ইহাও বলা যায়, সাবধানী, শান্ত, সম্মানজনক ও সুবিচার-ভিত্তিক জীবনই সুখ ও শান্তির জীবন। জীবনের যত সদ্‌গুণ সুখের সঙ্গে যুক্ত এবং সুখী জীবন সংযম, সুবিচার, সাবধানতা ইত্যাদি সদ্‌গুণ হইতে অবিচ্ছিন্ন।

ধীরচিন্তা ও শান্ত বিচার দ্বারা সংযত জীবনই সর্বাপেক্ষা সুখকর

জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে সচেতনতা এবং গভীর নিরাশাবাদ অ্যারিস্টিপ্পাস্-এর মতো এপিকিউরাসের মধ্যেও দেখিতে পাই। কিন্তু এপিকিউরাসের চিন্তা গভীরতর। অ্যারিস্টিপ্পাসের মনোবৃত্তি পরাজয়ের (the defeatist mentality)। তিনি যেন মরিয়া হইয়া, প্রবৃত্তির হাতে মানুষকে আত্মসমর্পণ করিয়া আমাদের ভাগ্যের দুঃখ ভুলিতে বলিতেছেন। কিন্তু এপিকিউরাস্ বলিয়াছেন—ভাগ্যের মার আমরা এড়াইতে পারিব না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া, অন্ধ প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ তো পরাজয় স্বীকার। বরং বীরের ধর্ম হইবে, এমনিভাবে মনকে প্রস্তুত করা, যাহাতে অনবরত দুঃখের আঘাত না পাইতে হয়। যে প্রতি ক্ষণিক আকাঙ্ক্ষার দাস, সে তো পদে পদে আঘাত খাইবেই। মুহূর্তে মুহূর্তে আশাভঙ্গের দুঃখ তাহার ভোগ করিতে হইবে। যাহার অভাব যত বেশী, তাহার দুঃখও তত বেশী। তাই তো তথাকথিত 'বড়লোকেরা' সব চেয়ে বেশী দুঃখী, কারণ তাহাদের বাসনার শেষ নাই, তাহা

জীবন অনিত্য, কিন্তু তাই বলিয়া অন্ধের মতো প্রবৃত্তির হাতে আত্মসমর্পণ মূর্খতা ও পরাজিতের মনোবৃত্তি সঞ্জাত

বুদ্ধিমান মানুষ বাসনা সংযম দ্বারাই দুঃখের মার এড়ান

বাড়িয়াই চলে। নিত্য নূতন তাহাদের অভাব ও অতৃপ্তি। ইহা তো অন্ধ নির্বোধের পথ। তাই এপিকিউরাস্ বলিলেন—জীবনের অভাব-বোধ কমাইয়া, সেই দুঃখের মার আমরা কম খাইব। কাজেই সুখের পথ হইতেছে, দেহ যাহাতে অসুস্থ না হয়, তেমনি সংযত স্বাস্থ্যসম্মত সরল জীবন যাপন করা, এবং মন যাহাতে অযথা উত্তেজিত হইয়া, অশান্ত ও উত্তপ্ত হইয়া দহনের দুঃখ না দেয়, সে জন্য ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যকে দমন করা। তথাপি সমস্ত দুঃখকে আমরা এড়াইতে পারিব না। সে দুঃখ শান্তচিত্তে বহন করিতে শিখিলেই তাহা আর দুঃখের কারণ হইবে না। এপিকিউরাস্ অ্যারিস্টট্‌লের মত ভগবানের মঙ্গলবিধানে বিশ্বাসী ছিলেন না—এই পৃথিবী এক শুভ পরিণতির দিকে পরিচালিত হইতেছে, ইহাও বিশ্বাস করিতেন না। তাই তিনি এই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, এই নিষ্ঠুর খামখেয়ালী পৃথিবীতে যথাসাধ্য সুখে বাঁচিতে হইবে, মানুষকেই বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিজ জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। প্রবৃত্তির পাগলা ঘোড়ার কাছে আত্মসমর্পণ তো নিজের আত্মহত্যারই পথ প্রশস্ত করা। প্রবৃত্তির সংযম ও নিয়ন্ত্রণ, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ভিন্ন নিষ্ঠুর পৃথিবীর আঘাত হইতে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নাই।[১] এপিকিউরাসের পরবর্তী স্টোয়িক্‌রাও (Stoics) গভীর নিরাশাবাদী ছিলেন, এবং আদর্শ জীবন সম্বন্ধে তাঁহারাও অনুরূপ মতই পোষণ করিতেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, পৃথিবীতে বাঁচিতে গেলে, দুঃখ-আঘাত আসিবেই—ইহা অনিবার্য। কিন্তু দুঃখের তীক্ষ্ণ শরাঘাতকে নিষ্ফল করিবার একমাত্র উপায়, নিরাসক্ত হওয়া। মানুষ নিজের সুখ-দুঃখের জন্য যতই বাহিরের উপকরণের উপর নির্ভর করিবে, ততই সে অসহায় ভাবে মার খাইবে। তাই তিনিই প্রাজ্ঞ যিনি "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্ন মনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ।"[২] নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো জীবনের সমস্ত আবেগ-আকাঙ্ক্ষার প্রবল বাত্যার মধ্যে যিনি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই সুখী। তাঁহার সুখ বাহিরের উপকরণের উপর নির্ভর করে না। তিনিই স্বাধীন,—তিনি প্রবৃত্তির দাস

স্বাস্থ্যসম্মত সরল জীবন যাপন ও অনুত্তেজিত মন দুঃখের পরিমাণ হ্রাস করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়

মানুষকেই এই খামখেয়ালী নিষ্ঠুর পৃথিবীতে বিচার-বুদ্ধি দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রণ দ্বারা, দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইতে হইবে

স্টোয়িক্ আদর্শ

দুঃখে নির্বিকার থাকাই দুঃখজয়ের পথ

১। Letters of Epicurus, (Tr. Wallace), Pp. 129-31

২। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ২য় অধ্যায় ৫৬

নন বলিয়াই অভাবের দুঃখ জানেন না। হোরেস্‌ও ঠিক একই কথা বলিয়াছিলেন, "স্বাধীন কে? তিনিই স্বাধীন যিনি প্রাজ্ঞ, যিনি নিজ প্রবৃত্তিসমূহের প্রভু, যিনি অভীঃ—অভাব, মৃত্যু, শৃঙ্খল কিছুই তাঁহাকে ভীত করে না; যিনি নিজ প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি যশের কাঙ্গাল নন; তিনি স্ফটিক গোলকের মতো স্বয়ংপ্রভঃ, সুসীমিত, সুগঠিত—সেই গোলকের মসৃণ তলে বাহিরের কোন বস্তু স্থিতি লাভ করিতে পারে না; এমন স্বাধীন চিত্তের বিরুদ্ধে প্রবৃত্তির সমস্ত আঘাত নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া যায়।"[৩]

যে সুখ বাহিরে খোঁজে, সে মূর্খ দুঃখ পাইবেই। বাহিরের সমস্ত দান সম্বন্ধে স্বাধীন ও নিস্পৃহ হইলেই দুঃখ জয় করা যায়

এই আদর্শ যে অ্যারিস্টিপ্পাসের স্থূল ভোগবাদ হইতে উচ্চতর, তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। এখানেও দেহ ও মনের সুখ লাভই শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং ব্যক্তির নিজস্ব সুখের কথাই চিন্তা করা হইতেছে। কিন্তু এই সুখলাভের পথ অন্ধ প্রবৃত্তির অনুসরণ নয়—শান্ত বিচার ও সাবধান ফলাফল-বিবেচনা। কিন্তু এ আদর্শ অনুযায়ী, যুক্তিবিচার, প্রবৃত্তির ইচ্ছাপূরণের সহায়ক। সেই জন্যই ইহার দাম। এ আদর্শ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের আদর্শ, অন্ধ প্রবৃত্তিচালিত পশুর আদর্শ নয়। কিন্তু এই আদর্শেও মানুষের জীবনে বিচারবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত নয়।

অ্যারিষ্টিপ্পাসের আদর্শ অপেক্ষা এই আদর্শ উচ্চতর

কিন্তু এই আদর্শ ভোগবাদের মূল ভিত্তি পরিত্যাগ করে—বিচার বুদ্ধিকেই নৈতিক বিচারের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করে

তবে ইহা লক্ষণীয়, এখানে প্রত্যক্ষভাবে সুখলাভের আকাঙ্ক্ষাকেই কর্মের উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই। বরং নেতিবাচক ভাবে বলা হইয়াছে যে, দুঃখ-নিবারণই মানুষের কর্মের উদ্দেশ্য। সুখের সংজ্ঞাও হইতেছে অস্তিবাচক ভোগ নয়—নেতিবাচক সংযম অথবা নিরাকাঙ্ক্ষতা—উদাসীনতা। কাজেই এই উদ্দেশ্য মহত্তর এ জন্যই যে, ইহা মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদের ভ্রান্ত ভূমি ত্যাগ করিয়াছে,—সুখকেই কাম্য এবং সুখানুভূতিকেই উদ্দেশ্য বলিতেছে না। এবং এপিকিউরাস্ সুখের আদর্শের সঙ্গে সুবিচার, মর্যাদা, সংযমকেও যুক্ত করিয়াছেন। প্রেয় বা সুখলাভই এখানে শেষ আদর্শ বা একমাত্র মাপকাঠি নয়। এ মতবাদ এই মূল্যবান্ সত্যটির উপর জোর দিয়াছে যে, মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সুখহীন কঠোর কর্তব্যপালন মাত্রই হইতে পারে না। তাহার মধ্যে সুখের উপাদান ও

এই আদর্শ নেতিবাচক-সুখ আহরণ আদর্শ নয়, দুঃখ নিরসনই আদর্শ

প্রেয়ের ভূমি ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ের ভূমিতে উত্তরণ

৩। Horace—Odes, Bk. II, Seventh satire

প্রতিশ্রুতি যদি না থাকে, তবে কোন আদর্শ—তাহা যত বিশুদ্ধই হোক না কেন—মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় হইতে পারে না। তবে এই আদর্শ শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়—কারণ জীবনের দুঃখকেই ইহা বড় করিয়া দেখিয়াছে এবং দুঃখ এড়ানোর আদর্শকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছে। ইহাও প্রেয়োবাদের ভ্রান্ত ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত, যদিও প্রেয় বা সুখভোগকে ইহা নেতিবাচক ভাবেই দেখিয়াছে। এই আদর্শে উদ্যম ও কর্মের স্থান সংকীর্ণ, এবং ইহা বড় বেশী ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। সমাজের হিতের সঙ্গে ব্যক্তির সুখকে যুক্ত করিয়া দেখা হয় নাই। ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশের কথাও এ আদর্শে নাই। তাই এই আদর্শ আধুনিক মানুষের চোখে সংকীর্ণ।

সংক্ষিপ্তসার

অ্যারিস্টিপাসের নগ্ন ইন্দ্রিয়ভোগবাদ রুচিসম্পন্ন মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারে না। মানুষের জীবন যখন অত্যন্ত সরল ও অভাব দুঃখের অভিজ্ঞতা যতদিন না হয় ততদিন এই বাধাবন্ধহীন সুখভোগের আদর্শ সম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে।

কিন্তু গ্রীস্ দেশের মানুষ যুদ্ধবিগ্রহ, মহামারী ইত্যাদি দুঃখের কবলে পড়িয়া পূর্বাপেক্ষা গম্ভীর হইল এবং জীবনকে গভীরতর দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিল। তাহার ফল—এপিকিউরাসের মার্জিত আত্মভোগবাদ।

এখানেও ব্যক্তির সুখই সমস্ত আচরণের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এপিকিউরাস্ বলিলেন অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়চর্চা দ্বারা সুখ পাওয়া যায় না। যে নির্বোধ নির্বিচারে প্রত্যেক মুহূর্তের ক্ষণিক উত্তেজনার তৃপ্তি খোঁজে, অশান্তি তাহার চির সঙ্গী। প্রবৃত্তির হাতে আত্মসমর্পণ আত্মহত্যারই নামান্তর। সংযম ভিন্ন ইন্দ্রিয়ভোগের পথেও সুখ মেলে না। জীবন অনিত্য, কিন্তু তাই বলিয়া অন্ধের মত প্রবৃত্তির হাতে আত্মসমর্পণ চূড়ান্ত মূর্খতা। এই দৃষ্টিভঙ্গী পরাজিতের মনোবৃত্তিসঞ্জাত।

বাস্তব আদর্শ, সুখ রূপ আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন নয়, দুঃখকে কি করিয়া যথাসম্ভব এড়ানো যায় তাহা দেখা। বুদ্ধিমান্ মানুষ জানেন, বাসনা সংযম দ্বারাই দুঃখের মার এড়ানো যায়। যতই বাসনা কামনা, অভাববোধ আমরা বাড়াইব, ততই আমরা আশাভঙ্গজনিত দুঃখের আঘাত বারে বারে পাইব। বুদ্ধিমান্ মানুষ জানেন, স্বাস্থ্যসম্মত সরল জীবন, অনুদ্বেজিত মন ও স্বল্পতম অভাববোধই জীবনে সুখ ও শান্তিলাভের উপায়। পরবর্তীকালে গ্রীক দর্শনে স্টোয়িকরা এই স্বাধীন জীবনের আদর্শকেই উঁচু করিয়া ধরিয়াছিলেন। বাহিরের উপকরণের উপর নির্ভর করিলে ঠকিতেই হইবে—সুখ বাহিরের উপকরণ-নির্ভর নয়, তাহা অন্তরের নির্লোভ প্রশান্তিতে। যিনি নিজ প্রবৃত্তির প্রভু, যিনি বাহিরের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে নির্বিকার, তিনিই স্বাধীন এবং তিনিই সুখী।

এ আদর্শ অ্যারিস্টিপ্পাসের অর্বাচীন আদর্শ অপেক্ষা উচ্চতর এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এপিকিউরাস্ এই সত্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন যে, শুধু প্রবৃত্তির পথে সুখশান্তি মিলে না। বিচারবুদ্ধি দ্বারা অন্ধ প্রবৃত্তির সংযম ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে সুখলাভ, শান্তিলাভ অসম্ভব। কাজেই এপিকিউরাস্ এক হিসাবে প্রেয়োবাদের ভিত্তিকে (যে ভোগেই সুখ) অস্বীকার করিলেন। বিচারবুদ্ধিকে নৈতিক জীবন-নিয়ন্ত্রণকারী উচ্চতর শক্তি হিসাবে স্বীকার করিলেন।

এই আদর্শে এই সত্য স্বীকৃতি আছে যে, সুখ অন্ধ প্রবৃত্তির পথে আসিতে পারে না, তাহা যুক্তি ও বিচার দ্বারা সংযমের উপর নির্ভরশীল। এবং সুখভোগের চেয়ে, দুঃখ নিরসনই অধিকতর বাস্তব পন্থা ইহাতেও সন্দেহ নাই। সমস্ত প্রেয়োবাদের মতো এপিকিউরাসের আদর্শে এই সত্য আছে যে সুখের প্রতিশ্রুতি না থাকিলে কোন আদর্শই—তাহা যতই উচ্চ হোক্—মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় হইতে পারে না।

সমস্ত প্রেয়োবাদের মতো ইহারও মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভিত্তি দুর্বল। তাহা ছাড়া এপি-কিউরাসের আদর্শ নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও নেতিবাচক। ব্যক্তির সুখ ও মঙ্গলকে তিনি সমাজের সুখ ও মঙ্গলের সহিত যুক্ত করেন নাই। ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ যে সমস্ত নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য, এই স্বীকৃতিও এই আদর্শে নাই। তাই ইহা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মত নয়।

Questions

1. Give a critical estimate of Epicureanism as the moral ideal.

2. In what respect is the ideal advocated by Epicurus a better ideal than that of Aristippus? Is it a completely satisfactory moral standard? If not, why not?

দ্বাদশ অধ্যায়

মার্জিত ভোগবাদ—বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় চ

Altruistic Hedonism

[Altruistic Hedonism reflects the modern mind—Utilitarianism: Bentham. Greatest happiness of the largest number—Hedonistic calculus—External Moral sanctions—Criticism. Mill's improvement—Five principles of Utilitarianism—Qualitative differences of pleasure—Internal moral sanctions—Criticism—Mill's influence. Sidgwick—a synthesis—anticipation of Kant—Criticism]

বহুজন হিতবাদ—বহুজন সুখবাদ—Universalistic or Altruistic Hedonism.

গ্রীস্ দেশের প্রেয়োবাদের দুইটি মত (অ্যারিস্টিপ্পাস্ ও এপিকিউরাস্) প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া ধরা যায়। স্বভাবতঃই বিজ্ঞান-পূর্ব যুগের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ থাকিবে। অতি প্রাচীন গ্রীস্ দেশের মানুষ প্রকৃতিকে রহস্যময়, আনন্দময়,—দেবতাদিগের বাসভূমি হিসাবে দেখিয়াছে (the pagan spirit)। আনন্দের অনুসরণ তাঁহাদের পক্ষে সহজ ছিল—জীবন তখন ছিল সহজ, সরল,—প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে আনন্দময়। সুতরাং সুখের অনুসন্ধানকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। ভারতবর্ষে প্রাচীন বৈদিক যুগের ঋষিদের মন্ত্রেও এই জীবনানন্দের স্বচ্ছন্দ ঘোষণা আমরা দেখিতে পাই। "ঋগ্বেদের ঋষি নয়ন মেলিয়া বিশ্ব দেখিতেছেন! যাহা দেখিতেছেন, তাহাই মধু, তাহাই আনন্দ। গগনের সূর্যচন্দ্র ও পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণায় আনন্দ। ঋষির শ্রবণে দিব্য মন্ত্র ধ্বনিত হইল, ঋষির নয়নে দিব্য মন্ত্র ফুটিয়া উঠিল,—

প্রাচীন যুগে জীবন সহজ ছিল এবং প্রেয়োবাদ স্বাভাবিক ছিল

প্রাচীন গ্রীস্ ও

মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বী র্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥
মধু নক্ত মুতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌ রস্তু নঃ পিতা ॥

ঋগ্‌বেদ-যুগের সহজ আনন্দময়তা

মধুমান্ নো বনস্পতি
মধু মাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ ॥

ঋষি এই মধুময় সুন্দর ভুবনে সতেজ ইন্দ্রিয় লইয়া শত শরৎ (শারদং শতম্) বাঁচিয়া থাকিতে চাহিতেছেন। শত শরৎ পার হইয়াও সুন্দর ধরণীর বিচিত্র আনন্দরসে বিতৃষ্ণা দেখাইতেছেন না।"[১]

কিন্তু স্বভাবতঃই পৃথিবী ও জীবন সম্বন্ধে এই শিশুসুলভ, কৌতূহলপূর্ণ, আনন্দিত দৃষ্টিভঙ্গী দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারে না,—হয়ও নাই। বাস্তব জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা হইতে মানুষ দেখিল, জীবন দুঃখময়। এ সংসারে দুঃখের বিস্তীর্ণ জাল পাতা, কাহারও নিস্তার নাই। কাজেই কি ভারতীয় দর্শন, কি গ্রীক্ দর্শনে সুপ্রাচীন আনন্দময়তার স্থানে দেখা দিল, গভীর নৈরাশ্যবাদ। ভারতীয় দর্শনের মূল সমস্যাই হইল, কি করিয়া এই দুঃখের জাল ছিন্ন করিয়া মুক্তি মিলিবে। সাংখ্য কারিকার প্রথম শ্লোকটিই হইতেছে, "দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তদভিঘাতকে হেতৌ"।

দুঃখের অভিজ্ঞতা ও গভীর নৈরাশ্যবাদ

ভারতীয় দর্শনের মূল

সাংখ্য কারিকা

আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক এই তিন প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক দুঃখের অবসানই প্রধান জিজ্ঞাস্য। বৌদ্ধ দর্শনেরও চারিটি মূল সূত্র—

ত্রিবিধ দুঃখ

প্রথমতঃ—দুঃখ আছে
দ্বিতীয়তঃ- দুঃখের কারণ আছে
তৃতীয়তঃ—দুঃখের নিরোধ আছে
চতুর্থতঃ—দুঃখ নিরোধের পথ আছে

এই নৈরাশ্যবাদ (ভারতীয় দর্শনকে ঠিক নৈরাশ্যবাদী বলা যায় না—কারণ তাঁহাদের মতে দুঃখ ব্যক্তিরই কর্মফল এবং দুঃখবিনাশের পথ আছে) গ্রীক্ দর্শনে-- অ্যারিস্টিপ্পাস্ ও এপিকিউরাসের চিন্তায় খুবই সুস্পষ্ট। ইহার কারণও সহজেই বোধগম্য। প্রাচীন যুগের মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে জানিত না—কাজেই বন্যা, ভূমিকম্প, দাবানল, মহামারী এই সমস্ত ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ছিল, মানুষের চিরসঙ্গী। সুতরাং সে যুগের মানুষের সমস্যা ছিল, কি করিয়া প্রকৃতির এ সব মারের আঘাত কিছুটা উপশম করিতে পারা যায়। বাহ্য প্রকৃতিকে

অ্যারিস্টিপ্পাস্ ও এপিকিউরাসের চিন্তায় নৈরাশ্যবাদ

১। সুধীরকুমার দাশগুপ্ত—আমাদের পরিচয়, পৃঃ ১-২

জয় করার কথা তাঁহারা ভাবিতেই পারিতেন না, তাই তাহাদের চিন্তা ছিল কি করিয়া অন্তঃপ্রকৃতিকে শাসন করিয়া দুঃখের বেগ উপশম করা যায়।

আধুনিক যুগে, মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির অসহায় ক্রীড়নক নহে

কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে, প্রকৃতি মানুষের কাছে পূর্বের মতো শিশুসুলভ রহস্যের আবরণ নিয়া উপস্থিত হয় না, আবার প্রাকৃতিক শক্তির নিষ্ঠুর পীড়নের সামনে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায়ও মনে করে না। মনোবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, অর্থবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মানুষের জ্ঞান পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মানুষ নিজের শক্তিতে অনেক বেশী বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে। তাই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে এক নূতন আশাবাদ দেখা যাইতেছে। আধুনিক

আধুনিক প্রেয়োবাদ সক্রিয় উদ্যমে বিশ্বাসী ও অস্তিবাচক উদ্দেশ্য-অনুসারী

প্রেয়োবাদ তাই পৃথিবীর দুঃখ-বেদনা হইতে পলাইয়া বাঁচিবার উপায় নয়। বরঞ্চ তাহার মধ্যে আছে নূতন পৃথিবী গড়িয়া তুলিবার সংকল্প। এপিকিউরাসের প্রেয়োবাদ অনেকটা নিষ্ক্রিয় ও নেতিবাচক আদর্শ (a passive and negative ideal)। কিন্তু আধুনিক প্রেয়োবাদ সক্রিয় উদ্যমে বিশ্বাসী (a dynamic & positive ideal) এবং অস্তিবাচক উদ্দেশ্য-অভিমুখী।

সমাজ-সচেতন বর্তমান যুগের আদর্শ হইল—বহুজনের সুখ, বহুজনের হিত

বর্তমান যুগের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে যে তাহা সমাজ-সচেতন। অ্যারিস্টিপ্পাস্ ও এপিকিউরাস্ শুধুমাত্র ব্যক্তির সুখের কথাই চিন্তা করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমান যুগের আদর্শ হইতেছে বহুজনের সুখ—বহুজনের হিত।

ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাস আধুনিক যুগের আর একটি লক্ষণ এবং আধুনিক প্রেয়োবাদীরা ইহা দাবি করেন যে, ক্রমবিকাশবাদের শিক্ষা হইতেছে পরোপকার প্রবৃত্তি প্রকৃতির বিরোধী নয়, তাহার সহায়ক।[২]

আধুনিক প্রেয়োবাদকে সর্বজন-সুখবাদ (Universalistic Hedonism) এবং পরসুখবাদও (Altruistic Hedonism) বলা হয়। তবে বর্তমানে এই আধুনিক

ব্রিটিশ উপযোগবাদ—Utilitarianism

এবং ব্রিটিশ প্রেয়োবাদ যে নামে সুপরিচিত, তাহা হইতেছে Utilitarianism—উপযোগবাদ। উপযোগ বা Utility বলিতে বোঝায় মনুষ্যচেষ্টা-সৃষ্ট এমন ব্যবস্থা, যাহা বহুমানুষের উপকারে লাগে। প্রাচীন গ্রীক্ প্রেয়োবাদ বলিয়াছিল, যাহা ব্যক্তির সুখ বর্ধন

২। Seth—Study of Ethical Principles, Pp. 94-95

করে, তাহার ভোগে লাগে, তাহাই মঙ্গল। কিন্তু আধুনিক ব্রিটিশ উপযোগবাদীরা বলেন, তাহাই মঙ্গল, যাহা বহু মানুষের পক্ষে আনন্দদায়ক, যাহা বহুজনের পক্ষে হিতকর। মিল্, বেনথাম্ ও সিজউইক্‌কে এই মতের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে ধরা হয়। অবশ্য মিল্ ও বেনথাম্ ব্যক্তিগত কল্যাণ ও বহুজনের কল্যাণের মধ্যে ভেদরেখা তীক্ষ্ণ করিয়া টানেন নাই। তাঁহারা যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহা যেমন ব্যক্তির সুখই আদর্শ এই মতকে সমর্থন করে, তেমনি বহুজনের সুখই কাম্য এই আদর্শকেও সমর্থন করে। বাস্তবিক পক্ষে মিল্ ও বেনথাম্ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, বহুজনের সুখ ও কল্যাণসাধন দ্বারাই ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ সুখ ও আনন্দ সাধিত হইতে পারে।[৩]

ব্যক্তিগত সুখলাভের আদর্শ হইতে বহুজনের সুখলাভের আদর্শরূপ মতের পরিবর্তন ধীরে ধীরে হইয়াছে

ব্যক্তিগত সুখলাভই আদর্শ, ইহা হইতে বহুজনের সুখই আদর্শ,—এই মতে পরিবর্তন ধীরে ধীরে হইয়াছে। এই দুই মতের মধ্যবর্তী সেতু হিসাবে পেইলীর (Paley) মত উল্লেখ করা যায়। তিনি বলিয়াছেন, "ভগবানের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ এবং চিরস্থায়ী সুখের জন্যই আমাদের সর্বমানবের সুখের জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে।" এখানে দেখা যাইতেছে **উদ্দেশ্য** হইতেছে ব্যক্তির নিজের সুখ—সুতরাং এ আদর্শ ব্যক্তিগত প্রেয়োবাদেরই আদর্শ, কিন্তু ইহা সাধনের **উপায়** হইতেছে, বহু মানবের হিতসাধন বা পরসুখবাদ।[৪]

উপযোগিতাবাদ—Utilitarianism—হিউম্, বেনথাম্, মিল্ ও সিজ্‌উইক্ এই আধুনিক প্রেয়োবাদকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণভাবে

উপযোগবাদ—বেনথাম্, মিল ও সিজ্‌উইক্

তাঁহাদের সকলের বক্তব্য আমরা এভাবে প্রকাশ করিতে পারি: সুখলাভই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সুতরাং যাহা দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুখলাভ হয়, তাহাই আমাদের কর্তব্য। ব্যক্তির নিজের সুখ তো একজনের মাত্র সুখ, সুতরাং ব্যক্তিগত সুখ অপেক্ষা বহুমানুষের সুখ নিশ্চয়ই পরিমাণে অধিক। এই সুখের পরিমাণ বিচারকালে ব্যক্তির নিজের সুখকে বড়

৩। Bentham and Mill did not clearly distinguish between egoistic and the universalistic hedonism, and consequently, though in the main supporting only the latter, often seemed to be giving their adhesion to the former. MacKenzie--A Manual or Ethics, P. 211

৪। Seth—A Study of Ethical Principles, P. 96

করিয়া দেখিলে চলিবে না। তাহাকে নিরপেক্ষ হইতে হইবে। বেনথাম্ এই সুখের পরিমাণ বিচারে গণতান্ত্রিক নীতি ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "প্রত্যেক ব্যক্তিকেই একজন ধরিয়া গণনা করিতে হইবে, এবং কাহাকেও একাধিক বলিয়া গণনা করা চলিবে না"—"Each to count as one, and no one as more than one." মিল্‌ও অনুরূপ কথাই বলিয়াছিলেন, "উপযোগবাদের আদর্শ হইতেছে, ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সুখ নয়, সব মিলাইয়া সর্বাধিক পরিমাণ সুখ। নিজের সুখ এবং অন্যের সুখের মধ্যে উপযোগবাদী কোন পার্থক্য করিবেন না। উপযোগবাদের আদর্শের দাবি এই যে, সদাশয় দর্শকের মতো ব্যক্তি নিজের সুখ ও অপরের সুখ সম্পর্কে সমান নিস্পৃহ ও সমান নিরপেক্ষ হইবেন। ন্যাজারেথের যীশু যে শ্রেষ্ঠ নীতি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যেই উপযোগবাদের সম্পূর্ণ আদর্শ প্রকট হইয়াছে;—তাঁহার স্বর্ণময় নীতি হইতেছে, 'অন্যের কাছে তুমি যে ব্যবহার আশা কর, অন্যের প্রতি সেই ব্যবহারই কর এবং তোমার প্রতিবেশীকে তোমার নিজের মতোই ভালবাস'। ইহাই উপযোগবাদ অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ।"[৫]

> সুখলাভই আদর্শ—কিন্তু সুখের পরিমাণ নির্ধারণে নিজের সুখ এবং পরের সুখ দুইকেই নিরপেক্ষ ভাবে দেখিতে হইবে

> 'Each to count as one and no one as more than one'

উপযোগবাদ বলে, একের সুখ অপেক্ষা, দুইয়ের সুখ অধিকতর কাম্য। আবার দুইয়ের সুখ হইতে বহুজনের সুখ আরো বেশী কাম্য। আর যদি সর্বমানবের সুখ হয়, তাহা তো সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। কিন্তু সর্বমানুষের সুখ তো বাস্তব আদর্শ হইতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নাই যাহা সব মানুষকে সুখ দিতে পারে। কাহাকেও সুখ দিতে হইলে, অন্য কাহাকেও কিছু দুঃখ না দিয়া উপায় নাই। কাজেই রাজনীতিবিদ্ বা দেশশাসক, বাস্তব আদর্শ হিসাবে এই আদর্শ গ্রহণ করেন, "সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মানুষের পক্ষে সর্বাধিক পরিমাণ সুখ"—"The greatest happiness the largest number".

> বহু মানুষের সুখের পরিমাণ একজনের (নিজের) সুখের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী

> সুতরাং প্রেয়োবাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ—**the greatest happiness of the largest number**

সিজ্‌উইকের যুক্তিও একই প্রকার। তিনি বলেন, "আমরা ধীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, সুখ ভিন্ন অন্য কিছুরই নিজস্ব আকর্ষণ নাই। সুখই যখন কাম্য, তখন সর্বাপেক্ষা

৫। **Mill—Utilitarianism**

অধিক পরিমাণ সুখই বুদ্ধিমান মানুষের কাম্য হওয়া উচিত। যে সুখ অধিকতর তীব্র, তাহা যে সুখ মৃদু, তাহা অপেক্ষা অধিকতর কাম্য। আবার যে সুখের স্থায়িত্ব দীর্ঘতর, তাহা ক্ষণিক সুখ অপেক্ষা অধিকতর কাম্য। এই সুখের পরিমাণ বিচারে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের মধ্যে কোন প্রভেদ করা উচিত নয় (বেন্থাম্ কিন্তু মনে করেন, বর্তমান নিশ্চিত সুখের মূল্য ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সুখের চেয়ে বেশী)। এবং সর্বশেষ অপরের সুখ এবং নিজের সুখের মধ্যেও কোন পার্থক্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, আসল মাপকাঠি হইতেছে, সুখের পরিমাণ।

সিজ্উইক্ও নিজের সুখ ও অপরের সুখের মধ্যে প্রভেদ করেন নাই এবং ক্ষণিক বর্তমান সুখ অপেক্ষা ভবিষ্যতের স্থায়ী সুখ অধিক কাম্য মনে করিযাছেন

অন্যের সুখের পরিমাণ যদি নিজের সুখের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে পরের সুখ অনুসন্ধানই যুক্তিসঙ্গত।[৬] কিন্তু আশ্চর্যের কথা সিজ্উইক্ ব্যক্তিগত সুখবাদের ভূমি ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে উপযোগবাদের আদর্শ গ্রহণ করেন নাই। কারণ বাস্তবিকপক্ষে তিনি ব্যক্তির নিজের সুখকেই সমস্ত আচরণের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়াই মনে করিয়াছেন। এখানে তিনি বেন্থামের সগোত্র।

বেন্থামের উপযোগবাদ স্থূল

স্থূল উপযোগবাদ—বেন্থাম্—Altruistic Gross Hedonism—Bentham.

বেন্থাম্ মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদের ভিত্তিতেই উপযোগবাদকে স্থাপন করিয়াছেন। মানুষের ইহাই প্রকৃতি যে, মানুষ সুখ আকাঙ্ক্ষা করে এবং দুঃখ পরিহার করিতে চায়, কাজেই ইহারাই হইতেছে সর্বকর্মের প্রেরণা বা উৎস।

তাঁহার উপযোগবাদের ভিত্তি—মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদ

সুখপ্রাপ্তিই যখন উদ্দেশ্য ও আদর্শ, তখন সুখ পরিমাপ করিবার মাপকাঠি চাই। বেন্থাম্ খুব স্পষ্ট করিয়াই সেই মাপকাঠি নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সুখের বিচার একটা অঙ্কের নির্ভুল হিসাব (Hedonistic calculus)। আমাদের দেখিতে হইবে—যাহাতে সব চেয়ে বেশী পরিমাণ সুখ ও সবচেয়ে কম পরিমাণ দুঃখ কোন কাজের ফলে পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন, "সুখের পরিমাণ তৌল কর, দুঃখের পরিমাণ তৌল কর, যেই দিকে পাল্লা ওজনে ভারী হইবে, তাহা দিয়াই হিসাব হইবে, কাজটি ভাল কি

সুখের পরিমাপ কি ভাবে হইবে?

যে কাজের ফলে সুখ বেশী এবং দুঃখ কম, তাহাই কাম্য।

৬। Sidgwick—Methods of Ethics, Bk. III, Ch. XIII, 43.

মন্দ।"[৭] তাঁহার এই হিসাবের কাজ সহজ হইয়াছে, কারণ **তাঁহার মতে সমস্ত সুখেরই দাম সমান,** তাহাদের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নাই, আছে পরিমাণগত প্রভেদ। তিনি বলিলেন, "পরিমাণ যদি সমান হয়, তবে পুস্পিন খেলার আনন্দ ও কাব্যচর্চার আনন্দের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।"[৮]

সুখের পরিমাণ কি দিয়া মাপা যায়?

সুখের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার উপায় কি? প্রথম হইল, **তীব্রতা**। যে সুখ তীব্রতর, তাহা মৃদু সুখের তুলনায় পরিমাণে অধিক, সুতরাং অধিকতর কাম্য। আবার যে সুখ **দীর্ঘতর,** তাহা স্বল্পস্থায়ী সুখ হইতে অধিকতর আকর্ষণীয়। এই দুইটিই প্রধান মাপকাঠি। কিন্তু ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি বিষয়ও এ সম্পর্কে বিবেচ্য—

তীব্রতা, দীর্ঘতা, নিশ্চয়তা, নৈকট্য, উর্বরতা, বিশুদ্ধতা

(১) নিশ্চয়তা—যে সুখ নিশ্চিত পাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা অনিশ্চিত সুখ হইতে অধিকতর কাম্য। **(২) নৈকট্য**—যে সুখ বর্তমানে পাওয়া যাইতে পারে, অন্য সব বিষয়ে সমান হইলে, তাহা ভবিষ্যৎ ও দূরবর্তী সুখ অপেক্ষা অধিক কাম্য। **(৩) উর্বরতা**—যে সুখ হইতে আরো সুখ ভবিষ্যতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা, যে সুখ ক্ষণিক এবং একবার মাত্রই পাওয়া যাইবে, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে অধিকতর কাম্য। দোকান হইতে কিনিয়া রসগোল্লা গালে পুরিয়া ফেলিলে, আনন্দ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী এবং একবার মাত্র ভোগেই তাহার অবসান। কিন্তু কিছু কষ্ট করিয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখিলে বারে বারেই আনন্দ পাওয়া যায় ও দেওয়া যায়। **(৪) বিশুদ্ধতা** অর্থাৎ যে সুখের মধ্যে দুঃখের খাদের মিশ্রণ যত কম, তাহা তত বেশী বাঞ্ছনীয়। সর্বশেষ, যে সুখ বহুজনে বিস্তৃত, তাহা ব্যক্তির একার সুখ হইতে অধিকতর কাম্য। 'পাখীসব করে রব' মার্কা, নিম্নলিখিত কবিতায় (?) বেন্থামের মাপকাঠির সম্পূর্ণ পরিচয় মিলিবে।

> *Intense*, *long*, *certain*, speedy, fruitful, pure,
> Such marks in *pleasures* and in *pains* endure,
> Such pleasures seek, if *private* be thy end ;

৭। "Weigh pleasures and weigh pains, and as the balance stand, will stand the question of right or wrong". Bentham—Principles of Morals & Legislation

৮। "Quantity of pleasure being equal, *pushpin is as good as poetry*" Ibid

If it be *public*, wide let them *extend*

Such *pains* avoid, whichever be thy view ;

If pains *must* come, let them *extend* to few."[৯]

বেনথাম্ হব্‌সের মতো বিশ্বাস করেন যে, মানুষ স্বভাবতঃ স্বার্থপর,—সে নিজের সুখই সর্বাগ্রে কামনা করে। "প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষেরই উদ্দেশ্য, নিজের সর্বাধিক পরিমাণ সুখ সংগ্রহ। প্রত্যেক মানুষের নিজের কাছে, নিজই সর্বাপেক্ষা নিকটতম আত্মীয়।"[১০]

স্বার্থপর মানুষ অন্যের সুখ কামনা করিবে কেন ?

কিন্তু তাহা হইলে, মানুষ পরোপকার করিবে কেন ? তাহার উত্তরে বেন্‌থাম্ বলেন, যুক্তির দিক হইতে নিজের সুখ, এবং অপরের সুখের মধ্যে কোন পার্থক্য করা সম্ভব নয়। যিনি সুসমঞ্জস প্রেয়োবাদী, যিনি সুখকেই আদর্শ ও উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনি এই মতই গ্রহণ করিতে বাধ্য যে, সর্বাধিক পরিমাণ সুখই মানুষের কাম্য এবং যে সুখ বহুজনে বিস্তৃত, তাহা নিশ্চয়ই ব্যক্তির নিজের সুখ হইতে পরিমাণে অধিক, সুতরাং ব্যক্তির নিজের সুখলাভের চেয়ে, বহুজনের সুখলাভই কাম্য হওয়া উচিত।

তাছাড়া, তিনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী, সমাজের লোকমতের চাপে, রাষ্ট্রবিধান বলে, অথবা ধর্মের অনুশাসনের তাড়নায় আমরা অন্যের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে বাধ্য হই। এইগুলিকে তিনি **নৈতিক চাপ—Moral sanctions**—বলিয়াছেন।

নৈতিক চাপ—
Moral sanctions
সবই বাহিরের—

অতিলোভীর মতো কেবল আত্মবসনার অসংযত তৃপ্তিতে প্রবৃত্ত হইলে, রোগে ভুগিতে হয়,—কাজেই আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হয়, অন্যের সঙ্গে ভোগ্যবস্তু ভাগ করিয়া ভোগ করিতে হয়। ইহা হইল প্রকৃতির নিয়মের দাবি (Natural sanctions)। আবার, সমাজে থাকিতে গেলে, নগ্ন স্বার্থপরতা নিন্দার কারণ হয়—কাজেই পিতামাতার সেবা করিতে হয়, প্রতিবেশীর জন্য কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। ইহা হইল সামাজিক চাপ (Social sanctions)। রাষ্ট্রও ব্যক্তিকে পরের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে বাধ্য করে—ট্যাক্‌স্ দিতে হয়, পরধনে লোভ সংযত করিতে হয়। ইহা হইল রাষ্ট্রের চাপ (Political

প্রকৃতির নিয়ম, রাষ্ট্রের আইন, সমাজের জনমত, ধর্মের অনুশাসন—আমাদের পরসুখ অনুসরণে বাধ্য করে

৯। Dewey—Outlines of Ethics, Pp. 36-7

১০। "To obtain the greatest portion of happiness for himself, is the object of every rational being. Every man is nearer to himself than he can be to any other man." Bentham.

sanctions)। সর্বশেষ ধর্মসংস্থাও (Church) আমাদিগকে স্বর্গের লোভ ও নরকের ভয়, ভগবানের কোপ, শাস্ত্রের নিষেধ ইত্যাদির চাপে বাধ্য করে, পরের উপকার করিতে, সংযত জীবন যাপন করিতে। কাজেই ব্যক্তির উপর কতগুলি বাহিরের চাপ ক্রিয়া করে, এবং তাহাকে পরের ভাল করিতে এবং নিজ স্বার্থপরতা সংযত করিতে বাধ্য করে।

বেন্থামের বহুজন সুখবাদের সমালোচনা—বেন্থামের সুখবাদ মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদের ভিত্তির উপর স্থাপিত। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদের মূল বক্তব্য, যে মানুষ সর্বদাই সুখের আকাঙ্ক্ষা হইতে কাজ করে, ইহা সত্য নয়। বরঞ্চ দেখা যায়, সচেতন ভাবে সুখের পশ্চাদ্ধাবন করিলে সুখ পাওয়া যায় না। সুখের আশাই অধিকাংশ কর্মের প্রেরণা নয়। এবং যদিই ইহা স্বীকার করিয়া নেওয়া যায় যে, মানুষ সর্বদাই সুখ আকাঙ্ক্ষা করে, তথাপি ইহা প্রমাণিত হয় না যে, সুখের আকাঙ্ক্ষা হইতে কর্ম করাই আমাদের উচিত।

বেন্থামের উপযোগ-বাদের সমালোচনা

মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়ো-বাদের ভিত্তি দুর্বল

বেন্থাম্ সুখ ও দুঃখের পরিমাণ তৌল করিয়া কর্ম করিবার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। তিনি এই সুখ ও দুঃখ পরিমাপের যে পরিচ্ছন্ন 'ফর্মুলা' দিয়াছেন, বাস্তবিকপক্ষে মানুষের জটিল জীবনে অত সহজ ও সূক্ষ্ম হিসাবনিকাশ সম্ভবপর নয়। আমাদের নিজের কর্মের পিছনে যে জটিল আবেগসমূহ আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রভাব বিস্তার করে, তাহার হিসাবই যথেষ্ট কঠিন—অন্যের সুখের পরিমাণ নির্ধারণ তো আরো অনেক কঠিন। কাজেই বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রেয়োবাদের হিসাবের যে নীতি তাহা প্রায় অচল—the hedonistic calculus does not work.

মানুষের জটিল জীবনে সুখের পরিমাপ এত সহজ নয়

বেন্থাম্ ব্যক্তির নিজের সুখের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের কথা বারে বারে বলিয়াছেন, অথচ আদর্শ হিসাবে বহুজনের সুখের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন ব্যক্তিগত সুখবাদ ও বহুজন সুখবাদ এই দুই আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তিনি বহিরাগত নৈতিক চাপের (External moral sanctions) যুক্তি দেখাইয়াছেন। এ চাপ হইতে যে কাজ তাহাও বাস্তবিক স্বার্থবুদ্ধিসঞ্জাত। বেন্থামের আদর্শ অনুযায়ী যে নৈতিক জীবন, তাহার ভিত্তি লোভ ও ভয়, ইহা হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎসারিত নয়, কিন্তু নীতিবুদ্ধি বাহির হইতে চাপানো জিনিস নয়—এবং স্বার্থ ই ইহার ভিত্তি হইতে পারে না।

বাহিরের নৈতিক চাপ হইতে যে পরসুখ অনুসরণ, তাহাও বাস্তবিক পক্ষে স্বার্থবুদ্ধিসঞ্জাত

বেন্‌থামের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ এই যে, তিনি সুখের স্তর-বিভাগের বেলায় তাহাদের গুণগত প্রভেদ (qualitative distinctions of pleasure) স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে সব সুখেরই মূল্য সমান—'মুড়ি-মিছরীর এক দর'। কফি হাউসে বসিয়া চিত্রতারকাদের কেচ্ছা-কাহিনী আলোচনা করিয়া যে আনন্দ এবং ভক্তের ভগবদ প্রসঙ্গে যে আনন্দ, তাহাদের মধ্যে গুণের কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ শুধু পরিমাণের! আমরা দেখিব যে, মিল্ বেন্‌থামের এই ত্রুটি সংশোধন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, সমস্ত সুখই মনুষ্যের মর্যাদোচিত নহে—কতক সুখ নিকৃষ্ট শ্রেণীর আর কতক সুখ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। তাহা হইলে দেখা যায়, সুখই শ্রেষ্ঠ আদর্শ নহে—সুখকেই মানুষের মর্যাদার উচ্চতর মূল্য দিয়া বিচার করিতে হয়। তাহা হইলে সুখবাদের মূল ভিত্তিই অস্বীকৃত হয়।

সমস্ত সুখের মূল্য এক নয়

মিলের সংশোধন

উপযোগবাদীরা বলিয়াছেন যে, সুখ দুঃখের পরিমাণ মাপিতে হইলে, সে সুখের বিস্তারের কথাও বিবেচনা করিতে হইবে—অর্থাৎ যে সুখ বহুজনে বিস্তৃত, তাহাই অধিকতর কাম্য। কিন্তু কি নীতি অনুযায়ী এই সুখ বণ্টিত হইবে? সম্ভবতঃ উপযোগবাদীরা বলিতে চাহেন যে, সুখবণ্টনের ব্যাপারটা যাহাতে ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহাও চিন্তা করিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সুখের পরিমাণই একমাত্র মাপকাঠি নয়—সুখবণ্টনের একটি ন্যায়-সঙ্গত নীতিও আর একটি মাপকাঠি। উপযোগবাদীরা সেই ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের নীতিটি কি তাহা বলেন নাই। এবং যদি ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের নীতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে, সুখকেও উচ্চতর কোন মূল্যদ্বারা পরিমাপ করিতে হয় অর্থাৎ সুখবাদ হইতে ন্যায়পরতার (Justice) শ্রেষ্ঠতর আদর্শকে স্বীকার করিতে হয়।[১১]

সুখবণ্টনও তো ন্যায়-সঙ্গত হওয়া চাই। সেই ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের নীতিটি কি, তাহা উপযোগবাদীরা নির্দেশ করিতে পারেন নাই

১১। When the Utilitarians used the expression "the happiness of the greatest number' they certainly introduced a consideration other than those provided by strict hedonism... ..For this a principle of distribution is required...and our intuition tells us that it ought to be a just distribution. Utilitarianism, however, provides no such principle. Lillie—An Introduction to Ethics, Pp 175-76

মিলের উপযোগবাদ—মার্জিত বহুজন সুখবাদ—Mill's Utilitarianism—Refined Universalistic Hedonism.

মিলের মার্জিত উপযোগবাদ

মিল্ উপযোগবাদকে ইয়োরোপের রাষ্ট্রচিন্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে উপযোগবাদ (Utilitarianism) নামটি মিলের চেষ্টাতেই প্রচলিত হইয়াছে। তিনি বেন্থামের স্থূল বহুজন সুখবাদকে মার্জিত করিয়া—অর্থাৎ সুখের গুণগত প্রভেদ (qualitative differences in pleasure) স্বীকার করিয়া, প্রেয়োবাদকে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের গ্রহণীয় করিয়াছেন। বেন্থাম্, জেমস্ মিল্ এবং তাঁহার অধিকতর প্রসিদ্ধ পুত্র, জনস্টুয়ার্ট মিল্ (যাঁহার নাম বিশেষভাবে উপযোগবাদের সঙ্গে যুক্ত) সকলেই সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া, অল্পবিস্তর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন এবং ইঁহাদের ব্যক্তিগত জীবন পবিত্র ছিল। ইহাও উপযোগবাদের জনপ্রিয়তার জন্য কিছুটা দায়ী ছিল। তাহা ছাড়া তাঁহারা তাঁহাদের আদর্শকে 'সুখের সন্ধান' (aiming at pleasure) না বলিয়া 'কল্যাণের সন্ধান' (aiming at happiness) বলিয়া, ইন্দ্রিয়সুখবাদের প্রতি মানুষের যে বিরূপতা তাহা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, জন স্টুয়ার্ট মিলের উপযোগবাদকে ঠিক ঠিক ভাবে সুখবাদ (hedonism) বলা যায় কিনা সন্দেহ।[১২]

মিলের উপযোগবাদের পাঁচটি সূত্র

মিলের উপযোগবাদকে পাঁচটি সূত্রে প্রকাশ করা যায়: (১) সুখই একমাত্র কাম্য; (২) কোন জিনিস বা কাজ বাঞ্ছনীয় কিনা, তাহার একমাত্র প্রমাণ, মানুষ তাহা বাস্তবিক পক্ষে আকাঙ্ক্ষা করে কিনা; যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহাই বাঞ্ছনীয়; (৩) প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ তাহার পক্ষে মঙ্গল, সুতরাং সর্বসাধারণের সুখ, সকলের পক্ষে মঙ্গল (৪) মানুষ সুখ ভিন্ন অন্য কিছুও হয়তো আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে, কিন্তু তাহা সে আকাঙ্ক্ষা করে সুখ প্রাপ্তির উপায় হিসাবে; (৫) সব সুখের মূল্য সমান নয়,—যাঁহারা দুইটি সুখেরই আস্বাদন করিয়াছেন, এবং যাঁহারা এ বিষয়ে বিচারের অধিকারী, তাঁহাদের মতামত অনুযায়ীই স্থির করিতে হইবে, কোন্ সুখ শ্রেষ্ঠ।

এবার তাঁহার যুক্তিগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

(১) সুখই কাম্য—মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদ

(১) মিল্ উপযোগবাদ বা বহুজন সুখবাদকে মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদের ভিত্তিতেই স্থাপন করিয়াছেন। মানুষ সুখই কামনা করে। দুঃখ কে চায়? ইহাই মানুষের স্বভাব—"Pleasure and freedom from pain are the only things desirable as ends."

১২। Lillie—An Introduction to Ethics, P. 167

এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সত্য নয়; ইহা পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে। সুখের আকাঙ্ক্ষাই আমাদের সমস্ত কর্মের প্রেরণা, ইহা সত্য নয়।[১৩] বরং দেখা যায়, সুখ আকাঙ্ক্ষা করিলেই সুখ আলেয়ার মতো মিলাইয়া যায়। আর মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদ সত্য হইলে, মানুষ অন্যের সুখ কামনা করিত না।

এ ভিত্তি দুর্বল

(২) যাহা আকাঙ্ক্ষা করি, তাহাই ভাল, এই কথা যে যুক্তিদ্বারা মিল্ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[১৪] তাহা তাঁহার মতো তীক্ষ্ণধী তর্কবিদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যাহা চোখে দেখি তাহা দর্শনীয়, যাহা শ্রবণ করি তাহাই শ্রাব্য এবং যাহা আকাঙ্ক্ষা করি, তাহাই কাম্য—ইহার চেয়ে অসার যুক্তি আর কিছু হইতে পাবে না, ইহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। ডাঃ মুর ইহাকে Naturalistic fallacy বলিয়াছেন।[১৫] যাহা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, তাহা ন্যায়, তাহাই শুভ, ইহা সম্পূর্ণ অপ্রমাণিত। বরং বিপরীতটাই অনেক সময় সত্য। তাই তো কবি বলিয়াছিলেন,

যাহা আকাঙ্ক্ষা করা যায়, তাহাই কাঙ্ক্ষণীয়, এ যুক্তি অ-গ্রহণযোগ্য

বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই,
বঞ্চিত করে' বাঁচালে মোরে
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে।

(৩) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সুখ স্বভাবতঃ কামনা করে, এবং তাহাই তাহার পক্ষে শুভ, এই ভিত্তি হইতে শুরু করিয়া তিনি বহুজন সুখবাদ প্রমাণের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও খুব অদ্ভুত। তিনি বলিলেন যে, আমি আমার সুখ কামনা করি, তুমি তোমার সুখ কামনা কর, উনি নিজের সুখ কামনা করেন, সে নিজের সুখ কামনা করে ইত্যাদি। আমি+তুমি+তিনি+সে ইত্যাদির যোগফল হইল সর্বমানব গোষ্ঠী আর আমার সুখ+ তোমার সুখ+তাঁহার সুখ+ওর সুখের সমষ্টি হইল, সর্বমানবের সুখ। কাজেই

প্রত্যেক প্রত্যেকের সুখ কামনা করে, কাজেই সকলে সকলের সুখ কামনা করে

১৩। ...It is the objects, not the feelings of pleasure that have value. The feeling of pleasure being the *sense* of value, not the *value* itself. Yet it may be accepted as the *measure* of value. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 224

১৪। The only proof capable of being given that an object is visible, is that people actually see it, the only proof that a sound is audible, is that people hear it...in like manner, I apprehend, the sole *proof* or evidence it is possible to produce that anything is desirable, is that people actually desire it. Mill—Utilitarianism.

১৫। G. E. Moore— Principia Ethica, Ch. VII, 24

প্রমাণ হইল, সব মানুষই সর্বমানবের সুখ আকাঙ্ক্ষা করে। তাঁহার নিজের যুক্তির অনুবাদ দেওয়া হইতেছে। "সর্বজনের সুখ কেন কাম্য তাহার এই মাত্র প্রমাণই দেওয়া যায় যে প্রত্যেক ব্যক্তিই—যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিশ্বাস করে যে ইহা তাহার সাধ্যয়ত্ত—নিজের সুখ আকাঙ্ক্ষা করে। ইহা যখন সর্বজনস্বীকৃত সত্য, তখন ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ (ততোধিক প্রমাণ এ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক) যে সুখই হিতকর: প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ তাহার পক্ষে হিতকর এবং সর্বমানবের সুখেই সম্মিলিত হিত।"[১৬] এই যুক্তির মধ্যে যে অনুপপত্তি তাহাকে fallacy of composition বলা হয়। যাহা পৃথক পৃথক ভাবে ব্যক্তিদের বেলায় সত্য, তাহা সম্মিলিতভাবে সমস্ত ব্যক্তিদের সমষ্টির বেলায় সত্য হইবে এমন কথা নাই। "তাছাড়া এখানে মিল্ এ কথা বিস্মৃত হইতেছেন যে, মানুষের সুখের যেমন সমষ্টি করা চলে না,—তেমনি ব্যক্তি মানুষগুলিরও সমষ্টি করা চলে না। এই যুক্তিটি অনেকটা এই ধরনের হইল,—একশো জন সৈন্যের এক দলের প্রত্যেকটি সৈন্য যদি ছ' ফুট করিয়া লম্বা হয়, তবে সমস্ত দলটি ছশো ফিট্ উঁচু! উত্তরে এ কথা বলা যায় যে, যদি সৈন্যেরা একজন আর একজনের মাথার উপর দাঁড়াইত, তবে অবশ্য ইহা সত্য হইত। অনুরূপভাবে মিলের যুক্তিও সত্য হইত, যদি মানুষের মনগুলি সবগুলি জড়াইয়া একটি পিণ্ড করা যাইত। কিন্তু ব্যাপারটা হইতেছে এই যে, সব মানুষের সমষ্টি বলিয়া কিছু নাই, সুতরাং এই সমষ্টির পথে কিছুই হিতকর হইতে পারে না। যাহা হিতকর, তাহা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেই হিতকর হইতে পারে।"[১৭]

এই যুক্তি fallacy of composition দোষে দুষ্ট

অবশ্য, মিল্ও বেন্থামের মতো মানিয়া নিয়াছেন যে সুখের পরিমাপ করা যায়, কাজেই তাহাদের সমষ্টিও করা যায়। কিন্তু পূর্বেই দেখাইয়াছি যে সুখের নির্ভুল আংকিক হিসাব সম্ভবপর নয়। বেন্থাম অবশ্য সব সুখকে সমান মূল্যবান্ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছিলেন, এবং কেবল মাত্র তাহাদের পরিমাণগত প্রভেদ স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে হিসাব তবুও কতকটা সহজ ছিল। কিন্তু এখনই আমরা দেখিব মিল্ সব সুখের মূল্য এক বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাহাদের গুণগত স্তর বিভাগ করিয়াছিলেন এবং তাহা হইলে সুখের পরিমাপ করা তো সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

সুখের পরিমাপ কালে শুধু পরিমাপ নয়, সুখের গুণগত প্রভেদও চিন্তা করিতে হইবে

১৬। Mill—Utilitarianism

১৭। MacKenzie—A Manual of Ethics, Pp. 219-20

কেন ব্যক্তি নিজের আকাঙ্ক্ষার সংযমন করিবে, কেন সে অন্যের উপকার করিবে, এই প্রশ্নের জবাবে, বেন্‌থাম্‌ নৈতিক চাপের (moral sanctions) উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, প্রকৃতির নিয়ম, রাষ্ট্রের শাসন, সমাজের জনমত এবং ধর্মের অনুশাসন মানুষকে আত্মসংযমী ও পরোপকারী হইতে বাধ্য করে। এ সমস্ত চাপই ব্যক্তির বাহির হইতে আসে। মিল্‌ও এই বাহ্য নৈতিক চাপের কথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করিলেন। তিনি বলিলেন, মানুষের অন্তরের মধ্যেই আছে আত্মসংযম ও পরোপকারের স্বাভাবিক প্রেরণা। মানুষের মধ্যে এক স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ (sense of dignity) আছে বলিয়াই সে অসংযত পশুর মত আচরণ করিতে পারে না। তদুপরি আছে, অন্যের প্রতি তাহার সহজ মমত্ববোধ (natural sympathy)। অন্যের দুঃখ দেখিলে, মানুষ অন্তরে পীড়াবোধ করে, তাই নিজের সুখ বিসর্জন দিয়াও মানুষ অনেক সময় পরোপকারে প্রবৃত্ত হয়। মিল্‌ বলিয়াছেন যে, "কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিলে মানুষ অন্তরে বেদনাবোধ করে।"

নৈতিক চাপ শুধু বাহিরের শাসন হইতেই আসে না, মানুষের অন্তরেই আছে স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ ও মানুষের প্রতি সহজ মমত্ববোধ ; এ জন্যই সে আত্ম-সংযমন করে ও পরো-পকারে প্রবৃত্ত হয়

এখানে মিল্‌ স্থূল প্রেয়োবাদের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করিলেন, কারণ তিনি মানিয়া নিলেন যে সুখই একমাত্র কাম্য নয়। মর্যাদাবোধ, অপরের প্রতি মমত্ববোধ, ও কর্তব্যবোধ স্থূল সুখের আকাঙ্ক্ষা হইতেও উচ্চতর। বিচারবুদ্ধি আছে বলিয়াই মানুষের মর্যাদাবোধ ও কর্তব্যবোধ আছে। কাজেই সুখবাদের যে মূল বক্তব্য যে, সুখই একমাত্র মাপকাঠি, তাহা ত্যাগ করিয়া তিনি যুক্তির উচ্চতর মূল্য স্বীকার করিয়া নিতেছেন।

বেনথামের স্থূল প্রেয়োবাদের উল্লেখ-যোগ্য সংস্কার সাধন

বিচার বুদ্ধি দ্বারাই সুখের গুণগত উৎকর্ষ পরিমাপ করা যায়

প্রেয়োবাদ হইতে উচ্চতর আদর্শের ইঙ্গিত

(৫) অবশ্য মিল্‌ একথা বলিয়াছিলেন যে, বহুজন-সুখবাদের ভিত্তিও আত্মসুখ আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ইহা অন্ধ আত্মসুখ কামনা নয়, ইহ বুদ্ধিচালিত মার্জিত আত্মসুখ কামনা (intelligent self-interest)। আমরা অন্যের সুখ চাই, কারণ সেই পথই নিজের স্বার্থসিদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় (the best policy)। যে সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষা করে, যে বহুজনের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়, সে তাহার মধ্য দিয়া নিজেরই শ্রেষ্ঠ হিতসাধন করে। যে কেবল নিজের কথাই ভাবে, নিজের সুখের জন্যই চেষ্টিত

উপযোগবাদও মার্জিত আত্মসুখ কামনা—**intelligent self-interest**

হয়, সে তো সুখী হইতে পারে না। তাহার কাছে সমস্ত মানুষই প্রতিযোগী, শত্রু, সুখের কাড়াকাড়িতে প্রতিদ্বন্দ্বী! কিন্তু যে পৃথিবীকে আপন বলিয়া ভাবে, যে অন্যের সুখেও সুখী—সেইই তো প্রকৃত সুখী।[১৮]

ইহা প্রচ্ছন্ন আত্ম-সুখবাদ

এই যুক্তি সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে প্রমাণিত হয় স্বার্থহীন পরসুখবাদ (altruistic hedonism) বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই, উপযোগবাদ আত্মসুখবাদেরই প্রচ্ছন্ন ও মার্জিত রূপ মাত্র।

মিলের বিশিষ্ট অবদান

প্রেয়োবাদ আলোচনায় মিলের বিশিষ্ট অবদান হইতেছে, সুখের গুণগত প্রভেদ স্বীকার। বেনথাম্ বলিয়াছিলেন যে, সুখের কোন গুণগত প্রভেদ নাই,— সব সুখের দামই সমান—pushpin is as good as poetry—তাহাদের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা কেবলমাত্র পরিমাণগত। কিন্তু মিল্ এ মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, মানুষের মধ্যে এক স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ আছে বলিয়াই, সে শূকরের মত বিষ্ঠায় গড়াগড়ি দিয়া আনন্দলাভ করিতে পারে না। তাই মানুষ নির্বিচারে সব সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। তাহার সুখ মানুষের উপযুক্ত সুখ হওয়া চাই। সম্ভবত, পশুর সুখ পরিমাণে বেশী; কারণ, অতি স্থূল কারণেই সে সুখী হইতে পারে। কিন্তু মানুষের রুচি আছে, বিচার আছে, কাজেই সে স্বল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। মানুষ তাই বলে, "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।" ভূমা কি শুধু পরিমাণেই বেশী? তাহা নয়,—এই ভূমানন্দের জাতই আলাদা! মানুষের সুখ বুঝি পশুর মতো অবিমিশ্র সুখ হইতে পারে না। তাহাতে থাকে বেদনার তীক্ষ্ণস্পর্শ। নিজের দুঃখ-বেদনাই তাহাকে আঘাত করে না, তাহার চারিপাশে পরিবেশের কুশ্রীতা, অপূর্ণতাও তাহাকে বিষণ্ণ করে। সে যে বিধাতার অসন্তুষ্ট সন্তান,—ইহাকেই পাশ্চাত্য কবিরা বলিয়াছেন—The divine discontent.' তাই মানুষ পশুর মতো স্থূল সুখের সন্ধান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। যদি বিধাতাপুরুষ মানুষের কাছে আসিয়া বলেন, "তোর সব

১। সুখের গুণগত প্রভেদ স্বীকার ও
২। নৈতিক চাপের একটি আন্তরিক দিক স্বীকার

১৮। It may be argued that a man's devoting himself to the pursuit of the general happiness is the best means of attaining happiness for himself, and far-sighted egoists convinced by this argument, would set themselves to seek the happiness of others. Lillie—An Introduction to Ethics, P. 171

সুখ আরামের ব্যবস্থা করিব, কিন্তু তোকে পশুর জীবন যাপন করিতে হইবে", তাহা হইলে, এমন কে হতভাগ্য আছে, যে তাহার সমস্ত দুঃখ দৈন্য অসন্তোষ সত্ত্বেও মানুষের মর্যাদা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকিবে? মিল্ ঠিকই বলিয়াছেন, "It is better to be a human being dissatisfied, than a pig satisfied; better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied."[১৯] কী সুন্দর কথা! কিন্তু ইহা তো প্রেয়োবাদের কথা নয়। মিল্ প্রেয়োবাদ ও আত্মসুখবাদের সংস্কার সাধন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত নৈতিক আদর্শ প্রেয়োবাদের ভূমিই পরিত্যাগ করিল। কারণ তিনি **সুখকেও উচ্চতর এক মাপকাঠি দ্বারা পরিমাপ করিলেন**। সেই মাপকাঠি হইল মানুষের **মর্যাদাবোধ ও বিচারবুদ্ধি**: আবার তিনি বলিলেন, ইহা হইতেছে **অভিজ্ঞ বিদগ্ধজনের মত**। বুদ্ধিমান ও নিরপেক্ষ পণ্ডিতজন, যাঁহাদের স্থূল ও মার্জিত এই দুই প্রকার সুখ আস্বাদনেরই সুযোগ হইয়াছে, তাঁহারা যদি বলেন যে মার্জিত সুখই অধিকতর তৃপ্তিদায়ক, তাহা হইলে তাঁহাদের মতই গ্রাহ্য।

অভিজ্ঞ বিদগ্ধজনের বিচার

বাস্তবিকপক্ষে এই বিচারকদের সকলেই একমত যে স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ হইতে মার্জিত চিন্তা ও রুচিসম্মত সুখই অনেক বেশী তৃপ্তিকর। যে মানুষ নির্বোধ ও রুচিহীন, সে হয়তো ইহা স্বীকার করিবে না, কিন্তু তাহার মত তো নিতান্তই একদেশদর্শী। সে তো কখনও মার্জিত উচ্চতর সুখের আস্বাদন জানে না।[২০]

১৯। Mill—Utilitarianism, Ch. II. also cf. George Eliot. We can only have the highest happiness such as goes along with being a great man— by having wide thought, and much feeling for the rest of the world as well as ourselves; and this sort of happiness often brings so much pain with it that we can tell it from pain by its being what we would choose before everything else because our souls see it is good. Epilogue to Romola.

২০। "Of two pleasures, if there be one to which all who have experience of both, give a decided preference .that is the desirable pleasure ..Now it is an unquestionable fact that those who are equally acquainted with, and equally capable of appreciating and enjoying both, do give a most marked preference to the manner of existence which employs their higher faculties. Few human creatures would consent to be changed into any of the lower animals for a promise of the fullest allowance of a beast's pleasures...If the fool or the pig is of a different opinion it is because they only know their own side of the question. The other party to the comparison knows both sides. Mill—Utilitarianism

মার্জিত প্রেয়োবাদের যে মত মিল্ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই মহৎ আদর্শ। কিন্তু এই মহত্ব অর্জিত হইয়াছে—প্রেয়োবাদের মূল ভিত্তি অস্বীকার করিয়া। মিল্ স্বীকার করিতেছেন, সুখই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়। সে সুখ মানুষের মর্যাদার উপযোগী এবং বুদ্ধিমান ও রুচিবান্ বিচারকের সম্মতিসাপেক্ষ। কিন্তু মানুষের মর্যাদার উপযোগী কি, তাহা তো সুখের পরিমাণের হিসাব হইতে পাওয়া যায় না। তাহা স্বচ্ছ বিচারসাপেক্ষ, এবং রুচিবান্ বিচক্ষণ বিচারকগণের যে রায় (the verdict of competent judges) তাহাও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ীই হইয়া থাকে। কাজেই বিচারবুদ্ধিই সুখের মাপকাঠি, তাহাই শ্রেষ্ঠতর আদর্শ। র‍্যাশডাল্ সে জন্য বলিয়াছেন, "গুণগতভাবে শ্রেষ্ঠ সুখের আকাঙ্ক্ষাকে সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষা বলা চলে না—"A desire for a *superior* quality of pleasure is not really a desire for pleasure." গ্রীন্ও তাই বলিয়াছেন, মানুষের মর্যাদাবাদ সুখের চেয়ে ভিন্নতর ও শ্রেষ্ঠতর আদর্শ। মানুষের মর্যাদাবোধ মানুষের সুখের আকাঙ্ক্ষা হইতে সঞ্জাত নয়—ইহা তাহার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিসঞ্জাত,—the sense of dignity natural in men, is the dignity of reason, not of sensibility.

মিলের উপযোগবাদ প্রেয়োবাদের উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করিল, কিন্তু তাহা দ্বারা তিনি প্রেয়োবাদের ভূমি ত্যাগ করিয়া বিচারবুদ্ধির উচ্চতর ভূমিতে উত্তীর্ণ হইলেন

সুতরাং দেখা যাইতেছে মিল্‌কে বাস্তবিকপক্ষে প্রেয়োবাদী বলা যায় না।

উপযোগবাদ বা বহুজন হিতবাদ, ইয়োরোপের,—বিশেষ করিয়া ইংল্যাণ্ডের, রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষেত্রে সংস্কারের আন্দোলনকে বেগ দান করিয়াছিল। রাষ্ট্রের আদর্শ শুধু ব্যক্তির অধিকার রক্ষা নয়—সামাজিক সুবিচার, সাম্যের ভিত্তিতে বহুজনের সুখ, বহুজনের হিত। কিন্তু উপযোগবাদীরা বৈষয়িক ও কায়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উপরই জোর দিয়াছেন—মানুষের রুচি, ধর্ম ও বুদ্ধির বিকাশের উপর ততটা গুরুত্ব দেন নাই। কিন্তু বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্যও উপযুক্ত চরিত্র সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রীতি ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ইহার মূল উপাদান।

ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে মিলের উপযোগবাদের প্রভাব

সিজ্‌উইকের উপযোগবাদ—Sidgwick's Utilitarianism—বহু বিষয়ে মিলের উপযোগবাদের সঙ্গে মিল থাকিলেও, সিজ্‌উইকের নৈতিক আদর্শের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁহার মতের মধ্যে, ব্যক্তির সুখই কাম্য (egoism)। শ্রেষ্ঠ

আদর্শ কি, তাহা ব্যক্তি নিজের অন্তরে বিচার ব্যতীতই জানিতে পারে (Intuitionism), উপযোগবাদ (Utilitarianism) এবং ক্রমবিকাশবাদের (theory of evolution) মিশ্রণ ঘটিয়াছে। সিজ্‌উইকের মতে, ব্যক্তি বিনা বিচারেই নিজের অন্তরে তৎক্ষণাৎ জানিতে পারে, কোন্ কাজ ন্যায় এবং কোন্ কাজ অন্যায়। এইভাবে তৎক্ষণাৎ যে আদর্শ ব্যক্তির অন্তর গ্রহণ করে, তাহা বুদ্ধিমান্ উপযোগবাদীরও গ্রহণযোগ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের অন্তর যখন আমাদের কোন কর্মের নির্দেশ দেয়, তখন তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং তাহার ফল বহুজনের সুখ, বহুজনের হিত। যেখানে আমাদের অন্তরে কোন কার্যের ন্যায্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে, সেখানে তাহা বহুজনের সুখ বা হিতের উপযোগী কিনা, তাহাও সন্দেহের বিষয়। সুতরাং সাধারণ মানুষের নীতিবোধ ও আদর্শ, উপযোগবাদী দার্শনিকের সচেতন চিন্তা ও বিচারের ফল নয়। মানুষের অন্তর স্বভাবতঃই বহুজনের হিতাকাঙ্ক্ষা করে, এবং যুগ যুগ ধরিয়া মানব-সমাজের অভিজ্ঞতা দ্বারা, ব্যক্তির নীতিবোধ ক্রমশঃ বিকশিত হয়, পরিবর্তিত হয়।

সিজ্‌উইকের উপযোগবাদে ব্যক্তিগত সুখবাদ, অন্তরবাদ, উপযোগবাদ ও ক্রমবিকাশবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে

কিন্তু ইহার স্বাভাবিক গতি, বহুজনের সুখের অভিমুখে। তিনি অবশ্য আত্মসুখবাদীদের মতো মনে করেন যে, নিজের সুখ ও স্বার্থ অনুসরণ করাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, এই নীতিতে তাহার অন্তরেরও সমর্থন আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরে দয়া, দাক্ষিণ্য, করুণার প্রেরণাও (benevolence) স্বাভাবিক ভাবে আছে। তাহার অন্তর বিশ্বাস করে যে নিজের সুখ ও অপরের সুখের মধ্যে প্রভেদ করা উচিত নয় (equity)।[২১] আমাদের মনে হয়, আত্মসুখবাদ (egoism) হইতে পরসুখবাদে (altruism) উত্তীর্ণ হইতে হইলে, বিচারের সাহায্যেই তাহা সম্ভব। ইহা অন্তরের অনুভূতির উপর নির্ভর করে না। আত্মসুখ ও পরের সুখের মধ্যে স্বভাবতঃই বিরোধ আছে। ইহা সিজ্‌উইক্ অস্বীকার করেন নাই। তিনি ইহাকে 'dualism of practical reason' বলিয়াছেন। তবে তিনি এই বিরোধ মীমাংসার দুইটি পথের ইঙ্গিত দিয়াছেন—একটি মনস্তাত্ত্বিক, আর একটি দার্শনিক। তাঁহার মতে, মানুষ যখন অপরের সুখ এবং হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার নিজের সুখও সর্বাধিক হয়।

আত্মসুখবাদ হইতে পরসুখবাদে বিবর্তন, ইহা শুধু অন্তরের অনুভূতির ফল নয়—ইহা বিচার-সঞ্জাত

আত্মসুখ ও অপরের সুখের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার পথ

২১। Broad—Five Types of Ethical Theory, P. 145-61

যাঁহারা জনসেবার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারা নিজেদের অন্তরেও গভীর তৃপ্তি লাভ করেন, ইহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য। কিন্তু কখনও কখনও কি ইহা দেখা যায় না যে যিনি দেশের সেবায় রত হন, তাঁহাকে বহু দুঃখ, অপমান, মনস্তাপ ভোগ করিতে হয়? যে দার্শনিক পথে তিনি মীমাংসার পথ দেখাইয়াছেন, তাহা হইল এই, ভগবানেরই এই বিধান যে, যাহারা পরের উপকার করে, তাহারা ইহলোকে অথবা পরকালে ভগবান দ্বারা পুরস্কৃত হন। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা অনেক সময় বিপরীতটাই সত্য হইতে দেখি; যাঁহারা পরোপকারী, সাধু ও সচ্চরিত্র তাঁহারাই পৃথিবীতে দুঃখ পান সর্বাধিক। কিন্তু পরকালের কথা তো কেহ প্রমাণ করিতে পারে না। তবে ইহা অবশ্যই সত্য যে, যাঁহারা হিন্দুদের মতো কর্মফল ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের কাছে এই প্রমাণ নিরর্থক নয়। এমন কি কাণ্টও ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং আত্মার অমরত্ব প্রমাণের জন্য এ যুক্তি দিয়াছিলেন যে, সত্যের জয় অনিবার্য, ইহা মানুষের এক অবিচল বিশ্বাস। এই বিশ্বাস সত্য না হইলে, ন্যায় আচরণের কোন যুক্তিগত ভিত্তি থাকে না। এই জগতে হয়তো দেখা যায় যে, সাধু মানুষ দুঃখ পায়, পাপী সাংসারিক সুখ ও আরাম ভোগ করে। কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে, এই জীবনের পরেও জীবন আছে, এবং সেই জীবনে ন্যায়-বিচারক ভগবান্ নীতি এবং সুখের সমতা বিধান করেন। তিনি সাধুকে উপযুক্ত পুরস্কৃত করেন, আর দুষ্টের শাস্তি বিধান করেন। সিজ্‌উইক্ এই দুইটি পথের ইঙ্গিত দিলেও, এই যুক্তিগুলি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নাই। কাজেই অন্তরের প্রেরণাকেই তিনি তাঁহার পরসুখবাদের ভিত্তি করিয়াছেন, এবং তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন যে আত্মসুখাকাঙ্ক্ষা ও পরসুখাকাঙ্ক্ষা অভিন্ন। আমাদের মনে হয় তিনি ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতে পারেন নাই। বাস্তবিকপক্ষে বিচারের পথে ভিন্ন এই দুইয়ের সমন্বয় সম্ভব নয়।[২২]

পরবর্তীকালে যুক্তিবাদী কাণ্টের মতের ইঙ্গিত তাঁহার মতবাদে, তবে তাহা স্পষ্টভাবে বিস্তার করেন নাই

সংক্ষিপ্তসার

প্রেয়োবাদের আদর্শ আধুনিক কালে বেন্‌থাম্, মিল্ ও সিজ্‌উইকের দর্শনে নূতন মর্যাদা লাভ করিয়াছে এবং রাষ্ট্রজীবনে বিপুল বাস্তব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই নূতন আদর্শ ব্যক্তির

২২। The real solution appears to be the complete rejection of egoistic hedonism as wholly inconsistent with our common sense intuitions, so that if utilitarianism in some form or other is to be accepted, it must be on some other ground than that of Sidgwick's premise of egoistic hedonism. Lillie—An Introduction to Ethics, P. 179

সুখকেই কাম্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই—তাহার পরিবর্তে বহুজনের সুখ ও বহুজনের হিতকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই আদর্শকে এই একটি বাক্যে প্রকাশ করা হইয়াছে—The greatest happiness of the largest number. ইহাকে উপযোগবাদ বা Utilitarianismও বলা হয়।

বেনথাম্ তাঁহার আদর্শকে মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদের ভিত্তিতেই স্থাপন করিলেন। সুখের আকাঙ্ক্ষাই সমস্ত কর্মের উৎস—এবং সুখ আহরণই আচরণের উদ্দেশ্য হওয়া সঙ্গত।

সুখই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে দেখিতে হইবে যাহাতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সুখ পাওয়া যায়। এই সুখের পরিমাণ মাপার উপায় হইতেছে, সুখের তীব্রতা, দীর্ঘ স্থায়িত্ব, নিশ্চয়তা, নৈকট্য, উর্বরতা ও বিশুদ্ধতা। যাহাতে সকলের চেয়ে বেশী পরিমাণ সুখ ও সবচেয়ে কম পরিমাণ দুঃখ পাওয়া যায়, তাহাই বুদ্ধিমান লোক হিসাব করিয়া দেখিয়া কাজ করিবেন। সুখের হিসাবের বেলায়, পরিমাণই শুধু হিসাব করা যায়। সুখের গুণগত কোন প্রভেদ নাই। একজন মানুষের (ব্যক্তির নিজের) সুখের চেয়ে বহু মানুষের সুখ নিশ্চয়ই পরিমাণে বেশী—সুতরাং তাহাই সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সব মানুষের সুখ সম্ভব হইলে, তেমন কাজই করা উচিত, যাহাতে সকল মানুষের সুখ হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা কখনও সম্ভব হয় না। তাই বাস্তব আদর্শ হিসাবে সর্বাপেক্ষা বেশী মানুষের সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ সুখ—এই আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে। সুখ পরিমাপের বেলায় নিজের সুখকে অন্যের সুখের সমান করিয়াই হিসাব করিতে হইবে—সুখ পরিমাপের ক্ষেত্রে—Everyone is to count as one, and no one as more than one. কিন্তু নিজের আকাঙ্ক্ষা সংযত করিব কেন? পরের উপকার করিব কেন? বেন্থাম বলিলেন, প্রকৃতির বিধি, রাষ্ট্রের আইন, সমাজের জনমত, ধর্মের অনুশাসন ইত্যাদি বাহ্য নৈতিক চাপ (External moral sanctions) ব্যক্তিকে সংযত করে, পরোপকার করিতে বাধ্য করে।

বেনথামের উপযোগবাদের ভিত্তি হইল মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদ এবং এই মতের ভিত্তি তাই দুর্বল। মানুষের সুখ-দুঃখ মাপিবার যে মাপকাঠি বেন্থাম্ দিয়াছেন, জটিল মানবজীবনে তাহার সার্থক প্রয়োগ অসম্ভব। বাহিরের নৈতিক চাপ হইতে যে কাজ করা হয়, তাহাও বাস্তবিক পক্ষে স্বার্থবুদ্ধিসঞ্জাত। সমস্ত সুখেরই গুণ বা মূল্য এক—ইহা নিতান্তই মিথ্যা। মিল্ এ ত্রুটি সংশোধন করিয়াছিলেন। সুখ বণ্টনের কাজ ন্যায়সঙ্গতভাবে করিতে হইলে, শুধু পরিমাণ দ্বারা পারা যায় না। বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ ভিন্ন তাহা সম্ভব নয়।

মিলের উপযোগবাদ মার্জিততর। তাঁহার মত পাঁচটি সূত্রে প্রকাশ করা যায়। (১) সুখই একমাত্র কাম্য। ইহা মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদের কথা। (২) কোন কাজ বাঞ্ছনীয় কিনা তাহার একমাত্র এবং যথেষ্ট প্রমাণ যে মানুষ বাস্তবিক পক্ষে তাহা আকাঙ্ক্ষা করে। ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত যুক্তি। (৩) প্রত্যেক মানুষ নিজের সুখ আকাঙ্ক্ষা করে, সুতরাং সকল মানুষ সব মানবের সুখ আকাঙ্ক্ষা করে। ইহা অত্যন্ত কুযুক্তি। (৪) মানুষ সুখ ভিন্ন অন্য কিছুও হয়তো আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে, কিন্তু তাহাও সুখ প্রাপ্তির উপায় হিসাবেই আকাঙ্ক্ষা করে। ইহাও খুব সত্য নয়। সুখই মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ মূল্য নয়। এবং এই যুক্তি দ্বারা মিল্ ইহাই প্রমাণিত করিলেন যে, উপযোগবাদ—স্বার্থবুদ্ধিসঞ্জাত। (৫) সুখের প্রভেদ শুধু পরিমাণগত নয়, কোন

কোন সুখ আছে যাহা অন্য সুখ হইতে অধিক মূল্যবান, যাহা মানুষের মর্যাদা-উপযোগী। ইতর পশুর স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ মানুষের আদর্শ হইতে পারে না। কোন্ সুখ মনুষ্যোচিত তাহা অভিজ্ঞ বিদগ্ধ জনেরাই স্থির করিবেন। তাঁহাদের স্থূল ও ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার সুখেরই অভিজ্ঞতা আছে এবং এইসব প্রাজ্ঞের অভিমত এই যে, সক্রেটিসের অসন্তুষ্টি শূকরের সহজ স্থূল সন্তুষ্টি হইতে অনেক বেশী কাম্য। তাঁহার এই যুক্তি দ্বারা মিল্ বেন্থামের উপযোগবাদের সংস্কার সাধন করিলেন সত্য, কিন্তু তিনি প্রেয়োবাদের ভূমি পরিত্যাগ করিয়া যুক্তিবিচার, মানবতাবোধ ও মর্যাদা-বোধের উচ্চতর ভূমিতে তাঁহার মতকে স্থাপন করিলেন। তিনি স্বীকার করিলেন যে সুখই শ্রেষ্ঠ 'মূল্য' নয়—সুখকেও উচ্চতর কোন আদর্শ দ্বারা মাপিতে হইবে। ইহাতে প্রেয়োবাদের আদর্শ ধ্বংস হইল।

অন্য আর একদিক দিয়াও তিনি বেন্থামের প্রেয়োবাদের সংস্কার সাধন করিলেন। তিনি শুধু বাহ্য নৈতিক চাপের শাসন স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন, মানুষের অন্তরে মর্যাদা বোধ ও মানবতাবোধ তাহাকে সৎকাজ করিতে বাধ্য করে। এখানেও তিনি স্বার্থবুদ্ধির চেয়ে উচ্চতর মানবিকতার কাছেই আবেদন জানাইলেন। মিলের উপযোগবাদ অবশ্যই স্থূল ও আত্ম সুখবাদের চেয়ে উচ্চতর আদর্শ। কিন্তু এই আদর্শ যুক্তিবাদের ইঙ্গিত বহন করে এবং সুখের চেয়ে উচ্চতর মূল্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। প্রেয়োবাদের ভূমি পরিত্যাগ করিয়াই তিনি প্রেয়োবাদের সংস্কার সাধন করিয়াছেন।

মিলের সঙ্গে সিজ্উইকের উপযোগবাদের খুবই সাদৃশ্য আছে। তিনি আত্মসুখবাদ ও পরসুখবাদের (egoism & altruism) সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন আন্তর অনুভূতি-বাদ (intuitionism) ও ক্রমবিকাশ-মূলক প্রেয়োবাদের (evolutionary hedonism) মিশ্রণ দ্বারা। তাঁহার মার্জিত উপযোগবাদও প্রেয়োবাদের ভূমি ত্যাগ করিয়া যুক্তিবিচারের উচ্চতর ভূমি আশ্রয় করিয়াছে।

উপযোগবাদ সমসাময়িক ব্রিটিশ ও পরবর্তী ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে এবং সমাজচিন্তায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহা আধুনিক মনের মানবিকতার পরিচায়ক। কিন্তু সমস্ত প্রেয়োবাদের মতো এই মতবাদও কোন কার্যের নৈতিকতা তাহার বাহ্য ফল দিয়া বিচার করে। মিল্ ও সিজ্উইকের উপযোগবাদ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ নির্ণয় বিচার-বুদ্ধি ব্যতীত কখনই সম্ভব নয়—কেবলমাত্র সুখই শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়, তাহা মানুষের মর্যাদার উপযোগী অবশ্যই হইতে হইবে।

Questions

1. What is Utilitarianism & Why is it so called? What are the main arguments of Bentham and Mill in support of this ideal? Give a critical estimate.

2. Distinguish between the Utilitarianism of Bentham & Mill. In what respects is Mill's Utilitarianism a better ideal? Is Mill a consistent hedonist?

3. How does Sidgwick attempt to reconcile egoism with altruism? Has he succeeded in his attempt?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্রমবিকাশমূলক প্রেয়োবাদ

Evolutionary Hedonism

[The concept of evolution—biological evolution. Darwin. Extension of the concept in the field of morals--Herbert Spencer—Criticism. Evolutionary hedonism—Leslie Stephen—Social health. Criticism. Alexander's Evolutionary hedonism—Criticism. A General assessment of all hedonistic theories]

ক্রমবিকাশভিত্তিক প্রেয়োবাদ—Evolutionary Hedonism—Herbert Spencer—বিংশ শতাব্দীর সমস্ত চিন্তা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-প্রবণতা এবং ক্রমবিকাশবাদ দ্বারা প্রভাবিত। নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সমস্ত সুখবাদের ভিত্তিই মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদ, ইহা আমরা দেখিয়াছি। ডারউইনের পরবর্তী ইংল্যাণ্ডের চিন্তায় জড়বাদ ও ক্রমবিকাশবাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। হারবার্ট স্পেন্‌সার ক্রমবিকাশের সূত্র সমস্ত আলোচনার ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত অনুসরণ করিয়া, এই মতকে বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নৈতিক আদর্শ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও স্পেন্‌সার (Spencer) এই ক্রমবিকাশের সূত্র অনুসরণ করিলেন। তিনি বলিলেন, নৈতিক আদর্শ ধ্রুব, অচল এবং চিরন্তন নয়। ইহার উৎস স্বর্গে এবং ইহার আধার ভগবান্, এই প্রকার মত বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিরোধী। নৈতিক আচরণ ও আদর্শ রহস্যময় কিছু নয়, আমাদের প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনেই ইহার ভিত্তি।

দার্শনিক চিন্তায় ক্রমবিকাশবাদের প্রভাব

আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা অভিজ্ঞতার ফলে দেখিয়াছিলেন, কতগুলি কাজের ফলাফল শুভ। এই কাজগুলি ব্যক্তিজীবন ও গোষ্ঠিজীবনের অনুকূল (useful)। কাজেই এ কাজগুলি প্রশংসিত, এবং সমাজ দ্বারা গৃহীত হইল। আবার কতগুলি কাজের ফলাফল দেখা গেল বিঘ্নকর, সমাজজীবনের পক্ষে হানিকর। সেই কাজগুলি সমাজ দ্বারা নিন্দিত হইল। ইহাই হইল নীতিবোধ

স্পেন্‌সার ক্রমবিকাশবাদ নীতিবুদ্ধির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করিলেন

এবং নীতিবিচারের ভিত্তি। যাহা ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে সুখকর, যাহা জীবনের পক্ষে অনুকূল, তাহাই হইল শুভ ও ন্যায়; যাহা দুঃখদায়ক, যাহা জীবনের পক্ষে প্রতিকূল তাহা অশুভ ও অন্যায়। যে কাজগুলির ফল অনুকূল স্বভাবতঃই সেগুলি পুনঃ পুনঃ আচরিত হইতে লাগিল; যে কাজগুলির ফল প্রতিকূল তাহা নিন্দিত এবং শাস্তিযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল। প্রথমতঃ যে কাজগুলি, অনুকূল ফলের জন্য সচেতনভাবে আচরিত হইত, সেগুলি ক্রমশঃ অচেতন অভ্যাসে পরিণত হইয়া ব্যক্তির স্বভাবে পরিণত হয়, এবং বংশধারা ক্রমে সেই স্বভাব ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরবর্তী পুরুষে সংক্রামিত হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, নৈতিক আদর্শ প্রথমতঃ আমাদের পূর্বপুরুষেরা সচেতন ভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে এই আদর্শগুলি আন্তরিক ও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই আদর্শগুলিও কালের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজজীবনের প্রয়োজনে, ক্রমবিকাশিত হইয়াছে, পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং মানুষের নৈতিক চেতনা রহস্যময় কিছু নয়। ভগবান অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (Unknown & Unknowable) বস্তু। মানুষের নীতিবুদ্ধি ব্যাখ্যা করিবার জন্য, ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। সাংসারিক জীবনের প্রয়োজন সাধনে অনুকূলতাই নৈতিক আদর্শের মাপকাঠি। যাহা সমাজের পক্ষে সুখকর ও আনন্দদায়ক, তাহাই নৈতিক আচরণ।

> নৈতিক আদর্শের ক্রমবিবর্তন আছে

> যে কাজগুলির ফল সমাজের পক্ষে শুভ, সে কাজগুলি সমাজে গৃহীত হইল; পুনঃ পুনঃ সে কাজগুলি করা হইল, তাহারা ন্যায় এই আখ্যা লাভ করিল

> ক্রমশঃ এই আদর্শগুলি আন্তরিক ও স্বাভাবিক হইল

> নৈতিক আদর্শ সমাজ-জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত ও পরিবর্তন-শীল—তাহা অপরিবর্তনীয় নয়

হার্বার্ট স্পেন্‌সার মানুষের নীতিবোধ, ও আদর্শের ক্রমবিকাশকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি নিজেকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন, মানুষের নীতিবোধের স্বরূপ কি? কিভাবে ইহার বিকাশ ঘটিল? কি ইহার সম্ভাব্য পরিণতি? তিনি বিজ্ঞানী বলিয়াই এই সব প্রশ্নের ব্যাখ্যার জন্য কোন রহস্যময় অপ্রমাণিত সত্তা স্বীকার করিয়া লন নাই। তিনি বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন যে, নীতিবোধ মানুষের স্বাভাবিক ব্যবহারেরই অঙ্গ এবং ঐতিহাসিকের মতো এই নীতি-বোধের ক্রমপরিণতির ধারাটি তিনি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি নীতিবিদ্যাকে একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পরিণত করিতে

> হার্বার্ট স্পেন্‌সার মানুষের নীতিবোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও ইহার ক্রমপরিণতি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিলেন

চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে গ্রীন্ হার্বার্ট স্পেন্সারের ক্রমবিকাশভিত্তিক সুখবাদকে বলিয়াছেন, 'a natural science of morals'।

মিল্ এবং বেন্থামের মতো তিনি আরোহ প্রণালী (Inductive Method) ব্যবহার করিয়া, সুখ ও দুঃখের অভিজ্ঞতা হইতে নৈতিক বিধিগুলি (moral laws) নির্ধারণের চেষ্টা (empirical hedonism) করেন নাই। আবার ভাববাদী গ্রীন্ ও হেগেলের মতো কতগুলি উদ্দেশ্য বা আদর্শ দ্বারা তাহাদের ব্যাখ্যা করিতে (Idealistic hedonism) চেষ্টা করেন নাই। তিনি জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা হইতে অবরোহ প্রণালী দ্বারা নৈতিক বিধিগুলি পাইতে (evolutionary hedonism) চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "নীতিবিদ্যার কাজ হইতেছে, জীবনের নীতি হইতে, অবরোহ প্রণালী দ্বারা নির্ধারণ করা, কোন্ জাতীয় কাজ স্বভাবতঃই সুখের বিধায়ক, এবং কোন্ জাতীয় কাজ স্বভাবতঃই দুঃখদায়ক। সেই নীতি অনুযায়ীই আচরণ নির্ধারণ করিতে হইবে—কোন কাজ হইতে কতটা সুখ বা দুঃখ পাওয়া যাইবে তাহার হিসাবনিকাশ দ্বারা নয়।"[১]

জীবনের নীতি হইতেছে, বাহ্য ও অন্তরের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা

জীবনের নীতি কি? জীবনের নীতি হইতেছে প্রাণীর বাহ্য ও অন্তর সম্বন্ধের সতত সামঞ্জস্য বিধান (the continuous adjustment of internal relations to external relations)। জীবনের ইহাই মৌলধর্ম যে, প্রাণী বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে সুসমঞ্জস সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সতত যত্নশীল। প্রাণীর যে ক্রিয়া এই সামঞ্জস্য বিধানে সহায়ক, তাহার পক্ষে তাহাই সুখকর; তাহাই অন্ততঃ তৎকালের জন্য জীবনশক্তির অনুকূল—সুতরাং তাঁহাই প্রাণীর পক্ষে কল্যাণকর। সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস ও সম্পূর্ণ সুখকর কর্ম অতিশয় বিরল। কাজেই যেই কাজের ফলে, দুঃখের চেয়ে সুখের পরিমাণ বেশী হওয়ার সম্ভাবনা, প্রাণীর পক্ষে সেই কর্মই অপেক্ষাকৃত শুভ বা কল্যাণকর। দুঃখের পরিমাণ যেখানে বেশী, তাহা জীবনের পক্ষে ক্ষয়কারক, তাহা অশুভ, তাহা পরিত্যাজ্য। সুতরাং, স্পেন্সারের নৈতিক আদর্শ, প্রেয়োবাদকেই সম্পূর্ণ সমর্থন করে। প্রাণী স্বভাবতঃই সুখকর কাজে আকৃষ্ট হয়, সেই জন্যই প্রাণিজগৎ টিকিয়া আছে এবং ক্রমশঃ তাহার বিস্তার ঘটিতেছে। বিপরীত হইলে, প্রাণিজগৎ ধ্বংস হইয়া যাইত। ক্রমবিকাশের অর্থই হইল, বাহ্য ও অন্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি। সুতরাং সেই আচরণই শুভ (good) যাহাতে অন্তরের আকাঙ্ক্ষা এবং আচরণের

১। H. Spencer—The Data of Ethics

ফলের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয়। কোন আদর্শ তখনই উচ্চতর বলিয়া বিবেচিত হইবে, যখন তাহা অধিকতর সামঞ্জস্য বিধানে সহায়ক। এই উচ্চতর আদর্শ যতই সার্থক হইবে, ততই জীবন দীর্ঘতর হইবে, এবং তাহার বিস্তার ঘটিবে—a prolongation of life and an increased amount of life, ইহাই হইল সমস্ত আচরণের আশু উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহার চরম উদ্দেশ্য হইতেছে, সুখলাভ—the ultimate end of life is happiness। এই সূত্র অনুযায়ীই নৈতিক আদর্শের উন্নয়ন বা ক্রমবিকাশ ঘটে।[২] আত্মসুখ-প্রাপ্তির (egoism) আদর্শ অপেক্ষা উপযোগবাদের আদর্শ (Utilitarianism) উচ্চতর, কারণ মানুষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া দেখিতে পায়,—সম্পূর্ণ স্বার্থান্ধ আচরণ বহু সংঘর্ষ ও বিরোধের সৃষ্টি করে—তাহা বাহ্য ও অন্তরের সামঞ্জস্য বিধানের সহায়ক নয়। আবার বিশুদ্ধ পরার্থপরতা এবং আত্মসুখ বিসর্জনও জীবনধর্মের বিরোধী। আত্মসুখবাদ ও পরসুখবাদ এই দুই বিপরীত আদর্শের সমন্বয় একদিনে ঘটে নাই, বহু যুগ ধরিয়া ধীরে ধীরে এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হইতেছে। আজও সেই সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ সাধিত হয় নাই। এক সুদূর ভবিষ্যতে আত্মসুখ অনুসরণ ও পরসুখ সাধনের আনন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না, এবং সেই স্বর্গরাজ্য যেদিন প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেদিন পরসুখ সাধনের মধ্যে কোন ক্লেশ থাকিবে না। মানব সমাজের ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরে, মানুষ যাহাতে সৎপথে চলে সে জন্য কিছুটা বাহিরের শাসন-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়। এই স্তরে বাহ্য ও অন্তর সমস্ত সম্পর্কের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটে না বলিয়াই, বিরোধ ও বিদ্রোহ কিছুটা দেখা যায়। সেই জন্যই কর্তব্যের ধারণার মধ্যে কিছুটা কঠোরতা, শুষ্কতা ও বাহিরের শাসনজনিত বিরক্তিবোধ থাকে। কিন্তু সমাজের উচ্চতম বিকাশ যেদিন ঘটিবে, সেদিন কর্তব্যপালন সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দময় হইবে।[৩] সমাজবিকাশের অসম্পূর্ণ অবস্থায়, ব্যক্তি নিকটবর্তী কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে। কিন্তু সমাজবিকাশ যতই সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে

যাহা সুখকর তাহা জীবনবর্ধক,— যাহা দুঃখকর তাহা জীবন-ক্ষয়কারক

আত্মসুখবাদ হইতে উপযোগবাদে উত্তরণ ক্রমবিকাশের ফলেই হইয়াছে

নীতিজীবনের প্রথমে থাকে বাহিরের শাসনক্রমে আসে অন্তরের শাসন

২। Lillie—An Introduction to Ethics, Pp. 183-84

৩। "The sense of duty or moral obligation is transitory, and will diminish as fast as moralisation increases. While at first the motive contains an element of coercion, at last this element of coercion dies out, and the act is performed without any consciousness of being obliged to perform it" Spencer—The Data of Ethics

থাকিবে, ততই দূরবর্তী, ভাবগত ও সাধারণ উদ্দেশ্য ও আদর্শ দ্বারা ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রিত হইবে—the individual's conduct will be controlled by remote ideal and general ends.

প্রাণিজগতে যেমন প্রকৃতি যাহা দেশোপযোগী, সময়োপযোগী, অবস্থা-উপযোগী সেই রূপটিকেই বাছিয়া নেয়, নৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রেই তাহাই ঘটে। কোন বিশেষ কালে, কোন বিশেষ সমাজে, কোন বিশেষ অবস্থায়, কোন বিশেষ আদর্শ তৎকালীন সমাজজীবনের উপযোগী হয় বলিয়াই, তাহা সেই সমাজে মূল্য লাভ করে, সেই আদর্শ সেখানে গৃহীত হয়। সুতরাং স্পেন্সারেব মতে, দেশ-কাল-অবস্থা-নিরপেক্ষ ধ্রুব ও অপরিবর্তনীয় কোন নৈতিক আদর্শ নাই। ক্রমবিবর্তনের ধারায় সেই আদর্শই গৃহীত ও নির্বাচিত হয়, যাহা জীবনের সঙ্গে পরিবেশের সামঞ্জস্যবিধানে সর্বাপেক্ষা সাফল্য লাভ করে। তবে তাঁহার মতে সমস্ত নৈতিক আচরণেব তিনটি উদ্দেশ্য আছে, আয়ুবৃদ্ধি—(prolongation of life), জীবনেব পরিধির বিস্তার (fulness of life) এবং সুখলাভ। এবং তাঁহার মতে এই তিনটি উদ্দেশ্যই মূলতঃ এক। এবং এই মূল উদ্দেশ্য সাধনে যে আদর্শ যত সফল, তাহাই তত উচ্চ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সেই আদর্শই গৃহীত হয় যাহা তৎকালীন সমাজজীবনেব উপযোগী

কোন ধ্রুব, অপবিবর্তনীয় নৈতিক আদর্শ নাই

সমালোচনা—হার্বার্ট স্পেন্সার মানুষেব নীতিবোধকে জীবনেব প্রয়োজনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত করিয়া, নীতিবিদ্যাব আলোচনাকে একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ পথ দেখাইয়াছেন। এতদিন নৈতিক আদর্শের আলোচনা ছিল নিতান্তই ভাব-নির্ভর, অনেকাংশে নিরালম্ব। স্পেন্সারের পব হইতে নীতিবিদ্যা বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত হইল। নৈতিক আদর্শেরও যে ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং ক্রমবিবর্তন আছে, তাহা জানিবার বুঝিবার প্রযোজন আছে।

স্পেন্সাব নীতিবোধকে জীবনেব প্রযোজনেব সঙ্গে যুক্ত কবিযা একটি সম্ভাবনাপূর্ণ পথ দেখাইযাছেন

পবিবেশের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য বিধান জীবনের মৌলিক ধর্ম। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই মানুষের প্রচেষ্টা হইতেছে সুসঙ্গতির অভিমুখে। নীতির ক্ষেত্রেও আমরা ক্রমশঃ এই সঙ্গতি বিধানের চেষ্টাই দেখিতে পাই। মানুষের নৈতিক বিকাশ অর্থই হইতেছে মানুষ মানুষের সঙ্গে অধিকতর সুসমঞ্জস সম্বন্ধ স্থাপনে অবিরত চেষ্টা করিতেছে।—মানুষের উদ্দেশ্য ক্রমশঃ অধিকতর প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন ও বিশুদ্ধতর বিধিবিধান প্রণয়ন

নীতিব ক্ষেত্রেও দেখা যায় জীবনেব সঙ্গে সঙ্গতিবিধানেব চেষ্টা

("Sweeter manners, purer laws")। কিন্তু এই সুসঙ্গতি বিধান মানে কি? সঙ্গতিবিধান করিতে হইলেই আমাদের কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শ থাকা চাই, যাহার সহিত সঙ্গতি আমরা কাম্য বলিয়া মনে করিতেছি। পশুস্তরে জীবনের অর্থ হইতেছে, বাহিরের পরিবেশের সঙ্গে তাহার ব্যবহারের সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা। পশুর ক্ষেত্রে, এই সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা অচেতন, বড জোর অবচেতন। পশু তাহার ভিতরকে বাহিরের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করে। ইহাকেই হয়তো জীবনধর্ম বলা যায়। কিন্তু মানুষের জীবনে এই সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা সচেতনভাবে ঘটে। মানুষ উদ্দেশ্য স্থির করিয়া, নিজেব ব্যবহার তাহার সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করে—এখানে ভিতরের সঙ্গে বাহিবকে খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা। নীতির জগতে মানুষ সচেতন ভাবেই বোধ করে, আদর্শের সঙ্গে আচরণের অসঙ্গতি এবং বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া সে নীতিবান্ হয় না; ববঞ্চ নিজ আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাহিবেব প্রকৃতির সঙ্গতিবিধান করে বলিয়াই সে নীতিবান্ হয়।[8] সুতরাং, জীবনেব ক্ষেত্রে সঙ্গতিবিধান করা অর্থ নীতিবান্ বা আদর্শবান্ হওয়া, একথা না বলিয়া বরং বিপরীতভাবে, এই কথাই বলা উচিত যে, মানুষ নীতি বা আদর্শ দ্বারা চালিত হয় বলিয়াই, জীবনের ক্ষেত্রে সে সঙ্গতি খুঁজিয়া পায়। নীতি জীবনকে অনুসবণ করে না। জীবনই নীতিকে অনুসরণ করে। ম্যাকেঞ্জী তাই হার্বার্ট স্পেন্সারের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ঘোড়ার আগে গাড়ীকে জুতিয়াছেন।[৫] লিলি অবশ্য ম্যাকেঞ্জীর

কিন্তু সঙ্গতি বিধান তো নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য-সাধক

নীতি জীবনকে অনুসরণ করে না, জীবন নীতিকে অনুসবণ করে

নীতিবিদ ঐতিহাসিক নন, তিনি আদর্শ নির্দেশ করেন

৪। The main problem is not to adapt the inward to the outward, but the outward to the inward, not to mould the self to conformity with nature, but to mould nature to increasing conformity with moral and aesthetic ideals. Muirhead—The Elements of Ethics, P. 161

৫। ......a little reflection seems to show that the Spencer's theory involves a kind of Hysteron Proteron, or putting the cart before the horse ....Adjustment seems to have no meaning unless we presuppose some ideal form of adjustment, some end that is consciously or unconsciously sought. But if so, then it is surely rather with this idea of this end that we ought to start, than with the mere idea of the process of adjustment, in which the end is presupposed. MacKenzie—A Manual of Ethics, Pp. 239-40

এই সমালোচনাকে খুব সঙ্গত মনে করেন না। তিনি বলেন যে স্পেন্সার তো স্পষ্টই বলিয়াছেন, (১) আয়ুবৃদ্ধি (prolongation of life), (২) জীবনের ঐশ্বর্যবৃদ্ধি (increased amount of life), (৩) সুখলাভই সমস্ত মানবিক চেষ্টার উদ্দেশ্য।

স্পেন্সার ঘোড়ার আগে গাড়ীকে জুতিয়াছেন

কিন্তু কথা হইতেছে ইহাদিগকেই নৈতিক আদর্শ বলা যায় কিনা। তা ছাড়া, আয়ুবৃদ্ধি কি সুখবৃদ্ধির নিয়ত কারণ? আর নৈতিক জীবন মানে কি জীবনের ঐশ্বর্য ও বিস্তার বৃদ্ধি? বরঞ্চ ইহাই কি সত্য নয় যে নৈতিক জীবন সরল, অনাড়ম্বর জীবন—সেই জীবন, যাহা সত্য ও পবিত্রতা রূপ স্বল্প কয়েকটি আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? এবং সুখ আহরণকেই কি জীবনের শেষ আদর্শ বা উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করা যায়? হাববার্ট স্পেন্সারের ক্রমবিবর্তনবাদ অনুযায়ী যতই কাল অগ্রসর হইতেছে, নৈতিক বুদ্ধি ও আদর্শেরও উন্নতি হইতেছে। আমরা কি এই বিংশ শতাব্দীতেই দেখি নাই ভীষণতম, সর্বনাশা বিশ্বযুদ্ধ, জঘন্যতম জাতিবিদ্বেষ, পৃথিবীর বুক হইতে মানব সভ্যতা মুছিয়া ফেলিবার ভয়ংকর ষড়যন্ত্র? ইহারই নাম কি জীবনের বিস্তার? সর্বশেষ, একথা নিশ্চিতই বলা যায়,—মানুষ জীবনে সুখকেই শ্রেষ্ঠ মূল্য দেয় নাই বলিয়াই মানুষ বড় হইয়াছে—পশুর স্তর ছাড়াইয়া সে ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। শৌর্য, বীর্য, আত্মত্যাগ ও মহত্ত্বের যে আদর্শকে মানুষ দাম দিয়াছে, তাহার জন্য অকুণ্ঠচিত্তে মানুষ সুখ বিসর্জন দিয়াছে। অকর্মণ্য, রুগ্ণ, বৃদ্ধ ও অক্ষমদের ধ্বংস করিয়া ফেলিলেই হয়তো মানুষজাতির সুখ, আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য বাড়িত,—তথাপি জীবনের বিস্তারের লোভেও মানুষ এই কাজ আজও করে না।[৬] কাজেই মানুষ কোনদিনই সুখকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। সুখের মধ্যে, ভোগের মধ্যে কোথায় যেন ক্ষুদ্রতা আছে, তাই মানুষ সুখভোগ করিয়া গর্ববোধ করিতে পারে না, স্বস্তি বোধ করে না। ঐশ্বর্যের বিকার অহরহঃ মানুষের মহত্ত্বকে লজ্জা দেয়, তাই সংসারত্যাগী, বিত্তবিমুখ সন্ন্যাসী যুগে যুগে মানুষের পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। মানুষের শ্রেষ্ঠ দেবতা ঐশ্বর্যের দ্যুতিমণ্ডিতা লক্ষ্মী নয়, জটাজুটধারী ভস্মাচ্ছাদিততনু শিব—ভোলা মহেশ্বর।

মানুষ সুখকে শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়াই বড় হয় নাই—সুখকে উপেক্ষা করিয়াই মানুষ মহত্ত্ব অর্জন করিয়াছে

৬। "There is certainly richness of living brought about by modern invention, but there is dispute as to whether it is the kind of richness which could be called morally better? Rousseau did not think so, and Mr. Gandhi took the same view People of the same outlook would also deny that the developed life of civilised man is more pleasant than the life of the primitive man. Lillie—An Introduction to Ethics, P. 186

লেজ্‌লী স্টিফেনের ক্রমবিকাশবাদী প্রেয়োবাদ—

নৈতিক আদর্শ আলোচনায়, স্পেন্‌সার ছাড়াও আর দুই জন দার্শনিক ক্রমবিকাশবাদের ধারণাটি ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম হইলেন লেজ্‌লী স্টিফেন্ ও দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার।

লেজ্‌লী স্টিফেনও ক্রমবিকাশবাদী

স্পেন্‌সার ক্রমবিকাশের ধারার একটি শেষ পরিণতি, একটি চরম শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শের কথা বলিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় অন্তর ও বাহির, ব্যক্তি ও সমাজ, কর্তব্য ও আনন্দের চূড়ান্ত সমন্বয় ঘটিবে। তখন মানুষ স্বেচ্ছায় সানন্দে নীতির পথে বিচরণ করিবে,—সেদিন বাহিরের কোন শাসন বা তাড়নার কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

স্পেন্‌সার নীতির ক্রমবিকাশের ধারায় বাহ্য ও অন্তরের একটি চূড়ান্ত সমন্বয়ের স্তরে বিশ্বাস করিয়াছেন

লেজ্‌লী স্টিফেন্-এর নীতিবাদ এরকম একটি চরম সমন্বয়ের স্তর স্বীকার করে নাই।

স্পেন্‌সার নীতির মাপকাঠি ধরিয়াছিলেন সুসামঞ্জস্য—সুসঙ্গতি (proper adjustment)। স্টিফেন্ বলিলেন, নৈতিকতা অর্থ হইল সমাজজীবনের স্বাস্থ্য। তাহাই সদ্‌গুণ, যাহা সমাজজীবনে স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়ক।[৭] তাঁহার মতে, নীতিবিদ্যার আলোচনার প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রাচীনপন্থীরা নৈতিক আদর্শকে ব্যক্তির দিক হইতে দেখিয়াছেন। উপযোগবাদীরা যখন সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণের সুখের কথা বলিয়াছেন, তখনও ব্যক্তিই ছিল তাঁহাদের হিসাবের একক.

স্পেন্‌সার সুসামঞ্জস্যকেই নীতির শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন

কিন্তু নৈতিক জীবনের একক ব্যক্তি নয়, সমাজ। সমাজ একটি জীবদেহের মত জীবন্ত ও বহু অংশযুক্ত সুবিন্যস্ত সংস্থা, ব্যক্তিরা সেই জীবদেহেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। যেমন জীবদেহে, তেমনি সমাজজীবনে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা ব্যক্তিরা নিজস্ব সত্তা নয়। তাহাদের শুভাশুভ, তাহাদের সুপরিণতি তাহাদের নিজস্ব বিচ্ছিন্ন চেষ্টা বা ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না। প্রত্যেক ব্যক্তি আলাদা আলাদা নিজ নিজ সুখের পরিমাণ হিসাব করিয়া কাজ করিবে, ইহা নৈতিক আদর্শ নয়। সমাজ একটি ক্রমবিকাশমান জীবন্ত সংস্থা, এবং তাহার স্বাস্থ্য ও সজীবতাই ব্যক্তিদের সুখ ও

স্টিফেনের মতে নৈতিক কর্মের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য সমাজজীবনের স্বাস্থ্য

যাহা সমাজজীবনের স্বাস্থ্য ও সতেজতা বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল, তাহারই শ্রেষ্ঠ মূল্য

৭। A moral rule is a statement of a condition of social welfare. Virtue means efficiency with a view to the maintenance of social equilibrium. Leslie Stephen—Science of Ethics, P. 450

স্বাস্থ্যের কারণ। সুতরাং ব্যক্তির সমস্ত ক্রিয়ার মূল্য নির্ধারিত হইবে এই মাপকাঠি দিয়া—তাহা সমাজজীবনের স্বাস্থ্য ও সতেজতা বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল কিনা। যাহা স্বাস্থ্যকর তাহা সুখকরও বটে, কিন্তু আচরণের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য সুখলাভ নয়, সুস্থতা বিধান। যেখানে সমাজদেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্বন্ধ মসৃণ বিরোধ-হীন, সেখানেই শক্তি, আনন্দও কার্যকারিতা বৃদ্ধি। ব্যক্তি যতই সমাজজীবনের স্বাস্থ্য, সতেজতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির সহায়ক হইবে, ততই সে নিজেও শক্তি ও সুখের অধিকারী হইবে। নৈতিক ক্রমবিকাশের ইহাই লক্ষণ যে, সমাজের সহজাত আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের সঙ্গে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের একাত্মতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। বাহিরের দিক হইতে দেখিলে, নৈতিক বিধিগুলি হইতেছে সমাজের স্বাস্থ্য ও সতেজতা বৃদ্ধির উপযোগী অবস্থা, এবং তাহার আন্তরিক দিক হইতেছে ব্যক্তির মনে সমাজের স্বাস্থ্যের অনুকূল অনুভূতি বা সহজ বোধের সৃষ্টি। বিবেক হইতেছে, ব্যক্তির অন্তরে সমাজের স্বাস্থ্যের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ—ব্যক্তির কাছে বিবেকের আদেশ হইল সে যেন সমাজের স্বাস্থ্যের উপযোগী প্রাথমিক শর্তগুলি পরিপূরণ করে। ব্যক্তির অন্তরে সমাজের প্রয়োজন ও প্রচেষ্টার সঙ্গে সমতাবোধকেই বলা যাইবে তাহার নৈতিক চেতনা। সমাজ ও ব্যক্তির স্বাস্থ্য যতই ক্রমবিকশিত হইতে থাকিবে, ততই দুইয়ের মধ্যে সমত্ববোধ বৃদ্ধি পাইবে এবং নৈতিক গভীরতম অনুভূতিগুলি ব্যক্তি ও সমাজের মনে সহজ ও স্থায়ী হইয়া উঠিবে।[৮]

নৈতিক বিধিগুলি সমাজের স্বাস্থ্য ও সতেজতা বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা

বিবেক হইতেছে ব্যক্তির অন্তরে সামাজিক স্বাস্থ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা

সমালোচনা—ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধটি যে অত্যন্ত নিবিড় এবং ব্যক্তির সুখ, স্বাস্থ্য, শান্তি যে সমাজজীবনের সঙ্গে সুসঙ্গতির উপর নির্ভর করে, এই সত্যটি

৮। The 'useful' in the sense of pleasure-giving, must approximately co-incide with the 'useful' in the sense of life-preserving.. objectively considered, moral laws may be identified with the conditions of social vitality and morality may be called "the sum total of the preservative instincts of the society corresponding to social welfare or health, the objective end, there is in the member of society, a social instinct or sympathy with that welfare or health ..the conscience is the utterance of the public spirit of the race, ordering us to fulfil the primary conditions of its welfare. The growth of society implies, as its correlate the growth of a certain body of sentiments in its members, and in accordance with the law of Natural Selection, this instinct, as pre-eminently useful to the social organism, will be developed—at once extended and enlightened. Seth—A Study of Ethical Principles, P. 109-101

লেজ্‌লী স্টিফেন্‌ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহাও সত্য যে নীতিবোধ ও নৈতিক আদর্শ বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়—সমাজের সুস্থ বিকাশ ব্যক্তির সুস্থ নীতিবোধের জন্য একান্ত প্রয়োজন, এ সত্যও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সমাজ প্রাণীদেহের মতো জীবন্ত সত্তা এবং ব্যক্তিরা সেই দেহের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র, ইহা একটি সার্থক উপমা সত্য, কিন্তু ইহা উপমাই। লেজ্‌লী স্টিফেনের মতো সমাজবাদীরা ইহাকে প্রায় বাস্তব সত্য বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু তাহা সত্য নয়। ব্যক্তির ঊর্ধ্বে সমাজের একটি জীবন্ত সত্য অস্তিত্ব আছে, ইহা মনে করা ভুল হইবে। তা ছাড়া, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ যতই নিবিড় হউক, ব্যক্তি সমাজের অঙ্গমাত্র নয়। তাহার স্বাধীন ইচ্ছা, অনুভূতি ও উদ্যম আছে, এবং তাহার সমস্ত নৈতিক সমস্যাই সামাজিক নয়। সমাজের কাছেই তাহার দায়িত্ব আছে এমন নয়, নিজের ও তাহার আত্মমর্যাদা আছে, আত্ম-উন্মোচনের প্রয়োজন আছে। অবশ্যই ইহা স্বীকার্য যে, তাহার সুসম আত্মবিকাশ, তাহার কল্যাণ ও আনন্দ, সমাজের সুসমঞ্জস বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু এই দুই অভিন্ন নয়। ব্যক্তির নিজস্ব সুখদুঃখ আছে, নিজস্ব সমস্যা আছে, নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিকাশের দাবি আছে। সমাজের সুখ, দুঃখ, স্বাস্থ্য এ সমস্তই উপমা। কিন্তু ব্যক্তির সুখ, দুঃখ, চেতনা, অনুভূতি, স্বাস্থ্য এইগুলি বাস্তব সত্য। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও আনন্দ—তাহার সম্পূর্ণ আত্মবিকাশই সমস্ত সামাজিক উদ্যমের শেষ উদ্দেশ্য। যেখানে ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সম্পূর্ণ বিধান হইয়াছে, তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ আছে—সেখানেই সমাজ সুস্থ। সমাজের নিজস্ব কোন চেতনা, ইচ্ছা, উদ্যম নাই—ব্যক্তিদের সম্মিলিত সুসমঞ্জস উদ্যমই সমাজের স্বাস্থ্যবিধান করে। সমাজের জন্য ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির জন্যই সমাজ।

ব্যক্তির সুখ ও শান্তি সমাজজীবনের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভরশীল, ইহা সত্য

কিন্তু সামাজিক স্বাস্থ্য একটি উপমা মাত্র—সমাজ একটি জীবন্ত পৃথক সত্তা নয়

ব্যক্তির সমস্ত কর্তব্য সমাজের কাছেই নয়

সমাজ-বাতিরিক্ত ব্যক্তির নিজস্ব জীবন আছে; ব্যক্তির সুস্থ বিকাশেই সমাজের সুস্থ বিকাশ

সমাজের স্বাস্থ্যকে শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া স্টিফেন প্রেয়োবাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিলেন। তিনি সুখের চেয়েও সর্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যকে উচ্চতর স্থান দিলেন, যদিও অবশ্য তিনি বলিলেন যে স্বাস্থ্যই সুখ। তাহা সত্য, কিন্তু সুখই স্বাস্থ্য নয়। মদ্যপান ক্ষণিক সুখকর হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা স্বাস্থ্যের

সুখের চেয়েও বড় আদর্শ সর্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য

পক্ষে হানিকর। যখন তিনি সামাজিক স্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি প্রেয়োবাদের ভূমি ত্যাগ করিলেন—তিনি সুখকেও স্বাস্থ্যের উচ্চতর মাপকাঠিতে মাপিলেন। কিন্তু যাহাকে স্টিফেন বলিলেন স্বাস্থ্য, বা স্পেন্সার বলিলেন অন্তরের ও বাহিরের সুসামঞ্জস্য, তখন বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা পরিপূর্ণ বিকাশের (Perfectionism) উচ্চতম আদর্শের প্রতিই ইঙ্গিত করিলেন। সেই আদর্শ পরে আমরা আলোচনা করিব। এখানে এটুকু শুধু বলা যাইতেছে যে সুখের তীব্রতা বা পরিমাণ দিয়া স্বাস্থ্য নির্ধারিত হয় না। মানুষের প্রবৃত্তিগুলি যখন বিচার দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত, ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সমাজের প্রয়োজনের মধ্যে যখন যুক্তিদ্বারা সুসমঞ্জস সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা হয়, তখনই সমাজ ও ব্যক্তি দুইয়েরই পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। সামাজিক স্বাস্থ্য সেই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যের বা শেষ লক্ষ্যের আনুষঙ্গিক লক্ষণ বটে, কিন্তু ইহাই শেষ উদ্দেশ্য নয়। সুসঙ্গতিই শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণ নয়। নরহত্যার সহিত যুক্ত দুঃসাহসী ব্যাঙ্ক ডাকাতি খুব সুসঙ্গত প্ল্যানের ফল হইতে পারে। কিন্তু যেহেতু ইহা সুসঙ্গত যে জন্যই ইহা নৈতিক কার্য, ইহা নিশ্চয়ই সত্য নয়। 'সুসঙ্গতি' সর্বদাই কোন শুভ উদ্দেশ্য বা আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি হইতে হইবে, তবেই কোন কার্য নীতিগুণসম্পন্ন বা প্রশংসনীয় হইবে।[৯]

এই আদর্শ সম্পূর্ণতা-বাদের আদর্শের (Perfectionism) দিকে ইঙ্গিত,

স্বাস্থ্য ও সুসঙ্গতি শেষ আদর্শ নয়, ইহাদেরও কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য থাকিতে হইবে—তাহা হইল ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ

আলেকজাণ্ডারের ক্রমবিকাশভিত্তিক প্রেয়োবাদ—Evolutionary Hedonism of Alexander.

আলেকজাণ্ডারও স্টিফেন-এর মতো ব্যক্তির প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য এবং ব্যক্তি ও সমাজের ইচ্ছা ও ক্রিয়ার মধ্যে সুসঙ্গতি ও ভারসাম্য স্থাপনকেই (establishment of an equilibrium) শ্রেষ্ঠ আদর্শ বিবেচনা করিয়াছেন।[১০] তিনি জৈব ক্রম-বিকাশবাদীদের 'প্রকৃতির নির্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (Natural selection and survival of the fittest) ধারণাকেও নৈতিক আদর্শের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার

আলেকজাণ্ডারের মতে বিপরীত প্রবৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য ও ব্যক্তি ও সমাজের আকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়ার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনই শ্রেষ্ঠ আদর্শ

৯। ...co-herence or equilibrium among the different tendencies of an individual or a community is of very little moral value unless the tendencies are in themselves good tendencies.

Lillie—An Introduction to Ethics, P. 189

১০। This moral ideal is an adjusted order of conduct which is based upon contending inclinations and establishes an equilibrium between them. Goodness is nothing but this adjustment in the equilibrated whole. Alexander—Moral Order & Progress, Bk, III. Ch. IV

করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, প্রাণিজগতে এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল, হইল দুর্বলদের ধ্বংস ও বিনাশ। "কিন্তু মানুষের চিন্তা ও নীতির ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ (দুর্বলের বিরুদ্ধে সবলের), যে ব্যক্তি দুর্বল, বা যে নিজেকে সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারিল না, তাহার বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু তাহাদের আদর্শ বা জীবনধারার (বা দৃষ্টিভঙ্গীর) বিরুদ্ধে। প্রকৃতি সেই আদর্শ বা জীবনধারাকে সহ্য করে না, বা টিকিয়া থাকিতে দেয় না, যাহা সমাজের মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।" অর্থাৎ এখানে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির সংগ্রাম নয়, অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ মত বা ভাবের বিরুদ্ধে, অধিকতর সুসঙ্গত ও সুসম্পূর্ণ মতের সংগ্রাম। এই সংগ্রাম শারীরিক সংগ্রাম নয়, ইহা বুদ্ধিবিচার দ্বারা দুর্বল মতের পরাভব। সমাজের মধ্যে একজন ব্যক্তি হয়তো নূতন একটি ভাব, নূতন একটি জীবনাদর্শ নিয়া সমাজে দেখা দেয়। তাঁহার সেই ভাব ও আদর্শ সমাজের প্রচলিত প্রথা ও আদর্শের বিরোধী। কাজেই এ দুইয়ের মধ্যে সংগ্রাম অনিবার্য। কিন্তু সেই নূতন ভাব ও আদর্শের মধ্যে যদি অধিকতর মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে, যদি তাহা সত্যতর আদর্শ হয়, এবং নূতন ভাবের প্রচারক যদি নিষ্ঠাবান্ হন, তবে সেই নূতন মত, প্রাথমিক বিরূপতা, উপহাস ও অত্যাচার সত্ত্বেও ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক চিন্তাশীল মানুষের সমর্থন লাভ করিবে। ক্রমেই নূতন আদর্শ জয়যুক্ত হইয়া, প্রাচীন আদর্শের পরিবর্তে, সম্মানের স্থান অর্জন করিবে। কাজেই চিন্তা ও নৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ বা সংগ্রামের দ্বারা কোন মত বা আদর্শ প্রাধান্য লাভ করে না। যুক্তিপ্রদর্শন ও শিক্ষাদ্বারাই দুর্বলতর মতকে পরাভূত করা হয়।[১১]

চিন্তা ও ভাব জগতেও উচ্চতর আদর্শ নিম্নতর আদর্শকে ধ্বংস করিয়া স্থাপিত হয়

উচ্চতর আদর্শ সম্পূর্ণতর সমন্বয়ের প্রতিশ্রুতি বহন করে

উচ্চ-নীচ আদর্শের সংগ্রাম—ভাবজগতে ইহার অস্ত্র হইল যুক্তিবিচার

সমালোচনা—আলেকজাণ্ডার নীতির ক্ষেত্রেও 'প্রকৃতির নির্বাচনে'র ধারণাটি যেমনভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অভিনব এবং শিক্ষাপ্রদ। কিভাবে নৈতিক আদর্শ স্থাপিত হয়, পরিবর্তিত হয়, ইহার ইতিহাস হিসাবে তাঁহার এই মত বিশেষ শিক্ষাপ্রদ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু নীতিশাস্ত্রে আদর্শের বিকাশের ইতিহাস

নীতির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণাটি অভিনব

১১। Persuation & education, in fact, without destruction, replace here the process of propagation of its own species and destruction of the rival ones, by which in the natural world species become numerically strong and persistent...Persuation corresponds to the extermination of the rivals... the victory of mind over mind consists in persuation. Ibid—Pp. 414, 420

মুখ্য বিবেচ্য বিষয় নহে। নীতিশাস্ত্রের কাজ হইতেছে, কেন কোন আদর্শ উচ্চতর ও গ্রহণীয়, তাহার কারণ নির্দেশ করা। আলেকজাণ্ডার নিজেও একথা এক জায়গায় স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কোন একটি মত সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই জন্যই ইহা ভাল হইয়া গেল, ইহা বলা যায় না। তবে কোন মত সফল হইয়াছে, ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, ইতিহাসের ধারায় 'ইহা ভাল' এ প্রকার চিহ্নিত হইয়াছে।"

কিন্তু নীতিশাস্ত্রের কাজ এই সংগ্রামের ক্রমিক স্তরগুলি বর্ণনা নয়, কেন একটি স্তর বা আদর্শ উচ্চতর তাহা নির্দেশ

কিন্তু তাহা হইলে আমাদের প্রয়োজন কোন উদ্দেশ্য বা মাপকাঠি, যাহা দিয়া কোন আদর্শের নৈতিক উৎকর্ষ পরিমাপ করা যাইবে। কি সে মাপকাঠি, সমস্ত সং বা উচ্চ আদর্শের মধ্যে সামান্য লক্ষণটি কি? তাহার উত্তরে তিনি স্পেন্সার বা স্টিফেনের মতোই বলিলেন, সেই জীবনাদর্শ ই শুভ, যাহা বর্তমান সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সবচেয়ে বেশী সঙ্গতিপূর্ণ। যেখানে এই সঙ্গতি থাকে, সেখানে বিরোধ দূরীভূত হয়, সমাজ ও ব্যক্তি মসৃণভাবে পরস্পরের কল্যাণে যুক্ত হইয়া উত্তম প্রকাশে রত হয়। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, এই সুসমঞ্জস সামাজিক অবস্থা হইতেছে, যেখানে সমাজের কোন অংশ, অন্য কোন অংশের স্বাধীন ও মসৃণ ক্রিয়ায় বাধা জন্মায় না।—এবং সমাজ সমগ্রভাবে এবং তাহার অন্য অংশ-গুলির সঙ্গে একটি সুসঙ্গত ভারসাম্যের অবস্থা রক্ষা করে। "কিন্তু নীতিবিদ্যার যে মূল প্রশ্ন তাহার উত্তর তো ইহাতে পাওয়া গেল না। সাম্যাবস্থাই বা শ্রেষ্ঠ আদর্শ কেন? কোন আদর্শের উৎকর্ষ বিচারে সর্বদাই এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া চাই,—কি তাহার উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য, যুক্তিসঙ্গত ও নৈতিক বিচারে শুভ বলিয়া প্রমাণিত কিনা। সমাজের সুস্থিত অবস্থাই (অথবা সামাজিক স্বাস্থ্য, বা সমাজ ও ব্যক্তির সুসঙ্গতি) যদি কাম্য হয়, তবে কেন তাহা কাম্য? তাহা নিশ্চয়ই কোন ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য (some future end) সাধন করে। কিন্তু ক্রমবিকাশবাদীদের ব্যাখ্যা হইতেছে বিপরীত দিক হইতে। তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে চান, অতীতের অবস্থাগুলি, যাহা বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার সমাবেশে বা ধাক্কায় বর্তমান অবস্থার উদ্ভব। জড়বিজ্ঞান আলোচনার পক্ষে এই এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যা (mechanical explanation) গ্রহণীয় হইতে পারে। কিন্তু জীবনের

কোন্ উদ্দেশ্যের পোষণ, এই মাপকাঠি?

ক্রমবিকাশবাদীদের সকলের মতেই ইহা হইতেছে অধিকতর সঙ্গতিবিধান—বিরোধ দূরীকরণ

সুসঙ্গতি শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়

সুসঙ্গতি নৈতিক আদর্শ হিসাবে মূল্যবান্ কারণ ইহা ব্যক্তি ও সমাজের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক ও সাধক

ক্ষেত্রে, বা নীতির ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা অচল। নৈতিক জীবন বা আদর্শকে ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য দ্বারাই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এবং তাহা করিতে গেলে, আমাদের স্বীকার করিতে হয় যে, শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইতেছে ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম বিকাশ। এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হইল, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবন্ত ব্যক্তিত্ব। ইহাই মানুষের স্ব-ভাব—এই স্বভাবে মানুষ যখন সম্পূর্ণ বিকশিত হয়, তখনই ঘটে সম্পূর্ণ সুসঙ্গতি, তাহারই প্রকাশ বা চিহ্ন হইতেছে, সামাজিক স্বাস্থ্যে, ব্যক্তির কল্যাণে ও পরিপূর্ণ আনন্দ লাভে।[১২] এই আদর্শকেই Perfection বা Eudaemonism নাম দেওয়া হইয়াছে। পরে এই শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ আলোচনা করিব।

তাহাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ

সমস্ত প্রকার প্রেয়োবাদের মূল্যবিচার—An evaluation of the hedonistic theories.

প্রেয়োবাদ সহজবোধ্য নৈতিক আদর্শ, এবং সহজেই ইহা মানুষকে আকর্ষণ করে। সুখ বা আনন্দ যে মূল্যবান্, অথবা ইহা যে মূল্যের একটি মান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই, মানুষের উপযোগী যে কোন নৈতিক আদর্শেই সুখ বা আনন্দের স্থান থাকিতে হইবে। যাহা শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ,—তাহা সুখ বিবর্জিত নহে। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ নিশ্চয়ই আনন্দময় ও সুখকর, সুতরাং প্রেয়োবাদের মধ্যে একটি মূল্যবান্ মৌলিক সত্য নিহিত আছে, এবং এই সত্যের স্পর্শ আছে বলিয়াই, যুগে যুগে, বারে বারে, ঘুরিয়া ফিরিয়া মানুষ এই আদর্শকে একটি বাস্তব আদর্শ হিসাবে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছে।[১৩]

প্রেয়োবাদ একটি সহজ-বোধ্য আদর্শ; সুখকে ইহা শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলিয়া অসঙ্কোচে নির্দেশ করিয়াছে

বাস্তবিক মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানুষের পক্ষে রুচিকর ও আনন্দময় হওয়া চাইই

কিন্তু প্রেয়োবাদের প্রধান ত্রুটি হইতেছে যে ইহা মানুষের ব্যক্তিত্বের মাত্র একটি দিককেই (সুখাকাঙ্ক্ষা) তাহার সম্পূর্ণ স্ব-ভাব বলিয়া ভুল করিয়াছে।

মানুষ সুখ অন্বেষণ করে ইহা সত্য, কিন্তু সে শুধু সুখই অন্বেষণ করে ইহা সত্য নয়। এবং যদি ধরিয়াই নেওয়া নয় যে, মানুষ সুখ অন্বেষণ করে, তাহা হইলেও ইহা প্রমাণিত হয় না যে, সুখই আকাঙ্ক্ষার বস্তু হওয়া উচিত।

সুখাকাঙ্ক্ষা মানুষের একটি দিক মাত্র

১২। The attempt to explain the moral life *from behind* cannot be of much avail. We must explain it rather by what lies in front of us, by the ideal or end that we have in view. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 24

১৩। Bradley—Ethical Studies, P. 234

সুখ মানুষের উপযুক্ত হইতে হইবে

সুখের চূড়ান্ত নিজস্ব দাম নাই। সুখ মানুষের উপযুক্ত সুখ হওয়া চাই, সুখকে উচ্চতর মূল্য বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করিতে হইবে।

প্রেয়োবাদ আচরণের নৈতিক মূল্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়া, বাহিরের ফলাফল দিয়া বিচার করে

সমস্ত প্রেয়োবাদের ইহা একটি ত্রুটি যে, এই মত কোন আচরণের নৈতিক মূল্য বাহিরের ফলাফল দ্বারা (ব্যক্তির তৃপ্তি, বহুজনের সুখ, সমাজের স্বাস্থ্য ইত্যাদি) বিচার করে। কিন্তু কোন কাজ নীতিসম্মত কিনা, তাহা সেই কাজের নিজস্ব আন্তরিক গুণের উপরই নির্ভর করে। বাহিরের ফলাফলের জন্য কোন কাজ নীতি-সম্পন্ন হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না।[১৪]

সুখই শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়; সুখকে শ্রেষ্ঠতর উদ্দেশ্য দিয়া মাপিতে হয়

সুখই শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইতে পারে না, কারণ সুখের উৎকর্ষ এবং এমন কি ইহার পরিমাণও শুধুমাত্র সুখ দিয়া মাপা যায় না। যদি বলা যায়, মানুষের মর্যাদানুযায়ী সুখ কাম্য, তাহা হইলে বুঝা যায় সুখের চেয়ে মর্যাদা উচ্চতর আদর্শ। আবার যদি বলা যায়, বহুজনের সুখই কাম্য, তাহা হইলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সুখ বন্টনের কোন নীতি প্রয়োজন। যদি বলা যায় সমাজকল্যাণই আদর্শ, তাহা হইলে প্রশ্ন থাকে, কিসে সমাজকল্যাণ হয়, কি তাহার মাপকাঠি, কি তাহার শেষ উদ্দেশ্য? কাজেই সুখকেই শেষ উদ্দেশ্য বা শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলা যায় না।

যুক্তিবিচার বাদ দিয়া বুদ্ধিমান মানুষ কোন নৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করিতে পারে না

সুখ বা আনন্দ নৈতিক জাবনের আবশ্যকীয় উপাদান হইতে পারে, কিন্তু যুক্তি বা বিচারের নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন নৈতিক জীবন অসম্ভব। প্রেয়োবাদীরা এই সত্যটি ভুলিয়া যান যে, নৈতিক জীবনের তন্তুগুলি হইতেছে অনুভূতির তৃপ্তি, কিন্তু এই তন্তুগুলিকে একটি সুবিন্যস্ত নক্সায় গড়িয়া তুলিতে হইলে যুক্তি ও বিচারের নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রয়োজন। সেই যুক্তিবিচারকে বাদ দিলে—সমস্ত বুননই খুলিয়া যাইবে।[১৫]

১৪। ...the very essence of morality is that the distinction between good and evil is a distinction of principle, and *not merely of result*, an *intrinsic* and essential, not an extrinsic and contingent distinction. Seth—A Study of Ethical Principles, P. 141

১৫। The threads of which our life it woven, are threads of feelings, if the texture of the web is reason's work. The Hedonist unweaves the web of life into its threads, and, having unwoven it; he cannot recover the lost design. Ibid, P. 148

প্রেয়োবাদ মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। মানুষ শুধুই 'প্রাণী' নয়, সে বিচারসম্পন্ন প্রাণী। তাহার জীবন ও আদর্শ শুধুই ইন্দ্রিয়সুখ হইতে পারে না। এই মতবাদের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি দুর্বল। আমরা 'সুখই আকাঙ্ক্ষা করি, সুখ প্রাপ্তির হিসাবনিকাশ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হই এ কথা সত্য নয়। এ প্রকার সুখদুঃখের সম্পূর্ণ ও নির্ভুল হিসাব কখনও সম্ভব নয়। বাস্তবক্ষেত্রে উপযোগবাদ যে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ হইতেছে এই যে, উপযোগবাদ শুধুমাত্র সুখসম্ভোগের ভূমি পরিত্যাগ করিয়া যুক্তি ও বিচারের উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে।

প্রেয়োবাদ একদেশ-দর্শী, উহা মানুষকে সম্পূর্ণ করিয়া দেখে না—শুধু প্রাণী হিসাবেই দেখে

যে আদর্শ সমগ্র মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ও দাবি মিটাইতে পারে না, তাহা কখন শ্রেষ্ঠ মানবিক আদর্শ হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না।

শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইল সমগ্র মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ

সংক্ষিপ্তসার

ডারউইন প্রথম জীবনের সমস্ত পরিবর্তন ক্রমবিকাশবাদ দ্বারা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ইহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন যে জীবনের ধারার ক্রম পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যুগ যুগান্তে জীবনের কয়েকটি রূপ বারে বারে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে, ইহা সত্য নয়।

হারবার্ট স্পেন্সার এই ক্রমবিকাশবাদকে জড় ও জীবন, মনোবিদ্যা ও সমাজবিদ্যা, নীতি-বোধ ও প্রথা-আচার সর্বক্ষেত্রেই ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, নৈতিক আদর্শ রহস্যময় ও অপরিবর্তনীয় নয়। নীতিবোধ ও নৈতিক আদর্শের ক্রম পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে এ প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজিলেন—নীতিবোধ কি? এই চেতনার পরিবর্তনের ধারা কি? ইহার সম্ভাব্য পরিণতি কি? তাঁহার মতে নীতিবুদ্ধি আদিম মানুষের ছিল না। তাহারা অন্ধভাবে গোষ্ঠীর প্রথা-আচারগুলি অনুসরণ করিত। যে আচার-পদ্ধতি-ক্রিয়া গোষ্ঠিজীবনের পক্ষে অনুকূল ছিল, সেগুলি গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করিত এবং বহু লোকে পুনঃ পুনঃ সেই গোষ্ঠী-সমর্থিত কাজগুলি করার ফলে সেগুলি ব্যক্তিদের অভ্যস্ত হইয়া গেল এবং বিশেষ মর্যাদা লাভ করিল। এ কাজগুলি করিলে গোষ্ঠীর প্রশংসা পাওয়া যাইত, এগুলি লঙ্ঘন করিলে নিন্দা হইত—ইহাই হইল নীতিবোধের মূল। অর্থাৎ তাহাই নীতি, যাহা জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত। জীবনের মূল সূত্রই বা কি? তাহা হইল বাহ্য ও অন্তর সম্বন্ধের বিরামহীন সুসমন্বয়ের চেষ্টা। এই সমন্বয় সাধনে যাহা সমর্থ, তাহাই নীতি বলিয়া গৃহীত হয়। জীবনের বাহ্য অবস্থার নিত্যই পরিবর্তন ঘটিতেছে, সুতরাং তাহার সহিত সমন্বয়ের চেষ্টায় আন্তরিক নৈতিক বিধিরও ক্রম পরিবর্তন ঘটে। এই সমন্বয় যেখানেই সফলভাবে ঘটে, সেখানেই সুখ বা আনন্দ। সুখ তাই সুসমন্বয়ের চিহ্ন ও মাপকাঠি। সুখ জীবনবর্ধক, দুঃখ জীবন-ক্ষয়কারক। কাজেই

সুখ জীবনের কাম্য, প্রেয়োবাদের এই মূল কথাটি সত্য। মানুষ প্রথমে নিজের সুখেরই আকাঙ্ক্ষা করে, সেই জন্যই উদ্যোগী হয়। কিন্তু ক্রমেই অভিজ্ঞতার ফলে সে দেখিতে পায় যে, সকলেই নিজের সুখ আকাঙ্ক্ষা করিলে বিরোধ ও অশান্তি উপস্থিত হয়। বহুর সুখের মধ্য দিয়াই নিজের সুখ সবচেয়ে সুসঙ্গতভাবে পাওয়া যায়। কাজেই আত্মসুখবাদ হইতে পরসুখবাদ বা উপযোগবাদে ক্রমবিকাশ ঘটে।

প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষার সংযম ও সুসমন্বয় ব্যতীত সুখ হইতে পারে না। স্পেনসারের মতে, ব্যক্তির জীবনের প্রথম অবস্থায় প্রবৃত্তির এ সংযম বাহিরের শাসনের উপরে নির্ভর করে। ক্রমে এ শাসন হয় আন্তরিক। এখানেও দেখি ক্রমবিকাশের সূত্রের ক্রিয়া।

স্পেন্সার নীতিবিদ্যার আলোচনায় একটি সম্ভাবনাপূর্ণ নূতন পথ দেখাইয়াছেন। নীতিকে তিনি জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া নীতিবিদ্যাকে নির্বস্তুক নিরলম্ব আলোচনার অনুর্বর পথ হইতে ফিরাইয়াছেন। ইহা তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব। তিনি জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানকেই বলিলেন নীতি, এবং তাহার ধারা নিপুণতার সঙ্গে অনুসরণ করিলেন। কিন্তু ইহা তো ঐতিহাসিকের কাজ। নীতিবিদ্যার আলোচনার বিষয়—কি ঘটে, এবং কিভাবে তাহা ঘটে মুখ্যতঃ তাহা নয়। তাহার আলোচনার প্রধান বিষয়—কি হওয়া উচিত? জীবনের আদর্শ কি? এবং কেনই বা ইহা আদর্শ? জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানই শেষ উদ্দেশ্য—সুখই শেষ কাম্য? না কি, সুখ বা সামঞ্জস্য বিধানও কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য লাভের জন্য? যাহা জীবনের সঙ্গে সুসঙ্গত, তাহাই নীতি, তাহাই আদর্শ? না কি যাহা নীতি-অনুসারী তাহাই জীবনের সঙ্গে সুসঙ্গত? নীতি জীবনকে অনুসরণ করিবে, না, জীবনই নীতিকে অনুসরণ করিবে? স্পেন্সার ঘোড়ার আগে গাড়ীকে জুতিয়াছেন। তিনি নীতির আগে জীবনকে জুড়িয়াছেন। তাই নীতিবিদ্যার আলোচনায় তাঁহার বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক পথ ভ্রান্ত। মানুষের পক্ষে সুখই শ্রেষ্ঠমূল্য নয়। সুখকে উপেক্ষা করিয়াই মানুষ বড় হইয়াছে।

স্পেন্সারের মতে, ক্রমবিকাশের ধারায় নীতিবোধের একটি চরম পরিণতি ঘটিবে। তখন ব্যক্তি ও সমাজ, কর্তব্য ও আনন্দের চূড়ান্ত সমন্বয় ঘটিবে। তখন মানুষ স্বেচ্ছায় সানন্দে নৈতিক আচরণ করিবে—কোন শাসন-তাড়নার আর প্রয়োজন থাকিবে না।

লেজ্‌লি স্টিফেনও নীতির ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশবাদ ব্যবহার করিলেন। তাঁহার মতে, সমস্ত নৈতিক চেতনা ও কর্মের আধার হইতে সমাজ। সমাজের সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যই সমস্ত নৈতিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। যাহা সমাজজীবনের স্বাস্থ্য ও সজীবতা বৃদ্ধির সহায়ক, তাহারই শ্রেষ্ঠ মূল্য দেওয়া হয়। নীতির মাপকাঠি মূলতঃ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয়। ব্যক্তির জীবনে সঙ্গতির পরিবর্তে, স্টিফেন্ সমাজ-জীবনে স্বাস্থ্যকে নৈতিকতার মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সমাজকে তিনি একটি ক্রম-বিকাশমান জীবন্ত সত্তা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এবং ইহারই সহিত তাল রাখিয়া নীতি-বোধেরও ক্রম পরিবর্তন ঘটে। নৈতিক বিধিগুলি সমাজের স্বাস্থ্য ও সচেতনতা বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা। আর ব্যক্তির বিবেক হইতেছে সমাজের অঙ্গ যে ব্যক্তি তাহার অন্তরে সমগ্রের স্বাস্থ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা। যতই সমাজের স্বাস্থ্য ক্রমবিকশিত হইবে, ততই সমগ্র এবং অঙ্গের মধ্যে মমত্ব-বোধ বৃদ্ধি পাইবে এবং নৈতিক চেতনা স্থায়ী হইয়া উঠিবে।

তাঁহার মত মূল্যবান্, কারণ তিনি নীতিকে সমাজের আধারে স্থাপন করিয়া তাহার প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করিলেন। কিন্তু সমাজ একটি জীবন্ত সত্তা এবং সামাজিক স্বাস্থ্য আন্তরিক অবস্থা। সমাজ-সম্বন্ধ ব্যক্তিবিবেকেও ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা ও কর্তব্য আছে।

ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে সামাজিক স্বাস্থ্যকে স্টিফেন্ বড় করিয়া দেখিয়াছেন, ইহা একটি গভীর সত্য। কিন্তু যাহাকে স্টিফেন্ বলিলেন সামাজিক স্বাস্থ্য এবং স্পেন্সার বলিলেন সুসঙ্গতি, দুইই উচ্চতর আদর্শ সম্পূর্ণতাবাদের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। সেই আদর্শের উপযোগী বলিয়াই সুসঙ্গতি বা সামাজিক স্বাস্থ্য কাম্য।

আলেকজাণ্ডারও ক্রমবিকাশবাদকে নীতির ক্রম পরিবর্তন ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মতে, ব্যক্তির ইচ্ছা, বিপরীত প্রবৃত্তির সমন্বয় সাধন ও ব্যক্তি ও সমাজের ইচ্ছার মধ্যে সুসঙ্গতি ও ভারসাম্য স্থাপনই নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য। তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণাটি নীতির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করিলেন। প্রাণিজগতে যেমন যোগ্যতমের উদ্বর্তন হয় ও দুর্বল ধ্বংস হয়, তেমনি যে ভাবাদর্শ অধিকতর ভারসাম্য স্থাপনে সমর্থ, তাহা জয়ী হয়। এমনই করিয়া ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতর নৈতিক আদর্শের উদ্ভব হয়। উন্নততর ভাবাদর্শ সম্পূর্ণতর সমন্বয়ের প্রতিশ্রুতি বহন করে। প্রাণিজগতে যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটে বাস্তব সংগ্রাম ও দুর্বলতরের দৈহিক ধ্বংস দ্বারা। ভাবজগতে এ সংগ্রাম ও উদ্বর্তন হইল বুদ্ধিবিচার-নির্ভর। উন্নততর নীতি তাহাই যাহা বিচারানুযায়ী অধিকতর সুসঙ্গত। অধিকতর যুক্তিবিচার সঙ্গত বলিয়াই উচ্চতর আদর্শ নিম্নতর আদর্শকে পরাভূত করিয়া নিজ প্রাধান্য বিস্তার করে।

নীতির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণার প্রয়োগ আলেকজাণ্ডারের বিশেষ অবদান। কিন্তু নীতিবিদ্যার কাজ—কিভাবে এক উচ্চতর আদর্শ নিম্নতর আদর্শকে পরাভূত করিল, আরো উচ্চতর আদর্শের দিকে অগ্রসর হইল, তাহার ইতিহাস বর্ণনা নয়। নীতিবিদ্যার কাজ হইতেছে কোন আদর্শ বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী কোন নৈতিক চেতনার মূল্য নিরূপণ, কেন উচ্চতর আদর্শ গ্রহণীয় তাহার বিচার। কোন আদর্শের মূল্য বিচারকালে এই প্রশ্নই করিতে হইবে ইহা কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করে। ক্রমবিকাশবাদীরা সকলেই বলেন, এই উদ্দেশ্য হইতেছে অধিকতর সঙ্গতি বিধান। কিন্তু সুসঙ্গতিই তো শেষ উদ্দেশ্য নয়। শেষ উদ্দেশ্য হইতেছে, ব্যক্তি ও সমাজের পরিপূর্ণ বিকাশ। এই পরিপূর্ণতাই (Perfectionism) শ্রেষ্ঠ আদর্শ—যাহার একটি প্রধান লক্ষণ হইল সুসঙ্গতি ও সামাজিক সজীবতা।

প্রেয়োবাদ মূল্যবান্, কারণ নীতির আদর্শ হিসাবে সুখকে শেষ উদ্দেশ্য হিসাবে স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে। এই আদর্শ গ্রহণ করি আর নাই করি, ইহা বোঝা খুব কঠিন নয়। প্রেয়োবাদ এই একটি মৌলিক সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে মানুষের নৈতিক আদর্শকে তাহার পক্ষে সুখকর বা আনন্দের প্রতিশ্রুতিবাহক হইতে হইবে। ইহা স্বভাববিরুদ্ধ হইলে চলিবে না। মানুষের স্বভাবের মধ্যে সুখের আকাঙ্ক্ষা একটি অনস্বীকার্য উপাদান।

কিন্তু প্রেয়োবাদ মানুষের স্বভাবের এই একটি দিককেই মানুষের সম্পূর্ণ স্বভাব বলিয়া ভুল করে। সুখ মানুষের চাই, কিন্তু সেই সুখ তাহার মর্যাদানুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। সুখের চূড়ান্ত নিজস্ব দাম নাই। সুখকে উচ্চতর উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত হইতে হইবে এবং যুক্তিবিচার দ্বারাই ইহা সম্ভব—ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সেই পথ দেখাইতে পারে না।

প্রেয়োবাদ মানুষের আচরণের মূল্য তাহার বাহ্য ফলাফল দিয়া বিচার করে। কিন্তু মানুষের সমগ্র আন্তরিক চরিত্র দ্বারাই আচরণের নৈতিক বিচার সম্ভব।

সুখ শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়। ইহার নিজস্ব কোন মূল্য নাই। উচ্চতর বিচারসঙ্গত উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বলিয়াই সুখ মূল্যবান। প্রেয়োবাদ যুক্তিবিচারকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয় নাই।

প্রেয়োবাদ একদেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ, ইহা মানুষের স্বভাবের একটি দিককেই স্বীকার করিয়াছে। মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ যুক্তিবিচারসম্পন্ন ও অনুভূতিশীল প্রাণীর সমগ্র স্বভাব অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। যাহাতে সমস্ত মানুষের সম্পূর্ণ বিকাশ ও পরিতৃপ্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণতাবাদই শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

Questions

1. Show how the concept of evolution has been applied in the field of Ethics. Discuss the evolutionary hedonism of Herbert Spencer and indicate its value.

2. Give a comparative estimate of evolutionary hedonism as propounded by Herbert Spencer, Leslie Stephen & Alexander. Attempt a critical evaluation of the evolutionary theories.

3. Give an assessment of hedonism as an ethical ideal.

চতুর্দশ অধ্যায়

যুক্তিবাদ—কাণ্টের কৃচ্ছ্রবাদ

Rationalism—Kant's Rigourism

[Rationalism opposed to hedonism. True nature of man is rational—Kant's Categorical Imperative—Moral law intuitive—autonomy of the Will. To act from impulse is abnormal—three principles following from the moral ideal—Moral act universal Treat every person as end, never as a means,—Act as a member of the Kingdom of Ends. Moral ideal as self-consistency. Postulates of morality—Merits of Kant's ideal—Criticism—Unpsychological, unrealistic, too rigouristic, too formal No positive guidance—Cynics & Stoics—Criticism of rationalistic ideals.]

প্রেয়োবাদীরা বলিয়াছিলেন, মানুষের স্বভাব হইতেছে যে সে প্রাণী, সুতরাং সুখ অন্বেষণই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক

প্রেয়োবাদীরা বলিয়াছিলেন যে, মানুষের স্বভাব হইতেছে, যে সে প্রাণসম্পন্ন জীব—Man is an animal এবং যেহেতু সমস্ত প্রাণীরই ধর্ম হইতেছে সুখ অন্বেষণ বা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি, সে হেতু, মানুষেরও ইহা ধর্ম যে, সে সুখ কামনা করে, ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি খোঁজে। এবং কোন বস্তু যখন তাহার স্বধর্ম অনুসরণ করে, তাহার স্বভাবে বিকশিত হয়, তখনই সে তাহার নিজ আদর্শ খুঁজিয়া পায়। প্রেয়োবাদীদের মতে, সুখ অন্বেষণই যখন মানুষের ধর্ম, তখন সুখ আহরণই মানুষের আদর্শ। কাঁঠালের পক্ষে আম হইয়া উঠা আদর্শ হইতে পারে না—তেমনি আগুনের আদর্শও হইতে পারে না, শৈত্য।

যুক্তিবাদীরা বলিলেন, বিচারবুদ্ধিসম্পন্নতাই মানুষের বৈশিষ্ট্য

প্রেয়োবাদীদের সঙ্গে যুক্তিবাদীরাও একমত, যে মানুষের আদর্শ হইল, মনুষ্যত্বের স্বভাবে পরিপূর্ণ বিকশিত হওয়া। কিন্তু তাঁহাদের মতে প্রাণীত্ব (animality) মানুষের স্বভাব নয়। মানুষ যেখানে প্রাণী, সেখানে সে পশুর সমগোত্রীয়। কিন্তু ইহা মানুষের সার্থক পরিচয় নয়। মানুষের বৈশিষ্ট্য,—প্রাণী হওয়ায় নয়। মানুষের বৈশিষ্ট্য, তাহার বিচারবুদ্ধির ক্ষমতায় (rationality)। এই গুণ দ্বারাই সে অন্য সমস্ত প্রাণী হইতে পৃথক। ইহাই তাহার বিশিষ্ট গুণ (differentium)। বিচারবুদ্ধিই যদি মানুষের স্বধর্ম হয়, তবে

তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইল, যুক্তিবুদ্ধি দ্বারা চালিত হওয়া। তাহাই মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ আচরণ,—যাহাতে তাহার অন্তঃস্থিত যুক্তি বা বিচারবুদ্ধির সমর্থন আছে— the rational is the ideal। সেই কাজই ন্যায়, যাহা যুক্তিসঙ্গত; আর সে কাজই অন্যায়, যাহা যুক্তিবিরোধী। যুক্তিযুক্ততাই নৈতিক আদর্শ,—ইহাই নৈতিকতার মাপকাঠি।

যুক্তির অনুসরণই মানুষের আচরণের আদর্শ

কাণ্ট বলিলেন, তাহাকেই বলি আদর্শ, যাহার নিজস্ব মূল্য আছে। প্রেয়োবাদীরা বলিলেন, অর্থ চাই, স্বাস্থ্য চাই, রূপ চাই, যশঃ চাই—কারণ ইহাতেই আছে সুখ। কিন্তু কাণ্ট বলিলেন, অর্থ, বল, রূপ, যশঃ কোন কিছুরই নিজস্ব দাম নাই। অর্থ মূল্যবান্ এবং শুভ যখন ইহা শুভ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। গৃধ্নু শিল্পপতিদের হাতে আছে কোটি কোটি টাকা। এ টাকা তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন বহু বঞ্চনা ও পীড়ন দ্বারা,—সহস্র সহস্র মানুষের দারিদ্র্যের মূল্যে, -এ অর্থ তাঁহারা নিয়োগ করিয়াছেন বিলাসে, ব্যসনে, আত্মসেবায়। এ অর্থ তাই অভিশপ্ত। ইহা আদর্শ হইতে পারে না। হেলেনের রূপের আগুনে ট্রয় পুড়িয়া ছাই হইল। পদ্মিনীর রূপের নেশায় মজিয়া আলাউদ্দিন নিজেও মরিলেন, আরও কত সহস্র মানুষের মৃত্যুর কারণ হইলেন। তাই এই সব বাহ্য সম্পদ কখনও শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইতে পারে না। মানুষের অন্তর ইহাদের সর্বোচ্চ মূল্য দেয় না। এই সমস্ত মূল্যই হইতেছে, সাপেক্ষ (hypothetical)। সুতরাং ইহারা নৈতিক বিধির ভিত্তি হইতে পারে না। কারণ, যাহা নৈতিক বিধি (moral law), তাহার মর্যাদা প্রশ্নাতীত, তাহা কোন শর্তসাপেক্ষ নয়। কাণ্ট বলিলেন, বাহিরের কোন উদ্দেশ্যই শর্তনিরপেক্ষ নয়, তাহাদের মধ্যে কোনটিরই নিজস্ব মূল্য নাই।

কাণ্টের মতে, যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহার নিজস্ব মূল্য আছে

কিসের নিজস্ব মূল্য আছে? কি শর্তনিরপেক্ষ ভাবেই মূল্যবান? কাণ্ট বলিলেন, "এই পৃথিবীতে অথবা তাহার বাহিরেও এমন কিছু নাই, যাহাকে শর্তবিহীন ভাবে, নিজস্ব মূল্যে মূল্যবান্ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। একটি বস্তুই ইহার ব্যতিক্রম, তাহা হইল মানুষের অন্তরের শুভ নীতিবুদ্ধি, শুভকর্মের অকুণ্ঠ সংকল্প। ইহা বিশুদ্ধ মণির মতো, নিজ দ্যুতিতেই ভাস্বর।"[১] এই শুভ নীতিবোধ কি? ইহা হইতেছে মানুষের যুক্তিবিচারসম্পন্ন স্বভাবের আহ্বান, ইহা মানুষের বিবেক

শুভ সংকল্পই একমাত্র বস্তু যাহার নিজস্ব মূল্য আছে

১। "There is nothing in the world, or even out of it, that can be called good without qualification, except a good will. Its shines like a gem in its own light." Kant—Critique of Practical Reason

বা মানুষের অন্তরে ভগবানের আদেশ, "যাহা কর্তব্য তাহাই অনুসরণ কর"। ফল যাহাই হউক, তথাপি মানুষকে নীতিবুদ্ধির এই আদেশ পালন করিতে হইবে, কারণ ইহা মানুষের স্বভাবেরই দাবি। এই আদেশ কোন সুখের প্রলোভন দেখায় না, স্বর্গসুখের আশ্বাস দেয় না, নরকের আগুনেরও ভয় দেখায় না। অন্তরের এই নীতিবুদ্ধি বলে, "ইহা যুক্তিসঙ্গত, ইহা তোমার স্ব-ভাবসঙ্গত,—ইহা কর্তব্য, এবং ইহা করিতেই হইবে।" ইহাকেই কাণ্ট বলিয়াছেন, "the Categorical Imperative"—নীতিবুদ্ধির আহ্বান শর্তহীন, স্বার্থনিরপেক্ষ, সুখ দুঃখ, অনুরাগ বিরাগ-নিরপেক্ষ অকুণ্ঠ আদেশ। অন্তরের নীতিবুদ্ধির মর্যাদা প্রশ্নাতীত, ইহা নিজের আলোকেই দীপ্যমান,—কেন না, ইহা স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধিরই নিষ্কম্প ধূমহীন দীপশিখা। এই নীতিবুদ্ধি অভিজ্ঞতালব্ধ নয়—The moral law is not empirical। ইহা মানুষের স্ব-ভাবের প্রকাশ। মানুষের অন্তরে ইহার প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত—The moral law is intuitive। ইহা স্ব-প্রকাশ, স্বতঃপ্রমাণিত—It is self-evident। কোন কার্যের নৈতিক গুণ তাহার বাহ্য ফলাফলের উপর নির্ভর করে না, তাহা নির্ভর করে তাহার যুক্তিযুক্তিতার উপরে, শুভবুদ্ধির বিশুদ্ধতার উপরে।[২] কাণ্টের আদর্শকে তাই Intuitionismও বলা যায়। অন্তর নিজেই এই শুভ আদর্শকে জানে। ব্রাডলে কাণ্টের আদর্শকে "Duty for duty's sake" সূত্র দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

এই শুভ সংকল্পই হইল মানুষের অন্তরের নীতি-চেতনা—যাহা শর্তনিরপেক্ষভাবে মানুষের অকুণ্ঠ আনুগত্য দাবি করে

ইহা মানুষের স্বভাবের প্রকাশ; ইহার সত্যতা স্বতঃপ্রমাণিত, তাই, কাণ্টের আদর্শকে Intuitionism বলা হয়। কর্তব্য বলিয়াই কর্তব্য করিতে হইবে, কর্মের নৈতিক গুণ ইহার বাহ্য ফলাফলের উপর নির্ভর করে না

যিনি যুক্তিদ্বারা চালিত, তিনিই স্ব-ভাবে আছেন। নীতির শাসন বাহিরের শাসন নহে। যিনি নীতি বা যুক্তিদ্বারা চালিত (এই দুইই একার্থবোধক), তিনি স্বাধীন—আত্মশাসিত, আত্মনিয়ন্ত্রিত। স্বরাজ্যই তাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মানুষের স্বভাবগত বিচার বা নীতিবুদ্ধি যখন তাহাকে চালনা করে, তখন সে নিজেই নিজেকে চালনা করে। নীতিবুদ্ধির শর্তবিহীন আদেশ আমরা মানিতে বাধ্য, কারণ আমাদের স্বভাবের মধ্যে আছে এই প্রবণতা। তাই কাণ্ট বলিলেন, Thou shalt, because

যিনি যুক্তিচালিত তিনি, নিজ স্বভাব দ্বারা চালিত

২। The rightness or wrongness of a particular action can be inferred from its agreement or disagreement with the moral Law. The moral quality of an action is not determined by its consequences, but by the purity of its motives—Paton

thou canst—**যে স্বাধীন স্বনিয়ন্ত্রিত, সেই যুক্তিচালিত এবং সেই নীতিবান্।** যে দাস, সে নীতিবান্ হইতে পারে না।

Autonomy of the will

বিবেকের আদেশ, প্রভুর কাছে দাসের আদেশ নয়—ইহা স্বাধীন মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। নৈতিক আচরণের এই মূলশক্তিকে কাণ্ট তাই বলিয়াছেন,—ইচ্ছাশক্তির স্বাতন্ত্র্য—autonomy of the will।[৩]

কিন্তু মানুষ তো সর্বদা বিবেকের আদেশ বা যুক্তির শাসন মানিয়া চলে না। আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদের প্রলুব্ধ করে, প্রবৃত্তি আমাদের হাতছানি দিয়া ডাকে, আবেগ, অনুভূতি আমাদিগকে অভিভূত করে। কাণ্টের

যে ইন্দ্রিয়তাড়িত, সে স্বভাবচ্যুত, সে অসুস্থ

মতে, **ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়, আবেগের বশে, যখন আমরা কোন কাজে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা আমাদের স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দেই**—তখন তো আমরা দাস। কাণ্ট বলিবেন, যখন আমরা আবেগতাড়িত, তখন আমরা মানুষের স্বভাববিচ্যুত। তাহার ভাষায় **আবেগ হইতেছে মানুষের অসুস্থ অস্বাভাবিক অবস্থা**—a pathological or abnormal state।

তাঁহার আদর্শ তাই প্রেয়োবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত

কাজেই লোভ, ভয়, ক্রোধ, এমন কি, দয়া বা সহানুভূতিবশতঃও যদি কোন কাজ করা হয়, তাহা হইলে সে কাজের ফল শুভ হইলেও, তাহা ন্যায়সঙ্গত নয়। সমস্ত আবেগই যুক্তিবিচারকে আচ্ছন্ন করে, মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে। এজন্যই কাণ্ট জীবনে বিবাহ করিলেন না, পাছে স্ত্রীকে ভালবাসিয়া ফেলেন, মোহমুক্ত হইয়া যুক্তির জীবন হইতে বিচ্যুত হন। মা যতক্ষণ কর্তব্যবুদ্ধিতে সন্তানকে যত্ন করেন, পালন করেন, পোষণ করেন, ততক্ষণ তিনি ন্যায়নিষ্ঠ, কিন্তু যদি স্নেহবশতঃ কোমল অনুভূতি দ্বারা আপ্লুত হইয়া, সন্তানের সেবা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কাজ 'বিশুদ্ধ' নয়, কারণ তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নয়। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায়, কোন কাজের ন্যায়পরতা তাহার ফলের উপর নির্ভর করে না এবং অনুভূতি বা আবেগের উপরও নির্ভর করে না। বরং তাহার বিপরীত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, **কাণ্টের নৈতিক আদর্শে হৃদয়াবেগের বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির কোন স্থান**

৩। It is the prerogative of a rational being to be self-legislative...As a rational being, man demands of himself a life which shall be reason's own creation, whose spring shall be found in pure reverence for the law of his rational nature. Seth—A Study of Ethical Principles, P. 163

নাই। শ্রেষ্ঠ আদর্শ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি নয়, ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষার কণ্ঠরোধ। কাণ্টের আদর্শ ভোগের নয়, ত্যাগের ; আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির নয়, আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ দমনে। কাণ্টের নীতিবাদে আকাঙ্ক্ষার কোন স্থান নাই, সুখ ও আনন্দের প্রতি এ আদর্শ সম্পূর্ণ বিমুখ। তাঁহার আদর্শে নৈতিক বিধির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ব্যতীত অন্য কোন অনুভূতির কোন স্থান নাই। তাই কাণ্টের আদর্শকে কৃচ্ছ্রতা-বাদ (Rigourism), এবং বিশুদ্ধতাবাদও (Purism) বলা হয়।

কাণ্টের নীতিবাদের আকাঙ্ক্ষা বা হৃদয়াবেগের কোন স্থান নাই

কাণ্টের যুক্তিবাদ অনুযায়ী, সেই আচরণই ন্যায়, যাহা যুক্তিসঙ্গত, যাহা বিচার-বুদ্ধির নির্দেশ অনুযায়ী করা হইয়াছে, যাহার মূল বিশুদ্ধ বিবেক বা নীতিবুদ্ধি। কিন্তু কোন পথ যুক্তিযুক্ত, তাহা কি করিয়া বুঝা যাইবে ? কি তাহার লক্ষণ ? কাণ্ট এ সম্বন্ধে তিনটি সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন।

সেই আচরণই ন্যায়, যাহা যুক্তিসঙ্গত, যাহার মূল বিশুদ্ধ নীতিচেতনা অথবা বিবেক

(১) তাহাই যুক্তিসঙ্গত, যাহা সর্বজনপ্রযোজ্য। ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে আমরা প্রত্যেকে বিভিন্ন, প্রত্যেকের প্রতিদ্বন্দ্বী। এমন কি এক আকাঙ্ক্ষা আর এক আকাঙ্ক্ষার বিপরীত। তাহাদের মধ্যে কোন সুশৃঙ্খলা বা ঐক্যের বন্ধন নাই। কিন্তু যুক্তিবিচারের ভূমিতে আমরা সকলেই একমত। সেই ভূমিতেই আমরা একত্র মিলিতে পারি। যখন যুক্তি করি,

যাহা যুক্তিসঙ্গত, তাহা সর্বজনগ্রাহ্য

সব মানুষ মরে
সক্রেটিস মানুষ
সুতরাং সক্রেটিস মরে

তখন এ সিদ্ধান্ত শুধু আমার পক্ষেই গ্রহণযোগ্য নয়, ইহা সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যাহা সত্য, নীতির ক্ষেত্রেও তাহা সত্য। অর্থাৎ যাহা নীতিসঙ্গত, তাহা সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। যাহা অন্যায়, তাহা কখনও সর্বজনগ্রাহ্য, সর্বজন-আচরণীয় হইতে পাবে না। **যাহা অন্যায়, তাহা বাস্তবিক পক্ষে স্ববিরোধী (self-contradictory)।** একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্। **চুরি করা অন্যায়** কেন ? কারণ, **পৃথিবীতে সকলেই যদি একে অন্যেরটা চুরি করিত, তাহা হইলে চুরি করাটা অর্থহীন হইয়া যাইত।** ইহা দ্বারাই চুরির আত্মবিরোধিতা প্রমাণিত হয় (reductio ad absurdum)। মিথ্যা কথাও সেই জন্যই অন্যায়।

যাহা অন্যায় তাহা স্ববিরোধী

কারণ এই আচরণ সকলে করিলে, তাহাও মূল্যহীন হইয়া দাঁড়ায়। যখন মিথ্যা বলি, তখন এই আশায়ই বলি যে, অন্য সকলে সত্য বলিবে, কিন্তু আমি একাই শুধু মিথ্যা বলিয়া লাভবান্ হইব। অর্থাৎ, যখন অন্যায় করি, তখন আমার মনের ভাবটি এই রকম, "এই কাজটি অন্য সকলের বেলায় অন্যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি নিয়মের ব্যতিক্রম, আমি এই কাজ করিলে দোষ কিছু নাই।" কাজেই বলা যায় **wrongdoing consists in making exceptions.**

চুরি করা অন্যায়, কারণ সকলেই চুরি করিলে চুরির কোন মানে থাকে না

কিন্তু ইহা স্পষ্টতঃই স্বতঃবিরোধী।[৪] কাজেই, বুঝা যাইতেছে সেই কাজই ন্যায়, যাহা সার্বজনীন (universal), যাহা স্ব-বিরোধমুক্ত (self-consistent)। কাণ্ট তাই এই ভাবে নৈতিক আচরণের স্মূত্রটি প্রকাশ করিলেন—**"Act only on that maxim which thou canst at the same time will to become a universal law"**। নৈতিকতা এবং যুক্তিযুক্ততা (অথবা স্ববিরোধমুক্ততা) সমার্থবাচক। চুরি করা সকলের পক্ষেই অন্যায়, সত্য কথা বলা সর্বক্ষেত্রেই ন্যায়। যেখানে ব্যতিক্রম সেখানেই নীতি-লঙ্ঘন, তাহাই অযৌক্তিক। এ কথাটিই বেন্‌থাম্ অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, Everyone is to count as one, and no one as more than one। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে যেমন, সকলের একটিই ভোট, এবং সকলের ভোটেরই একই দাম, তেমন সমাজের নীতির ক্ষেত্রেও এই একই কথা সত্য। তাই কাণ্টের উপদেশ, 'এমন কাজ কর, যাহা অন্য সকলে একই অবস্থায় করিবে, ইহা তুমি ইচ্ছা করিতে পার'।[৫]

তাহাই ন্যায় যাহা সকলে আচরণ করিলে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না

'এমন কাজ কর যাহা এই অবস্থায় সকলেই করুক, ইহা ইচ্ছা করিতে পার'

(২) দ্বিতীয় স্মূত্রটিও যুক্তিবাদিতার নীতি অনুসরণ করিয়া পাওয়া যায়। নীতির ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই স্বাধীন, এবং প্রত্যেকের মূল্যও সমান। সুতরাং প্রত্যেককেই স্বাধীন ব্যক্তিত্বের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হইবে। কাহারও অন্যের স্বাধীন

৪। এ কথাটিই বর্তমান কালে কিছু অন্যভাবে বলিয়াছেন এক বক্তা,—"Think of a country where people were *admired* for running away in battle, or where a man felt *proud* of double-crossing all the people who had been kindest to him, you might just as well try to imagine a country where two and two made five. C. S. Lewis—Broadcast Talks, P. 11

৫। Act in such a way as you could will that everyone else should act under the same general conditions. Kant—Critique of Practical Reason, (Tr. Abbot)

ব্যক্তিত্বে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকাব নাই। আবার নিজের ব্যক্তিত্বকেও সমান মর্যাদা দিতে হইবে। অন্য কাহারও কাছে কোন ভয় বা প্রলোভনেই নিজ ব্যক্তিত্বের স্বাধীন মর্যাদা বিসর্জন দেওয়া চলিবে না। প্রত্যেক মানুষই সার্বিক যুক্তির প্রকাশ। কাহাকেও যখন নিজ স্বার্থসাধনের উপায় হিসাবে ব্যবহার কবি, তখন তাহার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অবমাননা করি। পরের ধন যখন অপহবণ করি, তখন সেই পরকে নিজ স্বার্থসিদ্ধিব উপায় হিসাবে ব্যবহার করি। আবার যখন আলস্য দ্বারা নিজ আত্মবিকাশে অবহেলা করি, তখনও নিজ স্বাধীন ব্যক্তিত্বের মর্যাদা বিস্মৃত হই। স্মরণ করিতে হইবে যে, **প্রত্যেক ব্যক্তিই উদ্দেশ্য হিসাবে মূল্যবান্ ও মর্যাদাসম্পন্ন,—কেহই দাস নয়, অন্যের স্বার্থ ও ইচ্ছা পরিপূরণের উপায় নয়।**[৬]

যুক্তি-নির্ভর মানুষ প্রত্যেকেই স্বাধীন

প্রত্যেকেই উদ্দেশ্য কেহই উপায মাত্র নয়; প্রত্যেককে সে মর্যাদা দিতে হইবে

আমাদের প্রত্যেকেরই আছে নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বে বিকশিত করিবার দায়িত্ব, আর আছে দায়িত্ব, অন্যের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি কবিবার। কিন্তু অপরকে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পূর্ণ করিয়া গঠন কবিবার অসম্ভব চেষ্টা হইতেও নিরস্ত থাকিতে হইবে।[৭]

প্রত্যেককে নিজ স্বাধীন সত্তার বিকাশে চেষ্টিত হইতে হইবে, এবং অন্যের স্বাধীন সত্তা বিকাশে সাহায্য কবিতে হইবে

(৩) তৃতীয় আর একটি সূত্রও অনুরূপভাবে যুক্তিবাদ হইতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাধীন ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, সকলকেই স্বাধীন ব্যক্তিত্বের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হইবে। কিন্তু এই স্বাধীন ব্যক্তিবা পবস্পব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। যাহা সত্য, যাহা ন্যায়সঙ্গত, তাহাব প্রতিষ্ঠাই সকলের উদ্দেশ্য। সমস্ত ব্যক্তিই সেই সংসমাজেবই সমমর্যাদাসম্পন্ন সদস্য। সকলেরই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আত্মবিকাশের জন্য উদ্যম এবং অপরের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক হওয়া।[৮] কাজেই প্রত্যেকেই উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেকেই আবার উপায়ও। এই সংসমাজকে

প্রত্যেকেই উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেকেই অপরের সম্পূর্ণ বিকাশেব সহায়ক—a Kingdom of ends.

৬। কাণ্ট তাঁহার সূত্রটি তাই এইভাবে প্রকাশ করিলেন, "So act as to treat humanity, whether in thine own person, or in that of any other, always as an end, and never as a means."

৭। কাণ্ট তাই উপরের সূত্র হইতে নিম্নলিখিত উপসূত্রটি নির্দেশ করিলেন, "Try always to perfect thyself, and try to conduce to the happiness of others, by bringing about favourable circumstances, at you cannot make others perfect."

৮। Critique of Practical Reason (Tr. Abbot)

যুক্তিবাদীরা বলিলেন, the Kingdom of ends। সুতরাং তৃতীয় সূত্রটি হইল, **"Act as a member of a Kingdom of ends."**[১] এই রাজ্যে প্রত্যেকেই রাজা ও প্রজা। প্রত্যেকেই নৈতিক বিধির অধীন, আবার প্রত্যেকেই আত্মনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার অধিকারী।

নৈতিক জীবনের তিনটি মূলভিত্তি—**Postulates of morality**

কাণ্টের মতে, **নৈতিক জীবনের তিনটি মূল ভিত্তি**। এই তিনটি স্বীকার না করিলে, নৈতিক জীবন সম্ভবই হয় না। তাই এই তিনটিকে বলা হইল **postulates of morality**। ইহারা কি? (১) প্রথমতঃ, ইচ্ছার **স্বাধীনতা**। যাহার ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, সে দাস,—তাহার কার্যের দায়িত্ব তাহার নহে। সুতরাং তাহার কার্য ন্যায় বা অন্যায় কিছুই হইতে পারে না। যে কাজ সম্পর্কে আমার স্বাধীনতা আছে, তাহার সম্বন্ধেই আমার নৈতিক দায়িত্ব আছে। (২) নৈতিক আদর্শের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে গেলে, **আত্মার অমরতা** স্বীকার করিতে হয়। এই জীবনে ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা ও বিচারবুদ্ধির নিত্য সংগ্রামের শেষ মীমাংসা হয় না। অনন্ত জীবনের মধ্য দিয়া এই সংগ্রাম চলিতে থাকে—অবশেষে জয় হয় ন্যায়ের। (৩) এই জগতে আমরা দেখি সাধু-মানুষেরা দুঃখ পায়—যাহারা ধূর্ত, যাহারা প্রবঞ্চক, যাহারা অত্যাচারী, তাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু নৈতিক জীবনের প্রেরণা মানুষের অন্তরের এই বিশ্বাস হইতে যে সত্যের জয় অনিবার্য। অধর্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। নিশ্চয়ই কেহ আছেন বিধাতা ও নিয়ন্তা, যাঁহার অমোঘ বিধানে একদিন না একদিন সাধু-মানুষের চোখের জল ঘুচিবে,—পাপী দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইবে। কাজেই নৈতিক শক্তির চূড়ান্ত জয়ে বিশ্বাস করিতে হইলে, **ভগবানের অস্তিত্বে,** তাঁহার মঙ্গলময়ত্ব ও শক্তিমত্তায়ও **বিশ্বাস** করিতে হয়।

(১) ইচ্ছার স্বাধীনতা

(২) আত্মার অমরতা

(৩) ভগবানের অস্তিত্ব

১। র‍্যাশডাল্ এই ভাবটিকে এ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, "Act in such a way as to treat thyself and every other human being as of equal intrinsic value; behave as a member of a society in which each regards the good of each other as of equal value with his own, and is so treated by the rest, in which each is both end and means, in which each realizes his own good in promoting that of others. Rashdall—Theory of Good & Evil, Vol. 1, P. 133

কাণ্টের যুক্তিবাদী আদর্শের সমালোচনা—

কাণ্টের আদর্শের মধ্যে মহত্ত্বের আহ্বান আছে, তাহা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রেয়োবাদীর আদর্শকে মানুষ শ্রদ্ধা করিতে পারে না—কারণ সুখ ও আরামের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা ক্ষুদ্রতা আছে, তাই ভোগবাদ মানুষকে লজ্জা দেয়। কিন্তু কাণ্ট যখন বলেন, যে ফলের আকাঙ্ক্ষায় নয়, সুখের আশায় নয়, স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়,—কর্তব্য বলিয়াই কর্তব্য কর,—সমস্ত পৃথিবী যদি ধ্বংস হইয়া যায়, তথাপি কর্তব্য করিয়া যাও, তখন আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এই মহৎ আহ্বানের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। 'প্রবৃত্তির দাসত্বে নয় প্রবৃত্তি জয়েই মনুষ্যত্ব'—এই সন্ন্যাসের বাণী আমাদের ভারতীয় মনে গভীর অনুরণন জাগায়। প্রেয়োবাদের মূল বক্তব্যের বিরুদ্ধে কাণ্টের যুক্তির জোর অনেকখানি, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রেয়োবাদীর আদর্শকে মানুষ শ্রদ্ধা করিতে পারে না—সুখ ও আরামের মধ্যে ক্ষুদ্রতা মানুষকে লজ্জা দেয়

কাণ্টের কর্তব্যের আদর্শ মহৎ

দ্বিতীয়তঃ কাণ্টের এই বক্তব্যও স্বীকার করিতেই হইবে যে, আচরণের নৈতিকতা বাহিরের ফলাফলের উপর নির্ভর করে না। এই গুণ আন্তরিক। সে আচরণই নৈতিক হিসাবে প্রশংসনীয়, যাহা বিশুদ্ধবিবেক বা স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি-প্রসূত। যদি এই আচরণের ফল সুখকর বা আনন্দময় নাও হয়, তথাপি বিশুদ্ধবিবেক-প্রসূত কাজ ন্যায়, তাহা প্রশংসনীয়। ভগবান কাজের ফলাফল দিয়া মানুষকে বিচার করেন না, তাহার অন্তর দিয়াই তাহার বিচার করেন—God judges man, not by what he does, but by what he is.[১০]

আচরণের নৈতিক মূল্য তাহার ফলাফলে নয়, বিবেকের বিশুদ্ধতায়

কিন্তু তাঁহার আদর্শের মহত্ত্ব সত্ত্বেও ইহা বলিতে হইবে যে, এ আদর্শ অবাস্তব, একদেশদর্শী, অসম্পূর্ণ।

(১) প্রথমতঃ, এই আদর্শের বিরুদ্ধে এই যুক্তি সঙ্গতভাবেই দেওয়া যাইতে পারে যে, তাঁহার আদর্শের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি দুর্বল। প্রেয়োবাদীরা বলিয়াছিলেন, মানুষ প্রাণী,—সুখ অন্বেষণ, বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই তাহার স্বভাব;—একথাও যেমন অর্ধসত্য মাত্র, তেমনি যুক্তিবাদীদের বক্তব্য যে, মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন,—যুক্তিবুদ্ধি

কাণ্টের মতের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি দুর্বল

১০। "If with its greatest efforts (the goodwill) shall yet achieve nothing, and there should remain only the goodwill (not to be sure, a mere wish, but the summoning of all means in our power), then like a jewel. it should still shine by its own light at a thing which has its whole value in itself."
Kant—Fundmental Principles of Metaphysics of Morals (tr. Abbot), P. 10

দ্বারা চালিত হওয়াই তাহার প্রকৃতি,—একথাও তেমনি অর্ধসত্য মাত্র। সত্য কথা এই যে, মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী; সে প্রাণী, ইহা যেমন মিথ্যা নয়, তেমনি সে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ইহাও তেমনি মিথ্যা নয়। কিন্তু মানুষ **শুধুই প্রাণী নয়, শুধুই বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন নয়।** কাণ্টের দৃষ্টিতে মানুষ ন্যায়শাস্ত্রের নির্ভুল বিধিমাত্র—তাহার যে রক্তমাংস আছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, অনুরাগ-বিরাগ আছে, দেহের প্রয়োজন আছে, কাণ্ট এ কথা বিস্মৃত হইয়াছেন মনে হয়,—অথবা মনে হয়, তিনি মানুষের দৈহিক দিকটি সম্পূর্ণ অস্বীকারই করিয়াছেন। কিন্তু যুক্তি দিয়া অস্বীকার করিলেও রক্তমাংস ও দেহের দাবি মিথ্যা হইয়া যায় না। মানুষের সত্য আদর্শ, সমগ্র সম্পূর্ণ জীবন্ত মানুষের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হওয়া চাই, তাহা না হইলে, অতিশয় মহৎ ও বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যই ইহা মিথ্যা হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কা থাকে।

এই আদর্শ এক-দেশদর্শী: মানুষ শুধুই বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন জীব—ইহা অর্ধসত্য মাত্র

আবেগ-আকাঙ্ক্ষাও মানুষের স্বভাবের উপাদান

কাণ্ট মানুষের অনুভূতি-আকাঙ্ক্ষা এবং বিচারবুদ্ধির মধ্যে তীক্ষ্ণ ভেদরেখা টানিয়া অনুভূতি-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ কণ্ঠরোধ করিবার, এবং বিচারবুদ্ধিকে একচ্ছত্র আধিপত্য দানের পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু মানুষের মন একটি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য, তাহাকে পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠে ভাগ করা সম্ভব নয়। একথাও সত্য নয় যে, প্রবৃত্তি-আবেগ-আকাঙ্ক্ষা এবং ধীর বিচারবুদ্ধির মধ্যে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য আছে। মানুষের জীবন হইতে অনু-ভূতি-আবেগকে সম্পূর্ণ অপসারণ করিলে, কর্মের সমস্ত প্রেরণাই নষ্ট হইয়া যাইবে। শুভ ইচ্ছাও (goodwill) সম্পূর্ণ কামনা-রহিত হইতে পারে না। প্রস্তরখণ্ডই শুধু সমস্ত সুখদুঃখও আকাঙ্ক্ষার অতীত হইতে পারে। কিন্তু প্রস্তরখণ্ডের তো কোন প্রাণ নাই, কোন ইচ্ছাশক্তিও নাই। কাজেই এই উক্তির সঙ্গে আমরা একমত,—deny all feelings and you strike at the very root of life—you cut off the springs of action। যুক্তিবিচার আকাঙ্ক্ষা-প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করিবে, ধ্বংসসাধন করিবে, ইহা অসম্ভব। ইহা অবাস্তব আদর্শ। যুক্তিবিচার প্রবৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করে না, তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করে।

বিচারবুদ্ধি ও প্রবৃত্তি আবেগ সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী, ইহা সত্য নয়

প্রবৃত্তিকে বাদ দিলে জীবনের মূলোচ্ছেদ করা হয়

কাণ্ট যখন বলেন যে, শুভবুদ্ধির আদেশ অমোঘ, অনতিক্রমণীয়, শর্তহীন, তখন এই ধারণা হইতে পারে যে, নৈতিক বিধি (the moral law) কোন বাহিরের

শক্তির হুকুম। কাণ্ট নিজেও কোথায়ও কোথায়ও বলিয়াছেন, নৈতিক বিধি হইতেছে ভগবানের আদেশ। কিন্তু বাহিরের কোন আদেশের ফলে, কোন কাজ সম্পূর্ণ নৈতিক গুণ লাভ করিতে পারে না। অবশ্য কাণ্ট বারে বারেই বিবেক বা নৈতিক বিধির আদেশ ব্যক্তির নিজস্ব স্বভাবের দাবিই বলিয়াছেন,—ইহা বাহির হইতে চাপানো নয়—ইহার প্রতি আনুগত্য আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু এই আপত্তি খণ্ডন করা কঠিন যে, নৈতিক আদর্শ কোন না কোন শুভ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হওয়া চাই (it must lead to some desirable end)। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া চাই, "কেন আমরা নৈতিক বিধি মানিয়া চলিব?" প্রেয়োবাদ আমরা গ্রহণ করি, আব নাই করি, তাঁহারা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই আচরণের উদ্দেশ্যটি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—আকাঙ্ক্ষাপূরণ বা সুখলাভই নৈতিক আচরণের উদ্দেশ্য। কেবলমাত্র যুক্তিযুক্ততাকে (self-consistency) আচরণের উদ্দেশ্য বলা যায় না। প্রশ্ন থাকিয়া যায়, নৈতিক বিধি অনুসরণ করিব কেন? অবশ্য কাণ্টের আলোচনায়ই আমরা তাহার ইঙ্গিত পাই। তিনি যুক্তিযুক্ততার নীতি হইতে যে তিনটি উপবিধি উপস্থাপিত করিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে ব্যক্তির স্ববৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া ওঠাকেই তিনি সমস্ত আচরণের উদ্দেশ্য বলিযা স্বীকার করিয়াছেন।[১১]

নৈতিক আদর্শ বাহিরের আদেশ নয়—তাহা অবশ্যই কোন যুক্তি-সঙ্গত উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন

বিরোধমুক্ততাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইতে পারে না, কোন্ অহং বা selfএর সহিত ইহা সুসঙ্গত (consistent) তাহা জানা প্রয়োজন

কাণ্টের আদর্শ সম্বন্ধে এই অভিযোগ সঙ্গত কারণেই করা হইয়া থাকে যে, ইহা **অত্যন্ত নীরস, কঠোর,** আনন্দহীন (it is a harsh ideal)। তিনি মানুষের অনুভূতির জীবনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। প্রবৃত্তি-বাসনা-কামনাকে তো বটেই, এমন কি স্নেহ, প্রীতি, দয়া ইত্যাদি কোমল বৃত্তিগুলিকেও যুক্তিবিরোধী অসুস্থতার লক্ষণ (abnormalities) বলিয়া তিনি সযত্নে পরিহারের উপদেশ দিয়াছেন। তাই জেকোবী ঠাট্টা করিয়া একটি কবিতায় বলিয়াছিলেন, আমি প্রীতিবশতঃ বন্ধুর বিপদে সাহায্য করিয়াছি, কিন্তু এখন মনে হইতেছে, নিশ্চয়ই পাপকার্য করিলাম—কারণ ইহাতো বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধি-

কাণ্টের আদর্শ অত্যন্ত কঠোর নিরানন্দময়,—সেখানে স্নেহ, প্রীতি দয়ারও স্থান নাই

১১। তিনি বলিয়াছিলেন, Try always to perfect thyself, and try to conduce to the happiness of others, by bringing about favourable circumstances, as you cannot make others perfect.

সঙ্গত নয়—তাহাতে তো অনুভূতি আবেগের 'খাদ' মিশ্রিত হইয়াছে! তবে অনুভূতির উপস্থিতিমাত্রই কোন আচরণ 'অশুচি' হইয়া গেল, ইহা নিশ্চয়ই কাণ্টের বক্তব্য নয়,—তাঁহার বক্তব্য, অনুভূতি দ্বারা যেন আচরণটি শাসিত না হয়—তাহা যেন যুক্তিদ্বারাই নির্ধারিত হয়। আদর্শ কর্মের নির্দেশক হিসাবে অনুভূতি মূল্যহীন,—অনেক ক্ষেত্রে তাহা সত্য পথে চলিবার পথে বিঘ্ন। যে কথাটি তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়া বলিতে চান, তাহা হইল এই যে, স্বার্থ বা আত্মসুখাকাঙ্ক্ষা যেন আমাদের আচরণের নির্দেশক না হয়, এবং আচরণ যেন কোন অবস্থায়ই যুক্তিবিরোধী না হয়।[১২]

কাণ্টের আদর্শ বড় ফর্মাল—ইহা হইতে বাস্তব নির্দেশ পাওয়া যায় না

কাণ্টের আদর্শ নিতান্তই আকারগত সঙ্গতিপূর্ণ বা ফর্মাল। তাঁহার দাবি এই যে, নৈতিক আদর্শ যেন, সুসঙ্গত স্বতঃবিরোধিতামুক্ত হয়। তাঁহার আদর্শে আচরণ সম্পর্কে কোন বাস্তব নির্দেশ পাওয়া যায় না। জীবন যে অত্যন্ত জটিল, তাহার বাস্তব পরিবেশ অনুযায়ীই যে কর্মের আদর্শ স্থির করিতে হয়, বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়াই যে কোন বিশেষ আচরণের ন্যায়-অন্যায় বিচার করিতে হয়, এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাণ্ট সচেতন নন। তিনি তর্কশাস্ত্রের বিশুদ্ধ নিয়ম দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। কিন্তু বাস্তব অবস্থা-নিরপেক্ষ, নৈতিক আদর্শ নিতান্তই শূন্যগর্ভ—তাঁহার আদর্শের আকারগত সুষমা আছে, কিন্তু তাহার কোন প্রাণ নাই, কোন বাস্তব উপাদান নাই। কাজেই জেকোবি (Jacobi) কাণ্টের বিশুদ্ধ সংসংকল্প (the pure goodwill) সম্পর্কে বলিয়াছেন, "It is a will that wills nothing." **কাণ্টের আদর্শ বাস্তব জগতের জন্য নহে—ইহা নিতান্তই ভাবজগতের বস্তু**—বইয়ে পুস্তকেই ইহা শোভা পাইতে পারে, কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে ইহা লাগে না।[১৩]

১২। It apperars to be a truer interpretation of Kant's view to hold that the presence or absence of inclination is morally indifferent. The utmost that Kant could have held necessary is that for an action to be good, the agent would still do it from a sense of duty, even if the inclination to do it were not present in his mind.

Lillie—An Introduction to Ethics, P. 153

১৩। The objection of formalism may be put in another way. Kant assumed that a good will can exercise itself without taking into account circumstances or consequences at all. Kant has made an unreal abstraction of one condition essential for a goodwill namely the possibility of its rule of action being universalised without contradiction, and even this formal condition does not universally hold at least in the way in which Kant expressed it. Ibid, P. 152

কাণ্টের ইহা একটি মূল্যবান্ নির্দেশ যে, যাহা ন্যায় তাহা সকলের জন্যই ন্যায়, যাহা অন্যায় তাহা সকলের পক্ষেই অন্যায়। নৈতিক বিধির (Moral law) প্রয়োগ ক্ষেত্রে কোন পক্ষপাতিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু কাণ্ট এই কথাটি বিস্মৃত হইলেন, যে **জীবনের জটিল পরিবেশে একটি সাধারণ অনড় বিধির শাসনই শেষ কথা হইতে পারে না।** জীবনের প্রয়োজনে, অবস্থা বিশেষে ব্যতিক্রম স্বীকার করিতেই হয়। স্বীকার না করিলেই অন্যায় হয়। কাণ্ট বলিবেন, 'মিথ্যা কথা বলা অন্যায়, যেহেতু, সকলে মিথ্যা বলিলে, পৃথিবীই অচল হইয়া যাইবে—এবং মিথ্যা বলারও কোন মূল্য থাকিবেনা। মিথ্যা কথা বলা অন্যায়, যেহেতু এই আচরণকে সার্বজনীন করা যায় না (Telling a lie is an evil because this conduct cannot be universalised)। সাধারণ ভাবে, কাণ্টের বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার্য, কিন্তু জীবনে কি কখনো কখনো এই অবস্থা আসে না, যখন মিথ্যা কথা বলাই উচিত, সত্য কথা বলাই অন্যায়। দস্যুদল তাড়িত হইয়া একজন অসহায়া স্ত্রীলোক তোমার গৃহে আশ্রয়ভিক্ষা করিল। তুমি সে অঞ্চলের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তুমি স্ত্রীলোকটিকে আশ্রয় দিলে। তাহার কতক্ষণ পরে দস্যুদল খুঁজিতে খুঁজিতে তোমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দস্যুদল তোমাকে সামনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোন স্ত্রীলোককে এদিক দিয়া দিয়া যাইতে দেখিয়াছ কিনা। কাণ্টের আদর্শ অনুযায়ী, তুমি 'সদা সত্য কথা বলিবে' নীতি অনুসরণ করিয়া যদি বল, যে স্ত্রীলোকটি তোমার বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়াছে, তাহা হইলে, সত্যের মর্যাদা রক্ষা হইবে সত্য, কিন্তু নারীর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হইবে। এ ক্ষেত্রে, যদি মিথ্যা কথা বলিয়া স্ত্রীলোকটির প্রাণ ও সম্মান রক্ষা করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তাহা বাস্তবিকই অন্যায় হইবে? না কি, সত্য কথা বলাই এক্ষেত্রে ঘোরতর পাপ হইবে? অনেক সময় মানুষের মনে অযথা আঘাত না দিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিতে হয়, সমাজে এই 'মিথ্যা' নিন্দনীয় নয়। এই জাতীয় মিথ্যা, যাহা নিজ স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্য বা অন্যকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে নয়, তাহাকে ইংরেজীতে বলে 'white lies'—তাহারা পাপের কালো রংয়ে রঞ্জিত নয়—সমাজ ইহাদের বলে harmless lies। আমাদের সামাজিক জীবনের অনেক ভদ্র ব্যবহারের মূলেই কি এই জাতীয় শ্বেতশুভ্র মিথ্যা কথা নাই? দরিদ্র এক আত্মীয়া তোমাকে আদর করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। তিনি

তাঁহার আদর্শে জীবনের বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী কোন ব্যতিক্রমের স্থান নাই

সদা সত্য কথন সর্বদাই প্রশংসনীয় হইতে পারে না

সমাজজীবনে এমন মিথ্যার স্থান আছে, যাহা নীতিবিরুদ্ধ নয়

খুবই যত্ন করিয়া তোমার পরিতৃপ্তির জন্য ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে লঙ্কাবাটা দিয়াছেন প্রচুর। তিনি সামনে বসিয়া খাওয়াই-তেছেন, পাখা দিয়া হাওয়া করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা তোর গরীব পিসির তো সাধ্য নেই তোকে পঞ্চব্যঞ্জন রান্না করে খাওয়াবে—তোর হয়তো পেটই ভরবে না! তা বাছা, রান্না কেমন হয়েছে?" তুমি কি তখন সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মতোই 'সত্য' গোপন করিবে না? না কি, কাণ্টের আদর্শ অনুসরণ করিয়া বলিবে, "পিসিমা সত্যিই আজ পেট ভরবে না, যে ঝাল দিয়েছো তা খায় কার সাধ্য?" কোনটা উচিত হইবে, ন্যায় হইবে? আমাদের শাস্ত্রকারেরা মনুষ্য-চরিত্র জানিতেন, তাঁরা কাণ্টের মতো কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত ছিলেন না,—তাই তাঁহাদের আদর্শ ছিল, 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াদ্ সত্যমপ্রিয়ম্'—সত্য বলিবে, প্রিয় বাক্যও বলিবে; কিন্তু অপ্রিয় সত্য কদাচ বলিবে না।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ

অবশ্য কাণ্টের স্বপক্ষে একথা বলা যায় যে, বিশেষ একটি অবস্থার সঙ্গে বিশেষ একটি আচরণই মাত্র ন্যায় হইতে পারে, এবং তাহা সকলের পক্ষেই ন্যায়। দস্যুতাড়িত স্ত্রীলোকটির ক্ষেত্রে গৃহস্বামী দস্যুদের কাছে সত্যগোপন করিয়া ন্যায় কার্যই করিয়াছেন, কারণ অন্য যে কোন মানুষের পক্ষেই অনুরূপ অবস্থায়, অনুরূপ আচরণ করা সঙ্গত হইত। কিন্তু বিপদ হইতেছে এই যে, দুজন মানুষের জীবনে কখনও ঠিক অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় না। আর অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে কাণ্টের সুসঙ্গতির (self-consistency) আদর্শের পরিবর্তন করা ভিন্ন উপায় থাকে না। কিন্তু কাণ্টের উদ্দেশ্যই ছিল সমস্ত 'অবস্থা-নিরপেক্ষ, বিশুদ্ধ আদর্শ' নির্ণয়। কিন্তু **অবস্থা-নিরপেক্ষ মানুষের আদর্শ নির্ধারণ অসম্ভব।**

সমস্ত অবস্থা-নিরপেক্ষ আদর্শ নির্ণয় অসম্ভব

তা ছাড়া শুদ্ধ মাত্র সুসঙ্গতি বা স্বতঃবিরোধিতার অভাবই আদর্শ হইতে পারে না; যে বঞ্চনা করা অন্যায় মনে করে না,—সে যদি সমস্ত জীবন মানুষকে বঞ্চনা করিয়াই কাটায়, তবে তাহার কাজও তো সুসঙ্গত (self-consistent); তাহার মধ্যে কোন আত্মবিরোধিতা (self-contradiction) নাই, তাই বলিয়া কি বলা যাইবে, যে, সেই ব্যক্তির পক্ষে বঞ্চনা করাটা ন্যায়সঙ্গত?

কাণ্টের মতে যে ব্যবহার সকলে অনুসরণ করিলে অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা অন্যায়; তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য ও দানশীলতাকে অন্যায় বলিতে হয়।
কাণ্টের আদর্শ নেতিবাচক

যে ব্যবহার সার্বজনীন (universalised) হইলে একটা অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি করে,—কাণ্টের মতে তাহা অন্যায়; তাহা হইলে ব্রহ্মচর্যও অন্যায়। কারণ সকলেই ব্রহ্মচারী হইলে তো, সৃষ্টিই লোপ পাইবে। সকলেই দাতা হইলে পৃথিবীতে দরিদ্র বলিয়া কেহ থাকিবে না। সুতরাং দানশীলতাও অন্যায়। এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায়, বাস্তব অবস্থা ও ফলাফল **বিবেচনা-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ স্বতঃবিরোধিতাশূন্যতা মানুষের জীবনের অস্তিবাচক আদর্শ হইতে পারে না।**[১৪]

পূর্বের আপত্তির সূত্র অনুসরণ করিয়া, ইহাও বলা যায় যে, কাণ্টের শুদ্ধ সুসঙ্গতির আদর্শ হইতে কোন গঠনাত্মক, অস্তিবাচক আচরণের নির্দেশ পাওয়া যায় না। যে আচরণ সার্বজনীন করা যায় না, তাহা ন্যায় আচরণ নয়, ইহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বীকার করা চলে। **ইহা একটি নিরাপদ নিষেধাত্মক নির্দেশ হইতে পারে।** অর্থাৎ ইহা হইতে বুঝিতে পারি, কোন কাজটি করা উচিত নয়। **কিন্তু কোন্ কাজ কোন এক বিশেষ অবস্থায় করা উচিত, তাহার নির্দেশ তো কাণ্টের স্বতঃবিরোধিতাহীনতার বিধি হইতে পাওয়া যায় না।** চুরি করা অন্যায় তাহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু আমার বর্তমান অবস্থায় কি কর্তব্য, তাহার নির্দেশ শুধুমাত্র সুসঙ্গতি (self-consistency) বা স্বতঃ-বিরোধহীনতার বিধি হইতে পাওয়া যাইতে পারে না।[১৫] র‍্যাশডাল অবশ্য মনে করেন, যে কাণ্ট তাঁহার নীতিশাস্ত্রে আমাদের গঠনাত্মক আচরণের পথও নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[১৬] কিন্তু সেথ্, ব্রাডলে, ডিউই, ম্যুইরহেড্ প্রমুখ অধিকাংশ দার্শনিকের মত, কাণ্ট এ বিষয়ে সফল হন নাই।

১৪। Seth—A Study of Ethical Principles, Pp. 164-66

১৫। The principle (of self-consistency) laid down by Kant affords in many cases a safe *negative* guide in conduct… ..when however we endeavour to extract *positive* guidance from the formula—when we try to ascertain by means of it, not merely what we should abstain from doing, but what we should do—it begins to appear that it is merely a formal principle. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 192

১৬। Rashdall—Theory of Good and Evil, Vol. I, P. 108

কাণ্টের নীতিবাদের সম্পর্কে নেতিবাচকতার অভিযোগ সেথ্ আর এক দিক হইতে করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কাণ্ট তাঁহার নৈতিক আদর্শ হইতে আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দকে সম্পূর্ণ নির্বাসন দিয়া জীবনকেই অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার নিরানন্দ বাসনা-কামনার গন্ধহীন আদর্শ তো মৃত্যুর আদর্শ। জীবন্ত মানুষ এই নিষ্প্রাণ আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে না।[১৭]

কাণ্টের নিরানন্দ আদর্শ জীবনধর্মের বিপরীত

শুধুমাত্র সুসঙ্গতিই ন্যায় আচরণের অপরিহার্য লক্ষণ নহে। অবশ্যই নৈতিক আচরণ কোন আদর্শ বা বিধির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে। সেই দিক হইতে সমস্ত নৈতিক আচরণই সার্বিক (universal)। কিন্তু প্রত্যেক আচরণই কোন বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশ-নির্ভর। এবং ন্যায় আচরণের ন্যায্যতা তাহার বাস্তব উপাদানের গুণের উপরও নির্ভর করে। সেই দিক হইতে ন্যায় আচরণের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য থাকে, কিছু ব্যক্তি-নির্ভরতা থাকে। তাহাকে শুধুমাত্র স্বতঃবিবোধিতাহীনতার শূন্যগর্ভ সার্বিক নীতিদ্বারা পরিমাপ করা যায় না। এই জন্যই বলা যায়, **নৈতিক আচরণ শিল্পীর সৃষ্টির মতো—তাহার মধ্যে মৌলিকতার প্রাণস্পন্দনও থাকিতে হইবে।**[১৮]

নৈতিক আচরণ শিল্প সৃষ্টির মতো, তাহাতে শুধু সুসঙ্গতি নয়, কিছু ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যও থাকিতে হইবে

কাণ্টের নৈতিক আদর্শ প্রেয়োবাদকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে এবং, **ব্যক্তিসত্তার সুসম্পূর্ণ বিকাশরূপ উচ্চতম আদর্শের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে।**

কাণ্টের আদর্শে সুসম্পূর্ণতার শ্রেষ্ঠতর আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত

সিনিক্ ও স্টোয়িক্ আদর্শ—প্রেয়োবাদীদের মতো, যুক্তিবাদীদেরও উগ্রপন্থী ও মধ্যমপন্থী এবং প্রাচীন ও নবীন দলে ভাগ করা যায়।

প্রাচীন গ্রীসের সিনিক্‌রা চরমপন্থী। তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে প্রেয়োবাদের বিপক্ষে। তাঁহাদের মতে সৎজীবন হইল, সুখে দুঃখে অবিচলিত, যুক্তিচালিত জীবন। যে সুখ আশা করে, সে ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অর্থ, প্রেম, যশঃ ইত্যাদির লোভ করি, ততক্ষণ আমরা বাহ্য অবস্থার দাস।

সিনিক্‌দের মতো কাণ্টও উগ্রভাবে প্রেয়োবাদের বিরোধী

১৭। The ascetic ideal is thoroughly false and inadequate and must always be corrected by the hedonistic......It is the ideal of death rather than of life, of inactivity rather than of activity......Life is life and we should not make it a meditatio mortis. Its banquet is richly spread and we should enjoy it with a full heart, nor see the death's head ever at the feast. Seth—A Study of Ethical Principles, P. 167

১৮। Lillie—An Introduction to Ethics, P. 155

"যে পাগল সেই শুধু সুখের আকাঙ্ক্ষা করে"—ইহাই হইল সিনিক্‌দের সুচিন্তিত মত। বৈষ্ণব ভক্ত ভগবানের মুখ দিয়া বলাইলেন,—

"যে করে সুখের আশ
আমি তার করি সর্বনাশ
আর, যে করে দুঃখের আশ
আমি হই তার দাসের দাস।"

যে সুখের আশা করে, সে ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক

অর্থাৎ যে বাহিরের অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন, সেই বাস্তবিক নিজের প্রভু—সেই কেবল মাত্র দুঃখের মার এড়াইতে পারে। কাজেই যে সত্যিকারের সুখ চায়, সে গীতার ভাষায় "উদাসীনবদাসীন"। চরিত্রের শুচিতা, নির্লোভত্ব, এবং যুক্তিচালিত জীবনই হইতেছে—বুদ্ধিমান মানুষের আদর্শ। প্রজ্ঞা এবং শান্তি সমার্থবাচক, আর যিনি প্রাজ্ঞ তিনি বাসনা-কামনা রহিত। তিনি সুখের জন্য পরমুখাপেক্ষী নন, তাঁহার সুখ তাঁহার অন্তরের শান্তিতে। যিনি 'স্বস্থ', তিনিই প্রকৃত সুস্থ।[১৯]

বাহিরের সুখদুঃখ সম্বন্ধে উদাসীনতাই প্রজ্ঞার লক্ষণ

তাঁহাদের আত্মসচেতনতা, অহমিকা এবং সাধারণ মানুষদের 'সাংসারিকতা' সম্পর্কে অবজ্ঞা, অনেক সময়ই তাঁহাদের ব্যবহারের নানা বাড়াবাড়িতে আত্মপ্রকাশ করিত। পোশাক-আশাক সম্পর্কে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। সামাজিক ভদ্রতা ও ভব্যতার তাঁহারা ধার ধারিতেন না। বাস্তবিক পক্ষে সমাজরূপ কৃত্রিমতাকেই তাঁহারা ঘৃণা করিতেন। তাঁহাদের মন্ত্র ছিল 'প্রকৃতির মতো স্বাধীন হও,—বন্ধনমুক্ত হও।' সিনিক্ মতবাদের প্রবর্তক অ্যান্টিসৃথীনিস্-এর পণ্ডিত শিষ্য ডায়োজীনিস্ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া একটি স্নানের টবে বাস করিতেন। আমাদের দেশে নাগা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাও সমস্ত সামাজিক বন্ধন অস্বীকার করেন, এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া বনে-জঙ্গলে বিচরণ করেন, লোকালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না। সহজেই বুঝা যায় এ আদর্শ যতই মহৎ হোক, ইহা সাধারণ মানুষদের জন্য নহে। এবং যে আদর্শ,—মানবপ্রেম নয়, মানুষের প্রতি অবজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা কখনও শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইতে পারে না।

সিনিক্‌রা সামাজিক ভদ্রতা-ভব্যতার ধার ধারিতেন না

সিনিকের আদর্শ সাধারণ সুস্থ মানুষের আদর্শ নয়

১৯। Wisdom and happiness are synonymous and the life of the wise is the passionless life of reason. The life of pleasure is the life of folly, the wise man would rather be mad than be pleased. For pleasure makes man the slave of fortune, the servant of circumstance. Independence is to be purchased only by indifference to pleasure and pain, by indifference,—by the uprooting of the desires which bind us to outward things. Seth—A Study of Ethical Principles, P. 154

এই সীনিক্ (Cynics) সম্প্রদায় হইতেই পরবর্তীকালে অন্য আর একটি যুক্তিবাদের আদর্শে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। ইহারা স্টোয়িক্স্ (Stoics) নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্রের পরিপূর্ণ উন্নতির যুগে, সে দেশের মানুষের চিন্তায় সীনিক্দের কৃচ্ছ্রসাধন ও সমাজবিচ্ছিন্ন 'স্বাভাবিক' জীবনের আদর্শ খুব বেশী রেখাপাত করিতে পারে নাই। কিন্তু রাষ্ট্রজীবনে বহু কঠিন আঘাতের ফলে, আনন্দপিপাসু সৌন্দর্যের উপাসক গ্রীক্ জাতি দুঃখের আগুনে পুড়িয়া, পার্থিব জীবনের সুখের ঊর্ধ্বে, যুক্তিচালিত, কঠোর আত্মসংযম দ্বারা প্রাপ্তব্য, উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের চেতনা উপলব্ধি করিলেন। সীনিক্রা বলিয়াছিলেন, আদর্শ জীবন হইতেছে স্বাধীন, প্রাকৃতিক জীবন। তাঁহাদের প্রাকৃতিক জীবন ছিল, সমাজজীবনের অস্বীকৃতি। কিন্তু স্টোয়িক্রা বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তর প্রকৃতির মধ্যে একই সার্বিক বিধি আবিষ্কার করিলেন, এবং এই সার্বিক বিধি হইতেছে, যুক্তিরই বিধি (the universal law of reason)। তাঁহাদের কাছে প্রাকৃতিক জীবন সমাজবিচ্ছিন্ন ও সমাজবিরোধী জীবন নহে। তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই যুক্তির নিয়ম দ্বারা চালিত। জীবনের আদর্শ আইনের অস্বীকৃতি নয়, মানবজীবন ও প্রকৃতির জীবনের ঐক্য আবিষ্কার এবং যে বিধি সর্ববিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালনা করিতেছে, সে বিধি অনুসরণ—সেই বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক আইনের কাছে বশ্যতা স্বীকার। ব্যক্তির মঙ্গল, সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন, 'স্বাধীন' হইয়া নয় (যেমন সিনিক্রা বলিয়াছিলেন), তাহার সহিত একাত্মতায়—যাহা বিশ্বের পক্ষে মঙ্গল, তাহাকে ব্যক্তির পক্ষেও মঙ্গল বলিয়া অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করায়।[২০] এই মতের সঙ্গে পরবর্তীকালে হেগেলের মতের খুব মিল আছে। স্টোয়িক্রাও সুখ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিকে নিম্নতর জীবন বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন এবং বিচারচালিত জীবনকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া নির্দ্বিধায় ঘোষণা করিয়াছেন।

স্টোয়িকরা বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তর প্রকৃতি এই দুইয়ের পশ্চাতেই এক সার্বিক বিধির শাসন স্বীকার করেন

নৈতিক জীবন সেই সার্বিক বিধিরই আনুগত্য

২০। "Not emancipation from law, but the discovery of the true law of man's life, and obedience to that law, is the object of the Stoics aspiration.. all things work together for good, what happens it always most fit and that it becomes man to accept as such all the events of life and the grand event of death itself. The part must not seek to separate itself from the whole, and mistake itself for the whole. Nothing can happen to me which is not best for thee, O Universe."

স্টোয়িকদের চিন্তার একটি উল্লেখযোগ্য ফল হইল যে, তাঁহারা মানুষকে স্পষ্ট করিয়া, বৃহৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দেখিলেন। তাঁহারা বলিলেন, মানুষের প্রকৃত পরিচয় এই নয় যে, সে কোন এক পরিবারের সন্তান বা সম্প্রদায়ের সদস্য। এমন কি ইহাও তাহার সত্য পরিচয় নয় যে, সে কোন রাষ্ট্রের প্রজা। মানুষের সত্য পরিচয় যে সে ভগবানের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গ। মানুষের আনুগত্য তাহার ক্ষুদ্র সসীম রাষ্ট্রের কাছে নহে—বৃহৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার্বিক বিধির কাছে।[২১] এই বিধাতার রাজ্যে, আইনকানুন আছে, প্রথা-আচার আছে, ভদ্রতা-সভ্যতা আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেই বৃহৎ জীবনের সাথে সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে হইবে, সেই সার্বিক জীবনে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। সেই জন্য ব্যক্তির নিজস্ব পৃথক ব্যক্তিত্ব অস্বীকৃত নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাধীন, যখন সে বৃহৎ জীবনের সঙ্গে যুক্ত সার্বিক বিধির অনুশাসন দ্বারা চালিত।

তাঁহারা মানুষকে বৃহৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন

মানুষের আনুগত্য কোন ক্ষুদ্র সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছে নহে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার্বিক বিধির কাছে

সিনিকরা জীবনকে অবিশ্বাস করেন, সমাজকে ঘৃণা করেন, কাজেই তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী দুঃখবাদী হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। অথবা কথাটা বোধ হয় উল্টাইয়া বলা উচিত, সিনিকরা জীবনের দুঃখ, দৈন্য, অশ্রুজল ও আশাভঙ্গের নিত্য ঘটনা দেখিয়াই, জীবন সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ—সমাজ সম্পর্কে মোহশূন্য।

স্টোয়িকদের ভাববাদী (idealistic) ও যুক্তিবাদী (Rationalistic) দর্শন তাঁহাদের আশাবাদী (optimists) করাই উচিত ছিল। তাঁহাদের ব্রাউনিং-এর মতো বলা উচিত ছিল, যাহা ঘটিতেছে তাহা মঙ্গলময় ভগবানের বিধানেই ঘটিতেছে, কাজেই সবই শুভ, সবই মঙ্গল। কিন্তু স্টোয়িক দর্শনেও দুঃখবাদের বিষন্ন সুর সুস্পষ্ট। কিন্তু ভগবৎ বিধানানুযায়ী চালিত পরিপূর্ণ মঙ্গলের আদর্শ জগতের সঙ্গে, বাস্তব জগতের দুঃখদীনতার পার্থক্য তো চোখে না পড়িয়া পারে না। তাই স্টোয়িক দর্শনেও এই সুর ধ্বনিত হইতেছে—"কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান"—সবই নশ্বর, এই জগতের সব হাসিগান মিথ্যা—তাই এই মায়ার ছলনায় ভুলিও না, আলেয়ার

দুঃখবাদ ও কৃচ্ছ্রতাবাদ

২১। On the earth that true city is not found, it is not like Plato's, a "Greek city", but a spiritual State and the Stoic citizenship is in the heavens. It is like Kant's 'Kingdom of intelligence' in which each citizen is at once sovereign and subject, for its law is the law of reason itself." Seth—A Study of Moral Principles, P. 157

পশ্চাতে ঘুরিয়া বিভ্রান্ত হইও না। সুখ নয়, উত্তেজনা নয়,—নিরাসক্তি ও প্রশান্তিই জীবনের কাম্য—জীবনের চাঞ্চল্যে নয়, মৃত্যুর চিরন্তন স্তব্ধতায়।[২২]

জীবন ও যৌবন এই আদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়

কিন্তু মৃত্যু কি জীবনের আদর্শ হইতে পারে? জীবনে বিশ্বাসী, কর্মে বিশ্বাসী, যৌবনের অমিততেজে বিশ্বাসী মানুষ এই নেতিবাচক কর্মবিমুখ, চিন্তা ও প্রশান্তির আদর্শকে গ্রহণ করিতে পারে না, তাই ইহার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ:[২৩]

মৃত্যুর এ চিরশান্তি, এই মৌন নিত্য নিস্তব্ধতা
জীবনের জয়টিকা, যৌবনের পুষ্পিত পূর্ণতা?
শ্মশানের চিতাভস্মে, মৃত্তিকায় পুনরাবর্তনে
শোধ হবে সব ঋণ, যৌবনের আত্মবলিদানে?
নয় নয়, ইহা নয় যৌবনের প্রাণের স্বপন,
চাই আলো, চাই সূর্য, হৃদয়ের চঞ্চল স্পন্দন,
শোণিতের খরবেগ—শিরায়, ইন্দ্রিয়ে কলতান,
প্রিয়ার বিমুগ্ধ দৃষ্টি, পাখীর প্রভাতী জয়গান
স্বপন নামুক চোখে, কল্পনায় স্নিগ্ধ নিদ্রালতা,
শান্তির পরশ মাগি, কিন্তু নহে মৃত্যুর শূন্যতা।
মৃত্যু নয়, মৃত্যু নয়, পাষাণের স্তব্ধ শীতলতা
চাই তাপ, চাই প্রাণ, যৌবনের চির চঞ্চলতা।
শান্তি কাম্য, কিন্তু তাহা যৌবনের জয়মাল্য নয়,
প্রাণের স্পন্দনে সুর—'নয়, নয়—নয়, মৃত্যু নয়'
শান্তিকামী প্রাজ্ঞজন দিবাশেষে লভুন বিশ্রাম,
অশান্ত যৌবন মাগে, সংগ্রামের আবেগ উদ্দাম!

২২। Its cry is for rest and peace, cessation from futile striving. Vanitas vanitatum! The wise man has awakened from life's fevered dream and broken the spell of all its illusions. His is the quiet and imperturbable dignity of spirit that goes not well with mirth or vulgar enjoyment. To him death is more welcome than life, seeing it is the way out of time to eternity.

২৩। But is a calm like this, in truth
The crowning end of life and youth.
And when this boon rewards the dead,
Are all debts paid, has all been said?

সংক্ষিপ্তসার

কাণ্টের যুক্তিবাদ প্রেয়োবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রেয়োবাদ বলে, ভোগই জীবনের আদর্শ; এবং যুক্তিবাদ বলে, ত্যাগই জীবনের আদর্শ। প্রেয়োবাদ বলে, সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য সুখলাভ; যুক্তিবাদ বলে, সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য যুক্তিবিচার অনুসরণ। প্রেয়োবাদ বলে, সুখপ্রাপ্তির জন্যই সুখের অনুসরণ; যুক্তিবাদ বলে, কর্তব্য করিতে হইবে। প্রেয়োবাদ বলে, ফলের দ্বারাই কর্মের বিচার; যুক্তিবাদ বলে, অন্তরের নৈতিক বিধির অনুসারী বলিয়াই কর্মের নৈতিক মূল্য।

কাণ্টের মতে, পৃথিবীতে যদি কোন বস্তুর নিজস্ব শ্রেষ্ঠমূল্য থাকে তাহা হইল শুভসংকল্প। শুভসংকল্প নৈতিক বিধি অনুসারী এবং ইহার আদেশ অর্থাৎ বিবেকের আদেশ শর্তবিহীন। নৈতিক বিধি প্রত্যেক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে অকুণ্ঠ আনুগত্য দাবি করে (categorical imperative)।

এই নৈতিক বিধি হইল, যুক্তিবিচারের বিধি। মানুষ ইহা মানিতে বাধ্য, কারণ যুক্তিবিচার মানুষের স্বভাব। ইহা মানুষের বৈশিষ্ট্য।

মানুষ যখন নৈতিক বিধি বা বিচারবুদ্ধির শাসন মানে, তখন সে নিজ স্বভাবের শাসনই মানে। নৈতিক বিধির শাসন যে মানুষ মানে, সেই বাস্তবিক স্বাধীন; কারণ সে নিজ স্বভাব দ্বারা শাসিত। যে মানুষ যুক্তিদ্বারা চালিত, সে স্ব-শাসিত—সেই নীতিবান্। কিন্তু যে মানুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা চালিত, সে দাস, সে স্বভাবচ্যুত, সে অসুস্থ, সে নীতিভ্রষ্ট। আবেগ-আকাঙ্ক্ষা হইতেছে যুক্তি-বিরোধী। সুতরাং নীতিবান্ স্বাভাবিক মানুষের আদর্শ হইল, প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা, তাহাকে ধ্বংস করা।

যে কাজ নৈতিক আদর্শ অনুসারী তাহা যুক্তিসঙ্গত, কাজেই তাহা সার্বিক, তাহা সকলের অনুসরণযোগ্য। প্রবৃত্তিজাত যে কর্ম, তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধ আনে। কিন্তু যুক্তির ভূমিতে সকল মানুষ এক হইয়া মিলিতে পারে। যাহা ব্যতিক্রম, তাহা যুক্তিবিরোধী, তাহা অন্যায়। চুরি করা অন্যায়, কারণ সব মানুষ চুরি করিলে চুরি করা অসম্ভব হইয়া যায়। তাই এ কাজ অন্যায়। অন্যদিকে সদয় ব্যবহার ন্যায়, কারণ সকলে সদয় ব্যবহার করিলেও কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। তাই নৈতিক আদর্শের উপদেশ হইতেছে, 'এমন কাজ কর যাহা সার্বিক হউক, ইহা ইচ্ছা করা যাইতে পারে।' যাহা অন্যায়, তাহা সর্বক্ষেত্রে সকলের পক্ষেই অন্যায়।

Ah no, the bliss youth dreams is one
For daylight, for the cheerful sun,
For feeling nerves and living breath—
Youth dreams a bliss on this side death.
It dreams a rest, if not more deep,
More grateful than this marble sleep;
It hears a voice within it tell:
Calm's not life's crown, though calm is well.
'Tis all perhaps which man requires,
But 'tis not what our Youth desires.

Matthew Arnold—Youth and Calm স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ: লেখক

নৈতিকতার আদর্শের দ্বিতীয় সূত্র হইল, প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীন সত্তা হিসাবে মর্যাদা দিতে হইবে। প্রত্যেককেই আত্মবিকাশের সুযোগ দিতে, প্রত্যেকের আত্মবিকাশে সহায়ক হইতে হইবে। নিজ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে কাহাকেও ব্যবহার করা চলিবে না।

ইহা হইতেই তৃতীয় সূত্র পাওয়া যায় যে, আমাদের প্রত্যেকেই সেই নীতি রাজ্যের প্রজা যেখানে প্রত্যেকেই রাজা এবং প্রত্যেকেই প্রজা (member of a kingdom of ends)।

কাণ্ট নৈতিক জীবনের তিনটি স্বতঃসিদ্ধ মূলসূত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন—(১) প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। স্বাধীন ইচ্ছা আছে বলিয়াই প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কর্মের জন্য দায়ী এবং প্রত্যেকের উপর এই শর্তবিহীন দাবি—নিজ স্বভাবানুযায়ী সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিবার জন্য উদ্যোগী হইতে হইবে। (২) আত্মা অমর। এই জীবনে নৈতিক আদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়—সুতরাং এই জীবন অবসানেও সেই আদর্শানুসরণ চলিতে থাকিবে। (৩) ঈশ্বর আছেন, তিনিই চূড়ান্ত বিচারের মালিক। তিনিই কর্তব্য ও সুখের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করিবেন।

কাণ্টের মতবাদ প্রেয়োবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিষেধক। সুখই জীবনের উদ্দেশ্য, ইহা আপাত মনোহর অথচ মিথ্যা ও সর্বনাশা আদর্শ। সুখ ও আরামের মধ্যে ক্ষুদ্রতা ও লোলুপতা আছে, তাই ইহা মানুষকে লজ্জা দেয়—ইহাকে মানুষ আদর্শ হিসাবে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে। কাণ্টের ত্যাগবাদ ও যুক্তিবাদের মধ্যে অসংশয় মহত্ত্ব আছে—মানুষের অন্তর এই আদর্শকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সমর্থন জানায়।

কিন্তু কাণ্টের আদর্শ মনস্তত্ত্ববিরোধী। সমস্ত আবেগ-আকাঙ্ক্ষা বাদ দিলে জীবনের মৌলবেগকেই অস্বীকার করা হয়। মানুষ যুক্তিবাদী পাথর নয়, তাহার মধ্যে জীবনের উত্তাপ আছে। কাণ্ট এই উত্তাপকে সম্পূর্ণ নির্বাপিত করিতে চান, কিন্তু তাহা অসম্ভব।

এই মত একদেশদর্শী। এই আদর্শ মানুষের যুক্তিপরায়ণতার দিকটাই শুধু স্বীকার করিয়াছে, তাহাকেই প্রাধান্য দিয়াছে। আবেগ-আকাঙ্ক্ষাও মানুষের আর একটা অত্যন্ত সত্য দিক। যুক্তি ও বিচারের কাজ মানুষের প্রবৃত্তির আবেগকে ধ্বংস করা নয়, তাহার নিয়ন্ত্রণ। এই আদর্শ তাই সম্পূর্ণ অবাস্তব। যুক্তিবিচার ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরের দুইটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন প্রকোষ্ঠে বাস করে না। ইহারা দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত শক্তি নয়—একই মানুষের অবিচ্ছিন্ন দুইটি দিক। একটিকে বাদ দিয়া আর একটির কল্পনা করা যায় না।

কাণ্ট বলিলেন, নৈতিকবিধি আমাদের অন্তরে ভগবানের আদেশ, তাহা অকুণ্ঠ আনুগত্য দাবি করে। যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে, কোন শক্তির আদেশ, সে শক্তি যত বৃহৎই হোক্ না কেন—অন্ধ আনুগত্য দাবি করিতে পারে না। নৈতিক আদর্শ বা বিবেকের আদেশ, মানুষের কাছে তখনই গ্রহণীয়, যখন ইহা কোন যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্য সাধন করে। নৈতিক আদর্শ এই জন্যই মানুষের কাছে গ্রাহ্য, যেহেতু ইহা তাহার সুসম্পূর্ণ বিকাশ রূপ উদ্দেশ্যের সহায়ক।

কাণ্টের মতে, নৈতিক আদর্শ যুক্তিযুক্ত—ইহা বিরোধমুক্ত (self-consistent)। বিরোধমুক্ততা একটি শূন্য ও নেতিবাচক আদর্শ। সম্পূর্ণ সুসঙ্গত মিথ্যাবাদী বা দস্যু আমরা কল্পনা করিতে পারি। কিন্তু সেই জন্যই মিথ্যাচার বা দস্যুতাকে নৈতিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ

করা যায় না। ইহা কোন্ কাজ করিব না, সে সম্পর্কে একটি নিরাপদ নির্দেশ হইতে পারে (যে কাজ স্বতঃবিরোধী তাহা অন্যায়)—কিন্তু ইহা হইতে অস্তিবাচক নির্দেশ—কোন এক বিশেষ অবস্থায় কোন্ কাজ কর্তব্য সে সম্বন্ধে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না।

এই আদর্শ অত্যন্ত কঠোর ও নিরানন্দ (ascetic ideal)। ইন্দ্রিয় দমনের কৃচ্ছ্রতাকেই এখানে অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। এই আদর্শে আকারগত সঙ্গতির (formal consisteney) উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে ব্যতিক্রমও স্বীকার করিতে হয়। সত্য কথা মাত্রই প্রশংসনীয় নয়। মিথ্যা কথা মাত্রই নিন্দনীয় নয়। প্রত্যেক আদর্শকেই প্রয়োগ কালে জীবনের প্রয়োজন ও অবস্থা বিবেচনা করিতে হয়। না হইলে সে আদর্শ আলমারীতে সাজাইয়া রাখিবার পুতুলের মতো তুচ্ছ ও মিথ্যা হয়। প্রত্যেক আদর্শকেই জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী হইতে হইবে।

কাণ্টের মতে, যে ব্যবহার সকলে অনুসরণ করিলে অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা অন্যায়। তাহা হইলে ব্রহ্মচর্যের আদর্শও অন্যায, কারণ সকলে ব্রহ্মচারী হইলে সৃষ্টি লোপ পাইত।

সমস্ত অবস্থা-নিরপেক্ষ অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্ আদর্শ মূল্যহীন। আদর্শ শুধু বুদ্ধির পক্ষেই তৃপ্তিকর হইবে এমন নহে, আদর্শ অনুসরণে শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দও থাকিতে হইবে। যে আদর্শে আনন্দের কোন প্রতিশ্রুতি থাকে না, তাহা মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় হইতে পারে না।

কাণ্টের আদর্শে সম্পূর্ণতার উন্নততর আদর্শের (Perfectionism) ইঙ্গিত আছে। শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাহাই যাহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক।

যুক্তিবাদের প্রাচীন রূপ আমরা গ্রীসের সিনিক (Cynics) এবং স্টোয়িকদের (Stoics) আদর্শে পাই। সিনিকরা বাহিরের অবস্থাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে চান, ইঁহারা মানুষকে ও পৃথিবীকে বিশ্বাস করেন না, সামাজিক আচরণ, ভদ্রতা শিষ্টতার ধার ধারেন না। ইঁহারা আত্মসচেতন, জ্ঞানের অহংকারে স্ফীত—ইঁহারা দুঃখবাদী, উগ্র যুক্তিবাদী—ইঁহাদের আদর্শ সম্পূর্ণ নেতিবাচক—পৃথিবীকে, সমাজকে অস্বীকার। তাহা হইতে পলায়নই জীবনের আদর্শ।

স্টোয়িকরা এত উগ্রতার পক্ষপাতী নন্। তাঁহারা ধীর স্থির যুক্তিবাদী, তাঁহাদের আচরণ মর্যাদাবোধ দ্বারা চিহ্নিত। স্টোয়িকরা বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তর প্রকৃতি এই দুইয়ের পশ্চাতেই এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সার্বিক বিধির নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেন। তাঁহারা মানুষকে বৃহৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, মানুষের আনুগত্য কোন ক্ষুদ্র সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছে নহে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার্বিক বিধির কাছে। ইঁহাদের দর্শনেও দুঃখবাদ ও কৃচ্ছ্রতাবাদ লক্ষণীয়।

কাণ্টের মতো ইঁহাদের আদর্শও জীবনের ধর্মের বিরোধী, কারণ জীবন ও যৌবন এই দুয়ার আদর্শের প্রতি বীতরাগ।

Questions

1. Analyse Kant's concept of the moral law as a 'categorical imperative'. How does this concept influence Kant's moral ideal ? Discuss.

2. Explain the ethical ideal according to Kant. Why is this ideal termed 'rationalistic', 'intuitionistic' and 'rigouristic' ?

3. Give a critical estimate of Kant's moral ideal. Do you agree that Kant's ideal is too formal and unrealistic ? Discuss fully.

4. "The ascetic ideal is thoroughly false and inadequate and must always be corrected by the hedonistic"—Critically examine the statement.

5. The merit of Kant's ideal is negative. It is a healthy antidote to the seemingly attractive hedonistic ideal. It affords a safe negative guide to conduct, but fails to afford positive guidance. Explain the statement and give a critical estimate.

পঞ্চদশ অধ্যায়

নৈতিক আদর্শ—পরিপূর্ণতাবাদ

Perfectionism—Eudaemonism

[What is the nature of man? Hedonistic & Rationalistic answers lead to incomplete ideals—Need for a comprehensive ideal—Perfectionism, the ideal of self-relization,—the ideal of personality or Eudaemonism—how the ideal synthesizes passion & reason—egoism & altruism—individual & society—Pleasure & happiness—Individuality, personality—Not the denial of passion but its control through reason—a dynamic and positive ideal—Be a person—Die to Live.—Philosophical basis of Perfectionism]

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বই মানুষের আদর্শ—এ বিষয়ে সব নীতিবিদ্‌ই একমত। কিন্তু মনুষ্যত্ব কি, তাহা নিয়াই যত মতভেদ। প্রেয়োবাদীরা বলিলেন, মানুষের প্রকৃতিই হইল যে সে সুখ অন্বেষণ করে এবং ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বা সুখই তাহার আচরণের উদ্দেশ্য ও মাপকাঠি। আবার যুক্তিবাদীরা বলিলেন, বিচার-যুক্তিই হইল, মানুষের স্বভাব এবং যুক্তি হইল ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষার বিপরীত, কাজেই মানুষের আদর্শ ভোগ নয়, ত্যাগ। এই দুইটি আপাত বিপরীত মতই অর্ধসত্য। এই দুই পক্ষই মানুষকে অসম্পূর্ণ করিয়া দেখিয়াছেন, মানুষের সম্পূর্ণ প্রকৃতি কেহই অনুধাবন করেন নাই। মানুষ শুধুমাত্র সুখান্বেষণকারী প্রাণী নয়, আবার সে কামগন্ধহীন অশরীরী যুক্তিমাত্রও নয়। মানুষের দেহ আছে, তাহার প্রয়োজন আছে, কামনা-বাসনা আছে, তাহার পরিতৃপ্তির দাবি আছে,—ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। আবার, তাহার যুক্তি আছে, বিচার আছে, ইন্দ্রিয়শাসন ও আত্মসংযমনের প্রয়োজন আছে, এ কথাও মানিতে হইবে। সুতরাং মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইবে তাহাই, যাহা তাহার আপাতবিরুদ্ধ এই দুই প্রকৃতির—ভোগপ্রবৃত্তি ও ত্যাগাকাঙ্ক্ষা—এই দুই বিপরীত স্বভাবের সুসমন্বয় ঘটাইতে পারিবে।

প্রেয়োবাদীরা বলেন, মানুষের প্রকৃতি হইল যে তাহারা প্রাণী এবং সুখের আকাঙ্ক্ষাই তাহার আদর্শ

যুক্তিবাদীরা বলিলেন, মানুষের প্রকৃতি হইল, সে যুক্তিবিচার-সম্পন্ন জীব এবং ইন্দ্রিয় দমনই তাহার আদর্শ

দুই আদর্শের সমন্বয় প্রয়োজন

বাস্তবিক পক্ষে, তাহার প্রকৃতির বৈপরীত্য সত্ত্বেও মানুষ একটি সুসম্পূর্ণ ঐক্য। তাহার মনের মধ্যে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি (sensibility) এবং বিচারবুদ্ধি (Reason) পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠে ভাগ করা নাই। প্রেয়োবাদী এবং যুক্তিবাদী দুই পক্ষেরই এই গুরুতর মৌলিক ত্রুটি যে, তাঁহারা মানুষেব এই বৈপরীত্যের কোন সমন্বয় করিতে পারেন নাই। তাঁহারা মানুষের একটা দিক সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া সহজ ব্যাখার পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ফলে তাঁহারা কেহই সমগ্র মানুষের সম্পূর্ণ আদর্শটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

বাস্তবিক পক্ষে, এই বৈপরীত্যের সমন্বয় কি সম্ভব? আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেই তো, এই দুই বিপরীত নিয়া ঘর করিতেছি। আমরা 'দুধও খাই তামাকও খাই'; ভোগও করি, ত্যাগও করি,—যেমন বলি "চাই, চাই", তেমনি বলি, "চাই না, আর না।" পৃথিবীতে এমন মানুষ-পশু নাই, যে শুধুই ভোগী, আবার এমন মানুষ- সন্ন্যাসী নাই, যে শুধুই ত্যাগী।

শ্রেষ্ঠ আদর্শ সমগ্র মানুষেব সর্বাঙ্গীন বিকাশ

সমগ্র গোটা মানুষের সম্পূর্ণ প্রয়োজন যে আদর্শ সম্যক ভাবে মিটাইতে পারিবে, তাহাই মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সেই সম্পূর্ণ আদর্শকেই বলা হইযাছে,—পরিপূর্ণতাবাদ (Perfectionism)। ইহার অন্য নাম আত্মপ্রতিষ্ঠাবাদ (Ideal of Self-realisation), ইহাকে পূর্ণ ব্যক্তিত্ববাদও (Ideal of Personality) বলা হয়। অ্যারিস্টটল্ পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশকেই বলিয়াছিলেন, পরিপূর্ণ আনন্দ। সেই জন্যই, এই আদর্শকে আনন্দবাদ বা Eudaemonismও বলা হয়। মানুষের সর্বশক্তির সম্পূর্ণ বিকাশেই তাহার শ্রেষ্ঠ আনন্দ ও গৌরব এবং ইহাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ।[১] অ্যারিস্টটল এবং তৎপূর্বে প্লেটো ও সক্রেটিস্ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে মানুষের জীবনে স্থান দিলেও, তাহাকে যুক্তি ও বিচারের নিয়ন্ত্রণাধীন করণ দ্বারাই প্রকৃত 'আনন্দ' লাভ করা যাইতে পারে, এই মত অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই প্রচার করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়কে জীবনে স্থান দিতে হইবে,—ভৃত্য হিসাবে, প্রভু হিসাবে নয়। ইন্দ্রিয়ের সুনিয়ন্ত্রণের ভার, বিচারবুদ্ধির; এবং বিচারবুদ্ধিদ্বারা প্রবৃত্তির সুনিয়ন্ত্রণ দ্বারাই ব্যক্তিত্বের

ইহাই সম্পূর্ণতাবাদ আত্মপ্রতিষ্ঠাবাদ, বা পূর্ণ ব্যক্তিত্ববাদ

এই সুসম্পূর্ণ বিকাশে পরিপূর্ণ আনন্দ, তাই ইহাকে আনন্দবাদও বলা হয়

১। Aristotle used 'endaemonia' the Greek word for 'happiness', to describe the moral end, and the name 'endaemonism' is used for a group of moral theories, which connect the state of 'happiness' with the process of self-realization. We may define endaemonism as the ethical theory, which regards the moral end as the perfection of the total nature of man, involving his fullest happiness in the realization of his capacities. Lillie—An Introduction to Ethics, P. 204

পরিপূর্ণ বিকাশ ও জীবনে সম্পূর্ণ আনন্দ লাভ করা যাইতে পারে। যাহার প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবিচার দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত, তিনিই প্রাজ্ঞ, এবং তিনিই বাস্তবিকপক্ষে সুখী। অসংযত ইন্দ্রিয়সমূহ দুঃখেরই কারণ এবং যিনি ইন্দ্রিয়শাসনে অভ্যস্ত হন নাই, তিনি প্রবৃত্তির ক্রীতদাস—তিনি তো পরিপূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব লাভ করেন নাই। আদর্শ জীবন—সুনিয়ন্ত্রিত, শুদ্ধ, শান্ত জীবন এবং তাহা ভগবজ্জীবনেরই প্রতিফলন।[২]

এই আদর্শ প্রবৃত্তিগুলির ধ্বংসের কথা বলে না, যুক্তি দ্বারা তাহাদের নিয়ন্ত্রণের কথা বলে

মানুষের দেহ আছে, ইন্দ্রিয় আছে, প্রবৃত্তি আছে,—ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা মূঢ়তা। যুক্তিবাদীরা এই ভুলই করিয়াছেন। তাঁহারা জীবনের মৌলিক ধর্মকেই অস্বীকার করিলেন। তাঁহারা এই অসম্ভব আদর্শ প্রচার করিলেন যে, প্রবৃত্তির কণ্ঠরোধ করিতে হইবে। তাঁহারা বলিলেন, দেহ পাপ, ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি পাপ, মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রেম, ভালবাসা পাপ। তাঁহারা তাঁহাদের 'অতি পবিত্র' দৃষ্টি দিয়া, সমস্ত পৃথিবীকেই অশুচি বলিয়া গণ্য করিলেন। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কারণ নাই যে, মৃত্যুর উত্তাপহীন, আবেগহীন, চাঞ্চল্যহীন স্তব্ধতার মধ্যেই তাঁহারা জীবনের আদর্শের সন্ধান করিলেন। জীবন্ত মানুষের কাছে এই 'অতি পবিত্র' আদর্শ গ্রহণযোগ্য হইতেই পারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে পারি,

মানুষের দেহ ও তাহার আকাঙ্ক্ষাগুলিকে অস্বীকার করা মূঢ়তা। প্রবৃত্তি মাত্রই পাপ নয়, তাহার মাত্রা অতিক্রম করিলেই তাহা অন্যায়

বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

যে ভগবান্ আমাকে বিচারবুদ্ধি দিয়াছেন, তিনি গড়িয়াছেন এই দেহ, এই ইন্দ্রিয় এই ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা। ইহারা অশুচি নয়, ঘৃণ্য নয়। জীবনের এই আদিম আবেগ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনা না থাকিলে জীবনই সম্ভব হইত না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম—অন্যায় নয়, অশুভ নয়। তবে ভগবানের দেওয়া বিচারবুদ্ধি দিয়া তাহাদের সীমানির্দেশ করিতে হইবে, তাহাদের বেগ ও গতি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। ক্ষুধা পাপ নয়, কিন্তু যখন তাহা তাহার সীমা অতিক্রম করে, তখনই সে অশুভ সৃষ্টি করে। ক্ষুধার্ত মানুষ ভগবানের দেওয়া পরিমিত অন্ন গ্রহণ করিবে, ইহা তাহার কর্তব্য। ইহাতে যদি সে সুখ বোধ করে, তাহাও অন্যায় নয়। অন্যায়,—অমিতাহারে, অমিতাচারে—সীমালঙ্ঘনে।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামকে বাদ দিয়া জীবনই সম্ভব নয়

২। Seth—A Study of Ethical Principles, P. 189

অতিভোজন যদি অন্যায় হয়, সুস্থ ক্ষুধার্ত মানুষের অনাহারও অন্যায়। গীতায় তাই উক্ত হইয়াছে—

প্রয়োজন মিতাহারের

> ন্যাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
> ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রত নৈব চার্জুন॥
> যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
> যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

"হে অর্জুন, কিন্তু যিনি অত্যধিক আহার করেন, অথবা যিনি একান্ত অনাহারী, তাঁহার যোগ হয় না, অতিশয় নিদ্রালু বা অতি জাগরণশীলেরও যোগসমাধি হয় না। যিনি পরিমিতরূপ আহাব-বিহার করেন, পরিমিতরূপ কর্মচেষ্টা করেন, পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগ্রত থাকেন, তাঁহারা যোগ দুঃখনিবর্তক হয়।"[৩]

যখন প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া নিজ সীমা লঙ্ঘন করে, যখন তাহা বুদ্ধিবিচারকে আচ্ছন্ন করে, তখনই অন্যায়। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া যখন বুদ্ধিবিচাব আচ্ছন্ন করে, তখন ইহা নিজ সীমা লঙ্ঘন করে—তখনই তাহা অন্যায

> কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
> মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
> ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ।
> যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥
> আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্য বৈরিণা।
> কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥

"ইহা কাম, ইহাই ক্রোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন, ইহা দুষ্পূরণীয় এবং অতিশয় উগ্র। ইহাকে সংসারে শত্রু বলিয়া জানিবে। যেমন ধূমদ্বাবা বহ্নি আবৃত থাকে, মলদ্বারা দর্পণ আবৃত হয়, জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়। ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি—ইহারা কামের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্থান বলিয়া কথিত হয। কাম ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন কবিয়া জীবকে মুগ্ধ কবে।"[৪]

ইন্দ্রিয ও আবেগকে জীবনে অস্বীকার করিবাব উপায় নাই। তাহাদের শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তাহারা জীবনের মৌল উপাদান। কিন্তু ইহারা অন্ধ। শুভ উদ্দেশ্য নির্দেশে ইহারা অসমর্থ। জীবনের মৌল উপাদানগুলিকে সুসংবদ্ধ আকাব দানের কাজ, অন্ধ ইন্দ্রিয় ও আবেগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। এই কাজ যুক্তি ও বিচারের। ইহারা ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম-নিয়ন্ত্রণ করিয়া, সুষম ব্যক্তিত্বের

৩। জগদীশচন্দ্র ঘোষ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—ষষ্ঠোঽধ্যায় ১৬।১৭

৪। ঐ —তৃতীয়োঽধ্যায় ৩৭-৪০

পথ সুগম করে। ইন্দ্রিয়গুলি হইতেছে পাগলা তেজী ঘোড়া, ইহারা না হইলে জীবনের রথ অচল। কিন্তু ইহাদের বল্গা দিয়া শক্ত হাতে না বাঁধিলে, যুক্তি-সারথি ইহাদের উপযুক্ত লক্ষ্যে না চালাইলে, ইহারা জীবনের রথকে সর্বনাশের গহ্বরে টানিয়া নিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবে। ইন্দ্রিয়ের বেগ ভিন্ন যুক্তিবিচার পঙ্গু, আবার যুক্তিবিচারের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত ইন্দ্রিয় আবেগ অন্ধ। তাই প্রয়োজন ইহাদেব সুসমন্বয—ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির ধ্বংস নয়,—প্রয়োজন, যুক্তির দ্বারা শুভ উদ্দেশ্যে ইহাদের সুনিয়ন্ত্রণ। ইহারই নাম ব্যক্তিত্বের পবিপূর্ণ বিকাশ। জীবনের সম্ভাবনাগুলিকে, পরিপূর্ণ বিকশিত করিয়া, ব্যক্তিকে বৃত্তের মতো সম্পূর্ণ পবিণতিতে নিতে গেলে, তাহার শক্তি ও ইচ্ছাগুলিকে তাহাদের সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতে হইবে। কিন্তু ইহাদের সংযমন ও নিযন্ত্রণেব ভার থাকিবে বিচাববুদ্ধিব। যে ইন্দ্রিয় আবেগেব তাড়নায় দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া চলে, সেও যেমন ব্যক্তিত্বের অধিকাবী হইতে পারে, আবার তেমনি যে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কৃচ্ছ্রতাব অগ্নিতে জীবনের সমস্ত রস ও আনন্দকে বিশুষ্ক করে, সেও সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা হইতে বঞ্চিত। ইন্দ্রিয়-গ্রাম প্রবল, মন চঞ্চল, বাহ্য আচরণে তাহাদেব অস্বীকার কবিয়া, অন্তবে লালসা পোষণ করিয়া তো কোন লাভ নাই। গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

প্রবৃত্তির বেগ দুর্বার—যুক্তি দ্বারা, বিচার দ্বারা ও সুঅভ্যাস দ্বারা তাহাদের নিয়ন্ত্রণই জীবনে কাম্য

ইহাই ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণ বিকাশের পথ

কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

"যে ভ্রান্তমতি হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া, অবস্থিতি করে, অথচ মনে মনে ইন্দ্রিয়-বিষয় চিন্তা করে, সে মিথ্যাচারী।"[৫] কাজেই গীতাব উপদেশ কর্মত্যাগ নহে, কর্মযোগ।

ইন্দ্রিয়ের দ্বাব রুদ্ধ কবিযা ইন্দ্রিয়-বিষয় চিন্তা কবা মিথ্যাচার

সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিয়া মানুষ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বিচার দ্বারা, যুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্বেব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, ইন্দ্রিয় ও আবেগের উপযুক্ত সীমা নির্দেশ করিতে হইবে—সেই মহৎ আদর্শের কাজেই ইহাদের নিয়োগ করিতে হইবে। ইহাকেই পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের আদর্শ বলা হয়, কারণ ইহা জীবন্ত মানুষের সম্পূর্ণ বিকাশের উপযোগী বাস্তব আদর্শ।

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ, ৬

এই আদর্শ মানুষের সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল বিকাশকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। এই আদর্শ মানুষের কোন অংশকেই অস্বীকার করে না, ঘৃণা করে না, এই আদর্শ চায়,—মানুষের সমস্ত শক্তির (দৈহিক, মানসিক, আত্মিক) সুষম পরিপূর্ণ বিকাশ।

সুখ ও আনন্দ—
Pleasure
&
Happiness

এই আদর্শ সুখকে অস্বীকার করে না, তবে ইন্দ্রিয়—সুখের সঙ্গে, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সুখকে এক মনে করিলে ভুল হইবে। তাই পরিপূর্ণতাবাদীরা তাঁহাদের আদর্শকে বলিলেন, আনন্দ। ইন্দ্রিয়ের সুখ বিচ্ছিন্ন, ক্ষণিক, পরস্পরবিরোধী—তাহারা আকাঙ্ক্ষা জাগায়, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা মেটায় না; তাহারা উত্তেজিত করে, শান্ত করে না। ইন্দ্রিয়ের সুখ,—অন্ধ, যুক্তিবিরোধী। কিন্তু আনন্দ হইল, সুসম্পূর্ণতায়, সুসঙ্গততায়, যুক্তিবিচার দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখের সুনিয়ন্ত্রণ ও সুসমন্বয়ে। ইহা অন্ধ নয়, ক্ষণিক নয়। ইহা মোহাচ্ছন্ন নয়, স্বচ্ছ বিচার-ভিত্তিক। সুসম্পূর্ণ

জীবনের উদ্দেশ্য সুখ আহরণ নয়, আনন্দের আত্মবিকাশ

মানুষই প্রকৃত সুখী, সে আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত, সে নিজের অন্তরেই খুঁজিয়া পায় সমস্ত সন্তুষ্টির উৎস। ইহা কাণ্টের কঠোর, নীরস, আনন্দহীন কর্তব্য পালনের আদেশ নয়। এই সুখ ও আনন্দ বাহিরের অবস্থার উপর নির্ভর করে না, ইহা বাহিরের লাভ ও আরামের উপর নির্ভর করে না। এই আনন্দ বিশ্বজগতের সুষম ছন্দের সঙ্গে একাত্মীভূততার আনন্দ। কারণ, যে ব্যক্তি সুসম্পূর্ণ, যে নিজ ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণ বিকশিত, সে তো বিশ্বজীবনের স্পন্দনকে নিজের অন্তরে অনুভব করিয়াছে, সে মঙ্গলময় চৈতন্যস্বরূপ বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছার মধ্যেই আপনার ইচ্ছার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি খুঁজিয়া পাইয়াছে। প্রেয়োবাদের উদ্দেশ্যকে আমরা বলিতে পারি, ইন্দ্রিয়ের কাছে আত্মসমর্পণ; যুক্তিবাদের উদ্দেশ্যকে বলিতে পারি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ,—আর পরিপূর্ণতাবাদের উদ্দেশ্যকে বলিতে পারি, আত্মবিকাশের বিশুদ্ধ আনন্দ।[৬]

কোন 'আত্ম'র বিকাশ ?

এক হিসাবে, সব নৈতিক আদর্শই নিজেকে আত্মবিকাশের আদর্শ বলিয়া দাবি করিতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হইল কোন্ 'আত্ম'র বিকাশ? প্রেয়োবাদ বলিবে, সেই 'আত্ম' হইল, ইন্দ্রিয়ময় প্রকৃতিময় আত্ম (the sentient self)। যুক্তিবাদ বলিবে, আত্ম হইল যুক্তিময় আত্ম (the rational self) আর পরিপূর্ণতাবাদ বলিবে, 'সমগ্র আত্ম'

৬। As the watchword of Hedonism may be said to be self-pleasing or self-gratification, and that of Rationalism to be self-sacrifice or self-denial, so the watchword of Eudeamonism may be said to be self-realisation or self-fulfilment. Seth—A Study of Ethical Principles, P. 198

যাহা ইন্দ্রিয়ময়ও বটে, যুক্তিময়ও বটে।[৭] কাজেই এই আদর্শে ভোগ ও ত্যাগ এই দুইয়েরই পরিপূর্ণ সমন্বয়—সুসঙ্গত পরিতৃপ্তি। তাই বুঝিতে পারি, পরিপূর্ণতাবাদ প্রেয়োবাদ ও যুক্তিবাদরূপ দুই আপাতবিরোধী ও অসম্পূর্ণ আদর্শের সুসমন্বয় করিয়া উচ্চতর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

এই আদর্শ নিষ্ক্রিয় নয়, নেতিবাচক নয়। আলস্য ও আরামের পথে নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয় না। এই আদর্শ সংসার হইতে পলায়নের উপদেশ দেয় না। ইহা নেতিবাচক নয়, অস্তিবাচক। চেষ্টা দ্বারা, উদ্যম দ্বারা, যুক্তিবুদ্ধির দ্বারাই কেবল মাত্র এ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

পৃথকত্ব ও ব্যক্তিত্ব—Individuality & Personality—ব্যক্তি কে? ব্যক্তিত্ব বলিতে কি বোঝা যায়?

প্রত্যেক প্রাণীই নিজেকে পৃথক বলিয়া মনে করে। আমিত্ববোধের মধ্যেই আছে এই কথা, 'আমি তোমা হইতে পৃথক'। আমরা বলি, "আমার ঘর, আমার বাড়ী, আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন।" এখানে আমার পৃথক অধিকার, পৃথক সত্তা সম্পর্কে আমি সচেতন। এমন কি জড় পদার্থের অস্তিত্বের মধ্যেও আছে এই পৃথকত্বের দাবি। জড়ের অবশ্যই বোধ নাই, কিন্তু তথাপি তাহারও স্বাতন্ত্র্যের দাবি আছে। সে যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেখানে সে অন্যের হস্তক্ষেপ সহ্য করে না। সে তাহার নিজ শক্তি অনুযায়ী বাধা দেয়, আঘাত করিলে—প্রত্যাঘাত করে। ইহাকেই আমরা বলি, দ্রব্যের অচ্ছেদ্যতা (impenetrability) রূপ মৌলিক গুণ (primary quality)। কিন্তু ব্যক্তিত্ব শুধু পৃথকত্ব নয়। ব্যক্তি বহুসম্বন্ধযুক্ত, নিবিড়, অবিভাজ্য ঐক্য-কেন্দ্র। যেখানে ব্যক্তি মুহূর্তের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগদ্বারা চালিত, সেখানে যে পশুরই সমগোত্রীয়। সেখানে সে শুধু নিজের 'অধিকার' নিয়া কলহে মত্ত। পশু শুধু অন্য সমস্ত পশু হইতেই বিচ্ছিন্ন নয়। সে নিজের মধ্যেও বিচ্ছিন্ন। পশুর বাসনা, কামনা, উদ্যম প্রত্যেকটিই স্বাধীন অধিকার দাবি করে, কাজেই তাহার মধ্যে কোন নিবিড় ঐক্যসূত্র নাই। মানুষও যতক্ষণ অনিয়ন্ত্রিত বাসনা-কামনা তাড়িত, ততক্ষণ সে পশু মাত্র, সে ব্যক্তিত্বের স্তরে উন্নীত নয় নাই। যখন বিচার ও যুক্তির সূত্র দ্বারা, মানুষ তাহার ক্ষণিক প্রবৃত্তিগুলিকে একটি সুসঙ্গত ঐক্যের বন্ধনে বিধিবদ্ধ করিতে অভ্যস্ত হয়, তখনই কেবলমাত্র সে ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় উন্নীত

জড় পদার্থও নিজের পৃথকত্ব দাবি করে

বিভিন্ন প্রবৃত্তি, আবেগ, কর্মোদ্যম চিন্তা যেখানে এক সুসংহত কেন্দ্রে বিধৃত, সেখানেই আছে ব্যক্তিত্ব

৭। Seth—*A Study of Ethical Principles*, P. 199

হয়। যে 'ব্যক্তি', সে শুধুই পৃথক নয়, সে সুসংবদ্ধ ঐক্য-কেন্দ্র। কে তাকে ঐক্যের সূত্রে বাঁধে? আত্মসচেতনতা (self-consciousness) দ্বারাই মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়া, বিভিন্ন আবেগ সুসংবদ্ধ ঐক্য লাভ করে। মানুষ আত্মসচেতন বলিয়াই তাহার বিভিন্ন ইচ্ছা, আবেগকে সে যুক্তির সার্বিক বিধি (the universal law of reason) দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং যিনি ব্যক্তি, তিনি স্বয়ংশাসিত, আত্মসংযত (self-controlled)। যিনি আত্মশাসিত, তিনি আত্মস্থ, যোগযুক্ত—তিনি একটি সচেতন ঐক্য-কেন্দ্র (the unity of self-conscious being)। তিনি শুধুই পৃথক নন, সার্বিক বিধির দ্বারা শাসিত হইয়া তিনি বিশ্বজগতের সঙ্গে যুক্ত। যুক্তিবিচারের যে বিধি (the laws of reason), তাহা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তাহা সার্বিক (universal)। এবং যখন সেই সার্বিক বিধির শাসন মানুষ সচেতন ভাবে স্বীকার করে, তখনই সে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্বের দাবি করিতে পারে।[৮]

আত্মসচেতনতা, আবেগের সংহতি এবং যুক্তিদ্বারা আত্মশাসন, এই কয়টি হইল ব্যক্তিত্বের লক্ষণ

এই ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা সহজ নয়—বহু সচেতন উদ্যম, বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়াই ব্যক্তি আত্মশাসনে অভ্যস্ত হয়। এ সংগ্রাম শুধু প্রতিকূল বাহ্য পরিবেশের বিরুদ্ধেই নহে, অন্তরের অশিষ্ট, উদ্দাম ও উৎকেন্দ্রিক প্রবৃত্তিগুলিরও বিরুদ্ধে। ইহা বংশধারার সূত্রে প্রকৃতির নিয়মে মানুষ সহজে প্রাপ্ত হয় না, ইহা আয়াস দ্বারা, অনুশীলন দ্বারা, চেষ্টা করিয়া কষ্ট করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়। কাজেই ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য, নৈতিক জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, দুঃখ ও সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। কঠিন দুঃখের মূল্যে এই ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার অর্জন করিতে হয়।[৯]

ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা উদ্যম সাপেক্ষ, অনুশীলন ও অভ্যাস সাপেক্ষ

নৈতিক জীবনের প্রতিষ্ঠা দুঃখ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া

৮। In this self-consciousness, this power of turning back upon the chameleon-like, impulsive, instinctive, sentient or individual self, and gathering up all the scattered threads of its life in the single skein of a rational whole that constitutes the true self-hood of man—Seth—A Study of Ethical Principles, P. 200

৯। "It is the very essence of a self-conscious nature to be *divided against itself* and to win its perfection, its ideal freedom and harmony, as the result of a fierce and protracted *internal strife*. The conflict of nature and spirit, of impulse with reason, of the lower with the higher, self, is one from which, for a rational and self-conscious being, there is no escape. Caird—Philosophy of Reason, Pp. 251-52

আর একদিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায়, শুধু মাত্র পৃথক স্বতন্ত্র থাকিয়া, মানুষ ব্যক্তিত্ব অর্জন করিতে পারে না। ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ সমাজ-পরিবেশেই কেবল মাত্র সম্ভব। মানুষ তাহার ভাষা, রীতি, নীতি, দৃষ্টিভঙ্গী, শিক্ষা, দৈহিক নিপুণতা সমাজের অন্য দশজনের সহযোগিতা ব্যতীত কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারে না। কাজেই ব্যক্তিত্ব অর্জন করিতে হইলে, সমাজজীবনের সঙ্গে যুক্ত হইতে হইবে। বহুর সঙ্গে সহযোগিতার মধ্য দিয়াই মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনার সম্যক স্ফুরণ ঘটে। মানুষ নিজ উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধেও সচেতনতা লাভ করে অনুকরণ দ্বারা, আলোচনা দ্বারা এবং তাহার মধ্য দিয়াই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী সম উপায় (common means to achieve common ends) অবলম্বন করিতে শেখে। কাজেই ব্যক্তি হওয়া শুধু বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হওয়া নয়,—বহুর সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়া,—একাত্ম হওয়াও বটে।[১০]

পৃথক থাকিয়া পূর্ণ ব্যক্তিত্ব লাভ সম্ভব নয়, সমাজজীবনের সঙ্গে যুক্ত হইয়াই ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা

কিন্তু ব্যক্তিত্ব কি বহু বা সর্বের সঙ্গে, নিঃশেষে একাত্ম হইয়া যাওয়ায়? ব্যক্তির কি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছুই থাকিবে না? অবশ্যই থাকিবে। ব্যক্তি সর্বের ছায়ামাত্র নয়, সে সমাজজীবনের প্রতিধ্বনি মাত্র নয়। এই কথাটিই কাণ্ট খুব সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন, "অপর মানুষকে বা নিজকে কখনও শুধু মাত্র উপায় হিসাবে ব্যবহার করিও না, প্রত্যেক মানুষকে নিজস্ব মূল্যে মূল্যবান উদ্দেশ্য হিসাবেই শ্রদ্ধা করিবে"—"Treat humanity whether in thyself or in others always as an end and never as a means." হেগেলও ঠিক এই কথাটিই বলিলেন, "Be a person and respect others as persons."

মানুষ তাহার সমগ্র ব্যক্তিত্ব, এমন কি তাহার নিজস্ব বিশিষ্ট সত্তাও সমাজ-পরিবেশেই সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে পারে। গভীর দৃষ্টিতে দেখিলে বোঝা যায় যে, ব্যক্তির সুখ ও মঙ্গল এবং সামাজিক সুখ ও মঙ্গলের বিপরীত তো নয়ই, সম্পূর্ণ পৃথকও নয়। যে আত্মবিকাশ ব্যক্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহা ক্ষুদ্র ও

১০। They (human beings) imitate one another, they communicate with one another, guide with one another, compete with one another, co-operate with one another, are conscious of common ends to which they adapt common means, and in many ways learn to think of their group or groups as a more comprehensive unity of which they are parts and from which they are not entirely separable. MacKenzie—Elements of Constructive Philosophy, P. 269

বিচ্ছিন্ন 'আমি'র ইচ্ছাপূরণ মাত্র নয়, তাহা বহু ব্যক্তির সংস্পর্শে ও সঙ্গে, বহুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার মধ্য দিয়াই শুধু সম্ভব। যে ব্যক্তি, ক্ষুদ্র 'আমি'র স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখেন, যিনি বহুর কল্যাণের জন্য নিজের একার সুখ বিসর্জন দিতে পারেন না, তিনি আত্ম-উন্মোচন দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে পারেন না। ক্ষুদ্র 'আমি'র অবসানেই শুধুমাত্র সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।[১১]

সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া, ক্ষুদ্র 'আমি'র পৃথকত্ব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বহুর সঙ্গে যুক্ত বৃহৎ 'আমি'র প্রতিষ্ঠা

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে, সম্পূর্ণতাবাদ ব্যক্তিসুখবাদ বা স্বার্থবাদ (egoism) এবং পরসুখবাদের (altruism) সমন্বয় সাধনে সমর্থ। পূর্বেই আমরা দেখিযাছি, এই মতবাদ প্রেয়োবাদ ও যুক্তিবাদেরও সমন্বয় সাধন করিয়া থাকে। ইহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ, যেহেতু সমস্ত বিপরীত আদর্শের সংঘর্ষ, এই আদর্শ মীমাংসা করিতে সক্ষম।

সম্পূর্ণতাবাদ আত্মসুখ ও পরসুখ, সুখ ও যুক্তি, ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয় সাধন করে

সম্পূর্ণতাবাদের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সূত্র—'Be a person'—পূর্বের আলোচনা হইতেই দেখা যাইবে, শুধু 'আমি'র ক্ষণিক তুষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়। আবার এ আদর্শ, সমস্ত সুখ, সমস্ত ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষার অস্বীকৃতিও নয়। সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের আদর্শে বিকশিত হওয়াই মানুষের চরম উদ্দেশ্য। যুক্তি, আকাঙ্ক্ষা-আবেগের সীমানির্দেশ করিবে, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় সাধন করিবে। এমনি করিয়াই শুধু মানুষ সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব অর্জন করিতে পারিবে। বিচ্ছিন্ন হইয়া নয়, পৃথক হইয়া নয়, বৃহৎ বিশ্বজীবনের অবিচ্ছেদ্য জীবন্ত অঙ্গ হিসাবেই, ব্যক্তি সার্থকতা অর্জন করিবে। ইহার নামই সত্য স্বাধীনতা। বিশ্বজীবনের বৃহৎ আধারে, প্রত্যেকেই স্বাধীন—আবার প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক। প্রত্যেকেই

'মানুষ হও'

মানুষ হইতে হইলে, বৃহৎ বিশ্বজীবনের সহিত একাত্ম হইতে হইবে

১১। For our ideal self finds its embodiment in the life of a society and it is only in this way that it is kept before us...this relation to our fellowmen that we find our ideal life ..the 'I' or *ideal self* is not realized in any one individual, but *finds its realization rather* in the relations to one another. We can realize the *true self* or the complete good only by realizing social ends. In order to do this, we must negate the merely individual self, which is not the true self. We must *realise ourselves by sacrificing ourselves.* MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 271-74

আত্মশাসিত—প্রত্যেকেই স্ব-রাট্‌। কেহই প্রবৃত্তির দাস নয়, অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার ভৃত্য নয়। আবার প্রত্যেকেই বিশ্ববিধাতার সার্বিক বিধির শাসনাধীন,—প্রত্যেকেই তাই প্রজা। প্রত্যেকেরই নিজস্ব মূল্য আছে, প্রত্যেকেই উদ্দেশ্য। আবার প্রত্যেকেই অপরের আত্মউন্মোচনেরও উপায়। কাজেই একথা বলা যায়, **In the realm of ends, every person is an end, as also a means.** ইহাই ব্যক্তিত্ববিকাশ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ; এই ব্যক্তিত্ব, সাধনার বস্তু, ইহা প্রকৃতিদত্ত নয়। ইহা বংশানুক্রমে আমরা প্রাপ্ত হই না, ইহা বহু স্খলন, পতন, কঠোর আত্মশাসন দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়। ইহা পশুর ধর্ম নয়—ইহা বীরেরই ধর্ম—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। যিনি আত্মস্থ, তিনি যেমন নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তেমনি অপরের ব্যক্তিত্বের প্রতিও তেমনি শ্রদ্ধাশীল। তাই সম্পূর্ণতাবাদের উপদেশ—**Be a person and respect others as persons.**

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার্বিক বিধির শাসনকে স্ব-ভাবের শাসন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে

Die to live—মৃত্যুর বিনিময়েই শুধু পূর্ণতর জীবনের অধিকার জন্মে। বীজ মাটিতে পড়িয়া ধ্বংস হইলেই, প্রচুর নূতন শস্য জন্মে। যখন ফল গাছে নিজের বৃন্ত অধিকার করিয়া থাকে, তখন সে একক। কিন্তু যখন উর্বর ভূমিতে নিজ সত্তা মিশাইয়া দেয়, তখনই সে জন্ম দেয়, বহু নবীন ফলবান্‌ বৃক্ষের।[১২] শুধু চাওয়া, শুধু আত্ম-পরিতোষণ দ্বারা ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব নয়। শুধু মুগ্ধ আত্মরতিতে নারী সম্পূর্ণ নয়—যেদিন রক্তের মূল্যে সে মা হইল, সেদিনই তাঁহার নারীত্বের পরিপূর্ণতা। যে স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিল না, যে পরের জন্য দুঃখভোগ করিতে শিখিল না, সে কখনও মনুষ্যত্বের গৌরব লাভ করিতে পারে না। যতক্ষণ আমরা কেবলই বাহিরের উপকরণের মধ্যে, সুখের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিজেকে হারাই, ততক্ষণ নিজেদের আমরা সম্পূর্ণ করিয়া পাইনা। "গেটের একটি কথা আমি মনে করে রেখেছি, সেটা শুনতে সাদাসিধা, কিন্তু বড়োই গভীর—

ক্ষুদ্র পৃথক 'আমি'র মৃত্যুতেই শুধু পরিপূর্ণ মানুষ 'আমি'র প্রতিষ্ঠা

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'

Entbehren sollst du, sollst entbehren.

Thou must do without, must do without.

১২। **Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone; but if it die, it bringeth forth much fruit.**

Kempis—Imitation of Christ.

কেবল হৃদয়ের অতিভোগ নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিসপত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়। বাইরের সমস্ত যখন বিরল, তখনই নিজেকে ভালো রকমে পাই।"[১৩] ত্যাগের দ্বারা, ক্ষুদ্র আমির মৃত্যু দ্বারাই শুধু, বৃহৎ বিশ্বজীবনের সহিত যোগযুক্ত 'সত্য আমি'কে চিনিতে পারি।[১৪]

সম্পূর্ণতাবাদের দার্শনিক ভিত্তি—Philosophical basis of Perfectionism—হেগেলের বস্তুগত ভাববাদ এই নৈতিক আদর্শের ভিত্তি। এই দার্শনিক মত অনুযায়ী সমগ্র জগৎ ও জীবন এক সর্বব্যাপী ভাবময় সত্তারই প্রকাশ! এই সত্তাকে আমরা ভগবানও বলিতে পারি। বাহ্য জগতের সমস্ত বস্তু এবং মানুষের অন্তরের সমস্ত চিন্তা, ইচ্ছা ও কর্ম সেই একই মূল সত্তার বিভাব। এই সত্তা সক্রিয় ও ক্রমবিকাশমান্। ভাবময় বিশ্বসত্তারই বাস্তব রূপ এই বিশ্বজগৎ ও মনোজগৎ। দুইই সেই ভাবময় সত্তার আত্মবিকাশের যে বিধি dialectic—তাহারই সূত্র অনুযায়ী thesis-antithesis ও synthesisএর পদ্ধতি অনুযায়ী ক্রমবিকশিত হয়। ব্যক্তি জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়—ব্যক্তির মনোজগৎ ও বাহ্য জড়জগৎ বিচ্ছিন্ন ও বিপরীত সত্তা নয়। দুইই ভাববাদী চরম সত্তার যুক্তির বিধি মানিয়া চলে। ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ পরিণতি বিশ্বজগৎ ও চূড়ান্ত ভাবময় সত্তার সঙ্গে একাত্মতা। এই আদর্শ নিষ্ক্রিয় নয়, নেতিবাচক নয়। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির শেষ উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, ইহা শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শও বটে।

সংক্ষিপ্তসার

মানুষের স্বভাব কি? এ প্রশ্নের উপরই নির্ভর করে মানুষের নৈতিক আদর্শ কি হওয়া উচিত। প্রেয়োবাদীরা বলেন, মানুষের প্রকৃত পরিচয় এই যে সে প্রাণী। প্রাণীর স্বভাব হইল, ইন্দ্রিয়ভোগ, সুখের আকাঙ্ক্ষা। ইহাই যখন মানুষের প্রকৃতি, তখন তাহার জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সর্বাধিক পরিমাণ সুখ আহরণ।

অন্যদিকে যুক্তিবাদীরা বলেন, মানুষের প্রকৃত পরিচয় এই যে, সে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। সে যুক্তিদ্বারা ইন্দ্রিয়ের বেগকে রোধ করিবে, আত্মত্যাগ করিবে, কৃচ্ছ্রের পথে চলিবে, ইহাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছিন্নপত্রাবলী—বিচিত্রা পৃঃ ৮৬।

১৪। I must die, as an individual object of sensibility, if I would live as a moral person, the master of sensibility ..Importunity is not the measure of ethical importance and the 'everlasting Nay' of self-sacrifice precedes and makes passible the 'everlasting Yea' of a true self-fulfilment.

Seth—A Study of Ethical Principles, P. 207

এই দুইটি আদর্শ পরস্পর বিপরীত এবং দুইটিই অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী। মানুষ শুধুমাত্র প্রাণীও নয়, বিশুদ্ধ বিদেহী যুক্তিও নয়, সুতরাং এই দুইটি আদর্শের কোনটিই সম্পূর্ণ মানুষের সমগ্র প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। এই দুই আপাতবিরোধী আদর্শের সমন্বয় প্রয়োজন।

সেই সমন্বয় সাধন করা হইতেছে, সম্পূর্ণতাবাদের আদর্শ। এই আদর্শ বলে, জীবনের উদ্দেশ্য শুধু ভোগও নয়, শুধু ত্যাগও নয়। এই দুইয়ের সুসামঞ্জস্যেই সম্পূর্ণ মানুষ। ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি ও যুক্তি মানুষের অন্তরে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করে না। একই মানুষের ইহারা অবিচ্ছিন্ন দুইটি দিক।

এই আদর্শ বলে, আত্মার ক্রম-উন্মোচন দ্বারা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটে। সেই জন্য ইহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শ—Ideal of self-realization বলা হয়। এই আদর্শ বলে, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাই জীবনের উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহাকে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠাবাদও বলা হয়। আবার শ্রেষ্ঠ গ্রীক্ পণ্ডিতেরা ইহাকে আনন্দবাদ বা Eudaemonism'ও বলিয়াছেন। যুক্তিবিচার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সুনিয়ন্ত্রণের ফল হইল, পরিপূর্ণ আনন্দ ও শান্তি, ইহাই হইল জীবনের উদ্দেশ্য।

মানুষের দেহ আছে, ইন্দ্রিয় আছে, তাহাদের দাবি আছে। এই বাস্তব সত্য উপেক্ষা করা মূঢ়তা। চরম যুক্তিবাদীরা বলেন, প্রবৃত্তিগুলির ধ্বংসই 'মানুষ' হইবার পথ। ইহা অসম্ভব কথা। মানুষের ইন্দ্রিয়জ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম তাহার স্বভাবের অঙ্গ, তাহারা অন্যায় নয়, পাপ নয়। তাহারা অন্যায় ও পাপ, যখন তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করে, যখন দুর্দম চঞ্চলতায় তাহারা সমস্ত শাসন-নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করে। যুক্তিবুদ্ধির কাজ, প্রবৃত্তির শাসন, নিয়ন্ত্রণ, সঙ্গতীকরণ। বুদ্ধিই প্রবৃত্তির সীমা যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্দেশ করিয়া দেয়। যুক্তি প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ নয়—তাহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ সুসঙ্গত সহযোগিতার। অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি অন্ধ আর প্রবৃত্তিহীন যুক্তি অবাস্তব ভাব মাত্র। তাহারা যখন সুসঙ্গত সহযোগিতার সম্বন্ধে যুক্ত হয়, তখনই ঘটে জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দময় ও স্বাভাবিক বিকাশ।

প্রবৃত্তি অন্ধ, এবং তাহা ব্যক্তিকে বিশ্বজগতের ঐক্যের কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করে। স্বার্থের সন্ধানে, মানুষ বাস্তবিকপক্ষে নিজেকে সম্পূর্ণ করিয়া জানে না। আবার নিজেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়াও কেহ জীবনে সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। এই দুইয়ের সমন্বয় প্রবৃত্তি ও যুক্তির সুসঙ্গত সহযোগিতায়ই শুধু সম্ভব।

ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থ বাস্তবিক সম্পূর্ণ বিপরীত নয়। যুক্তিদ্বারাই মানুষ নিজের স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থের সমন্বয় সাধন করিতে পারে।

সম্পূর্ণতাবাদের আদর্শ তাই সমন্বয়ের আদর্শ। ইহা ব্যক্তির বিভিন্ন শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্মের সমন্বয়ের দ্বারা ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের পথ নির্দেশ করে।

ইহা স্বার্থবাদ ও পরার্থবাদের সমন্বয় সাধন করে—ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয় সাধন করে। ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সমাজ পরিমণ্ডল হইতে বিভিন্ন হইয়া সম্ভব নয়।

এই আদর্শ বলে 'মানুষ' হওয়াই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। 'মানুষ' যে, সে প্রবৃত্তির দাস নয়। যুক্তি-দ্বারা সে প্রবৃত্তিগুলিকে সংহত করে, সংযমন করে, নিয়ন্ত্রণ করে।

এই আদর্শ বলে, পরিপূর্ণ জীবনের প্রতিষ্ঠা, সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা ক্ষুদ্র 'আমি'র মৃত্যুর দ্বারাই সম্ভবপর। বৃহৎ আমি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলসত্তার সমগোত্রীয় 'আমি' শুধু স্বার্থ ও প্রবৃত্তির দাসত্বের দ্বারা হয় না। যুক্তিদ্বারা সেই ক্ষুদ্রকে অতিক্রম করিয়াই বৃহৎ আমির প্রতিষ্ঠা।

এই মতবাদ শ্রেষ্ঠ, এবং ইহা হেগেলের বাস্তব ভাববাদের সঙ্গে সুসমঞ্জস।

Questions

1. Critically explain and critically examine the Ethical ideal of perfectionism. Show how it brings about a synthesis of differing ethical ideals.

2. Which do you regard as the most satisfactory ethical ideal? Give reasons.

3. Critically comment on the maxims : 'Be a man' and 'Die to Live'.

ষোড়শ অধ্যায়

ভারতীয় চিন্তায় নৈতিক আদর্শ

[Does Indian thought ignore moral consciousness ?—Jnanamarga of the Upanishads—the Ideal according to the Advaita Vedanta—the Ideal according to Shri Ramanuja—The Ideal of Vivekananda—A new interpretation of the Vedanta—Its significance for our present life.]

পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা—ভারতীয় চিন্তায় নীতি-বোধের অভাব

পাশ্চাত্ত্য দেশের চিন্তাশীল মানুষেরা অনেক সময় ভারতীয় চিন্তাধারার সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ভারতীয় দর্শনে নৈতিক চিন্তার অভাব আছে। এই মত ভারতীয় চিন্তা সম্বন্ধে অগভীর পল্লবগ্রাহিতার ফল।

ভারতীয় দর্শনে নীতিকে ধর্ম ও সাংসারিক কর্তব্য হইতে পৃথক করিয়া দেখা হয় না

ইহা সত্য যে, ভারতীয় দর্শনে নীতিশাস্ত্রকে পৃথক করিয়া আলোচনা করা হয় নাই। ইহাও সত্য যে, বৈদান্তিক মতানুযায়ী বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষলাভ সম্ভব, এবং যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি পাপ ও পুণ্যের উর্ধ্বে—তাঁহার কর্মবন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়, সংসারের কোন কর্তব্য তাঁহার থাকে না।[১] বৌদ্ধ দর্শনেও নির্বাণ প্রাপ্তিই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য—এবং যিনি নির্বাণ লাভ করিলেন, তাহার পক্ষে সাংসারিক কর্তব্যের কোন প্রয়োজন নাই। উপনিষদে বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রভেদ করিয়া বলা হইয়াছে,

ব্রহ্মচারীর কর্মবন্ধন ছেদ হইয়া যায়

বিদ্যা দ্বারাই মুক্তি, জ্ঞানই সমস্ত বন্ধন ছেদনের উপায় আর অবিদ্যাই হইতেছে সমস্ত বন্ধনের হেতু। বিদ্যার চর্চার দ্বারাই মানুষ মৃত্যু হইতে ত্রাণ পায়। যাঁহারা কর্মের পথে মুক্তি সন্ধান করেন, তাঁহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। আর যাঁহারা ব্রহ্মকে না জানিয়া, দেবতাদের পূজায় রত হন, তাঁহারা গভীরতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন।[২] সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে চক্ষুদ্বারা জানা যায় না, বাক্যদ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করা

১। Dwijadas Datta—Moksha or the Vedantic Release—Journal of the R. A. S., Vol. XX, P. 4

২। ঈশোপনিষৎ—৯

যায় না, কর্মের মধ্য দিয়া তাঁহাকে লাভ করা যায় না, মনদ্বারা তাঁহাকে চিন্তা, করা যায় না,—নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।[৩] বিশুদ্ধান্তঃকরণ সাধক নির্মল জ্ঞানের দ্বারা, ধ্যান যোগে নিরবয়ব আত্মাকে দর্শন করেন। কর্মদ্বারা বা তপস্যাদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না—

জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়

> ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
> নান্যৈ র্দেবৈ স্তপসা কর্মণা বা
> জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব
> স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলংধ্যায়মানঃ।[৪]

এই অল্প কয়টি উদ্ধৃতি হইতে ইহা মনে হইতে পারে যে, ভারতীয় চিন্তায় জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া চিন্তিত হইয়াছে, এবং সংসারের কর্তব্য, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি সম্পূর্ণই উপেক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এই ধারণা সত্য নয়।

কিন্তু নীতিবোধ অস্বীকৃত নয়

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাকে গৌণ স্থান দিয়াছেন—বিশুদ্ধ আচরণের উপরই জোর দিয়াছেন। ধম্মপদের উপদেশের মধ্যে এই কথাটিই বারে বারে পাওয়া যায় যে, যদিও সত্য-জ্ঞান দ্বারা নির্বাণ লাভই উদ্দেশ্য, কিন্তু চিত্তের শান্তির জন্য প্রয়োজন,—ইন্দ্রিয় সংযম ও সদাচার। সত্যজ্ঞান লাভের প্রথম সোপান আত্মশাসন ও বিশুদ্ধ চিত্ত।

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন বিশুদ্ধ আচরণের উপরই জোর দিয়াছেন

উপনিষদ্ জ্ঞানের পথেই মুক্তি অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু সেখানেও বিশুদ্ধ-জীবন ব্যতীত সত্যজ্ঞান সম্ভব নয় একথা স্বীকৃত। কঠোপ-নিষৎ দ্বিতীয়া বল্লীর প্রথম শ্লোকটি হইতেছে—

উপনিষদে জ্ঞানমার্গই মুক্তির পথ বলিলেও, বিশুদ্ধ জীবন ব্যতীত সত্যজ্ঞান সম্ভব নয়, ইহা স্বীকৃত

> অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়
> স্তে উভে নানার্থে পুরুষংসিনীতঃ।
> তযোঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
> ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃনীতে॥

শ্রেয় (যাহা শুভ) ও প্রেয় (যাহা সুখকর) পরস্পর বিপরীত। এই উভয় বিভিন্নরূপে পুরুষকে (অর্থাৎ, মনুষ্যকে) আকর্ষণ করে। যে এই দুইয়ের মধ্যে

৩। কঠোপনিষৎ—১২
৪। মুণ্ডকোপনিষৎ—৮-৯।

শ্রেয়কে গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হয়; আর যে প্রেয়কে গ্রহণ করে, সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।

তাহার পরের শ্লোকেই বলা হইয়াছে যে, যাহারা মন্দ অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি তাহারাই কেবল অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণের অভিলাষে প্রেয়কে বরণ করে।

তৃতীয় শ্লোকে যম নচিকেতাকে এই বলিয়াই প্রশংসা করিতেছেন যে, সে রমণীয় ও আপাত সুখকর দ্রব্যসমূহের অসারত্ব চিন্তা করিয়া তৎ সমস্ত বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়াছে।[৫]

অন্যান্য উপনিষদ হইতেও এ প্রকার ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তাহাতে এই সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট হইবে যে, ভারতীয় চিন্তায় ইন্দ্রিয় সংযম ও বিশুদ্ধ জীবনকে সত্যজ্ঞান লাভের প্রথম সোপান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইন্দ্রিয় সংযম ও বিশুদ্ধ জীবনকেই সত্যজ্ঞান লাভের প্রথম সোপান বলিয়া বলা হইয়াছে

যোগ দর্শনেও সত্যজ্ঞান লাভকে মুক্তি বা অপবর্গের পথ বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রস্তুতি হিসাবে চিত্তবৃত্তি নিরোধের বিভিন্ন পন্থা সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। অন্তরকে যোগযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে যে আটটি সোপান (অষ্টাঙ্গিক মার্গ) উপদিষ্ট, তাহার প্রথম দুইটি হইতেছে যম এবং নিয়ম। যম বা আত্মসংযমের প্রণালীগুলি হইতেছে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (non-stealing), ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ (non-acceptance of unnecessary gifts)। নিয়ম হইতেছে শৌচ (outer & inner cleanliness), সন্তোষ, তপঃ (enduring hardships) স্বাধ্যায় (reading holy books) ও ঈশ্বর প্রণিধান (meditation of God and resignation to His will)। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, যেগুলিকে পাশ্চাত্ত্য দেশ নৈতিক গুণ বলিয়া মান্য করে, তাহার সব কয়টি গুণের অনুশীলনই হিন্দু দর্শন অনুসারে জ্ঞানলাভ দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।[৬]

যোগ দর্শনে যম ও নিয়ম এই আত্মসংযমের পথেরই নির্দেশ

নৈতিক গুণের অনুশীলন হিন্দু শাস্ত্র বারে বারেই নির্দেশিত

'পঞ্চদশী'তে যদিও যজ্ঞ বা সৎকর্ম দ্বারা মোক্ষ লাভ অসম্ভব বলা হইয়াছে, তথাপি আমরা মোক্ষকামীর মুখে এমন প্রার্থনা শুনিতে পাই, "অজ্ঞানী ব্যক্তিরা পার্থিব সুখের প্রতি যে নিত্য আকাঙ্ক্ষা বোধ করে, তোমার নাম যখন স্মরণ করি তখন যেন তেমনি আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরে চির জাগরূক থাকে।" অর্থাৎ এখানে,

৫। কঠোপনিষৎ—দ্বিতীয়া বল্লী—১-৪

৬। যোগ সূত্র—২, ২৯,

সত্যজ্ঞান লাভের জন্য, পার্থিব সুখ উপেক্ষা করাই কর্তব্য এই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। অবশ্যই ইহা সত্য যে বেদান্তবাদীদের মতে যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, তাঁহার আর কর্ম থাকে না, তিনি তখন পাপ ও পুণ্যের ঊর্ধ্বে—

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ [৭]

এই মত, যে যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনি নৈতিক কর্মের ঊর্ধ্বে, ইহা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের কাছে আপত্তিজনক মনে হয়। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তাঁহার অহং বুদ্ধিও থাকে না, সামাজিক সংস্কারও থাকে না। তাঁহার সমস্ত কর্ম, সমস্ত চিন্তা সেই পরম ব্রহ্মের সঙ্গেই একাত্মীভূত। তাই তাঁহার কর্ম ও ইচ্ছাকে সাংসারিক নীতিবোধের মাপকাঠিতে মাপা যায় না।

যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনি নৈতিক কর্মের ঊর্ধ্বে, কারণ তাঁহার অহং বোধই লুপ্ত হইয়া যায়

পাপ ও পুণ্য এই প্রভেদ নিতান্তই মানবিক। কিন্তু সর্ববিশ্বের যিনি বিধাতা তাঁহার সমস্ত কর্ম বা ইচ্ছাই সৎ। যাহা ঘটে, তাহা তাঁহারই ইচ্ছা এবং তাহাই মঙ্গল—'What is real is rational and what is real is rational is real.'

পাশ্চাত্ত্য চিন্তাযও এমন কথা আছে যে, যিনি ঈশ্বরে সমর্পিতদেহবুদ্ধি, তিনি পাপ-পুণ্যের অতীত

স্পিনোজায়ও কি আমরা অনুরূপ চিন্তাই পাই না? এই জন্য ভারতীয় দর্শনে নৈতিক চিন্তার অভাব আছে বলিয়া নিন্দা করা নিতান্তই নিরর্থক।[৮]

সন্ন্যাসের আদর্শ—অদ্বৈত বেদান্ত—সন্ন্যাসের আদর্শের আকর্ষণ চিরন্তন। মায়াবাদে বিশ্বাসী ভারতবর্ষের চিন্তায় এই আদর্শ গভীরতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শংকরাচার্য বেদান্তের যে অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা প্রবর্তন করেন এবং তাঁহার নিজ বিশুদ্ধ জীবন, এ আদর্শের গভীর প্রভাবের মূল।

শংকর বেদান্ত মতে, ব্রহ্মই একমাত্র একমাত্র সত্য, আর সমস্তই মায়া। পৃথিবীর বহু দ্রব্য, এবং আমি-তুমি ইত্যাদি প্রভেদ সবই মিথ্যা, সবই মায়া। এবং জীবাত্মা ও ব্রহ্মবস্তু অভেদ। জ্ঞানের পথে এই অভিন্নতা প্রতিষ্ঠাই জীবের আদর্শ। ইহার জন্য অজ্ঞানতার মায়াবরণ ছিন্ন করা প্রয়োজন। কর্মের পক্ষে

শংকরের বেদান্তবাদ—জগৎ মায়া, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য

৭। মুণ্ডক উপনিষৎ—২, ২, ৮,

৮। ম্যাক্সমূলারও তাই বলিয়াছেন, Dangerous as this principle seems to be, that whosoever knows Brahman cannot sin, it is hardly more dangerous *if properly understood*, than the saying of St. John (Ep. 1, V. 68), that whosoever is born of God, sinneth not. Max Muller—Six Systems of Indian Philosophy, P. 168

সংসারচক্রের মায়াজাল ছেদন,—দুঃখের অত্যন্ত অবসান—সম্ভব নয়। যজ্ঞাদি কর্ম, দান, ধ্যান, তপস্যা,—'প্লবাঃ হ্যেতে অদৃঢ়াঃ'—ইহারা সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার পথে নিতান্তই অনির্ভরযোগ্য অদৃঢ় ভেলা। কর্মের দ্বারা উচ্চতর লোক লাভ হইতে পারে, কিন্তু—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি',—পুণ্য ভোগ হইলে আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ইহার দ্বারা সংসারচক্র অতিক্রম করা যায় না, দুঃখের জাল ছেদন করা যায় না—মুক্তিলাভ অসম্ভব। বেদান্ত মতে এই মুক্তির অর্থ হইতেছে সমস্ত মায়া আবরণ ছিন্ন করিয়া, আত্মার স্বভাব—ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। অবিদ্যার আবরণ আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে বলিয়াই, আমরা এক সত্যবস্তু ব্রহ্মের পরিবর্তে 'বহু'কে দেখি। জ্ঞানের দ্বারা এই মায়ামোহ ধ্বংস করিয়াই জীবাত্মা আপনার ব্রহ্ম স্বরূপে প্রকাশিত হয়। 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্মঃ'।[৯] আর যিনি সত্যবস্তু ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'। ব্যক্তিকে ইহাই উপলব্ধি করিতে হইবে যে জীবাত্মাই ব্রহ্ম—তৎ ত্বমসি।[১০] ম্যাক্সমূল্যর বেদান্তের সারমর্ম এই উদ্ধৃতি দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন,

মায়াজাল ছিন্ন করিয়া ব্যক্তির ব্রহ্মত্বে প্রতিষ্ঠাই আনন্দ

কর্মের দ্বারা মুক্তির আশা নিষ্ফল

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ[১১]

পাশ্চাত্ত্য খ্রীষ্টান পণ্ডিতেরা এই 'সোহং' তত্ত্বে মানুষের অমার্জনীয় অহংকার দেখিয়া উত্তেজিতভাবে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তা এই বেদান্ত-বাদ—জীবাত্মা ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ একাত্মীকরণে। এই চিন্তা ভারতবর্ষের মানুষ শান্ত বিনম্র চিত্তেই গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রতি জীবে ব্রহ্মস্বরূপ উন্মোচনের সাধনাকে অসম্ভবও মনে করে নাই—অহংকৃত ধৃষ্টতা বলিয়াও উত্তেজিত চিৎকার করে নাই।[১২]

'অহংই ব্রহ্ম' এই কথা পাশ্চাত্ত্যবাদীরা ব্যক্তির অমার্জনীয় অহংকার মনে করেন

৯। মাণ্ডুক্য উপনিষৎ—২

১০। ছান্দোগ্য "—৬, ৮

১১। 'In one half verse I shall tell you what has been taught in thousands of volumes : Brahman is true, the world is false, the soul is Brahman and nothing else. There is nothing worth gaining, there is nothing worth enjoying, there is nothing worth knowing but Brahman alone, for he who knows Brahman is Brahman. Max Muller—Three Lectures on the Vedanta.

১২। ম্যাকসমূল্যর ইহা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন, "To maintain the eternal identity of the human and the divine is very different from arrogating divinity for humanity and on this point even our philosophy may have something to learn which has often been forgotten in modern Christianity though it was recognised as vital by the early fathers of the Church, the Unity of the Father and the Son, nay, of the Father and all His sons. Max Muller—Six Systems of Indian Philosophy, P. 124

যখন এই জগৎ মায়া মাত্র, তখন এই পৃথিবীর কোন দ্রব্যে আকর্ষণ যেমন নিরর্থক, তেমনি পার্থিব লাভের আকাঙ্ক্ষায় কোন কর্মও নিতান্ত অর্থহীন। যিনি মোক্ষকামী (মুমুক্ষু) তিনি যেমন আসক্তিশূন্য হইবেন, সংসারের কোন বন্ধনেও তিনি আবদ্ধ হইবেন না। যিনি জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে চান, তিনি বিরজা হোমের দ্বারা সমস্ত উপাধি, সমস্ত বক্তিগত ও সামাজিক পরিচয়, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা এবং **সমস্ত কর্তব্য ত্যাগ** করিয়া, ধ্যানমগ্ন হইয়া, আত্মস্থ ব্রহ্মস্বরূপ অনুধাবন করিবেন। তাঁহার গৃহ নাই, পরিজন নাই, বিত্ত নাই, মোহ নাই, কোন **সামাজিক দায়িত্বও** নাই। তিনি মুক্ত ও নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ। অদ্বৈত বেদান্ত মতে দেবপূজন, ভক্তি, আরাধনাও সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন,—কারণ ব্রহ্মস্বরূপ জীবাত্মা কাহার পূজা করিবে, কাহার আরাধনা করিবে? কর্মমার্গ ও ভক্তিমার্গ দুইই অদ্বৈত বেদান্ত মতে অস্বীকৃত। "শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ অদ্বৈতবাদ, ও মায়াবাদ এবং সাধনপথে সন্ন্যাস ও জ্ঞানমার্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন।......এই মতানুসারে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় হয় না এবং ভক্তির ইহাতে বিশেষ উপযোগিতা নাই।"[১৩] বৈদান্তিক জ্ঞানবাদীদের মতে, কর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ, সুতরাং মোক্ষই যাঁহার কাম্য তাঁহার পক্ষে সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ শ্রেয়ো মার্গ।[১৪] যিনি ব্রহ্মজ্ঞ 'তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে'। তাঁহার পাপপুণ্যও নাই। কারণ, পাপপুণ্য-বোধের মূলে আছে, অজ্ঞানতা জনিত, অহংকার। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনিই তো ব্রহ্ম এবং 'নির্দোষং হি সমংব্রহ্ম'। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পারমার্থিক তত্ত্ব হিসাবেই অদ্বৈত বেদান্তে সন্ন্যাসের কর্মত্যাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য তত্ত্ব হিসাবে এই জগৎ ও ইহার কর্তব্যগুলিকে অস্বীকার করিলেও, ইহাদের 'ব্যবহারিক সত্তা' অস্বীকার করেন নাই। তিনি জানেন যে, এই উচ্চতম 'শুদ্ধ আদর্শ' সাংসারিক মানুষের জন্য নহে, তাঁহাদের জন্য নিম্নতর বাস্তব আদর্শের প্রয়োজন আছে। এবং একথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন, স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া কর্তব্য সম্পাদন,

সমস্ত জগৎ মায়া, সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি সংসারের সমস্ত দ্রব্যের প্রতি আসক্তিহীন

যিনি জ্ঞানী, তিনি সমস্ত কর্তব্য ত্যাগ করিয়া আত্মস্থ ব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন থাকিবেন

ইহা বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ—এ পথে কর্ম ও ভক্তির স্থান নাই

সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসই জ্ঞানমার্গের উদ্দিষ্ট পথ

ইহা পারমার্থিক তত্ত্ব, কিন্তু ব্যবহারিক উপদেশ নয়

১৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—জগদীশ ঘোষ—ভূমিকা পৃ ৫১

১৪। " — " — ১৮, ৩

কামনা-বাসনার সংযম, অসনে-বসনে সংযম, বাক্যে ও চিন্তায় সংযম, শাস্ত্রাধ্যয়ন, দেবপূজন ইত্যাদি, বিশুদ্ধজ্ঞান লাভের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সকলেই সন্ন্যাসী হইতে পারে না। এখানে অধিকার ভেদ আছে এবং তাহা সাধনা-সাপেক্ষ। এবং সাংসারিক জীবন যাপনের জন্য যে পথ যোগ দর্শনে নির্দেশিত হইয়াছে, শঙ্করাচার্যও সেই পথই নির্দেশ করিয়াছেন। সে পথ নিতান্তই পাশ্চাত্ত্য মতেও 'নীতিসম্মত' পথ। ভারতীয় চিন্তায়ও মানুষের আদর্শ তাহার পরিপূর্ণ আত্ম-উন্মোচন। তবে ভারতবর্ষ এই আত্ম-উন্মোচনের আদর্শকে আরো অনেক সত্য ও গভীর অর্থেই গ্রহণ করিয়াছে। মানুষ তাহার অজ্ঞানের সমস্ত আবরণ ত্যাগ করিলেই কেবলমাত্র তাহার ব্রহ্ম-স্বরূপ আপন প্রভায় ভাস্বর হইয়া প্রকাশিত হইতে পাবে। সংসারের সব মানুষই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিস্বরূপ—সেই ভস্মের আবরণ জ্ঞান-শলাকা দ্বারা বিদূরণ করিলেই, জীবাত্মার প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ স্বয়ংপ্রভ নির্মল অগ্নির মত আত্মপ্রকাশ করিবে। আর একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মানুষের সাংসারিক জীবন, নৈতিক জীবন, আত্মিক জীবন, ধর্মজীবন পরস্পরবিচ্ছিন্ন এবং পৃথক নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশ তাহার বিজ্ঞানসুলভ বিশ্লেষণী দৃষ্টি দ্বারা, এই জীবন-গুলিকে পৃথক পৃথক বলিয়া কল্পনা করিয়া, তাহাদের নীতি ও বিধি পৃথক পৃথক করিয়া আবিষ্কার করিয়া, অবশেষে তাহাদের সমন্বয়ের বৃথা চেষ্টা করিয়াছে। তাই ইংরেজের ব্যবসায় ক্ষেত্রের নীতির সঙ্গে, পারিবারিক নীতি এবং উপাসনালয়ের নীতির মধ্যে ব্যবধান লক্ষিত হয়। দেশের স্বার্থের ক্ষেত্রে, সে দেশপ্রেমের নীতিকে উঁচু করিয়া ধরে, আবার অন্যদেশের ক্ষেত্রে সে সর্বমানবের ভ্রাতৃত্বের আদর্শের কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে। কিন্তু ভারতবর্ষ জীবনকে এমন খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে নাই তাই, ভারতীয় দর্শনে নীতিশাস্ত্রের আলোচনা নাই। তাহার সাংসারিক নীতি, ব্যবসায়গত নীতি, সামাজিক নীতি এবং ধর্ম পৃথক পৃথক নয়, অভিন্ন ও অবিভাজ্য। কিন্তু ভারতের সন্ন্যাসীর আচরণ এবং সাংসারিক মানুষের আচরণ দুইই বিশুদ্ধতা, সংযম, করুণা ও মৈত্রী ইত্যাদি উচ্চ মানবিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। তত্ত্বের দিক হইতে সন্ন্যাসীর পক্ষে কোন কর্তব্য নাই—কিন্তু তাঁহার আচরণ কখনও নীতিবিরুদ্ধ নয়। এবং তাঁহার কোন কর্মই 'অহং বুদ্ধি' হইতে অনুষ্ঠিত হয় না।

জগতের সাধারণ মানুষদের জন্য এই আদর্শ নয়

কিন্তু জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে হইলে আত্ম-সংযম দ্বারা নৈতিক জীবন যাপন করিতে হয়

ভারতীয় ঋষি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীর মতো জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখেন নাই

তাই ভারতীয় দর্শনে নীতির পৃথক আলোচনা নাই

কিন্তু সন্ন্যাসীর জীবন ও সংসারীর জীবন সর্বত্রই বিশুদ্ধতা, সংযম, করুণা, মৈত্রী ইত্যাদি মানবিক গুণ প্রশংসিত ; সন্ন্যাসীর জীবন নীতিবিরুদ্ধ নয়

শ্রীরামানুজাচার্য—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য বস্তু স্বীকার করিলেও জগৎ মিথ্যা এ কথা গ্রহণ করে না। এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন এ কথাও স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী, কিন্তু জীব বহু, সসীম, প্রতি শরীরে বিভিন্ন। জগৎ ব্রহ্মের মায়াশক্তি-প্রসূত—ব্রহ্মেরই শরীর। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণ কর্মত্যাগকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন না। ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা বিশুদ্ধ সংযত জীবন যাপন, অপ্রমত্ত হইয়া, অহংবুদ্ধি বিরহিত হইয়া সংসারের কর্তব্য পালনই ইঁহারা বিধেয় বলিয়া মনে করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়াই গ্রহণ করেন, এবং তাঁহাদের মতে ঈশ্বরারাধনা বিশুদ্ধ জীবন যাপনের উপায় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। নিজ কর্মের জন্য ব্যক্তির দায়িত্ব আছে। শুধু মাত্র জ্ঞান বা যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা মুক্তি লাভ সম্ভব নয়, ইহার জন্য প্রয়োজন ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রসাদ। নিজ কর্মফলের দ্বারাই মানুষের বন্ধন ঘটে এবং সদাচরণ দ্বারাই পাপক্ষয় ঘটে। এই মত অনুযায়ী, ধর্মজীবন শুষ্ক বুদ্ধিচর্চাও নহে এবং অর্থহীন যজ্ঞ, তপস্যা সাধনও নহে—বিশুদ্ধ জীবন ও ভক্তিই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ। ব্যক্তি নিজ দুষ্কৃতির ফল ভোগ করে এবং এই কর্মফল ভোগের দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া, ভগবৎকৃপায় সে ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করে।[১৫] শ্রীরামানুজাচার্য যে আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন—তাহা এই মাটির পৃথিবীর মানুষদের জন্যই—'সোঽহংবাদী' তত্ত্ববাদীর জন্য নহে।[১৬]

শ্রীরামানুজাচার্য ব্রহ্মকে মূল সত্তা বলিয়া স্বীকার করিলেও, জগৎকে অস্বীকার করেন না

অহং বুদ্ধি বিবর্জিত হইয়া সংসার-কর্তব্য পালন নির্দেশিত হইয়াছে

ভক্তির স্থান স্বীকৃত

১৫। On account of its past deeds, the soul finds itself confined in a material body, its inner light obscured by the outer darkness...In Ramanuja's philosophy great emphasis is placed on the conviction of sin and man's responsibility for it. So far as responsibility is concerned, each individual is an other to God, a different person. When the soul fails to recognise its dependence on God, God helps it to realise the truth by the machinery of Karma, which inflicts punishments on the soul, thus reminding it of its sinful efforts. Through the operation of the indwelling God, the soul recognises its sinfulness and entreats God for help.

Radhakrishnan—Indian Philosophy, P. 793

১৬। Of course with Ramanuga also, Brahman is the highest reality, but this Brahman is at the same time full of compassion or love. The Ramanuga's sect assumed no doubt, the greatest importance, as a religious sect as teaching people how to live, rather than how to think. Max Muller—Six Systems of Indian Philosophy, P. 187

স্বামী বিবেকানন্দ—আধুনিক কালে বেদান্তের বাণীকে এক নূতন তাৎপর্য দিয়াছিলেন শ্রীবিবেকানন্দ। তাঁহারও মন্ত্র ছিল 'শিবোঽহং'—জীবই শিব। মানুষে ব্রহ্মসত্তাই বিরাজমান—তাই সে অভীঃ, সে স্বাধীন। কিন্তু বৈদান্তিক সংসারবিমুখ, কর্মবিমুখ, শুদ্ধধ্যাননিমগ্ন আত্মকেন্দ্রিক সত্তা নয়। এই জগৎ ক্ষণিক, অসম্পূর্ণ, তাই ইহা মায়া। আত্মাবস্তু স্বাধীন, তাই সে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সুখদুঃখের প্রতি অনাসক্ত, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মিথ্যা বা শূন্য নয়। এই জীবনের কর্তব্যকে অবহেলা করা চলিবে না,—নিস্পৃহ ও নিরহঙ্কার হইয়াই এই কর্তব্য পালন করিতে হইবে। কিন্তু পদ্মপত্রে নীড়ের মতই নিস্পৃক্ত হইয়াই সংসারে নির্ভয় হইয়া বীরের বাস করিতে হইবে,--ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস। কোন জীব ঘৃণার পাত্র নয়, অবহেলার বস্তু নয়, সবাইকেই শিবজ্ঞানে সেবা করিতে হইবে। যিনি বৈদান্তিক, তিনি সংসার হইতে পলাইয়া, হিমালয়ের কন্দরে গিয়া আত্মতত্ত্ব ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবেন, এমন নহে—তিনি সিংহবিক্রমে সংসারে বিপুল কর্মময় জীবন যাপন করিবেন, অথচ কর্মের দ্বাবা আবদ্ধ হইবেন না,—ইহাই হইল শ্রীবিবেকানন্দের কর্মযোগ।

বিবেকানন্দ বৈদান্তিক, কিন্তু তিনি কর্মযোগী

বিবেকানন্দের বেদান্তবাদ শুধু ভাবালুতা নয়—শুধুই বুদ্ধি ও বিচারেব ফল নয়। তিনি নিজের সন্ন্যাসী জীবন যাপনের দ্বারা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, অদ্বৈতবাদ শুধু শুষ্ক তত্ত্বমাত্র নয়। অদ্বৈত বেদান্ত ঘোষণা করিয়াছিল, জীবাত্মাই পরমব্রহ্ম—পরমবীর্য যাহার স্বরূপ, ভয় ও কাপুরুষতা তাহাতে সাজে না। তাই বিবেকানন্দ কম্বুকণ্ঠে দেশের জরাজীর্ণ ভীরু মানুষদের ডাকিয়া বলিলেন, "হে বীর সাহস অবলম্বন কর—দুর্বলতাই পাপ, কাপুরুষতাই পাপ—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। আবার বলিলেন, "যাহা কিছু কর, মানুষের মত কর। মনুষ্যত্বকে অবনমিত করিও না। সিংহ-শিশু-স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে মেষশিশু ভাবিও না। ওঠ, জাগো, মোহ নিদ্রা হইতে জাগো—ভুলের খেলা অনেক হইয়াছে। স্বপ্ন দিয়া এখন স্বপ্ন ভাঙো; স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও।" উপনিষদের এই অভয় বাণী বইয়ের পৃষ্ঠায় লুকানো ছিল, কিন্তু তাঁহার জীবনে এই বাণী মূর্ত হইয়া উঠিল—এই বাণী প্রাণময়ী হইয়া উঠিল। সহস্র প্রতিকূল অবস্থায়ও তিনি নির্ভয় চিত্তে সংগ্রাম করিয়াছেন, কখনও নতি স্বীকার করেন নাই। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি শুভ কর্ম কবিয়া গিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভ ছিল না, কোন ফলাকাঙ্ক্ষা ছিল না।

অদ্বৈতবাদ শুষ্ক জ্ঞানচর্চা নয়

দুর্বলতাই পাপ কাপুরুষতাই পাপ-বীরের মত সংসারের কর্তব্য করিতে হইবে

তাঁহার সন্ন্যাস তাই কর্মত্যাগ নয়, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। তিনি প্রাচীন বেদান্তকে শুষ্ক প্রাণহীন পলায়নপরতা ও ধ্যানমগ্নতা হইতে উদ্ধার করিয়া, এক নূতন ব্যাখ্যা দিলেন,—নবযুগের জন্য এক নূতন জীবন-বেদ রচনা করিলেন। এ বেদান্ত কেবলই বলে না—নেতি, নেতি, নেতি—জীবন মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, মানুষের সুখদুঃখ মিথ্যা। তিনি বলিলেন, "কাজ কর, কাজ কর, প্রশংসা করিল, কে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কাজ করিয়া যাও,—কে নিন্দা করিল ভ্রূক্ষেপও করিও না। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—উঠ জাগ, যতদিন না অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতেছ ততদিন ক্রমাগত তদুদ্দেশ্যে চলিতে ক্ষান্ত হইও না।···এ একদিনের কাজ নয়। পথ ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু···আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শত শত লোক এ চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উঠিবে।··বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় উদ্যম···তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল, দেখিতে যাইও না। অগ্রসর হও, সম্মুখে, সম্মুখে। এই রূপেই আমরা অগ্রগামী হইব—একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।"

কর্ম করিতে হইবে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া

কিন্তু কি সে কাজ, যাহার জন্য এই সন্ন্যাসী মানুষকে বারে বারে আহ্বান জানাইয়াছেন? এক কথায়, সে কাজ—নরনারায়ণ সেবা। এ আদর্শ তিনি তাঁহার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন। ইহার ইতিহাসটুকু কৌতুহলোদ্দীপক। একদিন (১৮৮৪ সালে) রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছিলেন। সর্বজীবে দয়া ঐ মূলতত্ত্বগুলির অন্যতম। "এই সমগ্র বিশ্বই কৃষ্ণের। একথা তোমরা গভীরভাবে আত্মাদিয়া অনুভব করো এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি সদয় হও। 'সমস্ত প্রাণীর প্রতি' রামকৃষ্ণ কথাগুলি পুনরায় উচ্চারণ করিলেন, এবং সমাধিস্থ হইলেন। পরে আত্মস্থ হইয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন: 'সর্বজীবে দয়া। তোদের কি লজ্জা নাইরে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট? ভগবানের জীবকে দয়া দেখাইবি কেমন করিয়া! দয়া দেখাইতে তুইই বা কে?···না! না! দয়া অসম্ভব। তাহারা যেন শিব, এইভাবে তাহাদের সেবা কর।'

কি মানুষের শ্রেষ্ঠ কাজ?

"অতঃপর নরেন (বিবেকানন্দ) অন্যান্য শিষ্যদের সহিত বাহিরে যাইবার সময় এই কথাগুলির গভীর অর্থ কি, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলেন। এ পর্যন্ত তাঁহারা কথাগুলি আবছা বুঝিয়াছিলেন মাত্র। নরেন সেবার মতবাদের দৃষ্টিতে এই কথা-

গুলির ব্যাখ্যা করেন। সেবার মধ্যেই মঙ্গল কার্যের সহিত ভগবানের ঊর্ধ্বতর প্রেমের মিলন হইয়াছে।"[১৭]

বিবেকানন্দের আদর্শ নেতিবাচক নহে,—ইহা নিষ্ক্রিয় জীবনের আদর্শ নহে। এই বিশ্বজগৎই তো ব্রহ্মময়, তাহাকে ত্যাগ করিয়া, তাহাকে অস্বীকার করিয়া তো ব্রহ্মলাভ হইতে পারে না। মানুষের মধ্যেই ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ—তাই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরও শ্রেষ্ঠপথ, নারায়ণ জ্ঞানে মানুষের সেবা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "তুমি ভগবানকে খুঁজিতেছ? বেশ তো, মানুষের মধ্যেই তাহার সন্ধান করো। ভগবান নিজেকে মানুষের মধ্যে যেমন প্রকট করিয়াছেন, তেমনটি আর কিছুর মধ্যে করেন নাই। ভগবান্ সর্বভূতে আছেন সত্য। তবে তাঁহার শক্তি অন্যান্য বস্তুতে কম বেশী প্রকট হইয়াছে। ভগবান মানুষের মধ্যে রূপলাভ করিয়া রক্তমাংসে আপনার শক্তিকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ করিয়াছেন।"[১৮] বিবেকানন্দ এই নরনারায়ণের সেবার মধ্য দিয়াই ভগবানকে খুঁজিবার আদর্শ শিখাইয়াছেন। ইহা এই যুগোপযোগী বাস্তব ও সার্থক আদর্শ। সর্বজীবে শিবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের জাতিভেদ প্রথা তাঁহাকে এত পীড়া দিত এবং এই কুপ্রথা দূর করিয়া মানুষকে তাহার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ নিজেকে অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিবে, অন্যের কাছে পূজা দাবি করিবে, ইহা অপেক্ষা মিথ্যা ও অনাচার আর কিছু হইতে পারে না।[১৯]

সাক্ষাৎ নারায়ণজ্ঞানে মানুষের সেবা

১৭। স্বামী সারদানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী

১৮। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ

১৯। তিনি বলিলেন, "In speaking of the soul, to say that one is superior to the other has no meaning...And last of all, and the worst because the most tyrranical, is the privilege of spirituality. If some persons think they know more of spirituality, of God, they claim a superior privilege over everyone else. They say, 'Come down and *worship us, you common herds; we are the messengers of God and you have to worship us'...There is no* special messenger of God, never were, never can be...For the infinite message is there imprinted once for all in the heart of every being wherever there is a being, that being contains the infinite message of the Most High." Vivekananda—Vedanta & Privilege, Vol. I, Pp. 419-23

বেদান্তের আদর্শ বিবেকানন্দের কাছে বাস্তব জীবনের আদর্শ। তিনি তাঁহার 'Practical Vedanta' নামে লণ্ডনে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন যে, বেদান্তের আদর্শ জগৎ ও জীবনকে অস্বীকৃতি নয়। ভোগের মোহময় দৃষ্টি হইতে মুখ ফিরাইয়া জগৎ ও জীবনকে ব্রহ্মময় করিয়া দেখা।[20]

বেদান্তে জীবন অনুশীলনযোগ্য আদর্শ, জগৎ ও জীবন মিথ্যা মায়া নয়—ব্রহ্মময়

বিবেকানন্দ নরনারায়ণ সেবার যে বাস্তব আদর্শ গ্রহণ করিলেন, তাঁহার বাস্তব আধার হিসাবে তাহার দুঃখী, দরিদ্র, মাতৃভূমিকেই গ্রহণ করিলেন। নিঃসংশয়ে বলিলেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ—পরম জননী মাতৃভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হউন—অন্যান্য দেবতাকে কয়েক বর্ষ ভুলিলে ক্ষতি নাই।" হৃদয়ের সমস্ত প্রেম, সমস্ত আবেগ ঢালিয়া বলিলেন, "হে ভারত ভুলিও না—...নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী,—ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই। তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বব, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ; ভারতেব কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা আমার কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

মাতৃভূমিই নরনারায়ণের সেবার শ্রেষ্ঠ আধার

দেশের মানুষের জন্য যাঁহার এত প্রেম, তিনি কি নিস্পৃহ, উদাসীন, শুষ্ক, কঠোর বৈদান্তিক? সমস্ত বিশ্বে ব্রহ্মস্পর্শ অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মানুষকে এমন করিয়া ভালবাসিয়াছেন, জীবের সেবায় আত্মোপলব্ধির পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। ইহা বেদান্তের এক অভিনব আধুনিক ব্যাখ্যা।[21]

প্রেমময় বিবেকানন্দ শুষ্ক, কঠোব বৈদান্তিক নন

২০। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন, It (Vedanta) does not destroy the world, but it explains it; it does not destroy the individuality, but explains it, by showing the real individuality. It does not show that this world is vain, and does not exist, but it says, "understand what this world is, so that it may not hurt you." Vivekananda—Practical Vedanta, Vol. II, P. 310

২১। তিনি The Way to Blessedness বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "Why should I love every one? Because they and I are one...there is this oneness, this solidarity of the whole universe. From the lowest worm that crawls under

দেশের মানুষকে এত গভীর ভাবে ভাল বাসিয়াছিলেন বলিয়াই দেশের মিথ্যাচার, কপটতা, হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে তাঁহার এত ক্ষোভ

এত প্রেম মানুষের জন্য তাঁহার হৃদয়ে ছিল বলিয়াই আমাদের ভীরুতা, মূঢ়তা, আত্মসন্তুষ্টি ও কপটাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার এত তীব্র ক্ষোভ। জাপান হইতে (১৮৯৩ সালে) তাঁহার বন্ধুদের কাছে চিঠিপত্রে তাঁহার ভৎর্সনার ভাষা মর্মভেদী।[২২]

তাঁহার আদর্শ বিশুদ্ধ ধ্যান নয়, দেশের সত্যিকার সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা।

দেশে অস্পৃশ্যতা দুরীকরণ, শিক্ষা বিস্তার, অর্থনৈতিক উন্নতি— এই সমস্ত বাস্তব সমস্যা সমাধানেই নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ধ্যানের জগতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন নাই

তিনি জানিয়াছিলেন, দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য চাই বিজ্ঞানশিক্ষা, চাই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, চাই স্বাস্থ্যবিধি পালন দ্বারা সবল সুস্থ দেহ। কলিকাতায় যখন প্রথম প্লেগ দেখা দিল, তিনি তাঁহার শিষ্যদের নিয়া রাস্তাঘাট নর্দমা পরিষ্কার করিবার কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, পীড়িতের সেবায় নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন। দেশের মানুষকে জানিবার জন্য, দেশের মানুষের মোহনিদ্রা ভাঙাইবার জন্য, পদব্রজে সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিলেন, নব-বেদান্তের বাণী প্রচার করিলেন।

our feet to the highest beings that ever lived—all have various bodies, but are one soul. Through all hands you work; through all eyes you see. You enjoy health in millions of bodies, you are suffering from disease in millions of bodies. When this ideal comes, and we realise it, see it, feel it, then will misery cease and fear with it. Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. II, Pp. 412-3

২২। Come, see these people and then go and hide your faces in shame. A race of dotards, you lose your caste if you come out (on a sea-voyage)! Sitting down these hundreds of year with an ever-increasing load of crystallized superstition on your heads, for hundreds of years spending all your energies upon discussing the touchableness or untouchableness of this food or that, with all humanity crushed out by the continuous social tyrrany of ages.

What are you? And what are you doing now?...Promenading the sea-shores with books in your hands—repeating undigested stray bits of European brainwork, and the whole soul bent upon getting a thirty-rupee clerkship, or at least becoming a lawyer the height of young India's ambition—and every student with a whole brood of hungry children cackling at his heels and asking for bread! Is there not water enough in the sea to drown you, books, gowns, university diplomas, and all?

Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, Pp. 7-9

বিশুদ্ধ যুক্তির দিক হইতে তাঁহার আদর্শ জ্ঞানমার্গবিশ্বাসী, কর্মত্যাগী শুষ্ক বেদান্ত-বাদীদের আদর্শ হইতে আকাশপাতাল প্রভেদ। তাঁহার ভগবান্ নির্গুণ, নিরাকার, উদাসীন, পরমব্রহ্ম নন্। তাঁহার ভগবান্ প্রেমময়, প্রাণময়—তাঁহার চোখে আছে দুঃখী তাপিতের জন্য অশ্রুজল, আর্ত, অক্ষম, পাপীর জন্য তাঁহার হৃদয়ে আছে করুণা। ভগবান্‌কে তিনি ধ্যানের মধ্যে খুঁজেন নাই, খুঁজিয়াছেন ঘরে ঘরে দেশের মানুষের মধ্যে।

তাঁহার ভগবান নির্গুণ, নিরাকার নন, তিনি সজীব মানুষের মধ্যেই প্রকাশিত

এই মানবতার আদর্শ আধুনিক যুগে ইয়োরোপেরও আদর্শ। আমাদের যুগের দৃষ্টিভঙ্গীর ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই মানবপ্রেম ও নরনারায়ণ সেবার গভীর মিল আছে বলিয়াই, বিশুদ্ধ বেদান্তবাদীর ভ্রূকুটি সত্ত্বেও এই আদর্শকেই আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। ১৮৪৮ সালে মৃত্যুর পরে এমিলি ব্রন্টিব ডেস্কে যে কবিতাটি পাওয়া যায়, তাহাতেও যেন বিবেকানন্দের বাণীরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।[২৩]

তাঁহার প্রভাব

স্বামী বিবেকানন্দেব মতে হিতবাদ (Utilitarianism) নিঃস্বার্থপর মহৎকর্মের প্রেরণা যোগাইতে পারে না। তিনি বলিলেন, "আজকাল অনেকের মতে নীতির

২৩। No coward soul is mine
No trembler in the world's storm-troubled sphere
I see Heaven's glories shine
And faith shines equal, arming me from fear.
O God within my breast,
Almighty, ever-present Deity!
Life—that in me has rest,
As I—undying Life have power in Thee!
Vain are the thousand creeds
That move men's hearts: unutterably vain;
Worthless as withered weeds,
Or idlest froth amid the boundless main.
With wide-embracing love
Thy spirit animates eternal years,
Pervades and broods above,
Changes, sustains, dissolves, creates and rears
There is not room for Death,
Nor atom that his might could render void;
Thou—Thou art Being and Breath,
And what Thou art may never be destroyed.

ভিত্তি হিতবাদ (utility) অর্থাৎ যাহাতে অধিকাংশ লোকের অধিক পরিমাণ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে পারে, তাহাই নীতির ভিত্তি। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা এই ভিত্তিব উপর দণ্ডায়মান হইয়া নীতি পালন করিব, তাহাতে হেতু কি? যদি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে, কেন না আমি অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট সাধন করিব? .....অবশ্য নিঃস্বার্থপবতা কবিত্ব হিসাবে সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব তো যুক্তি নহে। আমাকে যুক্তি দেখাও কেন আমি নিঃস্বার্থপর হইব। হিতবাদীগণ (Utilitarians) ইহার কি উত্তর দিবেন? তাহারা তাহ্নাব কিছুই উত্তর দিতে পারেন না।" আমরা পূর্বে দেখিয়াছি বেন্‌থাম্ বলেন যে, রাষ্ট্র, সমাজ ধর্ম প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বাহ্য শক্তি আমাদিগকে অন্যের হিতসাধনে বাধ্য করে। আর মিলের মতে, এই বাধ্যতা আসে অন্তব হইতে মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহানুভূতি হইতে।

স্বামী বিবেকানন্দ উপযোগবাদকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন

বিবেকানন্দের মতে, মানুষ এই ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহানুভূতি তখনই বোধ কবিতে পারে, যখন সে জানে যে, সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মময়—"যাঁহা যাহা নেত্র পবে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই ভাবটি সুন্দর প্রকাশিত হইযাছে: 'ন বা অরে লোকানাং কামায লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি।'[২৪] অর্থাৎ, সেই পরামাত্মা উপস্থিত আছেন বলিযাই পতি পত্নীর নিকট প্রিয় বস্তু, আমাদের সমস্ত প্রীতির মূল হইতেছে, সেই এক পরমাত্মা। 'আত্মনস্ত কামায়'ব আত্মা পতি-জাযা-পিতা-পুত্র বা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষেব আত্মা বা জীবাত্মা নয়, তাহা বিশ্বাত্মা।[২৫]

বিশ্বকে ব্রহ্মময় করিয়া জানিলেই নৈতিক জীবনের প্রেরণা মিলে

সমস্ত প্রিয়বস্তু ব্রহ্ম বলিয়াই প্রিয়

তুমি অপরকে, তোমাব শত্রুকেও ভালবাসিবে কেন? কারণ তুমি তোমার আত্মাকে ভালবাস। তুমিই তো অপরও—তত্ত্বমসি। ইহাই বেদান্তের তত্ত্ব। "প্রহ্লাদকে যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন, শত্রুর সঙ্গে রাজার কি রকম ব্যবহাব করা কর্তব্য? প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, 'শত্রু কে? সকলই বিষ্ণুময়, শত্রুমিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায়?"[২৬]

সকলই ব্রহ্মময়, কাজেই শত্রু কেহ নাই

২৪। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—৪।৫।৬

২৫। শ্রীললিতমোহন সেন—মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ (আলোচনা), পৃঃ ১২

২৬। বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণচরিত্র

বাস্তবিক পক্ষে, বিবেকানন্দের কাছে বেদান্ত শুষ্ক জ্ঞানের চর্চা মাত্র ছিল না, ইহা ছিল প্রবল, জীবন্ত, নিরাসক্ত শুভকর্মের ভিত্তি। এ ধর্ম সংসার পরিত্যাগ নয়—সংসার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর বুদ্ধিতে সর্বজীবের সেবা।[২৭]

সমস্ত মানুষই ব্রহ্মস্বরূপ ও সেবার পাত্র

বহুকে একের মধ্যে সংগ্রহ, অথবা এককে বহুর মধ্যে দেখা, ইহাই উপনিষদের বাণী—ইহাই ভারতবর্ষের বাণী—এবং ইহাই বিবেকানন্দের বাণী। আজ আর এক সমন্বয়ের প্রয়োজন—জ্ঞানের সহিত প্রেমের[২৮]—বিজ্ঞানের সহিত অতীন্দ্রিয়বাদের এবং আরো প্রয়োজন জ্ঞান ও প্রেমকে মানবসেবার কার্যে নিয়োগ। বিবেকানন্দ সেই সমন্বয়ের পথ দেখাইয়াছেন।

বহুকে একের মধ্যে, এবং এককে বহুর মধ্যে দেখাই উপনিষদের বাণী, তাহাই বিবেকানন্দেরও আদর্শ

শ্রীযুত মণি বাগচী এই সমন্বয়ে-সমর্থ বীর বিবেকানন্দের এই পরিচয় দিয়াছেন—

"বেদান্তের মূর্তিমান্ সার-নিষ্কর্ষ রামকৃষ্ণ
'রামকৃষ্ণের মানস-সন্তান বিবেকানন্দ।
জাতীয় জীবনের সার-নিষ্কর্ষ স্বামী বিবেকানন্দ।
নীলকণ্ঠ-সন্ন্যাসী ও বীর্যবান্ স্বদেশ-প্রেমিক।
প্রেমে ও পৌরুষে অদ্বিতীয়।
অগ্নিগর্ভ—আগ্নেয়গিরি তিনি।
বুদ্ধ দিলেন,—সর্বভূত হিতে রতি।

২৭। ডয়সেন-এর মতো বিবেকানন্দও নিশ্চয়ই বলিতে পারিতেন, The highest and the purest morality is the immediate consequence of the Vedanta. The Gospels fix quite correctly as the highest law of morality 'Love your neighbour as yourself'. But why should I do so, since by the order of nature, 'I feel pain and pleasure only in myself and not in my neighbour ?' The answer is not in the Bible--but it is in the Vedas in the great formula, 'That thou art (Tvat Twamasi)' which gives, in three words, metaphysis and morals together. Deussen—Philosophy of the Upanishads

২৮। cf. Robert Browning : I too have sought to know, as thou to love,
Excluding love as thou refusest knowledge,
Are we not halves of one dissevered world
Whom this strange chance unites once
More ? Part never,
Till thou the lover know, and I the knowner
Love—until both are saved.

শঙ্কর দিলেন,—জ্ঞান ও বৈরাগ্য।
রামমোহন দিলেন,—বেদান্ত স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রীতি।
রামকৃষ্ণ দিলেন,—যত্র জীব তত্র শিব।"
ইহারই সমন্বিত এবং সার্থক প্রকাশ বিবেকানন্দ।[২৯]

সংক্ষিপ্তসার

ভারতীয় শাস্ত্রে নীতি, প্রাত্যহিক জীবন ও ধর্ম হইতে পৃথক করিয়া একটি বিষয় হিসাবে কখনও আলোচিত হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বৈষয়িক জীবন, ব্যক্তিগত জীবন, নৈতিক জীবন, ধর্ম জীবন ইত্যাদি ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিয়াছেন। ভারতীয় চিন্তায় জীবন এক অখণ্ড সম্পূর্ণ এক এবং সমস্ত জগৎ ও জীবনই এক চরম সত্তারই বিভাব। এবং যিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, তিনি ব্রহ্মই হন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত, সাংসারিক বা সামাজিক কোন কর্তব্য থাকে না—তিনি পাপ, পুণ্য ইত্যাদি নৈতিক বিশেষণের উর্ধ্বে।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা এজন্য মনে করেন, ভারতীয় চিন্তায় নৈতিক চেতনার অভাব। ইহা নিতান্ত ভুল ধারণা। ব্রহ্মজ্ঞের কোন কর্তব্য নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার জীবন অনৈতিক নহে। বরং নৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুযায়ী তাঁহার জীবন ঘটিত হইয়াছে বলিয়াই, তিনি নৈতিকতার উর্ধ্বে উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন। শাস্ত্রও সদাচারই ধর্মজীবনের ভিত্তি এবং ইহা ব্যতীত অন্তরে সত্য স্ফুরিত হয় না, ইহাই বলে। তাছাড়া সংসারী মানুষের জন্য যে দৈনিক কর্মসূচী বিধেয়, তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে জীবপ্রীতি, দয়া, করুণা, বিশুদ্ধতা ও সংযম ইত্যাদি নৈতিক গুণের উদ্বোধন ও চর্চা।

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে বিশুদ্ধ আচরণের উপরই জোর—আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার স্থান সেখানে গৌণ।

জীবনের শেষ উদ্দেশ্য মুক্তি বা সংসার-চক্র ছেদন। উপনিষদের মতে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথেই শুধু মুক্তি সম্ভব। কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম ও বিশুদ্ধ জীবনই সত্য জ্ঞানলাভের প্রথম সোপান।

যোগদর্শনে যম ও নিয়ম এই আত্মসংযমের পথেরই নির্দেশ। সমস্ত হিন্দুদর্শনেই যোগাভ্যাস দ্বারা আত্মশুদ্ধির নির্দেশ আছে।

বেদান্তদর্শনে জ্ঞানেরই নির্দেশ তাহাতেই ব্যক্তির ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি নৈতিক কর্মের উর্ধ্বে, কারণ তাঁহার অহংবুদ্ধি তিরোহিত। বাইবেল ও স্পিনোজার ঈশ্বর চিন্তায়ও অনুরূপ ভাবের ইঙ্গিত আছে।

শ্রীশঙ্করাচার্যের বেদান্ত মত অনুযায়ী, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—জগৎ মায়া। জাগতিক কোন বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার জন্য উদ্যম এই মায়ারই প্রকাশ। অবিদ্যা আমাদের দৃষ্টি

২৯। মণি বাগচী—ভগিনী নিবেদিতা

আচ্ছন্ন করে বলিয়াই আমরা লোভ করি, দ্বেষ করি, মায়া মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হই। এক ব্রহ্মকে আমি-তুমি-সে এভাবে 'বহু' করিয়া দেখি। নিজের মধ্যে ব্রহ্মসত্তা উদ্বোধনই প্রকৃত জ্ঞান। পাশ্চাত্ত্যবাসীরা শঙ্করের 'সোহং'বাদকে বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা ভাবেন—সসীম মানুষের ইহা অমার্জনীয় অহংকার। শঙ্করের মতে, সমস্ত জগৎ সম্বন্ধে নির্মম হইয়া, সমস্ত কর্তব্য ত্যাগ করিয়া আত্মস্থ ব্রহ্মের ধ্যানই জ্ঞানের পথ। এ পথ বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথ, এ পথে কর্ম ও ভক্তির কোন স্থান নাই। সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাসই জ্ঞানমার্গের উদ্দিষ্ট পথ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের মার্গে বিচরণ করিবার অধিকার তাঁহাদেরই যাঁহারা আত্মসংযম ও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছেন।

শ্রীরামানুজাচার্য ব্রহ্মকে মূল সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও জগৎকে ও জীবকে অস্বীকার করেন না। জগৎ ব্রহ্মেরই মায়াশক্তি প্রসূত—ইহা ব্রহ্মেরই শরীর। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কর্মত্যাগের উপদেশ দেন না। ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা বিশুদ্ধ জীবন যাপন, অপ্রমত্ত হইয়া ও অহংবুদ্ধি বিরহিত হইয়া সংসারের কর্তব্য পালনই বিধেয়। ব্রহ্ম সগুণ, এবং ঈশ্বরারাধনা বিশুদ্ধ জীবন যাপনের উপায়। ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মের দ্বারা, ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিলে তবেই মুক্তি লাভ হয়।

বিবেকানন্দ নিজেকে বৈদান্তিক বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু তিনি শঙ্কর বেদান্তের এক অভিনব ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ সন্ন্যাস ও কর্মত্যাগ নয়—তাঁহার আদর্শ কর্মযোগ। তাঁহার মতে অদ্বৈতবাদ শুষ্ক জ্ঞানচর্চা নয়। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি অভয়। দুর্বলতাই পাপ, কাপুরুষতাই পাপ। বীরের মতো, সংসারের কর্তব্য করিতে হইবে। নির্লিপ্ত হইয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে হইবে। এই জগৎ মিথ্যা নয়—ইহা ব্রহ্মানুসরণের আধার। মানুষের মধ্যেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। তাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় হইল সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে নরনারায়ণ সেবা। বেদান্ত অবাস্তব ভাবাদর্শ মাত্র নয়, ইহা জীবনে অনুশীলনযোগ্য। জগৎ ও জীবন মিথ্যা মায়া নয়, ইহা ব্রহ্মময়। তাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ কর্মত্যাগ ও সন্ন্যাস নয়, কর্মযোগ ও নরনারায়ণ সেবা। মাতৃভূমির দুর্গত মানুষই বিবেকানন্দের মতে নরনারায়ণের সেবার শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। দেশের মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় স্থাপিত করাই ছিল তাহার জীবনের ব্রত, তাই জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁহার এক ক্ষোভ—দেশের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও হৃদয়হীন আচার-প্রথা দূর করিবার জন্য তিনি শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের দুর্দিনে বন্যা-মহামারীতে দেশের মানুষ যখন বিপন্ন, তখন রামকৃষ্ণ মিশন নিরলস সেবার কাজে অগ্রসর হইয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও তিনি যথা-সাধ্য করিয়া গিয়াছেন। ইহাই ছিল তাঁহার Practical Vedanta.

বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, বেনথাম্ ও মিলের উপযোগবাদ নিঃস্বার্থপর মহৎকর্মের প্রেরণা যোগাইতে পারে না। বিশ্বকে ব্রহ্মময় করিয়া জানিলেই নরনারায়ণের সেবা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতে পারে। ইহা বৈদান্তিকের পক্ষেই সম্ভব। তাঁহার বৈদান্তিক মানবিকতার আদর্শ ইযোরোপের আধুনিক চিন্তাকেও প্রভাবিত করিয়াছে।

জ্ঞানের সহিত প্রেমের, বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের, দেশপ্রেমের সহিত মানবপ্রীতির সার্থক সমন্বয়ের জীবন্ত আদর্শ আমরা পাই শ্রীবিবেকানন্দের জীবনে।

Questions

1. Does Indian thought ignore all moral questions ? Discuss this with reference to the philosophy of the Vedanta.

2. Discuss the moral ideal with reference to the life and teachings of Vivekananda. What is the significance of these teachings to our present life ?

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আদর্শ—নিষ্কাম কর্ম

বেদ ভারতীয় চিন্তাধারায় মূল আকর গ্রন্থ। ভারতীয় সাধনায় তিনটি মূল ধারা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—তিনটিরই ইঙ্গিত আছে বেদে। কিন্তু সেখানে এই সব বিভিন্ন চিন্তা সুবিন্যস্ত নয়। আধুনিক পাঠকের কাছে তাই বেদ বহুস্থলেই দুর্বোধ্য—অস্পষ্টতা ও আপাতবিবোধিতায় পূর্ণ।

প্রাচীন বৈদিক ঋষি জীবনকে মধুময় রূপে দেখিয়াছেন

পরবর্তীকালে ভারতীয় চিন্তায় যে দুঃখবাদ কেন্দ্রস্থল অধিকাব করিয়া আছে, বেদে তাহার অভাব দেখিতে পাই। প্রাচীন বৈদিক ঋষি জগৎ ও জীবনকে বিস্ময়ের চোখে, আনন্দের চোখে দেখিয়াছেন এবং সমস্ত জগৎ ও জীবনের নিয়ন্তা হিসাবে, সূর্য, চন্দ্র, বরুণ, মাতরিশ্বকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদের জয়গানে রত হইয়াছেন। তাঁহাদের কাছে দ্যুলোক, ভূলোক—এই মবজগৎ ও অমৃতলোকের মধ্যে কোন ভেদ ছিল না, সমস্তকেই আনন্দময়, মধুময় করিয়া তাঁহারা দেখিয়াছেন। সেই আনন্দময় সর্বব্যাপী বহু দেবতার স্বতঃস্ফূর্ত জয়গান—সামবেদ। ঋগ্বেদও সেই দেবতাদেরই আবাহন, তাঁহাদেরই আরাধনার মন্ত্র। ঋগ্বেদের ঋষি বিস্ময়ে নয়ন মেলিয়া বিশ্বের পানে তাকাইলেন। যাহা চোখে পড়িতেছে তাহাই মধু, তাহাই আনন্দ। আকাশের সূর্যচন্দ্র ও পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা মধুময়। ঋষির শ্রবণে দিব্য মন্ত্র ধ্বনিত হইল। ঋষির কণ্ঠে দিব্য মন্ত্র উঠিল—

মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ ॥
মধু নক্ত মুতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দৌ রস্তু নঃ পিতা ॥
মধুমান্ নো বনস্পতি
মধু মাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥[১]

১। ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ৯০, ৬-৮

তাঁহাদের কাছে এই দেবতারা প্রত্যক্ষের বিষয় ছিলেন, আপন জন ছিলেন, তাই দ্বিধাহীন কণ্ঠে তাঁহারা বলিতে পারিলেন—'আমরা দেখিয়াছি—জানিয়াছি'।[২] যদিও সুশৃঙ্খল দার্শনিক চিন্তার তখনও উদ্ভব হয় নাই, তথাপি আমরা দেখি, ঋগ্বেদের ঋষিদের চিন্তায় এই সত্য প্রতিভাত হইয়াছিল যে, সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি, সমস্ত দেবতা একই বিশ্বজাগতিক শক্তিরই প্রকাশ। সূত্র যেমন মণিগুলিকে ঐক্যের তারে বাধে, তেমনি সেই একই শক্তি সমস্ত বস্তু, সমস্ত গতি, সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশিত—এক সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি।[৩]

দেবতারা তাঁহাদের প্রত্যক্ষের বিষয় ছিলেন

ব্রহ্মাণ্ডে বহুর মধ্যে তাঁহারা এক বিশ্বশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন

বহু দেবতাকে হবি দ্বারা অর্চনা করিলেও, বৈদিক ঋষি সেই এক মূল বিশ্বশক্তিতেই সেই পূজা উদ্দিষ্ট, ইহা জানিতেন।

হিরণ্যগর্ভ স্বয়ং সর্বাগ্রে আবির্ভূত হইলেন। জন্মমাত্রই তিনি হইলেন সমস্ত নিখিলের একমাত্র পতি। তিনিই ধারণ করিলেন, এই ভূলোক ও দ্যুলোককে—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ ?

যিনি আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি সমস্ত বলদাতা, যাঁহার শাসন এই জগৎ ও দেবতাগণও মান্য করেন, অমৃত ও মৃত্যু যাঁহার ছায়া,—সেই দেবতাকেই কি আমরা হবিদ্বারা অর্চনা করিব ?[৪] আবার দীর্ঘতমস্ সূক্তে বলা হইল—তাঁহারা এই এককে বহু নামে অভিহিত করেন—তাঁহারা ইহাকে বলেন ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি··যিনি এক, তাঁহাকেই কবিরা অগ্নি, যম, মাতরিশ্বন্ ইত্যাদি বহু নামে চিহ্নিত করেন।[৫]

সেই এক বহু নামে অভিহিত

নাসদীয় সূক্ত

নাসদীয় সূক্তেও প্রাচীন ঋষির এই সৃষ্টি সম্পর্কে বিস্ময় অত্যন্ত প্রকট।[৬]

২। শ্বেতাশ্ব।

৩। ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৬৪

৪। " ১০ম মণ্ডল ১২১—১, ২, ৩

৫। দীর্ঘতমস সূক্ত—ঋক ১, ১৬৪, ৬

৬। নাসদীয় সূক্ত—ঋক ১০,১২৯,১

Darkness was thee, in the beginning, which was a sea without light; the germ that lay covered by the husk, that One was born by the power of heat (Tapas).

কিন্তু বেদের যুগে জ্ঞানকাণ্ডের স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকিলেও ক্রমেই দেবতাদিগকে পূজা, আরাধনা, যজ্ঞ দ্বারা তুষ্ট করিয়া ফললাভ—অর্থাৎ কর্মকাণ্ডই প্রাধান্য লাভ করিল।

বৈদিক যুগে সমাজে শুধুই ছিল ব্রহ্মচিন্তা, তত্ত্ববিচার, জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, এমন ধারণা নিতান্তই ভুল। বৈদিক ঋষি এই জীবনের সুখ-ভোগের কথা বলিতে, কোন লজ্জাবোধ করেন নাই। স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি অন্যায় বলিয়া নিন্দিত হইত না, বরঞ্চ দীর্ঘ জীবন, স্বাস্থ্য, বিত্ত, শত্রুনিপাত কাম্য বলিয়াই বিবেচিত হইত, এবং সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেবতাকে পূজা, অর্চনা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা তুষ্ট করিবার জন্যই বিচিত্র কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই বিশ্বাস তখন বদ্ধমূল ছিল যে, বিভিন্ন দেবতা বা অপদেবতাকে পূজা, বলি, যজ্ঞ ইত্যাদি দ্বারা তুষ্ট করিলেই সংসারের সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে। "ঋষিগণের মুখ্য উপাসনা প্রণালী ছিল যজ্ঞ বা হোম অবলম্বন করিয়া। বেদে তাই যাগযজ্ঞের কথাই বেশী। প্রত্যেক বেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত—সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। সংহিতা ভাগ হইতেছে মন্ত্রসমষ্টি বা মূল বেদ। ব্রাহ্মণ ভাগে এই মন্ত্রসমষ্টির ভাষ্য বা ব্যাখ্যা। উহা সাধারণতঃ গদ্যে লিখিত, যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের আলোচনাই সেখানে প্রধান। ব্রাহ্মণের আবার তিনটি ভাগ। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ। ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ আরণ্যক, আরণ্যকের শেষ ভাগ উপনিষৎ। উপনিষৎ তাই বেদের অন্তভাগ বলিয়া বেদান্ত নামে বিখ্যাত। ব্রাহ্মণে সংহিতার ক্রিয়াকাণ্ডের আলোচনা, বাহ্যিক অনুষ্ঠানের বিবরণই মুখ্য।"[৭]

বৈদিক যুগ শুধুই ব্রহ্ম-চিন্তার যুগ ছিল না

জীবনে সুখভোগের জন্য দেবতাদিগকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বিচিত্র কর্মকাণ্ড

Their ray which was stretched across, was it below or was it above? There were seed-bearers, there were powers, self-power below and will above.

Who then knows who has declared it here, from whence was born this creation? The gods came later than this creation, who then knows whence it arose?

He from whom this creation arose, whether he made it or did not make it, the Highest Seer in the highest heaven, he forsooth knows; or does even he not know?

Tr. Max Muller—History of Ancient Sanskrit Literature, P. 562

৭। সুধীরকুমার দাসগুপ্ত—আমাদের পরিচয়—(ছাত্র সংস্করণ) পৃঃ ৫

কিন্তু উপনিষদের যুগে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর প্রবল হইয়া উঠে। যাগযজ্ঞ দ্বারা স্বর্গলোক-দেবলোক প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল মানুষদের মনের পিপাসা মিটাইতে সক্ষম হইল না। তাঁহারা বুঝিলেন এই কর্মকাণ্ড দ্বারা জীবনের সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়, দুঃখের আত্যন্তিক অবসান এই পথে হইতে পারে না।

উপনিষদের যুগে কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

ইহার জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের। জানিতে হইবে সত্য স্বরূপকে—যাহাকে জানিলে সব জানা হইয়া যায়। যিনি সব জানিয়াছেন, তিনি দেহকে আত্মা বলিয়া ভুল করেন না, এবং সংসারের সুখদুঃখের মধ্যে নির্মোহ ও প্রশান্ত হইয়া মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারেন— ইহাই হইল জ্ঞান-মার্গ। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলিতেছেন

জ্ঞানের দ্বারাই অবিদ্যা পাপছেদন করা যায় ও মুক্তি লাভ করা যায়

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম
তপো ব্রহ্ম পরামৃতম।
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য।[৮]

কর্ম, তপ, শ্রেষ্ঠ ও অমৃত ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ) এই সমস্ত সেই পুরুষই। হে সৌম্য! যিনি এই পুরুষকে হৃদয়ে নিহিত বলিয়া জানেন, তিনি এখানে (এই পৃথিবীতেই) নিজ অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন করেন।

অন্ধ পুরোহিতেরা তদপেক্ষা অন্ধ যজমানগণকে নানা প্রকার যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারা অভীষ্ট ফললাভের প্রতিশ্রুতি দ্বারা বিভ্রান্ত করে, কিন্তু ইহারা জানে না—

প্লবা হ্যেতে অদৃঢা যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢাঃ জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢা অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।

এই অষ্টাদশাঙ্গ যজ্ঞরূপ ভেলাসমূহ, যাহা এই অশ্রেষ্ঠ কর্মের নির্দেশ দেয়, তাহারা সমস্তই অদৃঢ। যে সকল মূর্খ ব্যক্তি ইহাকে শ্রেয়ঃ বলিয়া প্রশংসা করে, তাহারা পুনরায় জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

যজ্ঞরূপ কর্ম অদৃঢ ভেলা

যাহারা অজ্ঞানতায় অবস্থিত, অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত

৮। মুণ্ডকোপনিষৎ—দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ১০

বলিয়া মনে, করে সেই সব মূঢ় ব্যক্তিরা (জরা, রোগাদি অনর্থসমূহ দ্বারা) অতিশয় পীড্যমান হইয়া অন্ধ কর্তৃক নীয়মান অন্ধদিগের ন্যায় পরিভ্রমণ করে।[৯] এই যজ্ঞকর্ম দ্বারা যে ফল লাভ হয়, যে কাঙ্ক্ষিত লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা নিতান্ত অস্থায়ী। অজ্ঞানী লোকেরা ইষ্ট (যাগাদিকর্ম) ও পূর্তকে (বাপী-কূপখননাদি কর্ম) প্রধান মনে করে, এবং অন্য শ্রেয়ঃ জানে না। তাহারা নিজ পুণ্যকর্মলব্ধ স্বর্গাদি লোক ভোগ করিয়া, পুণ্যফল ক্ষয় হইলে, পুনরায় এই লোক অথবা তদপেক্ষা হীনতর লোকে প্রবেশ করিয়া থাকে।

উপনিষৎ পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার মধ্যে প্রভেদ করিলেন। পরাবিদ্যার উদ্দেশ্য প্রেয়বস্তু লাভ আর অপরাবিদ্যার উদ্দেশ্য শ্রেয়কে লাভ। পণ্ডিত ব্যক্তি এই পরাবিদ্যালাভেই উৎসুক। এই পরাবিদ্যা দ্বারাই কেবল তাঁহাকে জানা যায়, যাঁহাকে জানিলে সকলই জানা হইয়া যায়। প্রশ্ন হইল, কস্মিন্ন ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি? উত্তর হইল, দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম ইদ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।

পরা ও অপরাবিদ্যা

পরাবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প (বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বোধক বিদ্যা), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বেদার্থ গ্রহণ সম্বন্ধে বিদ্যা), ছন্দঃ, জ্যোতিষ—ইহারা হইল অপরাবিদ্যা। পক্ষান্তরে যদ্বারা সেই অক্ষর (পুরুষকে) জানা যায়, তাহাই পরাবিদ্যা।[১০]

কিন্তু পরাবিদ্যা যে সদ্‌বস্তুকে প্রকাশ করে, তিনি কেমন? ইহার উত্তর উপনিষৎ যে কতভাবে দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কখনো তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া ঋষি বলিয়াছেন, তিনি চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, আমরা তাঁহাকে জানি না। কিরূপে তাঁহার উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না। ...যিনি বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হন না—বরঞ্চ যাহার দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয়—মন যাঁহাকে জানিতে পারে না—বরঞ্চ যিনি মনকে জানেন; যাঁহাকে লোকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, কিন্তু যাঁহার শক্তিতে লোকে চক্ষুগোচর বস্তুসমূহ দেখিতে পায়, যাঁহাকে লোকে কর্ণ দ্বারা শুনিতে পায় না, বরঞ্চ যাঁহার শক্তিতে কর্ণ দ্বারা লোকে শ্রবণ করে, তিনিই ব্রহ্ম।[১১]

সদ্‌বস্তুর নেতিবাচক বর্ণনা

৯। মুণ্ডকোপনিষৎ ১. ২. ৭-৮ কঠোপনিষৎ দ্বিতীয় বল্লী পঞ্চম শ্লোকও অনুরূপ

১০। „ „ ১. ১. ৩-৬

১১। কেনোপনিষৎ ৩-৭

আবার বলিলেন, যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়প্রজ্ঞ নহেন; অপ্রজ্ঞ নহেন, যিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অনির্বচনীয়, যিনি একাত্ম্য প্রত্যয়ের বিষয়, পঞ্চ বিষয়ের অতীত, শান্ত, মঙ্গল-স্বরূপ ও অদ্বৈত তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই ওঁকার।[১২]

তিনিই যে সর্বদেবতার মূলীভূত শক্তি এই কথাটি কেনোপনিষদ সুন্দর এক উপাখ্যানের মধ্য দিয়া প্রকাশ কবিলেন। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রত্যেকেরই অভিমান হইয়াছিল, তাঁহারাই সর্বশক্তির শ্রেষ্ঠ দেবতা। ব্রহ্ম তাঁহাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন, কিন্তু দেবতারা কেহই সেই পূজ্য স্বরূপকে জানিতে পাবিলেন না। দেবতারা অগ্নিকে পাঠাইলেন তাঁহার স্বরূপ জানিয়া আসিতে। ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' অগ্নি নিজ পরিচয় দিলেন। ব্রহ্ম তাঁহার শক্তি জানিতে চাহিলেন। অগ্নি বলিলেন, "পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমস্তই দগ্ধ করিতে পারি।" ব্রহ্ম তাঁহাকে এক তৃণখণ্ড দিলেন এবং বলিলেন, "ইহা দগ্ধ কর।" কিন্তু সমুদয় বল প্রকাশ করিয়াও অগ্নি সেই তৃণখণ্ডকে দগ্ধ করিতে পাবিলেন না। তাঁহার অহংকার চূর্ণ হইল। এই ভাবে ব্রহ্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের অহংকারও চূর্ণ করিলেন। তখন ব্রহ্ম তাঁহাদের সম্মুখ হইতে তিরোহিত হইলেন। এবং আকাশে স্ত্রীরূপিণী অতি সৌন্দর্যশালিনী হৈমবতী উমা উপনীত হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন যে, সেই পূজ্যস্বরূপই হইলেন ব্রহ্ম, তাঁহার বলেই তাঁহারা বলীয়ান, তাঁহার বিজয়েব দ্যুতিতেই তাঁহারা মহিমান্বিত।[১৩]

কেনোপনিষৎ—সমস্ত দেবতা একই মূল উৎস হইতে শক্তি সংগ্রহ করেন

সেই এক ব্রহ্মই বহুরূপে বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত, তিনিই সর্ব বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন—'ঈশাবাস্যং ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।'[১৪] আবার কঠোপনিষৎ বলিলেন, যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া (দাহ্যবস্তুর) রূপভেদে তৎ তৎরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তেমনি এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নানা বস্তুভেদে তৎ তৎ বস্তুরূপ হইয়াছেন এবং এই সমস্ত বস্তুকেও অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান আছেন।[১৫] উপনিষদের ঋষি তৎশিষ্যদিগকে উপদেশ দিলেন, "রথচক্রের নাভিতে (axle) অরসমূহ (spokes) যেরূপ আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে, সেই

কঠোপনিষৎ—সেই ব্রহ্মেরই নানারূপে বিশ্বজগতে প্রকাশ

১২। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ—৭-৮
১৩। কেনোপনিষৎ ১৪-২৫
১৪। ঈশোপনিষৎ ১
১৫। কঠোপনিষৎ ৫. ৯

রূপে কলাসমূহ যাঁহাতে আশ্রিত রহিয়াছে, সেই জ্ঞাতব্য পুরুষকে জ্ঞাত হও, যাহাতে (হে শিষ্যগণ) মৃত্যু তোমাদিগকে দুঃখ দিতে না পারে।"[১৬]

ইহা উল্লেখযোগ্য যে কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী বেদ এবং জ্ঞানকাণ্ডে বিশ্বাসী উপনিষৎ, দুই ক্ষেত্রেই ইহা উক্ত হইয়াছে যে, সংযত ও বিশুদ্ধ জীবন ব্যতীত কর্ম বা জ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী হওয়া যায় না। বেদের ঋষি শত শরৎ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, পর্যাপ্ত ব্রীহী ধান্য, গবাদি পশু ইত্যাদি সাংসারিক সুখ এবং শত্রুনিপাতরূপ সুখের বিঘ্ন দূরীকরণের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু কোথায়ও ব্যক্তির নিজের সুখকে অন্যের সুখের উপরে স্থান দেওয়া হয় নাই, কোথায়ও ব্যক্তির জীবনকে সমাজজীবনের কর্তব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা হয় নাই। ভারতীয় দর্শনে চার্বাকই বোধ হয় একমাত্র ব্যতিক্রম, যিনি ব্যক্তির সুখকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, যিনি ইহকালের প্রেয়কেই বাঞ্ছনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু সেই চার্বাকও তাঁহার অনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ঋণ করিয়া ঘৃতপানের অধিক, অন্য কোন অসামাজিক বা অনৈতিক আচরণের উপদেশ দেন নাই। যে বিদ্যা অপরাবিদ্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যাহাদের উদ্দেশ্য প্রেয়োলাভ, তাহারাও সর্বত্রই সুখের মূল হিসাবে সংযত ও শুদ্ধজীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। এবং ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, অপরাবিদ্যা পরাবিদ্যা লাভেরই প্রস্তুতি মাত্র। পারলৌকিক কল্যাণকে, ইহলৌকিক সুখ অপেক্ষা উচ্চতর মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। এবং সমস্ত ইহলৌকিক সুখের মূলে আছে শাস্ত্র ও সদাচার, ইহা পুনঃ পুনঃই উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদে গার্হস্থ্যাশ্রমকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষলাভের সাধনক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সমস্ত সাংসারিক জীবনকে পবিত্র বিরতিহীন যজ্ঞ বলিয়াই উপদিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্থের জন্য যে সব কর্মের বিধান রহিয়াছে, তাহা যেমন ব্যক্তির সুখভোগের সহায়ক, সাংসারিক ঐশ্বর্যবৃদ্ধির অনুকূল, তেমনি তাহা সেবা, প্রীতি, নম্রতা, ধীরতা, শক্তি, ধৈর্য ইত্যাদি সদ্‌গুণের উদ্বোধক এবং সর্বোপরি সমস্ত বিশ্বজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের সহায়ক। এবং সাংসারিক জীবন, পারলৌকিক কল্যাণের জন্যই প্রস্তুতি হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। কাজেই জোর করিয়াই ইহা বলা চলে যে ভারতীয় চিন্তা

বেদ ও উপনিষৎ মুক্তির বিভিন্ন পন্থায় বিশ্বাসী হইলেও এই বিষয়ে তাঁহারা একমত যে, সামাজিক কর্তব্যপালন ও বিশুদ্ধ জীবনই সুখ-শান্তি লাভের উপায়

চিত্তশুদ্ধি, বর্ণাশ্রম ধর্মপালন ও আত্ম-সংযম সাংসারিক কর্তব্যের মূল

১৬। প্রশ্নোপনিষৎ—৬. ৬

কথনোই নীতি-বিরুদ্ধ নহে। তবে পাশ্চাত্ত্য দর্শন যে অর্থে নীতিকে জীবনের শেষ উদ্দেশ্য মনে করে, ভারতীয় দর্শন তাহা করে না। ধর্ম ও নীতি অবিচ্ছেদ্য. কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য সৎকর্ম-দ্বারা পুণ্য অর্জন নয়। সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্য সবই বন্ধন। জীবনের শেষ উদ্দেশ্য, সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্তি। তবে ইহা করিতে হইলে চাই চিত্তশুদ্ধি, বর্ণাশ্রম ধর্মপালন, আত্মবিলোপ। তাহা হইলেই অজ্ঞানান্ধকার বা অবিদ্যা দূরীভূত হইবে এবং ইহাই মুক্তির উপায়।[১৭]

আমরা এই পর্যন্ত ভারতীয় চিন্তায় কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ এই দুইটি পথেরই সন্ধান পাইয়াছি। এবার আর একটি পথ বা ভক্তিমার্গ সম্বন্ধেও কিছু বলিতে হইবে। ভক্তিমার্গ অনুসারে ভক্তি দ্বারাই মোক্ষ সম্ভব। তাহার

বেদে ভক্তিমার্গের প্রাধান্য নাই

জন্য জ্ঞান বা কর্মের কোন প্রয়োজন নাই। ভগবানের পূজা, আরাধনা, তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই,—মুক্তির শ্রেষ্ঠ পথ। যে মূর্খ, জ্ঞানের পথ তাহার কাছে রুদ্ধ। কর্মকাণ্ডের কৌশলও সে আয়ত্ত করিতে পারে না। কিন্তু সে জন্য তাহার কাছে মুক্তির দ্বার রুদ্ধ নয়। যে অচলা ভক্তি দ্বারা, আত্মবিলোপ দ্বারা, ভগবানের কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং তাহার সমস্ত বন্ধন ছেদন হয়। সে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করিয়া ধন্য হয়, তাহার কর্মবন্ধ ছেদন হয়।

বৈদিক বা ঔপনিষদিক যুগে সাধনার এই ধারাটি খুব প্রাধান্য লাভ করে নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেনের মতে ইহা অনার্য সভ্যতার দান।[১৮] বেদ বা উপনিষদে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়া বহুক্ষেত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ভক্তিমার্গে ব্রহ্ম সগুণ। নির্গুণ ব্রহ্মকে পূজা, উপাসনা,

---

১৭। The ideal of the systems is practically to transcend purely ethical level.. in his (the holy man's) case the good is no more a goal to be striven after, but is an accomplished fact. While virtue and vice may lead to a good or bad life within the circle of samsara, we can escape from samsara through the transcending of the moralistic individualism. All systems recognise as obligatory unselfish love and disinterested activity and insist on cittasuddhi (cleansing of the heart) as essential to all moral culture. In different degrees they adhere to the rules of caste (varna) and stages of life (asrama). S. Radhakrishnan.—Indian Philosophy, P. 27, Introduction.

১৮। ক্ষিতিমোহন সেন—ভারতের সভ্যতা, পৃঃ ২৬-২৯

অর্চনা করা চলে না। শঙ্করাচার্যের মতে নির্গুণ ব্রহ্ম এক, এবং তিনিই একমাত্র সত্যবস্তু। কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের দ্বৈততা না থাকিলে ভক্তি হয় না, পূজা, অর্চনা, উপাসনা কিছুই সম্ভব হয় না। তাই আমরা পরবর্তী কালে বেদান্তের নূতন ভাষ্য পাই। শ্রীরামানুজাচার্য মায়াবাদের প্রতিবাদ করেন, বাসুদেবভক্তি ও বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার করেন এবং শঙ্করভাষ্যের (১০০ খ্রীষ্টাব্দ) পরিবর্তে নূতন ভাবে গীতার ব্যাখ্যা করেন। রামানুজাচার্যের কাল সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ। তাহারও প্রায় দুই শতাব্দী পরে শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীমধ্বাচার্য প্রমুখ ধর্মনেতারা বেদান্তের ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা প্রচলন করেন। তাঁহারা শঙ্করের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদের ঘোরতর বিরোধী। তাঁহারাও নিজ নিজ মতানুযায়ী গীতার ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশুদ্ধ ভক্তিবাদের প্রবল প্রভাব আমরা ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময় দেখিতে পাই। গৌড়ীয় গোস্বামীপাদগণ কর্তৃক বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার এবং গীতার ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা করেন। কাজেই দেখা যায় যে, বিশুদ্ধ ভক্তিবাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই প্রকট হইয়াছে। এই মত অনুযায়ী ভগবান নিরাকার ও নির্গুণই শুধু নন—তিনি সাকার, সগুণও বটেন। ভক্ত তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে—তাঁহার দর্শন, স্পর্শন লাভ করিতে পারে। একাদশ শতাব্দীতে নানক, কবীর, দাদু ভক্তিপথের পথিক ছিলেন এবং প্রেমময়ী রাজরানী মীরাবাঈও এই পথেই 'মেরে গিরিধরীলাল'কে খুঁজিয়াছিলেন। একেবারে আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এই ভক্তিমার্গের প্রকৃষ্ট সাধক—যদিও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতোই সমস্ত ধর্মমতের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন।

শ্রীশঙ্করাচার্যের বেদান্তে ভক্তির স্থান নাই

শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীমধ্বাচার্য শঙ্করের বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গের বিরোধী

ভক্তিমার্গের পথিক নানক, কবীর, মীরাবাঈ, দাদু, রামকৃষ্ণ প্রমুখ

কিন্তু সমস্ত বাদের মতো ভক্তিবাদের মূল চিন্তা বেদ ও উপনিষদে নানা স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। বেদ বা উপনিষদে ব্রহ্ম যেমন নির্গুণ ও নিরাকার বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন, তেমন সগুণ ও সাকার বলিয়াও তাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণনা আছে যে, ব্রহ্ম সর্বকর্মা, সর্বকামঃ—শাণ্ডিল্য ঋষি এই মন্ত্রটির প্রবক্তা। এবং তিনিই সগুণ উপাসনা ও ভক্তিমার্গের প্রবর্তক বলিয়া বেদান্তসারে উল্লিখিত

হইয়াছে।[১৯] শ্রীশঙ্করাচার্যও স্বীকার করিয়াছেন যে, বেদ-উপনিষদে ব্রহ্মস্বরূপের সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়বিধ বর্ণনাই আছে। কিন্তু তিনি ব্রহ্মের সগুণাত্মক বর্ণনা গ্রহণ করেন নাই।[২০] ঋগ্বেদে যে সব যজ্ঞকর্মের উল্লেখ আছে তাহার সঙ্গে অর্চনা, বন্দনা, নমস্কার ইত্যাদি ভক্তিমূলক ক্রিয়াও যুক্ত ছিল।[২১] তবে ভক্তিমার্গ বেদ বা উপনিষদের যুগে সুস্পষ্ট বা পৃথক মুক্তির পথ হিসাবে চিহ্নিত হয় নাই, ইহা প্রায় নিঃসংশয়েই বলা যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এক আশ্চর্য সমন্বয় গ্রন্থ। ইহাতে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিধারার অপূর্ব মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির আশ্চর্য সমন্বয়

মহাভারত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (গীতা মহাভারতেরই অংশ) যে সময় রচিত হইয়াছিল (খ্রীঃ পূঃ ৯০০ ?) তাহার বহু পূর্বেই বিভিন্ন দার্শনিক মত ভারতবর্ষে (বিশেষতঃ সাংখ্য, যোগ ও ন্যায়) সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গীতায় এই সব বিভিন্ন দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। "গীতাপ্রচারের সময় বেদবাদ ও বৈদিক কর্মমার্গ, (উপনিষোদোক্ত) বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ ও

গীতা বিভিন্ন দার্শনিক মতেরও সমন্বয় সাধন করিয়াছে

জ্ঞানমার্গ, সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিবাদ ও কৈবল্যজ্ঞান, আত্মসংস্থযোগ বা সমাধিযোগ, অবতারবাদ ও ভক্তিমার্গ এই সকলই প্রচলিত ছিল।" এসমস্ত আপাতবিরোধী মত ও পথের যে সমন্বয় গীতায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সত্যই অভিনব। গীতায় কোন মত বা পথই অস্বীকৃত হয় নাই বা পরিত্যক্ত হয় নাই, কিন্তু গীতা তাহাদের প্রত্যেকটিকেই যথাস্থানে স্থাপন করিয়া এক অপরূপ সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন। গীতার বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা সমস্ত ভারতীয় চিন্তার প্রামাণ্য সংক্ষিপ্তসার। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ধ্যানে উক্ত হইয়াছে—

সর্বোপনিষদো গাব দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

১৯। উপাসনানি সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস—ব্যাপার রূপাণি—শাণ্ডিল্য বিদ্যাদীনি—বেদান্তসার।

২০। সন্তি উভযলিঙ্গাঃ শ্রুতযো ব্রহ্মবিষয়াঃ সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ ইত্যেকমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। অস্থূলমনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্বিশেষ লিঙ্গাঃ—শঙ্কর।

২১। ঋগ্বেদ—১।৭; ১০।৬৬; ১০।১৫১

সমস্ত উপনিষদ হইতেছে গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন হইতেছে দোহনকর্তা, অর্জুন হইতেছেন গাভীর বৎসতুল্য, পণ্ডিত ব্যক্তি এই দুগ্ধপানকর্তা আর গীতার অমৃতস্বরূপ বাণী হইতেছে দুগ্ধস্বরূপ।

সমস্ত বেদ একই কালে রচিত হয় নাই—তাহাতে অনেক বিরুদ্ধ উপাদান আছে এবং বেদের চিন্তাধারা সুবিন্যস্ত আকারে বিধৃত নয়। উপনিষদে বেদের সারসংগ্রহ এবং বৈদিক চিন্তাধারা কিছুটা সুবিন্যস্ত আকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু উপনিষদ্‌গুলিও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ছড়ানো, এবং বিভিন্ন উপনিষদের, এমন কি একই উপনিষদের চিন্তার মধ্যে বৈপরীত্য আছে। তাহা ছাড়া মহাভারতের কালে উপনিষদের যুগ ছাড়াইয়া আর্যজাতির চিন্তা অগ্রসর হইযাছে, ষড় দর্শনের মতামতগুলি দেশে সুপ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, বিভিন্ন ধর্মমত ও প্রণালীও প্রচলিত হইয়াছে, সুতরাং আর একবারও আর্যজাতির চিন্তার সারসংকলন ও সুশৃঙ্খল প্রকাশ প্রয়োজন হইল। এই কাজটিই গীতায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং যত্নের সঙ্গে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে গীতা পাঠ করিলে, সমগ্র হিন্দুধর্মের সারমর্ম অনুধাবন করা যায়, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গীতায় হিন্দুচিন্তার বহু বিপরীত ধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং আপাতদৃষ্টিতে গীতাতেও বহু বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। তথাপি যে কোন নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাশীল পাঠক গীতায় এ সমন্বয়-চেষ্টা সার্থক হইয়াছে, ইহা স্বীকার করেন। গীতার অসংখ্য ভাষ্য ও টীকা হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, বিভিন্ন ধর্ম ও চিন্তা, সম্প্রদায় বা ব্যক্তি নিজ নিজ রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী গীতা হইতে প্রেরণা ও শক্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। মহাভারতের যুগের পরে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজে এমন কোন ধর্মমত বা দার্শনিক মত আত্মপ্রকাশ করে নাই—যাহা নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী নিজ মতের সমর্থন গীতা হইতে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে নাই। ভারতে হিন্দুর চিন্তায় গীতার এমনই সুউচ্চ স্থান যে, গীতাকে উপেক্ষা করিয়া বা অগ্রাহ্য করিয়া কোন ধর্মমত বা দার্শনিক মতই আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিবার কথা চিন্তা করিতে পারে নাই। শঙ্করাচার্য হইতে শুরু করিয়া, মধ্বাচার্য পর্যন্ত বেদান্তের বিভিন্ন ব্যাখ্যাতা

বেদের সারসংগ্রহ উপনিষদে

আবার বেদ, উপনিষদ, ও নানা দর্শন-পুরাণের সারসংগ্রহ গীতায়

গীতার জ্ঞান হিন্দুর চিন্তায় এত সুপ্রতিষ্ঠিত যে, গীতাকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করিয়া কোন ধর্মমত বা দার্শনিক মত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা চিন্তা করিতে পারে না

সকলেই গীতাভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়েরই পৃথক পৃথক গীতাভাষ্য আছে। ভারতবর্ষের এমন কোন মনীষী ব্যক্তি নাই, যাঁহার উপর গীতার প্রভাব পড়ে নাই। শ্রীঅরবিন্দ গীতাতে দেখিয়াছেন দিব্য জীবন যাপনের অভ্রান্ত পন্থা, বঙ্কিমচন্দ্র, মিল্,

আধুনিক ভারতের চিন্তায় গীতার বিপুল প্রভাব

বেন্থামের মার্জিত বহুসুখবাদের সূত্র গীতাতে খুঁজিয়াছেন, মহামান্য তিলক ও স্বদেশী যুগের নেতারা দেশপ্রেমের জন্য সংগ্রামের প্রেরণা গীতা হইতে লাভ করিয়াছেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্রও গীতায় তাঁহার আপসহীন সংগ্রামের সমর্থন লক্ষ্য করিয়াছেন, আবার মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য বিনোবা ভাবে অহিংসা ও সর্বোদয় আদর্শের বীজও এই গীতা হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন, গৌতম বুদ্ধের জ্ঞানমূলক শূন্যবাদ ও সন্ন্যাসবাদের সহিত গীতোক্ত ভক্তিবাদ ও নিষ্কাম কর্মবাদের সংযোগ সাধন করিয়া, পরবর্তী মহাযানপন্থা রূপে বৌদ্ধমত গঠিত হয়। বাইবেলের উপদেশের সঙ্গে গীতার উপদেশের বহু ক্ষেত্রে আশ্চর্য মিল আছে এবং তাই কোন কোন উৎসাহী পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ প্রকার অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যীশুখ্রীষ্ট হইতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চিন্তাধারা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু মহাভারতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী (এবং সুতরাং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা) যীশুখ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ পাঁচ-ছয় শতাব্দী পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল—ইহাই সাধারণতঃ প্রাচ্য পণ্ডিতদেরও গৃহীত মত।

গীতার পটভূমিকা হইতেছে এই: ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষী পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে সমবেত হইয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধের ফলে স্বজনবিনাশ অনিবার্য, ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ কুরুপক্ষীয় আচার্যদের দেহে

গীতার পটভূমিকা

অস্ত্রাঘাত করিতে হইবে, কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্র-দ্রোহজনিত পাতকের ভাগী হইতে হইবে, কুলধর্ম নষ্ট হইবে, কুলস্ত্রীগণ দূষিতা হইবেন, এবং বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে; কুলনাশ হইবে, পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধতর্পণ-ক্রিয়া লোপ পাইবে, তাঁহারা নরকে পতিত হইবেন, সনাতন জাতিধর্ম, কুলধর্ম, ও আশ্রম-ধর্মাদি উৎসন্ন যাইবে—

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের বিষাদ

শোকাকুলিত অর্জুন এইরূপ বলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন।[২২] দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে শেষ অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত অর্জুনের

২২। শ্রীমদভগবদ্গীতা—অর্জুনবিষাদ যোগ নাম প্রথমোঽধ্যায়

প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী। তিনি অর্জুনের বিষাদ যে 'অনার্যজুষ্টম্, অস্বর্গ্যম, অকীর্তিকরম্'—তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। প্রথম যে যুক্তিগুলি তিনি দিলেন, তাহা সবই সাংসারিক উপদেশ, যে ক্ষত্রিয় হিসাবে রণে ভঙ্গ দিলে নিন্দা হইবে, শত্রুরা উপহাস করিবে—নিরয়গামী হইতে হইবে এবং শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিলেন, মোহগ্রস্ত হইয়া তিনি কর্তব্যাকর্তব্য বিস্মৃত হইয়াছেন—তাঁহার মতো ক্ষত্রিয় বীরের এই হৃদয়দৌর্বল্য শোভা পায় না। এবং উপহাস করিয়া বলিলেন—"যাহাদের জন্য শোক করার কোন কারণ নাই তুমি তাহাদিগের জন্য শোক করিতেছ, আবার পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ।"[২৩] তাহার পরই প্রকৃত তত্ত্বকথা শুরু হইল। শোকক্লিষ্ট মোহগ্রস্ত অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে কর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে খ্যাত।

মোহগ্রস্ত অর্জুনকে ক্লৈব্যত্যাগ ও ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালনে আহ্বান

অত্যন্ত অগভীর ও বাহ্যদৃষ্টিতে ইহা মনে হইতে পারে যে, গীতার উদ্দেশ্য হইল, ক্ষত্রিয় অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহদান—অথবা আর একটু গভীর দৃষ্টিতে মনে হইবে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম শিক্ষাদানই গীতার উদ্দেশ্য। অবশ্য এরকম সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ হইতেও গীতার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কেহ কেহ ইহা বলিয়াছেন যে, বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষাই গীতার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ প্রকার ব্যাখ্যা কিছুতেই সত্য হইতে পারে না—কারণ তাহা হইলে, এত যুগ ধরিয়া কোটি কোটি মানুষের জীবনে গীতার এত বিপুল প্রভাব কিছুতেই হইতে পারিত না।

যুদ্ধে উৎসাহ দান বা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্যে উৎসাহদান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের উদ্দেশ্য ?

কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধ, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। সম্ভবতঃ ইহাই সমীচীন ব্যাখ্যা যে, গীতায় যে যুদ্ধের পটভূমিকা তাহা বাস্তবিক যুদ্ধ নহে, ইহা একটি নৈতিক যুদ্ধের রূপক, ইহা মানবাত্মার চিরন্তন যুদ্ধ,—অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে। গান্ধীজী এই অর্থেই গীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গান্ধীভাষ্যের যে বাংলা অনুবাদ শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের

গীতায় যুদ্ধের পটভূমিকা—রূপক

২৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয়োঽধ্যায় ১১

ভিতর যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিরন্তর চলিতেছে, তাহাই গীতোক্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—"দেহ রথ, অর্জুন রথী, শ্রীকৃষ্ণ সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব ও লাগাম মন। রথ যে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই কুরুক্ষেত্ররূপ হৃদয়ক্ষেত্র। দৈবী ও আসুরী, হৃদয়স্থ এই দুই বৃত্তি দুই পক্ষ। এই যুদ্ধ নিয়তই মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে চলিতেছে। এই যুদ্ধে যাহাতে দৈবী পক্ষই জয়ী হয়, তজ্জন্য ভগবান্ সারথিবেশে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান অজ্ঞ দেহী অর্জুনকে দিতেছেন।"[২৪]

গান্ধীজীর মতে প্রবুদ্ধ মানুষের অন্তরে শুভ ও অশুভের চিরন্তন দ্বন্দ্ব

এই ভ্রম ও মোহ কি? প্রথমতঃ অর্জুন দেহের মৃত্যু ইত্যাদির কথা ভাবিয়াই বিচলিত হইতেছেন, কিন্তু দেহের জরা, মৃত্যু তো অনিবার্য। এই দেহ তো নশ্বর। বারে বারে এই দেহের বিনাশ ঘটিবে, জীব জন্ম-জন্মান্তরে নূতন দেহ লাভ করিবে,—সুতরাং দেহের মৃত্যুর জন্য দুঃখ নিতান্তই ভ্রম। ইন্দ্রিয়জ সুখদুঃখ সমস্তই ক্ষণিক, সুতরাং প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহার জন্য বিচলিত হন না। দেহ, ইন্দ্রিয়, সুখদুঃখের তো কোন স্থায়িত্ব নাই, ইহারা তো অসৎ বস্তু। বুদ্ধিমান যিনি তিনি সদ্‌বস্তুর সন্ধান করেন,—যাহার পরিবর্তন নাই, জরা নাই, ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই। আত্মাই সেই সদ্‌বস্তু; দেহ ও আত্মা এক মনে করাই ভ্রম। কেমন সে আত্মার স্বরূপ?

অর্জুনের ভ্রম নিরসন—দেহের মৃত্যুর জন্য শোক নিতান্ত মিথ্যা

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥[২৫]

আত্মা তো অজর, অমর, অবিনাশী

আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। অন্যান্য বস্তু জন্ম লাভ করিয়া অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আত্মা সৎরূপে নিত্যই বিদ্যমান—আত্মা নিত্য, শাশ্বত ও চির পুরাতন। দেহের মৃত্যু হইলেও, আত্মা মৃত হয় না। হে অর্জুন, ইহা ভাবিয়া তুমি বিচলিত হইতেছ যে, দুর্যোধন ইত্যাদি আত্মীয়-পরিজনকে হত্যা করিতে হইবে, ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরুজন ব্যক্তির দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে হইবে। কিন্তু দুর্যোধনের দেহটা দুর্যোধন নয়,—ভীষ্ম-দ্রোণের দেহে আঘাত তাঁহাদের আত্মাকে আঘাত

আত্মাই নিত্য শাশ্বত চিরপুরাতন

২৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—গান্ধীভাষ্য—শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত—উপক্রমণিকা।

২৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২, ২০

করিতে পারে না। যেমন দেহী পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বসন গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ এক দেহান্তে অন্য দেহ পরিগ্রহ করে, কিন্তু আত্মাবস্তুকে

নৈণং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈণং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম ক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ম বিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে—

আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে এ সব তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি দেহের বিকার বা নাশের কথা চিন্তা করিয়া শোকগ্রস্ত হন না। কাজেই হে অর্জুন, মোহ ত্যাগ কর। তুমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়জনোচিত কার্য—যে ধর্মযুদ্ধ, তাহা অবিচলিত চিত্তে করিয়া যাও।

কর্তব্য বলিয়াই কর্তব্য করিতে হইবে

এখানে কাণ্টের উপদেশের কথাই স্মরণ হয়, কর্মের ফলাফল চিন্তা না করিয়া, কর্তব্য কর্ম করিয়া যাইতে হইবে, তাহাতে যদি পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যায় তাহাতেও কর্তব্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইবে না।

সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।

অতএব লাভ হইবে কিনা, স্বার্থসিদ্ধি হইবে কিনা, ইহা বিবেচনা না করিয়াই, মানুষের কর্তব্যকর্ম করিতে হইবে।

কিন্তু মানুষ অন্ধের মত কেন কর্ম করিবে? তাহার কর্ম বুদ্ধিদীপ্ত হওয়া প্রয়োজন এবং সে কর্মের পশ্চাতে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা যেন না থাকে। গীতা এস্থানে অত্যন্ত তীব্রভাষায় "বেদবাদরতাঃ" -দের নিন্দা করিয়াছেন। এই বেদবাদীরা বলেন বিশুদ্ধ, মন্ত্র উচ্চারণ এবং বিশুদ্ধ প্রণালী অনুযায়ী হোম, যজ্ঞ, পূজা ইত্যাদি সম্পন্ন করিলে, ভোগ ও ঐশ্বর্য লাভ নিশ্চিত। এই সমস্ত পুষ্পিতা বাক্ (প্রীতিপ্রদ মনোমুগ্ধকর প্রতিশ্রুতি) দ্বারা যাহারা মানুষের চিত্তকে প্রলুব্ধ করে, তাহাদের চিত্ত কামনা-কলুষিত—স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তিই তাহাদের কাছে পরম পুরুষার্থ। এই সমস্ত বাক্য দ্বারা যাহারা প্রলুব্ধ, যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষায় এই কর্মমার্গে

মানুষের কর্ম বুদ্ধিদীপ্ত হওয়া প্রয়োজন

নির্বোধ কর্মকাণ্ডের নিন্দা

প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের হৃদয়ে সত্যজ্ঞান কখনও স্ফুরিত হয় না। তাহাদের বুদ্ধি সংসারের আপাতমনোহর মরীচিকার পশ্চাতে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, তাহা কখনো ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় না। ইহা বাস্তবিক সুখশান্তির পথ নহে—মুক্তির পথ তো নয়ই। জ্ঞানহীন, আকাঙ্ক্ষা-কলুষিত কর্ম বন্ধনই আনিয়া দেয়, শৃঙ্খল মোচনের পথ দেখায় না।[২৩]

আকাঙ্ক্ষা-কলুষিত কর্ম বন্ধনই আনিয়া দেয়

মানুষের ইহা যেমন ভ্রম যে, দেহই আত্মা,—ইন্দ্রিয়সুখ বা ভোগৈশ্বর্যই মানুষের কাম্য, তাহার চেয়েও গুরুতর ভ্রম হইতেছে এই বিশ্বাস যে, আমি কর্তা, আমি যুদ্ধ করিতেছি, আমি অস্ত্রাঘাত করিতেছি, মানুষেব মৃত্যু ঘটাইতেছি, আমিই অর্থ, যশঃ, প্রতিপত্তি নিজ চেষ্টা দ্বারা লাভ করিতেছি। এই অহংকার সমস্ত মোহ, সমস্ত আসক্তির মূল। 'আমি কর্ম করিতেছি' ইহা যখনই বিশ্বাস করি, তখনই কর্মফলেবও আকাঙ্ক্ষা করি—তখনই সংসারের সমস্ত বন্ধন ও সমস্ত দুঃখের জালে জড়িত হই। পৃথিবীতে সুখ ও শান্তির ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত পথ।

অর্জুনেব প্রথম ভ্রম-দেহই আত্মা, দ্বিতীয় তদপেক্ষা জড়ভ্রম যে 'আমি কর্তা।'

কর্মফলের আকাঙ্ক্ষাব মূল অহংবুদ্ধি, ইহা বন্ধনেবই সেতু

কর্তব্য বলিয়াই কর্ম করিতে হইবে, কিন্তু সেই বর্ম করিবে, অহংবুদ্ধি রহিত হইয়া, কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া। বিষয় ভোগ করিয়াও সংসারে নির্লিপ্ত তিনিই থাকিতে পারেন, যিনি নিজেকে ভগবানের ভৃত্য বলিয়া জ্ঞান করেন, যিনি সুখ ও দুঃখ ভগবানেরই দান, এই সমত্ব-বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন—যিনি এই সংসারকে তাঁহার প্রসাদ হিসাবেই ভোগ করেন ইহাই ঈশোপনিষৎ-এর প্রথম শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য—

নিরত কর্ম করিতে হইবে, কিন্তু তাহা করিতে হইবে কর্ম-ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কবিয়া

ঈশাবাস্যমিদম্ সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্।

এই সমগ্র বিশ্ব সেই ঈশ্বর দ্বারাই ব্যাপৃত—যাহা কিছু এ জগতে আছে, তাহা তাঁহারই। সুতরাং সংসারের সমস্ত কিছুই তাঁহারই 'প্রসাদ' জ্ঞানে ভোগ কর,—কাহারও ধনে লোভ করিও না।

২৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়—৪২-৪৪

তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী যিনি ইহা জানিয়াছেন যে, ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা। ইহা স্বীকার করিয়া **তাঁহারই নির্দেশ হিসাবে যিনি নিজ কর্তব্য করিয়া যান, যিনি** অপ্রমত্ত হইয়া **ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া সংসারে কর্মে রত** থাকেন এবং **যিনি সর্বকর্মের ফল ঈশ্বরেই সমর্পণ করেন,** এমন যিনি জ্ঞানযুক্ত কর্মী ভক্ত, তিনিই পরমশান্তি লাভ করিতে পারেন। ইহাই গীতার মূলমর্ম।

ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, তাঁহাকেই সর্বকর্ম ফল অর্পণ করিতে হইবে—ইহাই গীতার শিক্ষা

যিনি এমন জ্ঞান লাভের অধিকারী, তিনি ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণের সমন্বয়েই প্রকৃতি। যিনি ত্রিগুণাতীত, তিনি বাহিরের অবস্থার দাস নন। তাঁহার সুখদুঃখ বাহ্য প্রকৃতির পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে না। এমন জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি বিপরীত প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত। এমন ব্যক্তিই কেবল মাত্র প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারেন। যিনি ঈশ্বরেই নিজেকে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি তো নির্ভয়—যজ্ঞকর্মাদিতে তাঁহার আর কোন প্রয়োজন নাই।

যিনি জ্ঞানী, তিনি ত্রিগুণাতীত

যিনি ঈশ্বরে সব সমর্পণ করিয়াছেন তিনি, নির্ভয়

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাই উপদেশ দিলেন

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফল হেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি

কর্মেই ব্যক্তির অধিকার, কর্মফলে নয়

হে অর্জুন, **কর্মেই তোমার অধিকার—কর্মফলে তোমার কোন অধিকার নাই। কর্মফলের প্রতি আসক্তি যেন তোমার কর্ম-প্রবৃত্তির হেতু না হয়—আবার কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।**[২৭]

কাজেই গীতায় কর্মত্যাগের নির্দেশ নাই, কর্মফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগেরই নির্দেশ। এই কর্ম করিতে হইবে, কর্মের ফল যে সুখ ও দুঃখ, এই দুইয়ের সম্পর্কেই সমত্ব বুদ্ধি হইতে। সুখও ঈশ্বরের দান, দুঃখও ঈশ্বরের এবং দুইই সমান নশ্বর। কিন্তু এই সমত্ব-বুদ্ধি বা কর্মযোগ তো সহজ নয়। কর্ম করিবে, অথচ তাহাতে লিপ্ত হইবে না,

গীতায় কর্মত্যাগের উপদেশ নাই

২৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২য় অধ্যায় ৪৭

তাহার ফলাফল সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকিবে, ইহারই কৌশল হইতেছে কর্মযোগ। এই কৌশলই গীতা শিক্ষা দিয়াছেন। যিনি এই কৌশল আয়ত্ত করেন, কর্ম তাঁহাকে বন্ধন করে না। **যতক্ষণ কর্তৃত্ব বুদ্ধিতে কর্ম করা হয়, ততক্ষণই কর্মফল আমাদের ভোগ করিতে হয়। এই কর্মফল সঞ্চিত হয় বলিয়াই আমাদের সুখদুঃখের ভোগ, বারে বারে জন্ম ও মৃত্যু। কিন্তু যিনি নিষ্কাম হইয়া কর্ম করেন,** ঈশ্বরে সর্ব কর্মফল অর্পণ করেন, **তিনি এই সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হন না।** এই মনীষী ও কৌশলী ব্যক্তিগণ জন্মবন্ধ বিনির্মুক্ত হইয়া ভগবদপদ প্রাপ্ত হন।[২৮]

বরঞ্চ কর্তৃত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া নিয়ত কর্ম করিবারই নির্দেশ

এবার অর্জুন প্রশ্ন করিলেন, এই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিদের লক্ষণ কি? কি তাঁহাদের ভাষা? কি রূপে তাঁহারা অবস্থান করেন? গীতায় এই প্রশ্নগুলির যে আলোচনা আছে, কোন দেশের কোন কালের ধর্ম-সাহিত্যে, ইহার চেয়ে সুন্দর উত্তর আছে কিনা সন্দেহ।

যাঁহারা এমন নির্লিপ্ত কর্মযোগী, তাঁহারাই প্রাজ্ঞ

প্রজহাতি যথা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্
নাভিনন্দতি নদ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

হে পার্থ, যিনি মনোগত সমস্ত কামনা বিসর্জন দিয়া আপনাতেই আপনি তুষ্ট থাকেন, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে।

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ

যিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না, আবার সুখেও যাহার স্পৃহা নাই, যিনি অনুরাগ ভয় বা ক্রোধশূন্য, তাঁহাকেই স্থিতধী, মুনি বলা হইয়া থাকে।

যিনি সর্ববিষয়ে মমত্ববোধশূন্য, যিনি প্রিয় বা অপ্রিয় কোন বিষয় লাভ করিয়া আনন্দিত হন না বা অসন্তোষও প্রকাশ করেন না, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।[২৯]

স্থিতপ্রজ্ঞকে কূর্মের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। কূর্ম যেমন নিজের খোলার মধ্যে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুটাইয়া রাখে, স্থিতপ্রজ্ঞ তেমনি ইন্দ্রিয়ের

২৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২য় অধ্যায় ৫১
২৯। ” ” ” ” ৫৫-৫৭

বিষয় হইতে, ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করিয়া লন। কিন্তু ইন্দ্রিয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইলেই তো প্রজ্ঞা লাভ হয় না। ইহা তো বাহ্য নেতিবাচক ক্রিয়া। আসল কাজ হইল, অন্তরের বাসনা-কামনা বিষয়তৃষ্ণার আকাঙ্ক্ষা জয় করা। ইহা যে অত্যন্ত কঠিন কাজ, তাহা ভগবানের অজ্ঞাত নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রবল—বলবান অশ্বের মতো তাহাদের আকর্ষণ-ক্ষমতা, মুনিগণের পক্ষেও প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য। তাই যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ইত্যাদি যোগাঙ্গ চিত্তের চাঞ্চল্য প্রশমনে সহায়ক হইলেও একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায় হইল, ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'যুক্ত আসীত মৎপরঃ'—আমার অনন্যভক্ত হও, আমার শরণাগত হও, ইহাই চিত্তশান্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। যম নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামে অহংবুদ্ধি থাকে—'আমি চিত্ত সংযম করিতেছি, আমি ইন্দ্রিয় শাসন করিতেছি' এই ভাব থাকে। কিন্তু কতটুকুই বা আমাদের শক্তি? বিষয়-চিন্তা তো আমরা জোর করিয়াও দূর করিতে পারি না। তাহা হইতেই আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতেই আসে কামনা। কামনা পূর্ণ না হইলে, অথবা বাধাপ্রাপ্ত হইলেই ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ হইতেই মোহ জন্মে, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, এবং স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয়। আর বুদ্ধিনাশ হইতেই ঘটে সর্বনাশ। বহুবার মুনিদেরও মতিভ্রম ঘটিয়াছে, তাঁহাদের পতন হইয়াছে। তবে উপায় কি? ব্যক্তি নিজের চেষ্টায়, নিজের উদ্যমে নিজের মুক্তি আহরণ করিবে, ইহা দূরাশা। তাঁহারও কৃপা চাই। যতদিন মানুষ সম্পূর্ণ ভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ না করিতে পারে, ততদিনই তাহার পতনের ভয় থাকিবে। একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য এবং সর্বাপেক্ষা সহজ পথ হইল, একান্তভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া। কারণ ঈশ্বরই সর্বভূতের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত হইয়া, সূত্রধর যেমন অন্তরালে থাকিয়া কৃত্রিম পুত্তলিকাগুলিকে যন্ত্রদ্বারা রঙ্গমঞ্চে নিজের ইচ্ছামত নাচায়, তেমন করিয়া ভূতগণকে ঈশ্বরই হাসান, কাঁদান, নানাকর্মে প্রবৃত্ত করান।[৩০] অথচ জীবের অহংকার, সে-ই কর্ম করে, ইচ্ছা করে, আবার আত্মশাসন করে। ইহাই দৈবী মায়া।

স্থিতপ্রজ্ঞ সুখে দুঃখে সমজ্ঞান

তিনি সংযত

তিনি অনলস, কুশলী

তিনি শান্ত, তিনি নির্ভয়

তাঁহার সমস্ত শান্তি ও শক্তির মূল ভগবানে আত্মসমর্পণ, অহংবুদ্ধি বিলোপ

৩০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—অষ্টাদশ অধ্যায় ৬১

এই দুস্তরা মায়া হইতে ত্রাণ পাইবার উপায়—আমারই শরণাগত হইয়া আমাকে ভজনা করা।[৩১] কাজেই শ্রীভগবানের শেষ উপদেশ হইতেছে

মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

হে অর্জুন, একমাত্র আমাতেই তোমার মন সমর্পণ কর, আমারই ভক্ত হও, আমাকেই ভজনা কর, আমার কাছেই নতি স্বীকার কর। **আমি তোমায় প্রতিশ্রুতি দিতেছি, তুমি এভাবে আমাকেই পাইবে,** কেননা তুমিই আমার প্রিয়। সকল ধর্মপরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর, আমিই তোমাকে সর্বপাপ হইতে মোচন করিব, তুমি শোক করিও না।

ভগবানে আত্মসমর্পণ

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ইহাকেই বলা হইয়াছে শরণাগতি। বায়ুপুরাণে এই শরণাগতির ছয়টি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে—

শরণাগতির লক্ষণ

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রতিকূল্যবিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥

ভগবানের অনুকূল অর্থাৎ প্রীতিজনক কার্যে সদা প্রবৃত্তি, তাঁহার প্রতিকূল কার্য হইতে নিবৃত্তি, তিনি আমাকে রক্ষা করিবেনই এই দৃঢ়বিশ্বাস, তিনিই আমাকে আবরণ করিয়া গোপন করিয়া রাখিবেন বলিয়া, তাঁহাকে হৃদয়ে বরণ, এবং তাঁহারই কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং 'তুমিই আমাকে রক্ষা কর' বলিয়া দৈন্য ও আর্তিপ্রকাশ—এই ছয়টিই শরণাগতির লক্ষণ।[৩২]

ভক্তিতে কর্মজীবন ও ধর্মজীবনের পরিসমাপ্তি

এই ভক্তিতেই কর্মজীবন ও ধর্মজীবনের পরিসমাপ্তি। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'কাঁচা আমি'র অবসান—কেবল তুমিই তখন সর্বেসর্বা। এমন অবস্থা যখন আসে তখনই ভক্ত গাহিতে পারে—

রামকৃষ্ণ

৩১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—সপ্তম অধ্যায়, ১৩-১৪
৩২। বায়ুপুরাণ, হরিভক্তিবিলাস—১১।৪।১৭

আর আমারে বাইরে তোমার
কোথাও যেন না যায় দেখা
তোমার মাঝে মিলাক আমার
জীবন সাঁঝের রশ্মিরেখা
আমায় ঘিরি, আমায় চুমি
কেবল তুমি, কেবল তুমি
'আমার' ব'লে যা আছে মা
তোমার ক'রে সকল হর।

রবীন্দ্রনাথ

শরণাগত সন্ত সুরদাসের তাই প্রার্থনা—

ওগো প্রভু, ওগো দয়াময়
রক্ষা করো রক্ষা করো মোরে।
তুমি যে প্রীতির উৎস, সর্বমূলাধার।
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অকূল পাথারে
হালভাঙ্গা মোর তরীখানি
ডুবে যায়, ভেঙ্গে যায় হায়!
মোরে ঘিরে নাচে অবিরাম,
মিথ্যা মায়া কামনার উত্তাল সাগর,
হিংসার তরঙ্গ তোলে মাথা
গ্রাসে মোরে প্রমত্ত কামনা,
রক্ষা করো, রক্ষা করো প্রভু!
ডুবে যাই, ডুবে যাই পিতঃ
আমার পাপের ভারে,—
আঁধার নিশীথে, তরঙ্গের বিক্ষুব্ধ গর্জন
পিষ্ট করে দুর্বল আত্মারে।
ছিঁড়িয়াছে দড়াদড়ি, ভেঙেছে নোঙ্গর
নিরাশ্রয় আমি প্রভু, শকতিবিহীন
তাই আজ নিঃসহায়, তোমারে যে স্মরি দীননাথ!
দীনের আশ্রয় তুমি, সর্বশক্তিমান্
চেয়ে দেখো বিপন্ন সন্তানে।

সুরদাস

কূলহারা অশান্ত সাগরে
শ্রান্ত আমি, আমি নিরুপায়
ডুবে যাই, ওগো ডুবে যাই।
বাহু দুটি কর প্রসারিত
ক্লান্ত মোরে নাও তুলি তীরে,
কোলে লও অধম সন্তানে।[৩৩]

গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যে সুসমন্বয় হইয়াছে, তাহা আলোচনাই আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য। পূর্বেই দেখিয়াছি, গীতায় জ্ঞানবিবর্জিত অন্ধ কর্মকাণ্ডের নিন্দা করা হইয়াছে। এ সমস্ত কর্মই কামনা-প্রসূত এবং ইহাদের ফলও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু শুধু জ্ঞানের পথেই মুক্তি আসিবে, এমন কথা গীতায় বলা হয় নাই। ভগবান অর্জুনের মোহ দূর করিবার জন্যই জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথার অবতারণা করিয়াছেন; দেহ আত্মা নয়, এবং জীব কর্তা নয়—ভগবানই একমাত্র কর্তা এবং আত্মা অবিনশ্বর—এই সত্যজ্ঞান লাভ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই আত্মা আশ্চর্যবৎ বলিয়া বোধ হইলেও, ইহাই কর্মজীবন ও ধর্মজীবনের ভিত্তি। এই সত্যজ্ঞানের আলোতে মোহমুক্ত হইয়াই জীবকে সংসারের কর্তব্য করিতে হইবে। মোহ দূর হইলেই, অনাসক্ত ভাবে জীব কর্ম করিতে পারিবে এবং কর্ম করিয়াও কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হইবে না।

কর্ম করিতে হইবে, এই সত্য জ্ঞান হইতে যে, ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, আমরা সকলেই ভৃত্য—যিনি সত্যজ্ঞানী তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত

এই ভাবেই গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সুসমন্বয়

বেদবাদীদের উপদিষ্ট কর্মের নিন্দা করিলেও, গীতা কখনও কর্মত্যাগের উপদেশ দেন নাই। গীতার আদর্শ অদ্বৈত বেদান্ত-বাদীদের আদিষ্ট সন্ন্যাস ও সংসার ত্যাগ নয়। বরঞ্চ সতত কর্মের উপদেশই দেওয়া হইয়াছে—

ফলাকাঙ্ক্ষাদুষ্ট বেদ-বাদীদের কর্মের নিন্দা

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়োহ্য কর্মণঃ
শরীর যাত্রাপি চতে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ

হে অর্জুন, তুমি নিয়ত কর্ম কর—যেহেতু অকর্ম হইতে কর্মই শ্রেষ্ঠ, এমন কি কর্ম না করিলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হইতে পারে না। গীতায় বিধিবদ্ধ যজ্ঞাদি কর্মও নিষিদ্ধ হয় নাই, কেবল বলা হইয়াছে, এ সব যজ্ঞ-তপস্যাদি কর্মও ফলাকাঙ্ক্ষা

কিন্তু কর্মত্যাগের উপদেশ নাই

৩৩। সুরদাসের একটি দোঁহার ভাবানুবাদ—লেখক

শূন্য হইয়া করিতে হইবে।[৩৪] হীরেন্দ্রনাথ দত্ত গীতোক্ত যজ্ঞাদি কর্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন মনে হয়। তিনি বলেন, 'যজ্ঞের মর্মভাব ত্যাগ, অতএব যজ্ঞার্থে কর্ম করার এরূপ অর্থও অসঙ্গত নহে যে ত্যাগের ভাবে কর্মানুষ্ঠান করা, এইরূপ কর্মানুষ্ঠান যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মানবজীবন একটি মহাযজ্ঞের আকার ধারণ করে। সে যজ্ঞের বেদী জগতের হিত, ত্যাগ, আত্মবলিদান এবং যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং ভগবান'।[৩৫]

যজ্ঞকর্মও আদিষ্ট

হিন্দুধর্মে গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চযজ্ঞ অবশ্য কর্তব্য। এই যজ্ঞ কর্মের মধ্যদিয়া গৃহীর অনিচ্ছাজনিত জীবহত্যার পাপ (পঞ্চসূনা)[৩৬] মোচন হয়। তাছাড়া মানুষ তাহার জীবন ও শুভাশুভের জন্য পিতৃপুরুষ, দেবতাদি, গবাদিপশু ও ভূত-পিশাচাদির নিকট ঋণী। সেই ঋণ শোধ করিবার জন্য ঋষিযজ্ঞ (শাস্ত্রায়ধ্যয়ন), পিতৃযজ্ঞ (তর্পণাদি), দৈব-যজ্ঞ (হোমাদি), ভূতযজ্ঞ (জীবজন্তুকে খাদ্যপ্রদান) এবং নৃযজ্ঞ (অতিথি-সৎকার) ইত্যাদি কর্ম কোন প্রকারেই ত্যাজ্য নহে। যে ব্যক্তি এই সমস্ত ঋণ শোধ না করিয়া, কেবলমাত্র আপন ভোগের জন্যই অন্ন পাক করেন, গীতায় তাঁহাদিগকে স্তেন (চোর) বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। গীতায় আরো বলা হইয়াছে, যে সজ্জনগণ দেবতা, অতিথি প্রভৃতিকে অন্নাদি প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন। যে পাপাত্মারা কেবল আপন উদরপূর্তির জন্য অন্নপাক করে, তাহারা পাপ-রাশিই ভোজন করে।[৩৭]

সাংসারিক ধর্মও আদিষ্ট

ইহা হইতে হিন্দুর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। জীবন শুধু নিজের সুখভোগের জন্য নহে, তাহা বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় চ। কিন্তু সেই সুখ শুধু এই ইহজগতের সাংসারিক সুখই নয়। মানুষের সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক কল্যাণ এবং অবশেষে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি। গীতায় এই সব নিয়তকর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু বলা হইয়াছে

কিন্তু সর্বকর্মের উদ্দেশ্য—বহুজনের কল্যাণ

৩৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, তৃতীয়োধ্যায় ৮—৯

৩৫। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—গীতায় ঈশ্বরবাদ

৩৬। 'কণ্ডনী পেষণী চুল্লী চোদকুম্ভী চ মার্জনী'—উদূখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকুম্ভ ও ঝাঁটা এগুলি গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য, অথচ এগুলিতে কীটপতঙ্গাদি প্রাণীবধ অনিবার্য। এজন্য যে পঞ্চসূনা বা পাপ তাহা পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা মোচন হয়।

৩৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩। ১২-১৩

কর্মবন্ধন এড়াইতে হইলে সমস্ত কর্মই নিষ্কাম ভাবে করিতে হইবে। গীতার উপদেশ—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষ।

ভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন—হে পার্থ, ত্রিলোকমধ্যে আমার করণীয় কিছু নাই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নাই, তথাপি আমি কর্মানুষ্ঠানেই ব্যাপ্ত আছি। কারণ আমি কর্ম না করিলে, সমস্ত লোক উৎসন্ন যাইবে, আমি বর্ণসঙ্করাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু হইব এবং ধর্মলোপ হেতু প্রজাগণের বিনাশের কারণ হইব। হে ভারত, অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্মফলে আসক্ত হইয়া কর্ম করিয়া থাকেন, জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনাসক্ত চিত্তে লোকের হিতসাধনার্থে সেইরূপ কর্ম করিবেন।

ভগবান নিজেও কর্মত্যাগ করেন নাই

সংকীর্ণ দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করিলে ইহা মনে হইতে পারে যে, গীতায় বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষার্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম করিবেন। তাঁহারা শুধু ইহাই স্মরণ রাখিবেন যে, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে।

গীতার সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শুরু করিয়া বর্তমানে বিনোবাজী প্রমুখ পণ্ডিত ও ভক্ত ব্যক্তিরা গীতোপদিষ্ট কর্মকে উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। ব্রাড্‌লে তাঁহার Man and his Station-এ এই উদার ভাবটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষের এই পৃথিবীতে নির্দিষ্ট স্থান আছে, নির্দিষ্ট সম্বন্ধে সে অপরের সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যেক স্থানের এবং প্রত্যেক সম্বন্ধের উপযোগী কর্তব্যকর্ম নির্দিষ্ট আছে। সেই কর্তব্যকর্ম যথাসাধ্য সুন্দর করিয়া করাতেই প্রত্যেক মানুষের সফলতা। এই কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিলেই সে প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়। প্রত্যেক কর্তব্যই সমান মূল্যবান। ভগবানের চোখে যিনি দেশের রাজা, তাঁহার কর্তব্যের যতখানি মূল্য, যিনি মেথর হইয়া মানুষের মলমূত্র পরিষ্কার করেন, তাঁহারও ততখানিই মূল্য। আমাদের কাছে ভগবানের এইটুকুই দাবি, আমরা যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য-কর্মটুকু সুসম্পন্ন করি। গীতার উপদেশকেও এভাবে আধুনিক কালে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত নয়। কিন্তু মিল্ ও বেন্থামের

গীতার উদার অসাম্প্রদায়িক আধুনিক ব্যাখ্যাই সঙ্গত

মতো প্রেয়োবাদীদের মতে কর্তব্যকর্ম নিষ্কাম নয়, তাহার পশ্চাতে আছে মার্জিত স্বার্থবুদ্ধি (intelligent self-interest)। অবশ্য কান্টের মতে কর্তব্যকর্ম (duty) আবেগমুক্ত তাহা, শুদ্ধ যুক্তি-বুদ্ধিদ্বারা চালিত। কান্টের কর্তব্যকর্ম কঠোর ও নিরানন্দ, কিন্তু গীতার কর্তব্যকর্ম নিরানন্দের ব্যাপার নহে, ভক্ত স্বেচ্ছায় সানন্দে ভগবচ্চরণে কর্মের ফল সমর্পণ করে। প্রেয়োবাদীদের মতে, মানুষের কর্তব্যের প্রেরণা হইতেছে বাহিরের শাসন, রাষ্ট্রের বিধি, লোকনিন্দা ইত্যাদি। কান্টের মতে এ প্রেরণা আন্তরিক বিবেকের বাণী, ভগবানেরই আদেশ। তবে ইহাও তো আদেশ—ব্যক্তির কাছে ইহা সহজ ও স্বাভাবিক নয়। গীতার মতেও কর্তব্যের প্রেরণা আন্তরিক—

কর্তব্যের পশ্চাতে স্বার্থ-বুদ্ধি—মিল্, বেনথাম্

কান্টের কর্তব্য কঠোর নিরানন্দ

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি

কিন্তু এখানে এই কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণা গভীরতর আত্মবিশ্লেষণ ও সত্যোপলব্ধি সঞ্জাত। ভগবানই তো একমাত্র কর্তা—আমরা সকলেই তো যন্ত্র, একমাত্র যন্ত্রী তো তিনিই। এই আত্মসমর্পণে কর্তব্যবুদ্ধির শুষ্কতা নাই। কান্টের মতে, ব্যক্তিই কর্তা। স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অহংকার পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত কখনোই ত্যাগ করিতে পারে না। তাই কান্টের কর্তব্য-কর্মের নৈতিক ভূমি অহংবুদ্ধি, যুক্তিবিচারের অহংকার। কিন্তু গীতার ভক্তের কর্মের ভূমি সম্পূর্ণ ও সানন্দ আত্ম-সমর্পণ। ইহাতে কোন দুঃখ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, ব্যক্তি স্বাধীনতার অহমিকা নাই। তাই ভারতীয় ভক্ত ইহা বলিতে লজ্জা পান না—

গীতায় কর্তব্যের প্রেরণা গভীরতর আত্মোপলব্ধি সঞ্জাত—গীতার কর্মফলত্যাগ নিরানন্দ নয়, ইহাতেই ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ আত্ম-উন্মোচন

'সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।'

আর আর দিক হইতেও কান্টের কর্তব্যবাদের (duty for duty's sake) সঙ্গে গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শের প্রভেদ আছে। মানুষ কর্তব্যকর্ম কেন করিবে? এই পৃথিবীতে দেখা যায় যে সাধুরা দুঃখ পান, অসৎলোকদেরই শ্রী বৃদ্ধি হয়। কান্ট ইহার উত্তরে বলিলেন, সৎকার্য ও সুখের মধ্যে সমতা বিধান

অবশ্যই প্রয়োজন, তাহা না হইলে মানুষ সৎকার্য করিবে কেন ? কাজেই এই পৃথিবীতে যখন এই সমতা বিধান হয় না, তখন ইহা স্বীকার করিতে হইবে পৃথিবীর এই জীবনের পরেও অন্য জীবন আছে এবং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে একজন পরমেশ্বর আছেন, যিনি বিচারক, যিনি পরকালে সাধুকে পুরস্কৃত করিবেন এবং দুষ্টকে দণ্ড দিবেন এবং সুখ ও পুণ্যের চূড়ান্ত সমন্বয় বিধান করিবেন। এ যুক্তি অবশ্যই নিষ্কাম কর্মের যুক্তি নয়, উচ্চতর স্বার্থেরই যুক্তি।

কাণ্টে সৎকার্যের উপদেশের পশ্চাতে আছে পারলৌকিক লাভের আশ্বাস—ইহা নিঃস্বার্থ নয়

অবশ্য গীতাতেও নিষ্কাম কর্মীর স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি আছে। "অনন্যচিত্ত হইয়া আমার চিন্তা করিতে করিতে যে ভক্তগণ আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই সব ভক্তের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করিয়া থাকি (অর্থাৎ তাহাদের প্রয়োজনীয় অলব্ধ বস্তুর সংস্থান এবং লব্ধবস্তুর রক্ষণ আমি করিয়া থাকি)।"[৩৮]

গীতায়ও এই প্রতিশ্রুতি আছে যে জ্ঞানী ভক্তের যোগ-ক্ষেম ভগবান বহন করেন

যে জ্ঞানীভক্ত ইহা বিশ্বাস করেন যে, ভগবানই একমাত্র কর্তা, তাঁহার পক্ষে এই প্রত্যয়ও স্বাভাবিক যে তিনিই সমস্ত জীবের যোগ-ক্ষেমও বহন করেন। কিন্তু এই স্বার্থবুদ্ধিই কর্তব্য কর্মের প্রেরণা নয়। তাঁহাকেই সব বলিয়া জানিতে হইবে, মানিতে হইবে—তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—এই ভাব যদি আসে, তাহা হইলে কর্তব্যকর্ম ক্লেশকর হইবে না—বাস্তবিকপক্ষে কর্মের দায়িত্বই তখন লোপ পাইবে। ব্যক্তি তখন ইহা স্বচ্ছন্দে ও সানন্দেই স্বীকার করিতে পারে—

কিন্তু এই স্বার্থবুদ্ধিই কর্তব্য কর্মের প্রেরণা নয়

আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী
আমি ঘর, তুমি ঘরণী
আমি রথ, তুমি রথী
যেমন চালাও তেমনি চলি।

গীতায় জ্ঞানীভক্ত স্বেচ্ছায় সানন্দে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করেন

কিন্তু সর্বকর্ম সমর্পণ না হইলে তো এই ভাব আসিবে না। তাই উপদেশ,

যৎকরোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্।

হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম

৩৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—নবমোঽধ্যায় ২২

কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।[৩৯]

লোকমান্য তিলকের ব্যাখ্যা

লোকমান্য তিলক তাঁহার গীতারহস্যে বলিয়াছেন, "এই কর্মার্পণের মূলে কর্মফলের আশা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবার তত্ত্ব আছে। জীবনের সমস্ত কর্ম, এমন কি জীবন ধারণ পর্যন্ত, এইরূপ কৃষ্ণার্পণ বুদ্ধিতে অথবা ফলের আশা ত্যাগ করিয়া করিতে পারিলে, পাপ-বাসনা কোথায় থাকিবে এবং কুকর্মই বা কিরূপে ঘটিবে? তখন তো 'আমি' এবং 'অপর' এই দুইয়ের সমাবেশ পরমেশ্বরে। এই দুইয়েরই পরমেশ্বরে সমাবেশ হওয়ায় স্বার্থ ও পরার্থ কৃষ্ণার্পণরূপ পরমার্থের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়। কৃষ্ণার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করিলে, নিজের যোগক্ষেমও বাদ পড়ে না। স্বয়ং ভগবানই এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।"[৪০]

গীতায় প্রথম জ্ঞান, তাহার পর কর্ম এবং তাহার পর ভক্তির উপদেশ, এবং তিনের অপূর্ব সমন্বয়

গীতার আরম্ভে জ্ঞানের উপদেশ—আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও ঈশ্বরপ্রভুত্ব স্বীকৃতি। তাহার পরই কর্মের নির্দেশ। নিরন্তর কর্ম করিতে হইবে—অহংবুদ্ধিশূন্য হইয়া, নির্মম হইয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া। সর্বশেষ ভক্তিভবে ভগবানে সর্বকর্ম সমর্পণের আহ্বান ও ভক্তের প্রতি ভগবানের সমস্ত ভার গ্রহণ করিবার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির এই এক আশ্চর্য সমুচ্চয়। এই আদর্শই শ্রেষ্ঠ ভারতীয় আদর্শ, কিন্তু ইহা সর্বমানবীয় আদর্শও বটে।

এই আদর্শ প্রেয়োবাদ নয়, কিন্তু ইহাতে সাংসারিক সুখ ও স্বার্থ অস্বীকৃত হয় নাই। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে এই জীবনের সুখই শেষ নয়, বরঞ্চ ইহা বন্ধনের হেতু—সুতরাং দুঃখেরই তাহা নামান্তর। ভারতবর্ষের মানুষ খোঁজে সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক অবসান, সমস্ত সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি। কান্টের কৃচ্ছ্রবাদের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে, কারণ, গীতায়ও বারে বারেই বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য দমন করিতে না পারিলে ইহকালে শান্তি ও পারলৌকিক কল্যাণ সম্ভব নয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবার অসম্ভব উপদেশ

নিষ্কাম

।—নবমোঽধ্যায় ২৭

৩৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ...ক—গীতারহস্য

৪০। লোকমান্য তিল...

গীতায় নাই। ইন্দ্রিয়দের বিপুল শক্তি, মনকে উন্মার্গগামী করিবার বিষম ক্ষমতা সম্পর্কে বারে বারেই অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সাবধান করিয়াছেন। কি করিয়া অভ্যাসযোগ দ্বারা, ঈশ্বরে অন্তর অর্পণ করিয়া কামনা-বাসনার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে, গীতায় তাহারই উপদেশ।

এই শান্ত প্রাজ্ঞতা অভ্যাসযোগের দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়

ইহাই ধ্যানযোগ বা অভ্যাসযোগ—

"সংকল্পজাত কামনা সমূহকে বিশেষ রূপে ত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে তাহাদের বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া, ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা মনকেও ধীরে নিরুদ্ধ করিবে এবং অবশেষে নিরুদ্ধ মনকে আত্মাতে নিবিষ্ট করিয়া অন্য চিন্তা হইতে বিরত হইবে।" চঞ্চল মনকে তাহার বিষয়বস্তু হইতে নিবৃত্ত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়—সমস্ত বিশ্বকে ভগবান বলিয়া দেখা এবং ভগবানকে আত্মার সঙ্গে এক করিয়া দেখা—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্রঃ সমদর্শনঃ ॥
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রনশ্যামি স চ মে ন প্রনশ্যতি ॥[৪১]

ইহা হইতে বুঝা যাইবে, গীতার আদর্শকে প্রত্যক্ষবাদ (Intuitionism) বলিতে বাধা নাই। কর্তব্যের নির্দেশ মানুষ বাহির হইতে পায় না—তাহা অন্তর হইতেই উদ্ভূত। হৃদিস্থিতেন্ হৃষিকেশই অহংবুদ্ধিশূন্য সেবক মানুষের অন্তরে থাকিয়া তাহাকে চালনা করেন।

কর্তব্যের নির্দেশ হৃদিস্থিত হৃষিকেশই দেন—কাজেই গীতার আদর্শ Intuitionism বলিতে পারি

সর্বশেষ এই আদর্শ সম্পূর্ণতাবাদও (Perfectionism) বটে। মানুষের ভগবানে লীন হওয়াতেই আত্মার সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ—'তুমি' হওয়াতেই 'আমি'র সার্থকতা, 'কাঁচা আমি'র অবসান হইলে, তবেই তো 'পাকা আমি'র প্রতিষ্ঠা। হেগেলের 'Die to live' কি এই আদর্শেরই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি নয়?

ইহা পরিপূর্ণতাবাদের আদর্শও বটে

পাশ্চাত্ত্য দেশ এই আদর্শকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে না। কারণ তাহারা

৪১। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—ষষ্ঠাধ্যায় ২৯-৩০

ব্যক্তি-স্বাধীনতার মোহমুক্ত হইতে পারে না। তাহাদের চিন্তায় ব্যক্তিই শেষ সত্য। সুতরাং জড়বাদ ও নিরীশ্বরবাদ পাশ্চাত্ত্য চিন্তার স্বাভাবিক ফল। পাশ্চাত্ত্যের অহংবুদ্ধিস্ফীত মানুষ—ইহাই বিশ্বাস করিতে ভালবাসে যে মানুষই কর্তা, মানুষই নিজের ভাগ্য গড়ে, মানুষই পৃথিবীর সুখ দুঃখ নিয়ন্ত্রণ করে—মানুষই অন্যকে সুখ দেয়, দুঃখ দেয়। গীতার প্রারম্ভে অর্জুনের এই দৃষ্টিভঙ্গীকেই শ্রীভগবান্ 'মোহ' বলিয়াছেন্—"যাহাদিগের জন্য শোক করার কারণ নাই তুমি তাহাদিগের জন্য শোক করিতেছ, আবার 'পণ্ডিতের' ন্যায় কথা বলিতেছ।" মানুষের এই পণ্ডিতম্মন্যতা রূপ মূর্খতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাত নয়। কাজেই যোড়শ অধ্যায় দৈবাসুর সম্পদ্ বিভাগ যোগে নিরীশ্বরবাদী অহংকারে স্ফীত অসুরদের কথা আলোচনা করিয়াছেন। এই আসুর প্রকৃতির লোকেরা বলিয়া থাকে যে, এই জগতে সত্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সকলই অসত্য; জগতে ধর্মাধর্ম বলিয়া কিছু নাই এবং ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাপক ঈশ্বর বলিয়াও কোন বস্তু নাই। পৃথিবীর কোন সৃষ্টি-পরম্পরা নাই। জগতের সকল পদার্থই মনুষ্যের কামনা-বাসনা তৃপ্ত করিবার জন্য। ইহাদের অন্য কোন উপযোগ নাই। এই নিরীশ্বরবাদীগণ বিকৃতমতি, অল্পবুদ্ধি, ক্রূরকর্মা এই ব্যক্তিগণ অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা জগতের বিনাশের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া, দম্ভ, মান ও মদে মত্ত হইয়া মোহবশতঃ ইহারা শাস্ত্রবিরুদ্ধ মনগড়া অপসিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং অশুচি ব্রত অবলম্বন করতঃ তাহারা ক্ষুদ্র দেবতাদির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহারা মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপরিমিত বিষয়চিন্তা আশ্রয় করিয়া এবং বিষয়ভোগে মগ্ন হইয়া, ইহাই স্থির করে যে, কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ, এতদ্ব্যতীত জীবনের অন্য লক্ষ্য নাই। সুতরাং ইহারা শত শত আশাপাশে বদ্ধ ও কামক্রোধপরায়ণ হইয়া অসৎ উপায় অবলম্বনপূর্বক অর্থসংগ্রহে সচেষ্ট হয়। ইহারা মনে করে, অদ্য আমার এই লাভ হইল, পরে এই ইষ্টবস্তু পাইব; এই ধন আমার আছে, এই ধন আমার পরে হইবে। এই শত্রুকে আমি পরাজিত করিয়াছি, অন্যান্যকেও হত করিব; আমিই সকলের প্রভু, আমিই সকল ভোগের অধিকারী; আমি কৃতকৃত্য, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি ধনবান্, আমি কুলীন, আমার তুল্য-

পাশ্চাত্ত্য দেশ ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে শ্রেষ্ঠ মূল্য দেয়, সুতরাং সর্ব-কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণের আদর্শটি তাহারা ঠিক বুঝিতে পারে না

পাশ্চাত্ত্য দেশ স্বভাবতই জড়বাদে ও ব্যক্তির নিজ সামর্থ্যে বিশ্বাসী

গীতায় জড়বাদীদের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও তাহাদের নিন্দা

আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব, আমি দান করিব, আমি আমোদ করিব —এই প্রকার কল্পনায় বিক্ষিপ্তচিত্ত, মোহজালজড়িত, বিষয়ভোগে আসক্ত ব্যক্তিগণ অপবিত্র নরকে পতিত হয়। এই আত্মাভিমানী, ধনমানের গর্বে বিমূঢ়, অবিনয়ী, ধনমানের গর্বে বিমূঢ় সেই আসুর প্রকৃতির ব্যক্তিগণ দম্ভ প্রকাশ করিয়া অশাস্ত্রীয় যজ্ঞ আচরণ করে। সাধুগণের অসূয়াকারী সেই সকল ব্যক্তি অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্বদেহে ও পর-দেহে অবস্থিত আত্মরূপী পরমেশ্বরকে দ্বেষ করিয়া থাকে।[৪২] আধুনিক জড়বাদী, সুখলোলুপ, অহংকারে স্ফীত মানুষের ইহাই কি নিখুঁত চিত্র নয়? কিন্তু কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন প্রকার মোহই হইতেছে নরকের দ্বার—এই পথে শান্তি নাই, নাই, নাই। তাই গীতার উপদেশ, প্রবৃত্তির পথ হইতে কূর্মের মতো ইন্দ্রিয় ও মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া ঊর্ধ্বে সংসারের যে মূল পরব্রহ্ম তাহাকেই আশ্রয় করা।[৪৩] সেই ব্রাহ্মীস্থিতিই গীতার উপদিষ্ট আদর্শ—

এই পথে কখনও সুখ শান্তি আসিতে পারে না

নির্মাণ মোহা জিতসঙ্গ দোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখ সংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্য মূঢ়াঃ পদমব্যয়ংতৎ ॥

মান ও মোহবর্জিত, সমস্ত সংসার-আসক্তি জয়ী, আত্মতত্ত্বে নিষ্ঠাবান্, কামনা-বর্জিত, সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত, অবিদ্যাবিহীন বিবেকী পুরুষেরাই সেই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হন।[৪৪] কিন্তু এই আদর্শ বিশুদ্ধ ধ্যানের আদর্শ নয়, নিষ্কাম ভক্তি-পরায়ণ কর্মের আদর্শ।

গীতাব আদর্শ ব্রাহ্মীস্থিতি—ইহা জ্ঞান, কর্ম, ভক্তিব সমন্বয়েই সম্ভব

সুতরাং গীতাকে পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গী মতে হয়তো নীতিশাস্ত্র বলা চলিবে না, কিন্তু ইহা ভারতীয় আধ্যাত্মসাধনার সার-সংকলন। শ্রীঅরবিন্দ তাই বলিয়াছেন—"That which the Gita teaches is not a human but a divine action; not the performance of social duties but the abandonment of all

শ্রীঅরবিন্দ

৪২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ৮-২১

৪৩। ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিদ—শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ১৫।১
এই শ্লোকটির প্রথম অংশটি কঠোপনিদ ষষ্ঠ বল্লী ১ম শ্লোক হইতে গৃহীত।

৪৪। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—১৫।৫

other standards of duty or conduct for a self-less performance of divine will working through our nature.

"In other words, the Gita is not a book of practical ethics but of spiritual life."[৪৫]

'বিশ্বময় সর্বত্র সচ্চিদানন্দোপলব্ধি, সচ্চিদানন্দাবলম্বন ও সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠাই মানবজীবনের শেষ লক্ষ্য,—ইহাই গীতার শিক্ষা।

সংক্ষিপ্তসার

বেদ ভারতীয় চিন্তার মূল উৎস। ইহাতে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন মার্গেরই ইঙ্গিত আছে, কিন্তু এই বিভিন্নমুখী চিন্তা সেখানে সুবিন্যস্ত নয়।

প্রাচীন বৈদিক ঋষি জীবনকে মধুময়রূপে দেখিয়াছেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় চিন্তায় যে দুঃখবাদ কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়াছে, বেদে তাহার অভাব। দেবতারা ঋষিদের প্রত্যক্ষের বিষয় ছিলেন। যদিও বহু দেবতায় তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন—তথাপি সমস্ত দেবতার মূল উৎস এক বিশ্বশক্তি ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই এক বহু নামে অভিহিত। নাসদীয় সূক্তে এই ইঙ্গিতই সুস্পষ্ট যে সমস্ত সৃষ্টি ও সমস্ত দেবতারা সেই এক মূল শক্তিরই সৃষ্টি। বেদে এই প্রকার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অঙ্কুর থাকিলেও, কর্মকাণ্ডই অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে। জীবনের সুখ ভোগের জন্য দেবতাদিগকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নানা যজ্ঞ, পূজা ইত্যাদি বিচিত্র কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা।

উপনিষদের যুগে বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ দেখা যায়। যজ্ঞকর্মের ফল অস্থায়ী, ইহা দ্বারা জীবনের সব দুঃখের নিরসন হয় না। উপনিষদ ঘোষণা করিল, জ্ঞানের পথেই অবিদ্যা পাশ ছেদন হয়—এবং সে পথেই শুধু মুক্তি সম্ভব। উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডের কেন্দ্র অধিকার করিয়া আছে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা। পরা ও অপরা বিদ্যার প্রভেদ করিয়া বলা হইল, অপরা বিদ্যায় অস্থায়ী সাংসারিক সুখ ও আরামের পথ নির্দেশ, কিন্তু মুক্তি ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের পথ পরা বিদ্যাই শুধু দেখাইতে পারে। পরা বিদ্যার সেই সদ্‌বস্তুর স্বরূপ নির্দেশকালে তাঁহাকে নেতিবাচকভাবে নানা ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু অস্তিবাচক অসংশয় প্রত্যয়ও আছে। কেনোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, সমস্ত দেবতারা এক মূল ব্রহ্ম হইতেই শক্তি আহরণ করেন। কঠোপনিষদ বলিয়াছেন, এক অগ্নির যেমন নানারূপে প্রকাশ, তেমনি সর্বভূতের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম আপনাকে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

বেদ ও উপনিষদে মুক্তির বিভিন্ন পন্থার নির্দেশ থাকিলেও, সর্বত্রই এই কথা বলা হইয়াছে

৪৫। Aurobindo—Essays on the Gita

যে, বিশুদ্ধ নীতিনিষ্ঠ জীবন ভিন্ন, জীবনে সুখশান্তি ও পারমার্থিক কল্যাণ সম্ভব নয়। চিত্ত-শুদ্ধি সমস্ত জ্ঞান ও ধর্মের প্রথম সোপান। বর্ণাশ্রমধর্ম পালন, ও সংযম দ্বারা আত্মশুদ্ধি সমস্ত সাংসারিক কর্তব্যের ভিত্তি। বেদে ভক্তিমার্গের পথের ইঙ্গিত খুব সুস্পষ্ট নয়। উপনিষদ যুগেও জ্ঞানমার্গেরই প্রাধান্য।

শ্রীশঙ্করাচার্যের বেদান্ত মতে জ্ঞানই মুক্তির উপায়—কর্মত্যাগই উপদিষ্ট এবং এই পথে ভক্তির ও স্থান নাই। পরবর্তীকালে শ্রীরামানুজাচার্য, নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য জ্ঞানের শুষ্ক পথকে নিন্দা করিয়া, ভক্তির পথকে প্রাধান্য দিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর পর নানক, কবীর, মীরাবাঈ, দাদু সকলেই ভক্তিমার্গের নির্দেশ দিয়াছেন—এই আধুনিক এই পথের অকপট নির্দেশ পাই শ্রীরামকৃষ্ণে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তৎপূর্ববর্তী সমস্ত দার্শনিক চিন্তার সার সংগ্রহ। বেদের সার সংগ্রহ উপনিষদে; বেদ, উপনিষদ ও নানা দর্শন-পুরাণের সার সংগ্রহ গীতায়। গীতার স্থান হিন্দুর চিন্তায় এত সুপ্রতিষ্ঠিত যে গীতাকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করিয়া কোন ধর্মমত বা দার্শনিক মত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা চিন্তাও করিতে পারে না। আধুনিক ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র-চিন্তায়ও গীতার প্রভাব সামান্য নয়।

গীতার পটভূমিকা ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে দুই যুধ্যমান শিবিরের মধ্যবর্তী রথে আরূঢ় অর্জুনের বিষাদ। সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ক্লৈব্য ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে, যে প্রাণপ্রদ ও মোহধ্বান্তিনাশন উপদেশ দিয়াছেন—তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যুদ্ধ ও হিংসায় প্ররোচনা দান অথবা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালনে অর্জুনকে উৎসাহ দানই সংকীর্ণ দৃষ্টিতে ভগবানের উপদেশের উদ্দেশ্য মনে হইতে পারে। কিন্তু এ ধারণা নিতান্ত ভুল। গান্ধীজীর মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমিকা বাস্তবিকপক্ষে একটি রূপক। এই যুদ্ধ বাহিরের কোন সংগ্রাম নয়; প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে শুভ ও অশুভের চিরন্তন দ্বন্দ্ব।

শ্রীভগবান প্রথম জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা অর্জুনের মোহ দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। আত্মীয়স্বজন বিনাশের জন্য শোক মিথ্যা মোহ। দেহেরই মৃত্যু, আত্মার মৃত্যু নাই, জরা নাই, তাহাকে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করা যায় না—অগ্নি দ্বারা দাহ করা যায় না। তাই যুদ্ধে যাঁহারা আহত বা হত হইবেন, তাহাদের দেহই শুধু ধ্বংস হইবে—ভীষ্ম-দ্রোণের আত্মার তো বিলোপ ঘটিবে না। অর্জুনের তাহার চেয়েও মারাত্মক ভ্রম হইতেছে যে, তিনি ভাবিতেছেন—তিনিই কর্তা, তিনিই যুদ্ধ করিতেছেন, আঘাত করিতেছেন—সেই জন্যই তাঁহার নির্বেদ। বাস্তবিক পক্ষে ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, একমাত্র যন্ত্রী, আর সকলেই যন্ত্র ও ভৃত্য।

জীবনে অহংবুদ্ধি বিরহিত হইয়া কর্তব্য করিতে হইবে। গীতায় প্রথমে কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়—তৎপর জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়—সর্বশেষ তিনের অপূর্ব সমন্বয়। ফলাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রলুব্ধ কর্মের ফল অস্থায়ী—এই জাতীয় নির্বোধ কর্ম, নূতন আসক্তি ও বন্ধনই শুধু আনিয়া দেয়। গীতার উপদেশ, নিয়ত কর্ম করিতে হইবে—কিন্তু সেই কর্ম হইবে জ্ঞানদীপ্ত, মোহশূন্য। কর্ম করিবার সময় জানিতে হইবে, ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা—তাঁহাতেই সমস্ত কর্মফল সমর্পণ করিতে হইবে। এখানেই চাই ভক্তি। নিরভিমানী জ্ঞানী ভক্তই ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া নিয়ত কর্তব্য-কর্ম করিয়া যাইতে পারেন।

· যিনি জ্ঞানী, তিনি ত্রিগুণাতীত—যিনি ঈশ্বরে সমস্ত সমর্পণ করিয়াছেন—তিনি নির্ভয়, নিশ্চিন্ত, তাঁহার কর্মের কোন বন্ধন নাই। জ্ঞানী ভক্ত ও কর্মযোগী জানেন, কর্মেই ব্যক্তির অধিকার—কর্মফলে নয়।

গীতার উপদেশ, অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিতে হইবে, কর্মফলের আসক্তি যেন কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়, আবার কর্মত্যাগেও যেন প্রবৃত্তি না হয়। কর্তৃত্ববোধে কর্মই কর্মফল সঞ্চয় করে, কিন্তু যিনি নিষ্কাম হইয়া কর্ম করেন, তিনি কর্মবন্ধনে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-দুঃখে চক্রে আবর্তিত হন না। যে ব্যক্তিরা, সত্যজ্ঞান লাভ করিয়া নিষ্কাম হইয়াছেন, তাঁহারা নিয়ত কর্ম করিয়াও কর্মবন্ধনমুক্ত ; গীতায় এই ভাগ্যবান্ পুরুষদের স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হইয়াছে। কি তাঁহাদের লক্ষণ ? কি তাঁহাদের কর্ম ? যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি কামনা-বাসনা জয় করিয়া, আত্মসন্তুষ্ট। তিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না, আবার আনন্দেও উৎফুল্ল হন না। তিনি অনুরাগ, ভয় ও অসূয়াশূন্য। যিনি অনন্যভক্ত, যিনি ভগবানেই আত্মসমর্পিত, তাঁহার অহংবুদ্ধি লুপ্ত হইয়া যায়। তিনি ভগবানের সম্পূর্ণ নিরাপদ আশ্রয়ে অভীঃ। তিনি শরণাগতি লাভ করিয়া নিজেকে ভগবানের যন্ত্র ও ভৃত্য জ্ঞান করিয়া নিরলসভাবে, নিস্পৃহ হইয়া, সংসারের কর্তব্য করিয়া যান। তাই গীতায় দেখি জ্ঞান ও কর্ম, ভক্তিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। যিনি এমন করিয়া ভগবানে সমর্পিত দেহ-মন-বুদ্ধি, ভগবান প্রতিশ্রুতি দিতেছেন তিনি তাঁহাকেই লাভ করিবেন। গীতায় জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সম্পূর্ণ সুসমন্বয়। গীতার উপদেশ কর্মত্যাগ নয়, সন্ন্যাস নয়—নিষ্কাম, নিরলস কর্ম।

মিল্ ও বেন্থামের উপযোগবাদে নৈতিক কর্মের প্রেরণা বুদ্ধিমান স্বার্থচিন্তা—intelligent self-interest। অহংবুদ্ধি এখানে প্রবল। কান্টের কর্তব্যবাদ duty for duty's sake এর আদর্শের সঙ্গে গীতার উপদেশের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে, মনে হইতে পারে। কারণ কান্টও বলিয়াছেন, ফলাফল চিন্তা না করিয়াই কর্তব্যকর্ম করিতে হইবে। কিন্তু কান্টের উপদিষ্ট কর্মও স্বার্থবুদ্ধি সঞ্জাত। কারণ, কান্টের মতে, ভগবান্ সাধুকে পরকালে পুরস্কৃত করিবেন, ও দুষ্টকে দণ্ডদান করিবেন, এই গভীর প্রত্যয় সমস্ত নৈতিক কর্মের পশ্চাতে ক্রিয়া করে। বাস্তবিক পক্ষে, পাশ্চাত্ত্য দেশের মানুষেরা, কখনই 'অহং' বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য অহং-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী স্বভাবতঃই জড়বাদে আত্মপ্রকাশ করে। এই জড়বাদে অহং-বুদ্ধি অতিস্ফীত, ঈশ্বর অস্বীকৃত এবং সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্যই দৈহিক ভোগ। গীতা এই দুর্মতিসম্পন্ন মানুষদের অসুর বলিয়াই নিন্দা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের সমস্ত দার্শনিক চিন্তার আদর্শ, দুঃখের আত্যন্তিক অবসান—জন্ম-মৃত্যুর চক্র ছেদন। পাশ্চাত্ত্য দেশ অপরাবিদ্যার সাহায্যে জীবনকে ভোগের করায় কথাই চিন্তা করে। তাঁহাদের সুখের আকাঙ্ক্ষারও শেষ নাই, ফলাকাঙ্ক্ষী উদ্যমেরও শেষ নাই। কিন্তু গীতার উপদেশ, এই বাহ্য উপকরণ সংগ্রহ দ্বারা—'সুখ' আয়ত্ত হইবে না, দুঃখের মূলোচ্ছেদ হইবে না, জীবের কল্যাণ হইবে না। গীতায় বারে বারে এই কথা বলা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়গুলি তেজী ঘোড়ার মতই প্রবল—সংযমের শক্ত লাগামে না বাঁধিলে তাহারা নিরুদ্দিষ্ট বেগে ইতঃস্ততঃ ছুটিয়া সর্বনাশের পথেই নিয়া যাইবে। এই পথে শান্তি মিলিতে পারে না ; ইহা কল্যাণের পথ নয়। সমস্ত কামনা-বাসনা সংযত করিয়া অনন্যমনা হইয়া

ভগবানের সেবকরূপে সংসারের কর্তব্য, কুশল ভাবে অথচ নিরাসক্ত ভাবে সম্পাদনে রত থাকিলেই শুধু ইহলোকে শান্তি ও পরলোকে কল্যাণ মিলিতে পারে। বিশ্বময় সর্বত্র সচ্চিদানন্দোপলব্ধি, সচ্চিদানন্দাবলম্বন ও সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠাই মানব জীবনের শেষ লক্ষ্য। গীতাকে পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে হয়তো নীতিশাস্ত্র বলা চলিবে না, কারণ পাশ্চাত্ত্য সমস্ত নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি হইল, অহংবুদ্ধি—কিন্তু অহংবুদ্ধি ত্যাগই ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার শেষ ফল।

Questions

1. Elucidate Gita's ideal of Nishkama Karma. Is it a practicable ideal ?

2. What according to the Gita, are the characteristics of a 'Sthita-prajna'? How cau this stage be reached ?

3. Compare the ideal of the Utilitarians and of Kant with that of the Gita. Which, according to you, is the higher ideal and why ? Discuss.

অষ্টাদশ অধ্যায়

গান্ধীজীর আদর্শ—সত্য ও অহিংসা

[God is Truth—God is Love—Truth is God. The way to Truth is Ahimsa—Ahimsa not the ideal of a coward—application of the principle of Ahimsa to politics—Hinduism contains the highest ideal—Gita, the Mother—Gandhiji not a Communalist—discipline & self-control: basis of moral life—Selfless service of man is the service of God—My life is my message—A practicat idealist—Vivekananda & Gandhiji—an assessment.]

"আমি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে চাই। আমি **জানি ভগবানই সত্য। আমার কাছে ভগবানকে জানিবার একমাত্র পথ হইল—অহিংসা, প্রেম।**

"যে ভগবানকে আমি সেবা করি, তিনি সত্য। ইহা ভিন্ন আমার আর কোন উপাস্য নাই।

"সত্য ভিন্ন আর কিছুতেই আমার অনুরক্তি নাই,—এই সত্যের শাসন ভিন্ন আমি আর কাহারও শাসন স্বীকার করি না।

গান্ধীজীর কাছে ভগবানই সত্য—অহিংসা ও প্রেমই ভগবানকে জানিবার পথ

"আমি নিতান্ত নগণ্য হইতে পারি, কিন্তু আমার মধ্য দিয়া সত্য যখন আত্মপ্রকাশ করেন, তখন আমি দুর্জয়।

"আমি জানি আমি কিছুই করিতে পারি না। ভগবানই সব করিতে পারেন। হে ঈশ্বর, আমাকে তোমার যন্ত্র হইবার যোগ্য কর, তোমারি ইচ্ছাপূরণের দাস কর।"

"তুমি এবং আমি এখন এই ঘরে বসিয়া আছি, ইহা যতটা সত্য বলিয়া জানি, তাহার চেয়ে আরো অনেক সত্য করিয়া জানি যে, তিনি আছেন। ইহাও নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে, জল ও বাতাস ভিন্ন হয়তো আমি জীবিত থাকিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে ছাড়া আমি একমুহূর্তও বাঁচিতে পারি না। আমার চক্ষু যদি উৎপাটন কর, তথাপি হয়তো আমার মৃত্যু ঘটিবে না; আমার নাসিকা যদি কর্তন কর তথাপি হয়তো আমার প্রাণত্যাগ হইবে না। কিন্তু যদি আমার ভগবানে বিশ্বাস চূর্ণ কর, তাহা হইলে নিশ্চিতই আমার মৃত্যু ঘটিবে।"

এমন পরিপূর্ণ বিনয় ও অসংশয় প্রত্যয়ের সঙ্গে যিনি কথা বলেন—তাঁহাকে অস্বীকার করা সহজ নয়। তাঁহাকে মানুষ পাগল বলিতে পারে, সাংসারিক বুদ্ধিশূন্য বলিয়া উপহাস করিতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

গান্ধীজীর বিপুল প্রভাবের মূল—অবিচল সত্যনিষ্ঠা ও বিশুদ্ধ জীবন

মহাত্মা গান্ধীজীর বিপুল প্রভাবের মূল তাঁহার বিশুদ্ধ জীবন, সত্যনিষ্ঠা, ঈশ্বরে অবিচল বিশ্বাস। এই ঈশ্বরবিশ্বাসই তাঁহাকে নির্ভীক অসমসাহসী করিয়াছে. ইহাই তাঁহাকে সমস্ত আঘাত, প্রতিকূলতা, নিন্দা, নির্যাতন সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছে, কাপুরুষ, দুর্বলচিত্ত, এমন কি চরিত্রহীনকে ক্ষমা করিবার মহত্ত্ব দিয়াছে—অসম্ভবের সাধনায় রত হইবার ধৈর্য ও ঐকান্তিকতা দিয়াছে।

ভগবানই প্রেম, তিনিই সমস্ত নীতি ও সদাচারের মূল, তিনিই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়

"আমার কাছে ভগবানই সত্য, তিনিই প্রেম; ঈশ্বরই সমস্ত নীতি, সমস্ত সদাচরণের মূল; তিনিই নির্ভয়তা। তিনিই সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত জীবনের উৎস—অথচ তিনি ইহাদের সকলকেই অতিক্রম করিয়া সকলের উর্দ্ধে বিদ্যমান্। ভগবানই মানুষের বিবেক। তিনিই নিরীশ্বরবাদীর ঈশ্বরে অবিশ্বাস। তাঁহার এতই অপার করুণা যে, তিনি নিরীশ্বরবাদীকেও ধ্বংস করেন না। তিনি মানুষের হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তিনি বাক্য ও যুক্তিকে অতিক্রম করেন। আমাদের বাক্যই যে আমাদের অন্তরের বাণী নয়, তাহা তিনি জানেন। তিনি জানেন যে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আমরা এমন কথা বলি, যাহা আমাদের সত্যই অভিপ্রায় নয়। যাঁহারা তাঁহার ব্যক্তিগত উপস্থিতি অন্তরের সঙ্গে কামনা করেন, তাঁহাদের কাছে ঘরের ঠাকুর হিসাবেই তিনি ধরা দেন—যাহারা তাঁহার স্পর্শ কামনা করেন, তিনি তাঁহাদের কাছে সাকার রূপেই ধরা দেন। তিনি সমগ্র বস্তুর সার বস্তু। যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের কাছে তিনিই একমাত্র সদ্‌বস্তু। যে তাঁহাকে যে ভাবে ভজনা করে তিনি তাহার কাছে সে ভাবেই প্রকাশিত হন।"

ভগবানই সত্য এবং সত্যই ভগবান

গান্ধীজীর কাছে ভগবান প্রেম ইহা অবশ্যই সত্য, কিন্তু তাহার চেয়েও যাহা গভীর ও মৌলিক, তাহা হইতেছে এই কথা যে, ভগবানই সত্য। শুধু তাহাই নয়, "পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল পূর্ব হইতে সত্যের সন্ধানে নিরন্তর রত থাকিয়া, আজ আর একপদ অগ্রসর হইয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি

যে, সত্যই ভগবান। কিন্তু ইহাও আমি আবিষ্কার করিয়াছি যে প্রেমের মধ্য দিয়াই সত্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী হওয়া সম্ভবপর। অবশ্য ইহাও আমি দেখিয়াছি যে, প্রেম কথাটির, ইংরাজী ভাষায় অন্ততঃ, বহু অর্থ হইতে পারে এবং ইহাও আমি দেখিয়াছি যে, মানুষের দৈহিক যে প্রবৃত্তিকে প্রেম বলা হয়, তাহা মানুষের অধঃপতনেরই কারণ হইতে পারে। ইহাও আমি দেখিয়াছি যে, অহিংসা অর্থে প্রেমের মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র পূজারী আছে। কিন্তু 'সত্য' কথাটির দ্ব্যর্থ কখনও আমি দেখি নাই, এবং যাঁহারা নিরীশ্বরবাদী, তাঁহারাও সত্যের প্রয়োজন স্বীকার করেন।

"আমি সেই সত্যরূপ ভগবানকেই মানুষেব সেবার মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

মানুষের সেবাই ভগবানকে প্রত্যক্ষ কবিবাব উপায়

"ভগবান এবং তাঁহার বিধান অভিন্ন। তিনিই বিধান। তাঁহাতে যে গুণই আমরা আরোপ করি না কেন, তাহা কেবলমাত্র বিশেষণ নয়। তিনিই যে বিশেষণ। তিনি সত্য, তিনি প্রেম, তিনিই বিধি-বিধান এবং মানুষের বুদ্ধি আর যত লক্ষ লক্ষ বিশেষণ কল্পনা করিতে পারে, তাহা সবই তিনি।

তিনি পরিপূর্ণ, কিন্তু তাঁহাব ক্ষমা ও করুণাব অন্ত নাই

"তিনি পরিপূর্ণ, অথচ তাঁহার মতো গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আর কে আছে? আমরা এত যে অন্যায়, এত যে বঞ্চনা, এত যে শঠতা আচরণ করি, তাহা তো সকলই তিনি সহ্য করেন। এমন কি আমাদের মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অধম জীব তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করি, তিনি এবং তাহাও সহ্য করেন—যদিও আমাদের দেহের প্রতি অণুপরমাণুতে তিনি বিরাজিত, আমাদের তিনি সম্পূর্ণ ব্যাপিয়া আছেন—আমাদেব অন্তরের প্রতিটি রন্ধ্র তিনি পূর্ণ করিয়া আছেন। এবং যাঁহাকে তিনি ইচ্ছা করেন, তাঁহারই কাছে নিজেকে তিনি প্রকাশ করেন।

তিনি নবঘাতকেব অস্ত্র চালনা কবেন আবার শল্য চিকিৎসকের ছুবিকাকেও নিয়ন্ত্রণ করেন

"অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভগবানই তো শুভ ও অশুভ, ন্যায় ও অন্যায় সকলেরই মূল। তিনি যেমন নরঘাতকের অস্ত্রকে চালনা করেন, তেমন শল্যচিকিৎসকের ছুরিকাকেও নিয়ন্ত্রণ করেন। তাহা হইলেও মানবিক দৃষ্টিতে ন্যায় ও অন্যায় পরস্পর হইতে পৃথক এবং পরস্পরের বিরোধী; শুভ ও ন্যায় হইল আলোকের প্রতীক, ভগবানের প্রতীক আর অন্যায় হইল অন্ধকার ও শয়তানের প্রতীক।"

গান্ধীজীর চক্ষে সত্যই ভগবান্। কায়মনোবাক্যে সত্যের অনুসরণেই মানুষের সম্পূর্ণ আত্মবিকাশ। এই পথের প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে, অহিংসা। অহিংসা অর্থ, শুধুমাত্র অন্য জীবহত্যা হইতে বিরত থাকা নয়। কোন জীবের কোন প্রকার অনিষ্ট চিন্তা, ঈর্ষা, দ্বেষ, সবই হিংসা। এই সমস্তই পরিহার করিতে হইবে। কিন্তু ইহা একটি নেতিবাচক আদর্শ নয়। "ইহা কোন রূপেই নিষ্ক্রিয়তা বা অলসতার আদর্শ নয়।" ভগবানই একমাত্র কর্তা এবং প্রতিটি জীবেই ভগবানেরই স্থিতি। এ কথা স্মরণ করিয়া, অনুসূয়াপরায়ণ হইয়া, পৃথিবীতে কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে হইবে। কর্মক্ষেত্রে বহু বিরোধের সম্মুখীন হইতে হইবে, বহু বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু যিনি সত্যের সেবক, তিনি একদিকে যেমন নির্ভয়, তেমনি তিনি সকলের প্রতি বিদ্বেষশূন্য। অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, প্রবল বিপক্ষের সম্বন্ধে যেমন ভয় জয় করিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে, তেমনি অন্তরকে অসূয়াশূন্য রাখিতে হইবে। "অহিংসার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা ইহাই যে তীব্র সংগ্রামের সময়ও অন্তরে কোন ক্রোধ, ঘৃণা বা বিদ্বেষের লেশমাত্র চিহ্ন থাকিবে না এবং সংগ্রামের অবসানে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়।"

সত্যের পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ অহিংসা

যিনি সত্যের সেবক তিনি নির্ভয় এবং তিনি বিদ্বেষশূন্য

রাজনীতিক্ষেত্রে এই সংগ্রামকেই তিনি বলিয়াছেন সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহী সত্যের জন্যই আজীবন সংগ্রাম করিবেন। এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত করিবেন, সমস্ত দৈহিক আঘাত, মানসিক নির্যাতন অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিবেন, কিন্তু কোন অবস্থায়ই ধৈর্য হারাইবেন না। ক্রোধের বশবর্তী হইয়া অন্যকে আঘাত করিবেন না। "আমি ইচ্ছাপূর্বক কোন জীবকে আঘাত করিতে পারি না—যদিও কোন মানুষ আমার বা আমার আত্মজনের গুরুতর ক্ষতিও করে, তবুও কোন মানুষকে আঘাত করিতে পারি না।" মানুষ সংগ্রাম করিবে, অসত্যের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কিন্তু মিথ্যাবাদী বা অত্যাচারী মানুষের বিরুদ্ধে নয়। "যাহার ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস নাই, সে কখনও সম্পূর্ণভাবে অহিংসা মন্ত্রকে গ্রহণ করিতে পারে না। ঈশ্বরের শক্তি ও কৃপা ব্যতীত অহিংসাবাদী কিছুই করিতে পারে না। ঈশ্বরের শক্তি ও কৃপা ব্যতীত অন্তরে কোন ক্রোধ, কোন ভয়, কোন প্রতিহিংসার ইচ্ছা দূরে রাখিয়া

রাজনীতি ক্ষেত্রে এই ঈশ্বরানুসরণই সত্যাগ্রহ

অন্তরে ক্রোধ ভয় ও প্রতিহিংসার ইচ্ছা দূরে রাখিয়া, প্রয়োজন হইলে মৃত্যুবরণ

মৃত্যুবরণের সাহস আসিতে পারে না। এই সাহস তখনই আসিতে পারে, যখন এই বিশ্বাস অন্তরে থাকে যে, ভগবান সকলের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত আছেন, এবং তাঁহার নিকটসান্নিধ্যে কাহাকেও বা কিছুকেই ভয় করিবার নাই। এবং তিনি সর্বজীবে বিদ্যমান্ এই বিশ্বাস হইতেই, যাহাকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করি, তাহাদেব জীবন সম্পর্কেও শ্রদ্ধা আপনিই উপস্থিত হয়।"

কেহ কেহ বলিয়াছেন, অহিংসা তো ক্লীবের ধর্ম। যে আমার ক্ষতি করিবে, যে আমায় দেশের অহিত করিবে, যে আমার দেশবাসীকে শোষণ কবিবে, তাহাকে সহস্রগুণ আঘাত ফিরাইয়া দিব, তাহাকে সবংশে নিধন করিব—ইহাই তো ক্ষাত্রধর্ম। পড়িয়া পড়িয়া যে মার খায়, সে তো নিবীর্য কাপুরুষ। চোখের সামনে শিশু উৎপীড়িত হইবে, নারীর অমর্যাদা হইবে, দুর্বল উৎপীড়িত হইবে—ইহা যে দাঁড়াইয়া দেখে, সে তো মনুষ্যনামের অযোগ্য। গান্ধীজীকে এই অপবাদ বহুবার শুনিতে হইয়াছে। উত্তবে সত্যাশ্রয়ী গান্ধীজীর উত্তর তাঁহারই উপযুক্ত—"সমস্ত জাতি নিবীর্য কাপুরুযে পবিণত হইবে—তাহাব চেয়ে সহস্রবার আমি হিংসার পথ অবলম্বন কবিতে বলিব। আমি নিশ্চিতই বিশ্বাস করি, যদি কাপুরুষতা এবং হিংসা এই দুই পথেব মধ্যেই আমাকে বাছিয়া নিতে হয়, তবে অবশ্যই আমি হিংসার পথ অবলম্বনের উপদেশই দিব।...ভারতবর্ষ নিজ অসম্মান অসহায় ভাবে, নিষ্ক্রিয় থাকিয়া কাপুরুষেব মতো প্রত্যক্ষ করিবে, তাহার চেয়ে বরং হিংসাব পথে অস্ত্রের সাহায্যে নিজ সম্মান রক্ষা করিবে, ইহা অবশ্যই আমি উপদেশ দিব। কিন্তু ইহাও আমি বিশ্বাস করি যে, হিংসার শক্তি অপেক্ষা অহিংসাব শক্তি বহুগুণ প্রবল।" "আমি এ কথা বলিনা যে দস্যু, তস্করের সঙ্গে ব্যবহারে, অথবা যে সব জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে, তাহাদের সহিত ব্যবহারে হিংসা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু অধিকতর সফলতার সহিত তাহাদের হিংসা দ্বারা বাধা দিতে হইলেও, আমাদের পূর্বে আত্মসংযম শিক্ষা করিতে হইবে। কথায় কথায় পিস্তল তুলিয়া গুলি করিতে যাওয়া শক্তি ও পৌরুষেব লক্ষণ নহে,—দুর্বলতারই চিহ্ন। পরস্পর ঘুষাঘুষি করিয়া হিংসার সফল ব্যবহার শিক্ষা লাভ করা যায় না। ইহাতে দুর্বলতাই শিক্ষা হয়। আমি যে অহিংস উপায়ের কথা বলিতেছি তাহার ফল শক্তিক্ষয় নয়।—বরঞ্চ জাতি

অহিংসা, কাপুরুষতা নয়

কাপুরুষেব মতো অন্যায়কে সহ্য কবাব চেয়ে হিংসাব পথে আত্মসম্মান বক্ষা শ্রেয়ঃ

কিন্তু হিংসা দ্বারা সফল ভাবে শত্রুব সঙ্গে সংগ্রাম কবিতে হইলেও আত্মসংযম প্রয়োজন

যদি হিংসার পথেও শত্রুকে বিপদের কালে বাধা দিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলেও এই পথেই সুশৃঙ্খল উপায়ে তাহা শিক্ষা করা সম্ভব।"

"আমার অহিংসার অর্থ প্রিয়জনকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া বিপদের মুখ হইতে পলায়ন নয়। হিংসা, এবং কাপুরুষের মতো পলায়ন, এই দুই পথের মধ্যে হিংসার পথই আমি বাছিয়া লইতে বলিব। কাপুরুষকে অহিংসা শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব—যেমন অন্ধ মানুষকে সুস্থ চক্ষুষ্মানের মত প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করিতে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। অহিংসা শ্রেষ্ঠ বীরত্ব। বহু বৎসর যাবৎ আমি যখন ভীরু ছিলাম, তখন আমি হিংসার কথা চিন্তা করিতাম। কিন্তু যখন হইতে এই ভীরুতা ত্যাগ করিতে শিখিলাম। তখন হইতেই অহিংসার প্রকৃত মূল্য আমি বুঝিতে শিখিলাম।"

অহিংসা অর্থ প্রিয়জনকে বিপদের মুখে ফেলিয়া পলায়ন নয়

গান্ধীজী কোন নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, এমন দাবি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের পথই নিজের জীবনে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনাদর্শ গীতার কর্মযোগ হইতে অভিন্ন। তিনি বলিয়াছেন, "গীতা অম্বা—তিনিই আমায় মাতা—তিনিই সুখে, দুঃখে, সংকটে, বিপদে আমায় পথ দেখাইয়াছেন। দীর্ঘকাল গীতার অনুশাসন জীবনে প্রত্যহ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এমন কোন অবস্থা কখনো আসে নাই, যেখানে গীতার নিকট হইতে নির্ভুল পথনির্দেশ লাভ করি নাই। আমি ইহা বিশ্বাস করি না যে, গীতা ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম করিবার উদ্দেশ্যে হিংসার প্ররোচনা দেয়। প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরে (শুভ ও অশুভের) যে সংগ্রাম, গীতা বিশেষ ভাবে, সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী। সেখানে ভগবান্ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া মৃত্যুভয় জয় করিয়া কর্তব্যপালনের উপদেশই দিয়াছেন। ফলাফল চিন্তা না করিয়া কর্তব্য পালনের উপদেশই গীতাতে দেওয়া হইয়াছে।"

তিনি কোন নূতন পথনির্দেশের দাবি করেন নাই, তাঁহার জীবনাদর্শ গীতার কর্মযোগ হইতে অভিন্ন

এমন কোন সংশয় নাই, যাহা গীতা পাঠে নিরসন হয় নাই

অবশ্যই গান্ধীজী গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী নন। সমস্ত ধর্মই তাঁহার কাছে সমান সম্মান ও শ্রদ্ধার বস্তু, তথাপি হিন্দুধর্মের মধ্যেই তিনি সমস্ত ধর্মের সার এবং সমস্ত নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠ নির্দেশ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। "আমি হিন্দুধর্মকে যেমন করিয়া জানিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, হিন্দুধর্ম আমার অন্তরের সমস্ত পিপাসা মিটাইয়াছে। আমার সমস্ত সত্তা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং উপনিষদ যেমন করিয়া পূর্ণ করিয়া আছে—এই গীতা ও উপনিষদ হইতে আমি যে গভীর শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করি, তাহা বাইবেলের 'সার্মন অন্ দি মাউন্টে'ও যেন পাই না। এমন নয় যে, সার্মন অন্ দি মাউন্টের উচ্চ আদর্শকে আমি মূল্যবান্ মনে করি না, এবং এই আদর্শ ও উপদেশ আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে নাই—কিন্তু এ কথা আমি স্বীকার করিব, যখন সংশয় আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, যখন নিরাশার মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি, যখন দিগন্তে একটি আলোর রেখাও দেখিতে পাই নাই, তখন আমি ভগবদ্গীতার কাছে আশ্রয়ের জন্য, আলোর জন্য, সান্ত্বনার জন্য গিয়াছি এবং সর্বদাই এমন একটি শ্লোক পাইয়াছি, যাহা আমার সংশয় দূর করিয়াছে, আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, এবং নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, নিরাশা ও দুঃখের মধ্যেও, আমার মুখে হাসি ফুটাইয়াছে। বাহিরের দিক হইতে দেখিলে আমার জীবনে বহু শোক, তাপ, বেদনার আঘাত আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা যদি আমার উপরে কোন দৃশ্য বা দুরপনেয় দাগ না রাখিয়া থাকে, তবে আমি তাহার জন্য ভগবদ্গীতার শিক্ষার নিকট ঋণী।" আজ গীতা আমার কাছে গীতা ও বাইবেল শুধু নয়,—ইহা তাহার চেয়েও অনেক বেশী,—গীতা আমার মাতা। আমার পার্থিব মাতা যিনি আমাকে জন্ম দিয়াছেন, তাঁহাকে আমি বহুদিন হইল হারাইয়াছি। কিন্তু এই চিরন্তনী মাতা আমার পার্থিব মাতার অভাব সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করিয়াছেন এবং তাঁহার অবর্তমানে তিনি সর্বদাই আমার পাশে পাশে আছেন। তাঁহার কোন পরিবর্তন হয় নাই এবং তিনি কখনও আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই। যখনই বিপদ বা দুঃখ আসিয়াছে, আমি তাঁহার বুকে আশ্রয় লাভ করিয়াছি।"

গান্ধীজীর কাছে হিন্দুধর্মেই সমস্ত ধর্মের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা নিহিত ; গীতার মধ্যেই তিনি গভীর শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন

গীতা তাঁহার কাছে কোরাণ, বাইবেল, জেন্দ আভেস্তাই শুধু নয়, গীতা তাঁহার চক্ষে অম্বা—আশ্রয় দাত্রী মা, অথচ তিনি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক

এই গভীর ভগবৎনির্ভরতা এবং আত্মস্বার্থ বিস্মৃত হইয়া কর্তব্যপালন ও সর্বমানবের একতায় বিশ্বাস সমস্ত ভারতীয় চিন্তার বিশেষতঃ আধুনিক কালের ভারতীয় মনীষীদের (বিবেকানন্দ ও গান্ধীজি) চিন্তায় সুস্পষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো গান্ধীজীও বিশ্বাস করিয়াছেন যে সমস্ত ধর্মেরই মূল এক,—সমস্ত ধর্মেরই উদ্দেশ্য মানুষের জীবনকে মহৎ ও পবিত্র লক্ষ্যে উন্নীত করা,—মহৎ জীবন যাপনে আগ্রহ সৃষ্টি করা।

বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের চিন্তার সঙ্গে তাঁহার মিল

মহাত্মা গান্ধী তাই বলিয়াছেন, "আমি ইহা বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের তুলনা দ্বারা মূল্য নিরূপণ অসম্ভব। শুধু তাহাই নহে, এই প্রকার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন, এমন কি, হানিকর। আমার বিচারে প্রত্যেক ধর্মের পিছনে একই উদ্দেশ্য ক্রিয়া করিতেছে,—তাহা হইল, মানুষের জীবনকে উন্নততর আদর্শের দিকে আকর্ষণ করা, উৎকেন্দ্র জীবনকে এক শুভ উদ্দেশ্যের দিকে চালনা করা।"

প্রত্যেক ধর্মই সত্য—সকলেরই উদ্দেশ্য মানুষকে উন্নততর জীবনের পথনির্দেশ

সমস্ত ভারতীয় মনীষীই বিশ্বাস করেন যে, আত্মসংযম ব্যতীত ধর্মজীবন ও নৈতিক আচরণ অসম্ভব। ইহা নিশ্চিত করিয়াই বলা চলে, ভারতীয় দর্শনের একটি মূল সুর—ত্যাগবাদ। প্রাচীন বেদে ভিন্ন অন্য কোথায়ও ভোগের জয় গান নাই। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী তো কান্টের মতো কৃচ্ছ্রতার আদর্শই প্রচার করিয়াছেন—

ধর্মজীবন ভোগের পথে নয়, ত্যাগের পথে

মা কুরু ধনজন যৌবনগর্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মাপদং প্রবিশন্তি বিদিত্বা॥
কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবং কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়া স্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ॥
নলিনীদলগতজলমতি তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধ্যাভিমানগ্রস্তং লোকং শোকহতক সমস্তম॥

কাজেই কে বা তোমার কান্তা, কে বা তোমার পুত্র? সংসার অতি বিচিত্র স্থান সুতরাং লোভ, মোহ ত্যাগ কর—আকাঙ্ক্ষা করিও না, আসক্ত হইও না।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বা গান্ধীজী সংসার হইতে পলায়নের উপদেশ দেন নাই, কর্মত্যাগের উপদেশ দেন নাই। গান্ধীজী বলিয়াছেন, "আমাকে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বলা ভুল হইবে। যে আদর্শগুলি আমার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি সর্ব মানবের গ্রহণের জন্যই আহ্বান জানাই। আমি নিজেকে কখনও সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিই না। কারণ, সন্ন্যাসী আরো অনেক কঠোর উপাদানে গঠিত। মানুষের সেবায় রত সামান্য একজন গৃহস্থ বলিয়াই নিজেকে মনে করি।"

কিন্তু জীবনের আদর্শ সংসার হইতে পলায়ন নয়

ঈশোপনিষৎ-এর শ্লোক বলে, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধ কস্যস্বিদ্ধনম্"

—ঈশ্বরের প্রসাদ হিসাবে ভোগ্যবস্তু ভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না। জীবন যাপন করিতে হইলে, সমস্ত ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু জীবনে শক্তিলাভ করিবার একমাত্র উপায় অভাব কমানো, আকাঙ্ক্ষা কমানো।

অভাব কমানোই শান্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়; যাহা লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ ভোগ করিবার সুযোগ পায় না, তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ

গান্ধীজীও ইহারই অনুসরণে বলিলেন, "শ্রেষ্ঠ নিয়ম হইতেছে—যাহা লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ ভোগ করিতে পারে না, দৃঢ়ভাবে তাহা ভোগ করিতে অস্বীকার করা। এই অস্বীকৃতির ক্ষমতা হঠাৎ একদিনে আসিবে না। প্রথম কাজ হইল, সর্বসাধারণের যাহা ভোগ করিবার সামর্থ্য নাই তাহা ভোগ করিব না, এই মনোভাব সৃষ্টি করা এবং তাহার পর চেষ্টা দ্বারা জীবনকে এমন ভাবে পুনর্গঠন করা যাহাতে তেমন ভোগের দ্রব্য ত্যাগ করিয়াও চলিতে পারি।" "আমাদের সভ্যতা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের স্বরাজ, অভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া, আত্মতোষণ দ্বারা আসিবে না,—তাহার জন্য প্রয়োজন আত্মসংযম ও অভাববোধ নিবৃত্তি।"

সমস্ত ভারতীয় চিন্তায় নৈতিক জীবনের ভিত্তি হিসাবে সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ এই চারিটি সংযম অবশ্য স্বীকৃত। স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী দুই জনেই ইহার উপর জোর দিয়াছেন। গান্ধীজী ইহারই পরিপূরক

সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ নৈতিক জীবনের ভিত্তি—ইহাই ভারতীয় আদর্শ

হিসাবে জিহ্বাসংযম ও বাকসংযমকে নৈতিক জীবনের প্রথম পদক্ষেপ বলিয়াছেন। "যে ব্যক্তি পাশবপ্রবৃত্তি সমূহ সংযত করিতে চান, তিনি যদি জিহ্বাসংযম করিতে পারেন, তবেই তাহার কাজ সহজ হইবে। আমি আশঙ্কা করি (আশ্রম জীবন যাপনে যাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ) এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাই সবাপেক্ষা কঠিন কাজ।" তাঁহার মতে, সাত্ত্বিক নিরামিষ সংযত

বাস্তব পদক্ষেপ হিসাবে গান্ধীজী যোগ করিলেন—জিহ্বা সংযম, বাক্ সংযম

আহার ভিন্ন, চিত্তসংযম সম্ভব নয়। আমরা ক্রমাগত জিহ্বার তোষণের জন্য, অতিরিক্ত তৈলাক্ত, মশলাযুক্ত, উত্তেজক, ঝাল, টক, মিষ্টদ্রব্য গ্রহণ করি এবং ভগবান এই দেহের শুচিতা রক্ষার যে দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন,—স্বভাববিরুদ্ধ খাদ্যের প্রতি লোভবশতঃ আমরা সে দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া, নানা ব্যাধিগ্রস্ত হই এবং কুপ্রবৃত্তির দাস হই।

সৎজীবন যাপন করিতে হইলে সংযম ও সদাচার অবশ্য পালনীয়। ইহার

জন্য কোন সহজ' পথ নাই। এ সংযম ও সদাচার কষ্টসাধ্য। গান্ধীজী নিজের জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিয়া অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে, বহুবার তাঁহার পদস্খলন হইয়াছে—তথাপি তিনি যাহা সত্যের পথ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, সেই পথ কখনও ত্যাগ করেন নাই।

সংযম ও সদাচার কঠিন সাধনা ও পুনঃ পুনঃ অনুশীলন সাপেক্ষ

গান্ধীজীর নৈতিক উপদেশের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কেবলই উপদেশ দেন নাই। যাহা নিজের জীবনে তিনি আচরণ করিয়াছেন, যাহা বারে বারে ঠেকিয়া তিনি শিখিয়াছেন, তাহাই তিনি শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি নিজের স্খলনপতনের কথা গোপন করেন নাই এবং এমন কোন উপদেশ দেন নাই, যাহা তিনি হাতেকলমে পরীক্ষা করিয়া ফল পান নাই। সেইজন্যই তিনি এমন সরল ভাবে এবং সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলিতে পারিয়াছেন, "আমার জীবনই আমার বাণী।"

গান্ধীজী এমন কোন উপদেশ দেন নাই, যাহা নিজে জীবনে আচরণ করেন নাই—"আমার জীবনই আমার বাণী"

"আমি (সত্যের) পথ জানি। সেই পথ সংকীর্ণ ও কণ্টকপূর্ণ। ইহা তরবারীর তীক্ষ্ণ ধারের মতো বিপজ্জনক। (তবুও) সেই পথে চলিতে আমি ভালবাসি। যখন আমার স্খলন হয় তখন আমি অশ্রুবিসর্জন করি। ভগবানের বাণী, 'যে চেষ্টা করে, তাহার বিনাশ নাই।' এই প্রতিশ্রুতিতে আমার অবিচল বিশ্বাস আছে। সুতরাং, যদিও নিজ দুর্বলতার জন্য, সহস্রবার আমার পতন ঘটিয়াছে, তথাপি আমি বিশ্বাস হারাইব না এবং আশা করিব, যখন এই দেহের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইবে, সেদিন সেই জ্যোতির্ময় সত্যের সাক্ষাৎ মিলিবে। আমি বিশ্বাস করি সেই সুদিন আসিবেই আসিবে।"

স্খলন পতন সত্ত্বেও অবিচলিত বিশ্বাসে সত্যের পথ অনুসরণ করিতে হইবে

আমরা যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারা প্রশ্ন করিতে পারি---এই পথ যে সত্য তাহার প্রমাণ কি? সমস্ত মহাপুরুষের মতো গান্ধীজীও বলেন, "ইহা আমি জানিয়াছি। ইহার যদি প্রমাণ চাও, তাহা আমি দিতে পারিব না, কিন্তু নিশ্বাসবায়ুর মত এই বিশ্বাস আমার প্রাণ। এই প্রত্যয় ব্যতীত আমার জীবনের কোন মূল্য নাই।" "এমন অনেক বিষয় আছে যেখানে যুক্তিবুদ্ধি আমাদের বহুদূরে নিয়া যাইতে পারে না এবং সে সব ক্ষেত্রে আমাদের

বিশ্বাস করিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। বিশ্বাস যুক্তিবিরোধী নয়—ইহা যুক্তিকে অতিক্রম করিয়া যায়। বিশ্বাস ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মতো। যেখানে বিচার অক্ষম, বিশ্বাস সে ক্ষেত্রে আমাদের পথ দেখায়।" "কিন্তু ইহা আমার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, যাহা বিশুদ্ধ যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব, সেখানে শাস্ত্রবিশ্বাসের দাবি অচল। কিন্তু ইহা আমি জানি যে জীবনের সর্বপ্রধান প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র যুক্তিদ্বারা কখনও হইতে পারে না। তাই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে, তাঁহাব মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস করিতে আমি কোন লজ্জা বোধ কবি না।" "এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও আমি বাঁচিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার, আমি কল্পনাও করিতে পারি না।"

বিশ্বাসই যুক্তির ভিত্তি—ইহা অন্ধ নয়

ব্রহ্মাণ্ডেব অস্তিত্ব অস্বীকাব করিলেও ঈশ্বরেব অস্তিত্বে অবিশ্বাস গান্ধীজী কল্পনা কবিতেও পাবেন না।

সুতরাং এই প্রকার মহাপুরুষদের পথ সত্য কি মিথ্যা, তাহার বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবার প্রয়াস করিয়াই কেবলমাত্র আমরা প্রমাণ করিতে পারি, তাঁহাদের পথ সত্য কি মিথ্যা।

গান্ধীজীব পথ সত্য কি মিথ্যা—সেই পথে চলিবাব আন্তবিক প্রয়াস দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইতে পাবে

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের ভাষায় আমরা গান্ধীজীকে কি ভাবে শ্রেণীভুক্ত করিব ?

তিনি ভগবানের বিধিকেই নৈতিক ও ধর্মজীবনের আদর্শ করিয়াছেন—কাজেই তিনি পেইলীর মতো বিধিবাদীদের সমগোত্রীয় (those who accept law as standard)।

তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানুষের নৈতিক আদর্শ শিক্ষা বা অভিজ্ঞতালব্ধ নয়—ইহা মানুষের অন্তরে বিবেকের বাণী—ইহা ঈশ্বরেরই আদেশ। কাজেই তিনি বাট্লারের মতো নৈতিক বোধবাদে (moral sense theory) বিশ্বাসী।

গান্ধীজীকে Intuitionist ও Moral sense মতবাদ বিশ্বাসী,

আবার তিনি কান্টের মতো যুক্তিবাদী (Rationalist) এবং কৃচ্ছ্রতাবাদী (Rigourist)। তিনি বিশ্বাস করেন, নৈতিক কর্ম সর্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য দাবি করে, এবং নৈতিক আদর্শ যুক্তিসম্মত। কিন্তু ইহাও তিনি মনে করেন যে, নৈতিক আদর্শে বিশ্বাস যুক্তিবিচার অপেক্ষাও উচ্চতর ভিত্তির উপর স্থাপিত। তিনিও কান্টের মতো মনে করেন যে, কোন স্বার্থের আকাঙ্ক্ষায়

কৃচ্ছ্র তাবাদী

নয়, সত্য ও ন্যায় বলিয়াই কর্তব্য পালন করিতে হইবে। কিন্তু কান্টের মতে, ব্যক্তিই কর্তা—তাহার স্বাধীন ইচ্ছাই নৈতিক জীবনের প্রেরণার মূল। কিন্তু গান্ধীজী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসরণ করিয়া, ভগবানকেই একমাত্র কর্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং কর্মফল ভগবানে সমর্পণের উপদেশ দেন। বিবেকানন্দ ও গান্ধী দুজনেই কর্মযোগী। কিন্তু গান্ধীজীর কর্মবাদের মূল কথা হইল,—সত্য ও অহিংসা। গীতায় সর্বত্র অহিংসার আদর্শ সমর্থিত হইয়াছে কিনা, এ বিষয়ে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলার স্বদেশী যুগের বিপ্লববাদীরা গীতাকে জীবনবেদ হিসাবে গ্রহণ করিলেও অহিংসা মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। বিবেকানন্দও সম্ভবতঃ গান্ধীজীর মতো অহিংসা ও সত্যকে অভিন্ন করিয়া দেখেন নাই। সুভাষচন্দ্র দেশমাতার বন্ধন মোচনের জন্য সোজাসুজিই হিংসার প্ররোচনা দিয়াছেন। কিন্তু গীতার যুদ্ধও সহিংস যুদ্ধ নয়। হিংসা কর্মে নয়, হিংসা অস্ত্র ব্যবহার, এমন কি নরহত্যায়ও নয়—হিংসা মনের প্রক্ষোভে। শল্যচিকিৎসক রোগীর দেহে অস্ত্রাঘাত করেন—রক্তপাত করেন। কখনো কখনো মাতার প্রাণরক্ষার জন্য গর্ভস্থ সন্তানকে ধ্বংস করেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার কাজকে নিশ্চয়ই সহিংস বলিয়া নিন্দা করা যায় না। তা ছাড়া গীতায় একমাত্র কর্তা, ভগবান। ব্যক্তি যদি ভগবানের ভৃত্য হিসাবে, নিষ্কাম ভাবেই কর্ম করে, তবে সে সহিংস তো হইতেই পারে না। কাজেই গান্ধীজীর ও গীতার আদর্শের মধ্যে কোন বিরোধ আছে বলিয়া মনে করি না।

যুক্তিবাদী,

কর্মযোগী সবই বলিতে পারি

ব্যক্তি নিজেকে ভগবানের সেবক জ্ঞান করিয়া নিরলস নিষ্কাম কর্মে লিপ্ত থাকিবেন, ইহাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ

গান্ধীজী নিশ্চিতই প্রেয়োবাদী নন। ভারতীয় চিন্তানায়কদের মতো ভোগের চিন্তা তাঁহার পক্ষে অশুচি। যদিও তিনি মানবের সেবাকে নিত্যকর্ম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার আদর্শ বহুজন সুখবাদ (Utilitarianism) নয়, কারণ Utilitarianদের কাছে অন্যের সেবা বাস্তবিক পক্ষে ব্যক্তির নিজ স্বার্থরক্ষার ভদ্র ও সুপরিকল্পিত উপায় (intelligent self-interest)। তাঁহারা আরো বলিবেন, এই পরসেবার পিছনে রহিয়াছে—রাষ্ট্রের চাপ, জনমতের চাপ ইত্যাদি বাহিরের শক্তির প্রভাব (moral sanctions)। কিন্তু গান্ধীজী বা বিবেকানন্দের সেবার

গান্ধীজী প্রেয়োবাদী নন—উপযোগ বাদও তাঁহার মতে নৈতিক কর্মের ভিত্তি নয়

আদর্শের পিছনে কোন স্বার্থের হিসাব নাই—আছে এই প্রত্যয়, যে ঈশ্বরই সর্বজীবে চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। জনসেবাই ভগবৎ সেবা।

এমন কি কান্টের কর্তব্যের আদর্শের পিছনেও যেন কিছু হিসাব আছে। কান্ট বলিলেন, সৎ সাধু মানুষ এই জীবনে সুখ পায় না সত্য. কিন্তু এই জীবনের পরপারে ভগবান্ হিসাবনিকাশ করেন, সেইদিন সাধু পুরস্কৃত হন—এই প্রত্যয় না থাকিলে কেহ সৎকাজ করিত না। কিন্তু গান্ধীজীর মতবাদ গীতায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসী—তিনি ভগবানেই সর্বকর্মের ফল অর্পণ করিয়া শান্ত হইয়া কর্তব্যকর্ম করিয়া যান। অবশ্য গীতায়ও প্রতিশ্রুতি আছে, তিনি ভক্তকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবেন, ইহলোকে তাহার যোগক্ষেম বহন কবিবেন এবং পবকালে তাহার চিরমুক্তির ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু ইহা বিবেচনা করিয়া, কোন ভারতীয় ভক্ত সৎকর্মে প্রবৃত্ত হয় না।

গান্ধীজা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণতাবাদী

গান্ধীজীকে অবশ্যই আমরা সম্পূর্ণতাবাদী বলিতে পারি। মানুষ যখন ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, তখনই ঘটে তাহার সম্পূর্ণ আত্মউন্মোচন। যখন আমি তুমিতে নিঃশেষে মিলাইয়া যায়, সেদিনই 'আমি' সম্পূর্ণ করিয়া নিজেকে পায়—সেদিনই তো পরিপূর্ণ শান্তি।

তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন।
আমি অশান্ত বিরামবিহীন—চঞ্চল অনিবার
যত দূর হেরি দিক্‌দিগন্তে, তুমি আমি একাকার।

কিন্তু মানুষ তখনই সম্পূর্ণ, যখন সে বিশ্বের জীবনের সঙ্গে একাত্ম

গান্ধীজী সমস্ত ভারতীয় ভক্তের মতোই বিশ্বাস করেন যে, মানুষ, বিশ্বের জীবনের সঙ্গে যখন সম্পূর্ণ করিয়া একাত্ম হইতে পারে, তখন তাহা শূন্য রিক্ততার অবস্থা নয়—তাহাই পরিপূর্ণ আনন্দের অবস্থা। গান্ধীজী বলিলেন যে, "এই পৃথিবীর কোন দ্রব্যকেই আমি আমার একার বলিয়া দাবি করি না, তাই এই সমস্ত পৃথিবীই আমার আপন। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে মিশাইবার যে আনন্দ তাহার তুলনা নাই। হয়তো পৃথিবীর মানুষ আমার বিত্তহীনতাকে উপহাস করিতে পারে। কিন্তু এই বিত্তহীনতা, আমাব পক্ষে পরম লাভ হইয়াছে। আমি সকল মানুষকে আমার অন্তরের এই প্রশান্তি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করি। এর চেয়ে বড় ঐশ্বর্য আমার আর কিছু নাই।" আবার কবির ভাষায় বলিতে পারি—

ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি, বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান, বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান, বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ।

গান্ধীজী ও স্বামী বিবেকানন্দ দুজনেই ভারতের সনাতন আদর্শে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাসী

গান্ধীজী এবং স্বামীজী দুইজনেই ভারতের সনাতন ধর্মকেই আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তা ও জীবনের ভিত্তি করিয়াছেন। বিবেকানন্দের মূল বেদান্তে, গান্ধীজীর গীতায়। দুজনেই তাহাদের জীবন দ্বারা আধুনিক পাশ্চাত্ত্য মোহগ্রস্ত মানুষের কাছে প্রমাণ করিলেন যে, ভারতীয় সনাতন আদর্শ আজও তাহার জীবনীশক্তি নিয়া বাঁচিয়া আছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই পথ অনুসরণ করিয়া আজও দিশাহারা মানুষ তাহাদের অচঞ্চল ধ্রুবজ্যোতিতে পথের দিশা পাইতে পারে।

বিবেকানন্দ বা গান্ধীজীর মত অসাধারণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনীষীদের লেবেল মারিয়া কোন দলে ফেলা যায় না

বিবেকানন্দ বা গান্ধীজীর মতো অসাধারণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনীষীদের কোন বিশেষ মতবাদ বা সম্প্রদায়ভুক্ত করা সম্ভব নয়। তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। দার্শনিকের বিচারে তাঁহাদের মতামতের মধ্যে বহু স্বতঃবিরোধিতা দেখা যাইবে—যুক্তির দুর্বলতা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহারা তো কোন 'মতবাদ' প্রচারে উৎসাহী ছিলেন না। তাঁহারা কতগুলি ধ্রুব আদর্শে বিশ্বাস করিয়া, জীবনে তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশের সত্যাসত্যের বিচার তাই নিজ নিজ জীবনে তাহা প্রয়োগ দ্বারাই কেবল মাত্র হইতে পারে। নৈতিক আদর্শ শুধু যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারাই প্রমাণিত হয় না—জীবনে তাহাদের প্রতিষ্ঠার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। একটি কথা তাঁহাদের সম্পর্কে নির্ভয়েই বলা যায় যে, তাঁহাদের জীবনে সত্যকেই সবচেয়ে মূল্যবান্ বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, কোন অবস্থায়ই তাঁহারা সত্য বলিয়া যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করেন নাই।

গান্ধীজী নিজের স্বতঃবিরোধিতার কথা সবিনয়েই স্বীকার করিয়াছেন,

"আমার কাজ মানুষের চোখে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য আমি ব্যস্ত নই। সত্যের অনুসরণে আমি অনেক মত পরিত্যাগ করিয়াছি, অনেক নূতন বিষয় শিখিয়াছি। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু এখনও আমি ইহা বোধ করি না যে, অন্তরের দিক হইতে নূতন করিয়া বাড়িবার শক্তি আমার শেষ হইয়া গিয়াছে। যে পর্যন্ত আমার দেহ ধ্বংস না হইয়া যায়, ততদিন পর্যন্ত আমার এই জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি। শুধু ইহাই আমার চিন্তা যেন জীবনের প্রতি মুহূর্তে সত্যের আহ্বান—যাহাকে আমি ভগবান বলিয়া স্বীকার করি,—সেই আহ্বান পালন করিবার মতো মন যেন আমার থাকে।"

তাঁহাদের মতে শ্রেষ্ঠ জীবন সত্যানুসরণ; তাহাই ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র পথ

সংক্ষিপ্তসার

গান্ধীজীর সমস্ত চিন্তা ও কর্মের মূলে ছিল, এই অবিচলিত বিশ্বাস যে, এক পরম কারুণিক সর্বজ্ঞ ভগবান আছেন, যিনি এই বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। গান্ধীজীর কাছে সেই ভগবান্ হইতেছেন—সত্য, অহিংসা ও প্রেম। জীবনের উদ্দেশ্য হইল সেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা। মহাত্মা গান্ধীজীর বিপুল প্রভাবের মূল, এই জ্বলন্ত ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ইহারই প্রত্যক্ষ ফল সত্যনিষ্ঠা, সরলতা ও সর্বমানুষের প্রতি প্রেম।

ভগবানই সমস্ত আদর্শের উৎস, কিন্তু এমনই তাঁর প্রেম ও ক্ষমা যে তিনি মহাপাপীকেও ধ্বংস করেননা। তিনি মানুষের হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান এবং যাঁহারা তাঁহাকে আকুল লইয়া সন্ধান করেন, তাঁহাদের কাছে সাকাররূপেই তিনি ধরা দেন।

ভগবানই সত্য, কিন্তু তাহার চেয়েও বড় আবিষ্কার, সত্যই ভগবান্। এবং প্রেমেই সত্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী হওয়ার সহজ উপায়। মানুষের সেবারই প্রেমের বাস্তব প্রকাশ।

তিনিই সদ্‌বস্তু—কাজেই শুভ ও অশুভ সকলেরই তিনি মূল। নরঘাতকের নৃশংস অস্ত্রকেও তিনি চালনা করেন, আবার শল্যচিকিৎসকের কল্যাণপ্রদ ছুরিকাকেও তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই তিনি পাপীকেও ত্যাগ করেন না।

সত্য অনুসরণ করিতে হইলে, প্রথম পদক্ষেপ হইল অহিংসা। অহিংসা একটি নেতিবাচক আদর্শ নয়। এবং ইহা অলসতা বা নিষ্ক্রিয়তার আদর্শ নয়। নির্ভয় হইয়া সত্যের পথে বিচরণ করিতে হইবে, অনস্থাপরায়ণ হইয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। এই অহিংসা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলে শত্রুও মিত্রে পরিণত হইবে।

রাজনীতির বাস্তব ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগের নাম সত্যাগ্রহ। সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজী নির্যাতন সহিয়াছেন, অথচ শত্রুর বিরুদ্ধে অন্তরে কোন হিংসা পোষণ করেন নাই। সত্যের জন্য নির্ভয়ে মৃত্যুবরণ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু শত্রুকে কখনও আঘাত ফিরাইয়া দেন নাই। ইহাই অহিংসার আদর্শ।

অহিংসা ক্লীবের ধর্ম নয়—কাপুরুষের ধর্ম নয়। প্রিয়জনকে বিপদের মুখে ফেলিয়া পলায়ন অহিংসা নয়। কাপুরুষতার চেয়ে হিংসার বশবর্তী হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ অনেক ভাল। কিন্তু অহিংসার উচ্চতম আদর্শ হইতেছে নির্ভীক চিত্তে অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, কিন্তু তীব্র সংগ্রামের সময়ও অন্তরে কোন ক্রোধ বা ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ না করা। এমন কি সকল অহিংস সংগ্রামও কঠিন আত্মসংযম ও সত্যে অবিচলিত বিশ্বাস ভিন্ন সম্ভবপর হয় না।

গান্ধীজী গীতাতেই খুঁজিয়া পাইয়াছেন সত্যের পথে চলিবার অসংশয় নির্দেশ। হিন্দুধর্মের সার গীতাতে আর গীতার উপদেশ সর্বধর্মেরও উপদেশ। গান্ধীজীর কাছে সমস্ত ধর্মই সমান শ্রদ্ধার বস্তু, কিন্তু গীতাতেই তিনি পাইয়াছেন গভীর অন্ধকারে আলোর নির্দেশ, দুঃখের দিনে সান্ত্বনা, বিপদের দিনে নিরাপদ আশ্রয়। তাই গীতাকে গান্ধীজী বলিয়াছেন, 'অম্বা'—মা জননী।

গান্ধীজীর মতো ঈশ্বরনির্ভরতা, ও সর্বমানবতার আদর্শে বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দেরও সুস্পষ্ট। তা ছাড়া গান্ধীজীর আদর্শ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর আদর্শ নয়। তিনি সংসার হইতে পলায়ন করিয়া ধ্যানে মগ্ন থাকার আদর্শ প্রচার করেন নাই, তিনি সংসার-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপদেশই দিয়াছেন।

কিন্তু দেশসেবা, অহিংসা এই সমস্ত আদর্শকে অনুসরণ করিতে হইলে আত্মসংযম প্রয়োজন। নির্লোভ হইতে হইবে, অভাব কমাইতে হইবে ইহা ভিন্ন জীবনে শান্তি আসিতে পারে না। দেশের মানুষকে সত্যই ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ যাহা ভোগ করিতে পারে না, তিনি তাহা ভোগ করিবেন না। তাই তাঁহার কটিবাস।

নীতিজীবন ও ধর্মজীবনের ভিত্তি হইল, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। আত্মসংযম ভিন্ন এই নীতিগুলিকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায় না। এই আত্মসংযমের প্রথম বাস্তব পদক্ষেপ হইল জিহ্বাসংযম ও বাক্‌সংযম। অবশ্যই সংযম কষ্টকর। অন্ততঃ প্রথম প্রথম, কষ্ট করিয়াই এ সব সদ্‌গুণ আয়ত্ত করিতে হয়—ইহার জন্য কোন সহজ পথ খোলা নাই। বহু প্রলোভন দমন করিতে হইবে, বহু স্খলন পতন ঘটিবে। তথাপিও সত্য আদর্শে বিশ্বাস রাখিয়া অবিচলিত নিষ্ঠায় ধর্মের পথে চলিতে হইবে। ভগবানের কৃপা হইলেই শুধু এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায়।

এই পথ যে সত্য, যুক্তিদিয়া হয়তো তাহা প্রমাণ করা যাইবে না। তথাপি বিশ্বাস করিতে হইবে। বিশ্বাস যুক্তিবিরোধী নয়, কিন্তু তাহা যুক্তির উর্ধ্বে।

গান্ধীজী নিশ্চিতই ভোগবাদী নন। তিনি ঈশ্বরের বিধানে বিশ্বাসী, তিনি বিশ্বাস করেন আমাদের বিবেকের বাণীই ভগবানের বাণী। তিনি যুক্তিবাদী ও কৃচ্ছ্রতায় বিশ্বাসী—তিনি গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করেন, গীতায় হিংসার আদর্শ প্রচারিত হয় নাই, অহিংসার আদর্শই উপদিষ্ট হইয়াছে। তিনি সত্য ও অহিংসাকে ভিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশের আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু গান্ধীজীর মতে, ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ ভগবানে আত্মসমর্পণ দ্বারাই সম্ভব। গান্ধীজী উপযোগবাদীদের মতো বিশ্বাস করেন না যে, মার্জিত স্বার্থবুদ্ধিই নৈতিক কর্মের প্রেরণা যোগায়। কান্টের মতো তাঁহার

আদর্শ অহংবুদ্ধি-নির্ভর নয়, শুষ্ক নিরানন্দও নয়। ভগবানে আত্মসমর্পণ ব্যক্তিত্বের বিলোপ নয়, পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা।

গান্ধীজীর মতো মহাপুরুষদের লেবেল আঁটিয়া কোন দলভুক্ত করা যায় না। তাঁহাদের আদর্শের সত্যতা তাঁহাদের পথে চলিয়াই শুধু প্রমাণ করা যায়। গান্ধীজী কোন মতবাদ প্রচারে উৎসাহী ছিলেন না—তিনি জীবন ভরিয়া সত্যের পথে চলিবার পরীক্ষাই করিয়া গিয়াছেন, এবং তাই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন, "আমার জীবনই আমার বাণী"।

Questions

1. Discuss the ideal of life according to Gandhiji. What is Ahimsa? Is it the ideal of a coward?

2. Compare the ideal of Gandhiji with that of Mill or Kant. Which according to you, is the higher ideal and why?

উনবিংশ অধ্যায়

নৈতিক ভিত্তি

Postulates of Morality

[Need for a philosophical basis of morality - Postulates of morality—Belief in the Freedom of the Will, Immortality of the Soul and Existence of God—Arguments in favour of determinism—Scientific, psychological and philosophical—Refutations—Arguments in favour of free will—Scientific psychological, moral and philosophical--Arguments to prove immortality of the Soul—Moral arguments to prove the existence of God]

নৈতিক জীবন নৈতিক আদর্শের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু নৈতিক আদর্শগুলি কি শুধু মানুষের অলস কল্পনা? তাহা হইলে তাহাদের খুব বেশী মূল্য থাকিত না। মানুষ যদি বিশ্বাস না করিত যে নৈতিক আদর্শগুলির বাস্তব ভিত্তি আছে, তবে এই আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন মানুষ করিত না। কাজেই যদিও নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্য হইল ঔচিত্যের (oughtness) আদর্শ বিচার,—সেই বিচার স্বভাবতঃই সত্য (Truth) বা বাস্তব (Reality) সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারে আমাদিগকে বাধ্য করে।

নৈতিক আদর্শগুলি শুধুই কল্পনা নয়, তাহাদের দার্শনিক সত্তা ভিত্তি থাকিতে হইবে

বাস্তবিক পক্ষে সদ্‌বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত, নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধেও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য দায়ী। যাহারা বিশ্বাস করেন যে, জড় প্রকৃতিই মূল সত্যবস্তু এবং সমস্ত বিশ্বজগৎ ও মনোজগৎ, এই জড়েরই বিকার তাঁহারাই নীতি-বিদ্যায় প্রেয়োবাদ সমর্থন করেন। আবার যাহারা ভাববাদী, পরম কারুণিক চিন্ময় ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাঁহারা হেগেলের মতো সম্পূর্ণতাবাদ (Perfectionism) অথবা বাটলার, স্যাফ্‌টেসব্যারীর মত অন্তর্দর্শনবাদ (Intuitionism) সমর্থন করেন। সুতরাং নীতিবিদ্যার আলোচনায়—দর্শনকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না। সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপরই সুসমঞ্জস নৈতিক আদর্শকে স্থাপন করিতে হইবে।[১]

১। The truth is that the theory of Ethics which seems most satisfactory has a metaphysical basis, and without consideration of that basis there can be no thorough understanding of it.

MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 431

দর্শনের সঙ্গে নীতিবিদ্যার সম্বন্ধ আমরা চারভাবে দেখিতে পারি—

১। নীতিবিদ্যার ভিত্তি দর্শনে

১। নীতিবিদ্যা অন্যান্য সব বিদ্যারই মতোই কতকগুলি ধারণা সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাদের সত্যতার প্রমাণ, দর্শন শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল।

২। সদ্বস্তু সম্বন্ধে দার্শনিক মত নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে মতকে প্রভাবিত করে

২। কখনো কখনো সদ্বস্তু সম্পর্কে দার্শনিক মত নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে মতকে প্রভাবিত করে।

৩। নৈতিক বিচারের সত্যতা তাহাদের দার্শনিক সত্যতার উপর নির্ভরশীল

৩। নৈতিক বিচারের সত্যতা, চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে, তাহাদের দার্শনিক সত্যতার উপরে।

৪। নীতিবিদ্যার মূল্য (value) দার্শনিক আলোচনার বস্তু

৪। নীতিবিদ্যার মূল্যবোধ বা বিচার দার্শনিক আলোচনার একটি উপাদান জোগায়।[২] যে ভাবেই আমরা প্রশ্নটিকে দেখি না কেন, ইহা সুস্পষ্ট যে নীতিবিদ্যার আলোচনায় দর্শনকে আমরা বাদ দিতে পারি না। ডাঃ মূর অবশ্য মনে করেন যে, ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ এমন গুণ, যাহার কোন বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, এবং সদ্বস্তু সম্বন্ধে দার্শনিক মতামত দ্বারা নৈতিক বিচারের কোন পরিবর্তন হইবার সঙ্গত হেতু নাই। অবশ্য তিনি ইহা স্বীকার করেন যে, কোন ব্যক্তির দার্শনিক মত বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁহার নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে মতামতকে প্রভাবিত করে।[৩]

নৈতিক বিচারের দার্শনিক পশ্চাৎপট—Postulates of moral judgment—প্রত্যেক বিজ্ঞানের পশ্চাৎপটে কতকগুলি মৌলিক ধারণা থাকে, যেগুলি বিনা প্রমাণেই স্বীকৃত হয়। সেগুলিকে Postulates বলে। নীতিবিদ্যায়ও এমন কয়েকটি postulates আছে। যেমন, যখন আমরা বলি, সত্য কথা বলা মানুষের উচিত, তখন ইহা আমরা বিনা প্রমাণেই স্বীকার করিয়া লই যে, মানুষের সত্য কথা বলিবার শক্তি ও স্বাধীনতা আছে। ইহা মানিয়া লই যে, মানুষ ইচ্ছা করিলে সত্য কথাও বলিতে পারে, আবার

প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই মূলে থাকে অল্প কয়েকটি মূল ধারণা, যেগুলি প্রমাণ ব্যতীতই গৃহীত হয়

২। Lillie.—An Introduction to Ethics, Pp. 293-94

৩। Good is a simple unanalysable quality, not depending for its nature on its relations to other things in the universe, so that the nature of these other things can have no effect whatsoever on the nature of the goodness. It is not however denied that a man's view of the nature of the universe does, as a matter of fact, influence his views on the nature of goodness. Moore—Principia Ethica, Ch. 4

মিথ্যা কথাও বলিতে পারে। তাহা হইলে, 'স্বাধীনতা' মানুষের নৈতিক জীবনের একটি postulate।

র‍্যাশড্যাল্ Moral postulatesগুলিকে দুই দলে ভাগ করিয়াছেন—

কতগুলি ধারণা আছে যেগুলি মানিয়া না নিলে, নৈতিক কর্ম হইতেই পারে না

(১) কতগুলি ধারণা আছে এমন যে, সেগুলি স্বীকার না করিয়া লইলে, নৈতিক কর্মই সম্ভব নয়, অর্থাৎ ন্যায় ও অন্যায়ের যে প্রভেদ আমরা নৈতিক বিচারে করিয়া থাকি, তাহাই অসম্ভব হয়। যেমন, ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা স্বীকার না করিলে নৈতিক জীবন ও বিচার অর্থহীন হয়। আবার (২) এমন কতগুলি ধারণা আছে, যেগুলি ব্যতিরেকেও ন্যায় ও অন্যায়ের প্রভেদ সম্ভব হয়, কিন্তু যেগুলি মানিয়া লইলে, নৈতিক বিচারের বিধিগুলির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সহজ হয়। যেমন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অথবা আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার না করিলেও নৈতিক বিচার অসম্ভব হয় না,—কিন্তু এই ধারণাগুলির ব্যবহার নৈতিক জীবনের সুব্যাখ্যার সহায়ক।[৪]

এগুলিকে বলে Moral Postulates

কাণ্ট—স্বাধীন ইচ্ছা, ভগবানের অস্তিত্ব এবং আত্মার অবিনশ্বরত্ব এই তিনটিকে **Postulates of Morality** বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—

ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা না থাকিলে নৈতিক দায়িত্ব অর্থহীন হয়

(ক) **ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মের ক্ষমতা**—আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে তাহার কর্মের জন্য নিন্দা বা প্রশংসা করি, যখন বিচার করি তাহার কাজটি ন্যায় বা অন্যায়, তখন অবশ্যই ইহা স্বীকার করিয়া নেই যে, ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মের ক্ষমতা আছে,—অর্থাৎ সে কাজটি করিতে বা না করিতে পারিত। সেই জন্য, তাহার কৃতকর্মের জন্য তাহাকে দায়ী করা হয়,—তাহার নৈতিক বিচার করিয়া বলা হয়, সে ন্যায় বা অন্যায় করিয়াছে।

ঐহিক জীবন অপূর্ণ—কিন্তু নৈতিকতার আদর্শে পূর্ণতা, কাজেই ঐহিক জীবনের পরেও জীবন আছে অর্থাৎ আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিতে হয়

(খ) **আত্মার অমরত্ব**—কাণ্ট বলিলেন, মানুষের ঐহিক জীবন অপূর্ণ—এই জীবনে পূর্ণতালাভ সম্ভব নহে। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, মৃত্যুর পরও মানুষের পূর্ণতার জন্য উদ্যম চলিতে থাকিবে। সুতরাং দেহের মৃত্যুর পরও আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করিতে হয়।

৪। Rashdall—Theory of Good & Evil, Bk. I, Ch 8, 3 ii

(গ) **ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস**—কাণ্ট বলিলেন, এই জীবনে সৎকর্মের উপযুক্ত পুরস্কার মানুষ পায় না। অসৎ কর্মের শাস্তিও অনেক সময় এড়াইয়া যায়। কিন্তু মানুষ যে নৈতিক জীবনযাপনে আগ্রহান্বিত হয়, তাহার কারণ, মানুষের অন্তরে এই গভীর প্রত্যয় আছে যে, একদিন না একদিন সৎকাজ পুরস্কৃত হইবে, দুষ্ট দণ্ড পাইবে। এ প্রত্যয় সত্য হইতে হইলে, ইহা মানিতে হয় যে, এই জীবনের পরও জীবন আছে, এবং একজন বিচারকর্তা ভগবান আছেন, যিনি সমস্ত মানুষের সমস্ত কার্যের চূড়ান্ত বিচার করিবেন।[৫] কাণ্টের এই তিনটি Postulate ছাড়াও র‍্যাশডাল্ আর দুইটি Postulateও স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করিয়াছেন।

এই জীবনে সৎকাজ ও সুখের সমন্বয় হয় না—একজন চূড়ান্ত বিচারক এই সমন্বয় সাধন করবেন, এই বিশ্বাস অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস সমস্ত নৈতিক কর্মের ভিত্তি

(ঘ) এই জগতে দুঃখ ও পাপ আছে। দুঃখ বা পাপের বিরুদ্ধেই নৈতিক সংগ্রাম। দুঃখ বা পাপ যদি মিথ্যা মায়া হইত, তবে নৈতিক সংগ্রাম তাহার মূল্য ও তাৎপর্য হারাইত। পাপ-পুণ্যেরও কোন অর্থ থাকিত না।

র‍্যাশডাল্ আরও দুইটি Postulates স্বীকার করিয়াছেন—এই জগতে দুঃখ ও পাপ আছে, তাই নৈতিক সংগ্রামের মূল্য

(ঙ) ইহাও স্বীকার করা প্রয়োজন যে কাল ও পরিবর্তন সত্য। কাল যদি মিথ্যা হইত, জগতের ঘটনাবলী যদি মায়ার খেলা হইত, তবে নৈতিক জীবনও অর্থহীন হইত। মানুষ নিজ চেষ্টা দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার করিবে, নিজ দুর্বলতাকে অতিক্রম করিবে, ইহাই তো নৈতিক জীবনের মর্মকথা। কাজেই মায়াবাদী বৈদান্তিক ও শূন্যবাদী বৌদ্ধের কাছে নীতির কোন বাস্তব তাৎপর্য নাই।

(খ) ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, এ জগৎ সত্য এবং মানুষের চেষ্টায়ই অন্যায়ের প্রতিকার ঘটে

ব্যক্তিরা স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন সত্তা, তাঁহারা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। এই জগৎ সত্য, মানুষ নিজ চেষ্টা দ্বারা পৃথিবীতে পরিবর্তন ঘটায়, এবং অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে। এ কথাগুলি না মানিলে নৈতিক জীবনই অসম্ভব হয়। এই সঙ্গে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, এবং আত্মার অমরতায় বিশ্বাস নৈতিক জীবন ও বিচারের সুব্যাখ্যার সহায়ক হয়। সুতরাং এই ধারণাগুলিকে আমরা Moral Postulates হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি।[৬]

৫। Kant—Critique of Practical Judgment (tr. Abbott), Ch. 2 35, Pp. 221—29

৬। Lillie—An Introduction to Ethics. P. 297

(ক) **মানুষের স্বাধীন কর্মের শক্তি আছে,** নীতিবিদ্যার পক্ষে ইহা একটি অপ্রমাণিত স্বীকৃত সত্য। কিন্তু মনোবিদ্যা ও দর্শন-শাস্ত্রের পক্ষে ইহা একটি গুরুতর মৌলিক সমস্যা।

Determinists গণ বলেন, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা নাই, সব ইচ্ছাই—পূর্ববর্তী কতগুলি শর্ত বা অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত

একদল বলেন, মানুষ বাস্তবিক পক্ষে স্বাধীন নয়। যেগুলিকে আমরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বা স্বাধীন কর্ম বলি, সেগুলি পূর্ববর্তী কতগুলি শক্তি দ্বারা বা অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত (determined)। যাঁহারা এমন বিশ্বাস করেন, তাঁহার মতকে Determinism বলা হয়।

যাঁহারা স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাস করেন তাঁহারা বলেন, মানুষ কোন কাজ করিতেও পারে, নাও করিতে পারে—এ স্বাধীনতা তাহাদের আছে

আবার আর একদল আছেন, যাহারা বলেন মানুষ ইচ্ছা করিলে কোন কাজ করিতে পারে, আবার নাও করিতে পারে, সে চোর হইতে পারে, আবার সে সাধুও হইতে পারে। স্বাধীন ইচ্ছা ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার। ইঁহাদের মতকে doctrine ot free will বলা হয়।

যাঁহারা **বাধ্যতাবাদে** (determinism) বিশ্বাসী, তাহারা প্রশ্নটি মনোবিদ্যা বা দর্শনের দিক হইতে দেখিতে পারেন।

Determinists গণ বলেন, প্রকৃতির সর্বত্রই কার্য-কারণ শৃঙ্খলের বাধ্যতা—মনের ক্ষেত্রেও কারণই কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করে

মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে যাঁহারা বাধ্যতাবাদী, তাঁহারা এ প্রকারের যুক্তি দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, প্রকৃতির সবত্র আছে, কার্যকারণ শৃংখলের বাধ্যতা। যেখানেই কার্য, সেখানেই তৎপূর্বে থাকে কারণ-শৃঙ্খল। সেই শৃঙ্খলই কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে, ইহার কোন ব্যতিক্রম কোথায়ও নাই। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতাই (determinism) হইতেছে বিধি। প্রকৃতির মধ্যে কোথায়ও স্বাধীনতা নাই—সর্বত্রই আছে শৃঙ্খল—কারণ দ্বারা কার্যের নিয়ন্ত্রণ। মানুষের ইচ্ছা, কর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এই সাধারণ সূত্রের কোন ব্যতিক্রম নাই।

প্রকৃতির মধ্যে কোথায়ও স্বাধীনতা নাই

সর্বত্রই পূর্বের অবস্থা পরের অবস্থাকে নির্ধারিত করে

মানুষের মনের কোন এক মুহূর্তের ইচ্ছা ও কর্ম তৎপূর্ববর্তী যে অবস্থাগুলির উপর নির্ভর করে, তাহাদের আমরা বংশানুক্রম ও পরিবেশ এই দুই দলে ভাগ করিতে পারি।

ব্যক্তির ইচ্ছা এবং কর্ম আকস্মিক ক্রিয়া নয়—ইহারা তাহার চরিত্রের

উপর নির্ভর করে। এবং মানুষের চরিত্র বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, তাহার বংশধারার (heredity) উপর। মানুষের দৈহিক প্রকৃতি যেমন পিতামাতা পূর্বপুরুষদের উপর নির্ভর করে, তেমনি তাহার মানস-প্রকৃতিও তাহার পিতামাতা পূর্বপুরুষ অর্থাৎ বংশানুক্রম দ্বারা নির্ধারিত। এখানে মানুষের কোন স্বাধীনতা নাই। তাহার সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার মূল যে মস্তিষ্কের গঠন, তাহা সে পূর্বপুরুষদের নিকট হইতেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে।

ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক গঠন অনেকখানিই পূর্ব-পুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত

ব্যক্তির কর্ম এবং ইচ্ছা ব্যক্তির চরিত্রের উপরই শুধু নির্ভর করে না—ইহা তাহার পরিবেশের উপরও নির্ভর করে। ব্যক্তির বাহ্য পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, ব্যক্তির আয়ত্তাধীন নয়। কাজেই, কোন এক বিশেষ মুহূর্তে সে কোন কাজ করিবে, তাহা সে নিজেও হয়তো জানে না। তাহার বাহিরের শক্তি-সমাবেশই তাহার কর্মের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে।

ব্যক্তির বাহ্যপরিবেশও তাহার কর্মকে প্রভাবিত করে, বংশধারা বা পরিবেশ ব্যক্তির আয়ত্তাধীন নয়

আবার মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদীদের (Psychological hedonists) মতে, মানুষের আন্তর পরিবেশও তাহার ইচ্ছা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। যখন একটি মাত্র সবল আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে ক্রিয়া করে, তখন কর্ম সে অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়। আবার যখন একসঙ্গে একাধিক বিপরীত আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়া করে, তখন তাহাদের মধ্যে একটি সংঘর্ষ বা টানাটানি শুরু হয়, এবং বিজয়ী ইচ্ছা ব্যক্তিকে তদনুযায়ী কার্যে প্রবৃত্ত করায়। কাজেই ব্যক্তি স্বাধীন নহে। সে তাহার নিজ আকাঙ্ক্ষাগুলির দাস। সে চালিত, সে চালক নয়।

যখন একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনের মধ্যে ক্রিয়া করে, তখন সে সেই অনুযায়ীই কাজ করে। যেখানে একাধিক বিপরীত আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেখানে সর্বাপেক্ষা বলবতী আকাঙ্ক্ষাই জয়ী হয়

আবার অন্যদিক হইতেও মানুষের নিয়মবাধ্যতা প্রমাণিত হয়। যে মানুষের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, সে কোন্ অবস্থায় কি করিবে, মোটামুটি পূর্ব হইতেই তাহা বলা যায়। মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন জীব হইলে আমরা তাহার ভবিষ্যৎ ক্রিয়া সম্বন্ধে আন্দাজ করিতে পারিতাম না। শুধু বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি কেন, বৃহৎ জনসমষ্টির ক্রিয়া সম্বন্ধেও পরিসংখ্যান তত্ত্ব ভবিষ্যৎবাণী (forecaste) করিতে চেষ্টা করে। কোন একটি সমাজে বৎসরে

কয়টি বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিবে, কতটি পুরুষ সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, কতজন বি. এ. পাস করিবে, কতজন বেকার থাকিবে, এমন কি কতজন আত্মহত্যা করিবে, কোন দল আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করিবে--সে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়, এবং মোটামুটি ভাবে তাহা সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়। তবেই বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র নির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা চালিত—তাহা স্বাধীন নয়।

কোন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ ব্যবহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়

মানুষের **স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তি** মোটামুটি দুইটি—(১) পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা **কার্য-কারণের জটিল শৃঙ্খলে** অনতিক্রমণীয় ভাবে বাঁধা—(২) **শক্তির অবিনশ্বরতাবাদ**. পৃথিবীতে মোট শক্তির পরিমাণ বাড়িতেও পারে না, কমিতেও পারে না। 'স্বাধীন ইচ্ছা' স্বীকার করিলে, ইহা মানিতে হয় যে, ইচ্ছা দ্বারা পৃথিবীতে নূতন শক্তি সৃষ্টি হইতে পারে, অথবা কোন শক্তি ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু তাহা অসম্ভব।

বাস্তবিক পক্ষে মানুষ এক জটিল যন্ত্র মাত্র। তাহার সমস্ত ইচ্ছা, কর্ম ও সত্তা যান্ত্রিকভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। জড়-জগতের মতো মানুষের জীবনেও পূর্ববর্তী অবস্থাগুলি অনিবার্য ভাবে, পরবর্তী অবস্থায় উপনীত করে। বিশ্বজগতে কোথায়ও কোন 'স্বাধীনতা' নাই—মানুষের ক্ষেত্রেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।

জড়জগৎ এবং মনোজগৎ সর্বত্রই কার্য-কারণের শৃঙ্খল ও শক্তির অবিনশ্বরতা

মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন জীব, **এই মতের বিরুদ্ধে গুরুতর দার্শনিক যুক্তি** দেওয়া হইয়াছে। সম্পূর্ণ বিপরীত-বাদী দুইদল স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। জড়বাদীরা বলিবেন, অণুপরমাণুর সংযোগ-বিয়োগ, আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তু ও সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সর্বত্র নিয়মের অনতিক্রমণীয় শৃঙ্খল। একটি বল আর একটি বলকে গিয়া ধাক্কা দিল, এবং তাহা গড়াইতে আরম্ভ করিল। এখানে দ্বিতীয় বলটির ক্রিয়ার মধ্যে যেমন কোন স্বাধীনতা নাই, তেমনি মানুষ পরিবেশের ধাক্কায় কোন এক পথে চলিল, ইহার মধ্যেও কোন স্বাধীনতা নাই।

জড়বাদীরা বলেন, অণুপরমাণুর সংযোগ-বিয়োগ ও বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত কার্য সম্পন্ন হয়—কোথায়ও স্বাধীনতা নাই

(২) যাঁহারা স্পিনোজার মতো বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী, তাঁহারা বলিবেন এক ব্রহ্মই সত্য—আর সবই মায়া। তিনিই একমাত্র যন্ত্রী, আমরা সকলেই

যন্ত্র—তিনি যেমন আমাদিগকে নাচান, তেমনি আমরা নাচি।[৭] আমরা বলি, "আমরা বোধ করি, আমরা স্বাধীন"। শঙ্করাচার্য বলিবেন, এই বোধ করাটাই মায়া—এই বোধের পিছনের প্রকৃত কারণটিও যে ব্রহ্মশক্তি, তাহা অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা জানি না। আমি যখন ঢিলটা ছুঁড়িয়া মারিলাম এবং তাহা গিয়া পুকুরে জলের মধ্যে ঝুপ্ করিয়া পড়িল, তখন ঢিলটিও মনে করিতে পারে, সে স্বাধীন ইচ্ছায়ই জলে ঝাঁপ দিয়াছে। অথবা একটি গরুকে মস্ত লম্বা দড়ি দিয়া খুঁটিতে বাঁধিয়া দিলে, সে ইতস্তত সুখে বিচরণ করিয়া বিশ্বাস করিতে পারে যে সে স্বাধীন।

ব্রহ্মই এক মাত্র সত্য আর সবই মায়া—স্বাধীনতাবোধও মিথ্যা মায়া

(৩) আবার গোঁড়া আস্তিক্যবাদীরা বলিবেন, ভগবান্ সর্বশক্তিমান্ সবকালাতীত। কাজেই যাহা কিছু ঘটে, তাহা তাঁহারই ইচ্ছায় ঘটে,—তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই জানেন। তাঁহার জ্ঞান সর্বব্যাপী, কালাতীত—তাহাতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের প্রভেদ নাই। আমরা যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে বলিয়া মনে করি, তাহা তাঁহার কাছে পূর্বেই ঘটিয়া আছে। তাহা হইলে মানুষের বাস্তবিক স্বাধীনতা কোথায়?[৮]

ভগবানই একমাত্র কর্তা, আমাদের সমস্ত কর্ম ভগবানের ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত, তিনিই একমাত্র যন্ত্রী, মানুষ সকলেই তাঁহার যন্ত্র মাত্র

স্বাধীন ইচ্ছার সত্যতায় যাঁহারা বিশ্বাসী (Doctrine of free will) তাঁহারা বাধ্যতাবাদীদের (determinists) যুক্তিগুলি নিম্নলিখিত ভাবে খণ্ডন করেন—(১) মানুষের আকাঙ্ক্ষা তাহাকে চালনা করে, ইহা সত্য নয়। বিপরীত আকাঙ্ক্ষাগুলির মধ্যে টানাটানিতে সবলতম আকাঙ্ক্ষা জয়ী হয়, এ কথা বলা ঠিক নয়। আকাঙ্ক্ষাগুলি সক্রিয় শক্তি, এবং ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র, এমন ধারণা করা ভুল হইবে। ব্যক্তিই মূল

ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাসীদের পূর্বোক্ত যুক্তিসমূহ খণ্ডন

৭। Lillie—An Introduction to Ethics, P. 294

৮। The Hegelian doctrine of the immanence of God in man leads to the same result. History like the course of things, is a logical process, the process of the universal reason ..the self is accounted for by being referred to the Absolute reality of which it is the passing manifestation·· Personality is explained to be mere appearance, the ultimate reality is impersonal. Seth—A Study of Ethical Principles, P. 392

শক্তির কেন্দ্র ; আকাঙ্ক্ষাগুলি তাহারই শক্তি এবং ব্যক্তিই কোন আকাঙ্ক্ষাকে বলীয়ান্ করে এবং কোন্ আকাঙ্ক্ষা জয়লাভ করিবে তাহা স্থির করে। ব্যক্তিই চালক, সে চালিত নয়। সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক প্রেয়োবাদীদের চেষ্টিত ক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিতান্ত ভ্রান্ত।

আকাঙ্ক্ষা মানুষকে চালনা করে, ইহা সত্য নয়, মানুষই আকাঙ্ক্ষাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে

(২) ব্যক্তির ভবিষ্যৎ কর্ম আমরা অনেক সময় ঠিক ঠিক আন্দাজ করিতে পারি। ইহা দ্বারা মানুষ স্বাধীন নয়, এমন সিদ্ধান্ত করা ভুল। একই অবস্থায় বারে বারে একই ভাবে ব্যবহার দ্বারা মানুষ স্বভাব গঠন করে। এমন ভাবেই কতগুলি দৃষ্টিভঙ্গী ও চরিত্র গঠিত হয়। এ চরিত্র বহু অভ্যাসের দ্বারা গঠিত বলিয়াই, একই চরিত্রের মানুষ বিশেষ ভাবে একই কাজ করে। কিন্তু গঠিতচরিত্র মানুষ স্বেচ্ছায়ই কাজ করে—সে বাহিরের কোন শক্তির দ্বারা তাড়িত নয়। সে নিজ স্বভাবের নিয়ম অনুযায়ীই কাজ করে। মানুষ স্বাধীন, অর্থাৎ, সে কোন নিয়মেরই অধীন নয়, এমন নয়।—সে নিজ স্বভাবের অধীন সুতরাং, তাহার ক্রিয়ায় যদি স্বভাব অনুযায়ী সঙ্গতি দেখা যায়, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই—বরঞ্চ তাহাই স্বাভাবিক।

মানুষ স্বাধীন অর্থ এই নয় যে, তা কোন নিয়মের অধীন নয় ; মানুষও একই অবস্থায় একই প্রকার কর্ম করে, কাজেই তাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়

(২) কার্য-কারণবাদের অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল মানুষের স্বাধীনতার বিরোধী নয়। মানুষ স্বাধীন ভাবে কাজ করে ইহার অর্থ এই নয় যে, সে কারণ ব্যতিরেকেই কাজ করে। স্বাধীনতা অর্থ তাহার কর্ম বাহিরের শক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত নয়। ব্যক্তি নিজেই তাঁহার কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তি স্বাধীন, অর্থাৎ ব্যক্তি স্ব-অধীন।

মানুষও কার্য-কারণের নিয়মের অধীন—তবে সে স্বাধীন, এ কথার অর্থ সে কোন বাহিরের শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তাহার কর্ম স্ব-নিয়ন্ত্রিত

(৩) শক্তির অবিনশ্বরতাবাদও মানুষের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে না। জড়শক্তিকেই একমাত্র শক্তি স্বীকার না করিয়া, মানসিক শক্তিকেও স্বীকার করিলে, একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে মানসিক শক্তি শারীরিক শক্তিতে পরিণত হইতে পারে, অথবা মানসিক শক্তি শারীরিক শক্তিকে বাধা দিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের সমগ্র শক্তির পরিমাণ তাহাতে বাড়ে বা কমে এমন সিদ্ধান্ত করিবার সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই।

শক্তির অবিনশ্বরতাবাদ স্বীকার করিয়াও বলা চলে মানসিক শক্তি, শারীরিক শক্তিতে পরিণত হইতে পারে

ভগবানই পরম কর্তা —তবে তিনিই মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা মায়া হইলেও তাহার বাস্তব ভিত্তি কিছু থাকিতে হইবে—তাহা অলীক মিথ্যা নয়

(৪) ভগবান্ ভবিষ্যৎ জানেন ইহা সত্য, এবং অন্তিম ভাবে ইহাই সত্য যে, তিনিই সর্বকর্মের একমাত্র কর্তা। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে ইহা মানা যাইতে পারে যে, ভগবানই মানুষকে নীতিজীবন শিক্ষা দিবার জন্য, কার্যতঃ স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন। ইহাকে মায়া বলিলেও ইহা সম্পূর্ণ অলীক বা মিথ্যা হইয়া যায় না। শঙ্কর-মায়াবাদীকেও স্বীকার করিতে হয় যে মায়ারও কিছু বাস্তব ভিত্তি থাকিতে হইবে।

স্বাধীন-ইচ্ছাবাদীরা শুধু বিপরীত মত খণ্ডন করিয়াই নিরস্ত থাকেন না। তাঁহারা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সপক্ষে কিছু অস্তিবাচক যুক্তিও দিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে প্রধান কয়টি যুক্তি নিম্নরূপ—

স্বাধীন ইচ্ছাবাদীদের সর্বপ্রধান যুক্তি এই যে, আমি স্বাধীন এই অনুভূতি প্রত্যক্ষ। স্বাধীনতা আছে বলিয়াই ব্যক্তি নিজ কর্মের জন্য অনুশোচনা বোধ করে

(১) আমাদের এ প্রত্যয় অসংশয়িত যে আমি, কোন কাজ করিতেও পারি, আবার নাও করিতে পারি। কোন কাজ সম্পর্কে দায়িত্ববোধের ইহাই ভিত্তি। আমরা যদি সর্বদাই বোধ করিতাম যে, আমরা যাহাই করি না কেন, তাহা করিতে আমরা বাধ্য, তবে দায়িত্ববোধ বা অনুশোচনার কোন অবসরই থাকিত না। মানুষ যে স্বাধীন, তাহার সপক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রবল যুক্তি ইহাই যে, স্বাধীনতাবোধ আমাদের একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে।

মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা না মানিলে নৈতিক জীবন অসম্ভব হয়

(২) মানুষের ইচ্ছার ও কর্মের স্বাধীনতা না থাকিলে, নৈতিক জীবন অসম্ভব হইত। কান্ট সেই জন্যই বলিয়াছেন, "Thou oughtest, therefore thou canst". আমরা এই বাক্যটিকে উল্টাইয়াও বলিতে পারি, কোন কর্ম সম্বন্ধে আমার স্বাধীন ক্ষমতা আছে বলিয়াই, ইহা সম্বন্ধে নৈতিক দায়িত্ব আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। ক্রীতদাস প্রভুর আজ্ঞায় অন্যের গৃহদাহ করিলে, সেই দুষ্কৃতির দায় ও শাস্তি প্রভুকেই বহন করিতে হইবে, ক্রীতদাসকে নহে।

আপাতদৃষ্টিতে এখানে নীতি ও ধর্মের মধ্যে বিরোধ আছে। নীতি-

বিশ্বাস করে ব্যক্তির কর্মের জন্য ব্যক্তিই দায়ী—ব্যক্তিই কর্তা, ব্যক্তিই ফলভোক্তা। ধর্ম বলিবে—ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, ঈশ্বরেই কর্মফল সমর্পণ কর, "নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচী—হে অর্জুন, তুমি তো নিমিত্তমাত্র—তুমি তো কর্তা নও"—"তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার"। কর্তৃত্ব-অভিমান যতদিন আছে, ততদিন ধর্মজীবনের গোড়াপত্তনই হয় নাই। অর্জুন যখন পাণ্ডিত্য ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন, "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাম্ প্রপন্নং—আমি তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম—প্রসন্ন হইয়া আমার মোহঅন্ধকার দূর কর"—তখনই সত্যের দ্বার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইল।

নীতি বলে, 'আমি আমার কর্মের জন্য দায়ী।'

ধর্ম বলে, "তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার"—ভগবানই একমাত্র কর্তা

বাস্তবিক পক্ষে, উচ্চতর ভাববাদ দ্বারাই এই আপাতবিরোধের মীমাংসা হইতে পারে। ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, কিন্তু ব্যক্তির স্বাধীনতা—ভগবান হইতে সম্পূর্ণ পার্থক্যের স্বাধীনতা নয়। ব্যক্তি যেদিন ভগবানের কাছে আত্ম-সমর্পণ করিবে সেদিনই সে আপনাকে সম্পূর্ণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে। সক্ষম মানুষের স্বাধীনতা কখনও সম্পূর্ণ ও নিরঙ্কুশ হইতে পারে না। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপিতে গেলে সমুদ্রেই তাহাকে মিশিতে হইবে। "আমিই জীবন্ত প্রস্রবণ: ছোট বা বড়, ধনী বা নির্ধন সকলেই এই প্রস্রবণ হইতেই জীবনধারা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যে স্বেচ্ছায় ও আনন্দে আমাকেই সেবা করে সে আমার প্রসাদ লাভ করে।

উচ্চতর ভাববাদ এই আপাত বিরোধের মীমাংসা করিতে সক্ষম

মানুষ যখন ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে, তখনই সে বাস্তবিক পক্ষে স্বাধীন

"সুতরাং যাহা কিছু শুভ, তাহার কর্তৃত্ব নিজে দাবি করিও না, অন্য কোন মানুষেও ইহা আরোপ করিও না। যাহা কিছু এই পৃথিবীতে আছে, তাহা আমাতেই সমর্পণ কর—আমি ভিন্ন মানুষের অন্য কোন সম্পত্তি নাই।"[১]

গীতায় ভগবান এই সর্বকর্ম ফল সম্পূর্ণ ই উপদিষ্ট হইয়াছে

"জীবাত্মা যা-কিছু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে পেয়েছে, তাই সে পরমাত্মার মধ্যে অসীমরূপে উপলব্ধি করতে চায়।

১ Thomas A Kempis—On the Imitation of Christ, Bk.ii, Ch. XI.

নিজের মধ্যে কী কী আমরা দেখছি ?
প্রথমে দেখছি আমি আছি, আমি সত্য।

তার পরে দেখছি, যেটুকু এখনই আছি এই টুকুতেই আমি শেষ নই। যা আমি হব, যা এখনও হই নি, তাও আমার মধ্যে আছে। তাকে ধরতে পারিনে, ছুঁতে পারি নে, কিন্তু তা একটি রহস্যময় পদার্থরূপে আমার মধ্যে রয়েছে।"[১০] যীশুখ্রীষ্ট মানবাত্মার আদর্শকে পরমাত্মার মধ্যে স্থাপন করিয়া, সেই দিকেই আমাদের লক্ষ্য স্থির করিতে বলিয়াছেন। সেই সম্পূর্ণতার মধ্যেই আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। মানুষের স্বাধীনতা বিশ্বচরাচরের সঙ্গে একাত্মবোধে, ভূমার মধ্যে আত্মাকে আবিষ্কারের মধ্যে।

মানুষের স্বাধীনতা বিশ্ব-চরাচরের সঙ্গে একাত্মবোধে, ভূমার মধ্যে আত্মাকে আবিষ্কারের মধ্যে

ব্যক্তি স্বাধীন, যেহেতু সেই 'ভূমা'র বোধ তাহার মধ্যে আছে—তাই সেই বৃহতের আহ্বানে সে নিজ ক্ষুদ্র ইচ্ছা ও কর্মকে সেই ভূমা অভিমুখেই পরিচালনা করে।

বিশ্বজগৎ সর্বত্র নিয়মের অধীন, এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে এই দুইয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। প্রয়োজন, কথা দুইটির প্রকৃতি ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা।[১১]

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শান্তিনিকেতন : সমগ্র এক

১১। ...necessity, rightly understood does not exclude freedom, rightly understood ..the true or proper meaning of freedom is freedom as opposed to compulsion ; and the true and proper meaning of necessity is necessity as opposed to contingency. Thus freedom being opposed to compulsion, and necessity to contingency, there is no antithetical opposition between freedom and necessity. Determinism maintains the uniformity of nature or necessity as opposed to contingency, not to freedom ; and therefore a determinist is perfectly at liberty to maintain the freedom of the will...... By freedom whether of the will or anything else, men at large mean freedom from compulsion. What know they or care they, about uniformity of nature or predestination or reign of law ? Shadworth Hodgson—Mind, O. S. Vol VI, P. 111

(খ) আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস—

এই বিশ্বাসও নৈতিক জীবনের একটি মূল ভিত্তি। জীবন নিত্য পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসরমান। এই জীবনে নৈতিক পরিপূর্ণতা লাভ হইতে পারে না। তাই এ জীবনের পরও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করিতে হয়। মৃত্যুর সত্যতা অস্বীকার করিয়া এবং আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রমাণ করিয়া, মার্টিন্যু কতগুলি যুক্তি দিয়াছেন।

আত্মাব অমরতার স্বপক্ষে যুক্তি

(১) জড়বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মৃত্যু হইতেছে, বস্তুব রূপ পরিবর্তন মাত্র। যে শক্তি দেহরূপে ছিল, তাহা মৃত্যুর পবে পঞ্চভূতে নানা শক্তিতে মিশাইয়া যায়। কাজেই কোন শক্তিব মৃত্যু বা সম্পূর্ণ বিলোপ হইতে পারে না।

মৃত্যু শেষ নয়, রূপান্তর মাত্র

শক্তির অবিনশ্বরতাবাদ বলে, এক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু কোন শক্তির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন ঘটে না। যদি এই নিয়ম কেবলমাত্র জড দ্রব্যেব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে মানসিক শক্তি জডবস্তুর নিয়ম মানিতে বাধ্য নয়। জডশক্তির মৃত্যু বা অবসান হইতে পারে, কিন্তু মানসিক শক্তি দেহেব মৃত্যুর পরও অম্লান থাকিতে পারে। আর যদি বলা হয় যে, এই নিয়ম জড় এবং অজড সমস্ত শক্তির বেলাতেই প্রযোজ্য, তাহা হইলে বলা যায় যে, জড়শক্তির যেমন কখনো সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটিতে পারে না, মানসিক শক্তিরও সম্পূর্ণ অবলুপ্তি কখনও ঘটে না—দেহের মৃত্যুর পরও তাহা অবিকৃত অবস্থায় চলিতে থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও আত্মাব স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন।

জড়শক্তিব যেমন অবলুপ্তি নাই—মানস-শক্তিবও অবলুপ্তি নাই—আছে রূপ পবিবর্তন

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শশ্বতোহয়ং পুরানো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥[১২]

১২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২য় অধ্যায় ০

(২) বিশ্বজগতের ক্রমবিবর্তনে প্রত্যেক জীবাত্মারও নির্দিষ্ট স্থান ও কর্তব্য আছে। সেই স্থান ও কর্তব্য এক জীবনে সমাপ্ত হইতে পারে না। তাই ইহা বিশ্বাস করিতে হয় যে, জীবাত্মার পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ না হওয়া পর্যন্ত, অনন্তকাল তাহার অস্তিত্ব চলিতে থাকে।

এই জগতে সমস্ত কর্তব্য শেষ হয় না, তাই চাই অনন্ত জীবন

(৩) বুদ্ধিমান ও নৈতিক জীব হিসাবে মানুষের অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে, এই জীবনই শেষ নয়। অমৃতত্বের জন্য মানুষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, অলীক স্বপ্ন হইতে পারে না। মার্টিন্যু এই অন্তরের প্রত্যয়কে vaticinations of the intellect, vaticinations of the conscience এবং vaticinations in suspense এই তিন দলে ভাগ করিয়াছেন।

মানুষের অন্তরের মধ্যে আছে অমৃতত্বের আকাঙ্ক্ষা—তাহা মিথ্যা নয়

(a) **Vaticinations of the intellect**—আমাদের মন ও বুদ্ধি দেশে ও কালে সীমিত। কিন্তু ইহার বিকাশের ও উন্নতির সম্ভাবনার কোন শেষ নাই। কিন্তু এই দেহে যতক্ষণ আমরা আবদ্ধ, ততক্ষণ এই উন্নতি দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ, কাজেই এ প্রত্যাশা অসঙ্গত নয় যে, মৃত্যুর পরও আমাদের বুদ্ধির বিকাশ অনন্তকাল অবধি চলিতে থাকিবে, যতদিন না দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া বুদ্ধি নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

মন ও বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এই জীবনের পরেও জীবন স্বীকার করিতে হয়

(b) **Vaticinations of the conscience**—আমাদের বিবেকেরও এ প্রত্যয় আছে যে নৈতিক জীবনে উন্নতি ও পরিপূর্ণ বিকাশের কোন সীমা নাই। সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, ধৈর্য যে কোন নৈতিক আদর্শেরই আগো উঁচু, তার চেয়েও উঁচুর দিকে ইঙ্গিত আছে। এই মরজীবনে নৈতিক আদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব নয়, তাই অনন্ত জীবনে বিশ্বাস একান্ত সঙ্গত। কান্টের যুক্তি আর এক প্রকার তাহা পূর্বেই আলোচনা করা গিয়াছে।

নৈতিক আদর্শেরও কোন শেষ সীমা নাই—এই জীবনে নৈতিক আদর্শের সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না

এই জীবনে ন্যায়ানুসরণ ও সুখের মধ্যে সমতা বিধান হয় না। ন্যায়-বিচারক ভগবান পরকালে সাধুকে পুরস্কৃত করেন, অসাধুকে দণ্ড দেন। তাই এই জীবনের পরও জীবন স্বীকার করা প্রয়োজন। কান্টের এই যুক্তিকেই মার্টিন্যু **Vaticinations in suspense** বলিয়াছেন।

(গ) **ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস**—কাণ্ট বলিয়াছেন যে শুদ্ধ বুদ্ধি ও যুক্তিবিচার দ্বারা, ভগবানের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু মানুষের নৈতিক প্রকৃতির মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল। একজন মঙ্গলময় শেষ বিচারক আছেন, যিনি দুষ্টের দণ্ড বিধান করেন, সাধু কার্যের পুরস্কার দান করেন—এই বিশ্বাস না থাকিলে পৃথিবীতে কেহ সৎকাজ করিত না।

শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু মানুষের নৈতিক প্রকৃতির মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল

সেথ্‌ বলেন, নৈতিক জীবনের সমস্ত উদ্যমের মূলে, যাহা আছে, যাহা বাস্তব,—তাহার সম্বন্ধে অসন্তোষ, এবং যাহা হওয়া উচিত, যাহা সম্ভব, তাহার সম্বন্ধে অদম্য আগ্রহ। এই যে বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে বিরোধ, তাহা চিরদিন অমীমাংসিত থাকিবে, ইহা হইতেই পারে না। এমন স্থান আছে যেখানে এই বিরোধ মিটিয়া গিয়াছে, এমন কেউ আছেন যিনি সমস্ত আদর্শের পূর্ণতম প্রকাশ,—ইহা একটি আলেয়া, বা কবিকল্পনা হইতে পারে না।[১৩]

ভগবান শেষ বিচার করিয়া সাধুকে পুরস্কৃত করিবেন, সমস্ত নৈতিক কর্মের পশ্চাতে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল

বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে বিরোধ চিরন্তন হইতে পারে না, একজন আছেন যাঁহার মধ্যে আদর্শের পূর্ণতম প্রকাশ

মার্টিন্যু যে নৈতিক প্রমাণ দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন তাহা এইরূপ: আমাদের কর্তব্যবোধের মধ্যে একটা বাধ্যতা আছে—ইহা উচিৎ, তাই ইহা আমাকে করিতেই হইবে। কিন্তু এই বাধ্যতা কাহার কাছে? অন্য কোন ব্যক্তি বা সমাজ বা রাষ্ট্র, মানুষের সমস্ত কর্তব্যের পশ্চাতে বাধ্যতার উৎস হইতে পারে না। আমি নিজেও নিজের কাছে এই বাধ্যতা দাবি করিতে পারি না, কাজেই সমস্ত কর্তব্যকর্মের পশ্চাতে যে বাধ্যতার দাবি, তাহার আধার একমাত্র সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ভগবানই হইতে পারেন।

কর্তব্যবোধের মধ্যে একটা দায় আছে—সে দায় কোন ব্যক্তির কাছে নয়, ভগবানের কাছে

১৩। The moral life is, in its essence, an ideal life—a life of aspiration after the realization of that which is not yet attained, determined by the unceasing antithesis of the 'is' and the 'ought to be.' What then, is the source and warrant of this moral ideal this imperious 'ought to be'? To answer that it is entirely subjective, the moving shadow of our actual attainment, would be irrevocably to break the spell of the ideal, and to make it a mere foolish will-o'-the-wisp which once discovered could cheat us no longer out of the sensual satisfaction with the actual. An ideal with no foothold in the real would be the most unsubstantial of all illusions. Seth—A Study of Ethical Principles

কোন সসীম মানুষের মধ্যেই আদর্শের পূর্ণতা সম্ভব নয়, অথচ এই আদর্শ মিথ্যা কল্পনা নয়, কাজেই বিশ্বাস করিতেই হয় যে ভগবানই একমাত্র সেই পরিপূর্ণতা। জড়জগতে যেমন, নৈতিক জগতেও তেমনি, ভাল, আরো ভাল, তার চেয়েও ভাল, এ রকম শ্রেণীবিভাগ আছে। উচ্চতর যাঁহারা, তাঁহারা তাঁহাদের নিম্নের সকলের উৎসাহ ও উদ্যমের উৎস। ভগবান হইতেছেন, সেই সব চেয়ে ভালর আদর্শ, যাহা সমস্ত নৈতিক আদর্শের মূল্য নির্দেশ করে।

ভগবান হইতেছেন সমস্ত আদর্শের পূর্ণতা, সমস্ত নৈতিক উদ্যমের উৎস

এই আদর্শ অবাস্তব ও নৈর্ব্যক্তিক হইতে পারে না। তাহা নিশ্চয়ই কোথায়ও না কোথায়ও বাস্তব ব্যক্তিরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।—আদর্শের পরিপূর্ণতার সেই ব্যক্তিরূপই ভগবান্। ইহা কোন সসীম জড়বস্তুতে রূপায়িত হইতে পারে না—ইহা নিশ্চয়ই কোন চিৎসত্তা হইতে হইবে।[১৪]

এই আদর্শ পরিপূর্ণতা কল্পনা মাত্র হইতে পারে না, তাহা নিশ্চয়ই বাস্তবে রূপ পাইয়াছে—সেই বাস্তব রূপই ভগবান

সংক্ষিপ্তসার

নীতিচিন্তা কেবল মাত্র কল্পনানির্ভর নয়, তাহাদের দার্শনিক সত্য ভিত্তি থাকিতে হইবে। সমস্ত বিজ্ঞানের মতো নীতিবিদ্যারও মূল সূত্রগুলি দর্শনের উপর নির্ভরশীল। দার্শনিক বিচার দ্বারা তাহাদের সত্যতা প্রমাণ করিতে হয়: সদ্বস্তু সম্বন্ধে দার্শনিক মত নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করে। নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্য আচরণের মূল্যবিচার এবং সমস্ত প্রকার মূল্যের (values) আলোচনা দর্শনের বিষয়বস্তু।

প্রত্যেক বিজ্ঞানের মতো নীতিবিদ্যারও পশ্চাতে থাকে, কতগুলি মূল ধারণা (fundamental concepts) যেগুলি প্রমাণ ব্যতীতই গৃহীত হয়। নীতিবিদ্যার গোড়াতেও আছে এমন তিনটি অপ্রমাণিত মৌলিক ধারণা, যেগুলি স্বীকার করিয়া না নিলে, নৈতিক কর্ম বা নৈতিক বিচার অসম্ভব হয়। এই তিনটি ধারণাকে বলা হয় Postulates of morality. এই তিনটি postulates হইতেছে (ক) ব্যক্তি-স্বাধীনতা, (খ) আত্মার অমরত্ব, (গ) ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

(ক) ব্যক্তির ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা না থাকিলে, তাহার কৃতকর্মের জন্য তাহাকে দায়ী করা যায় না। তাহা হইলে নৈতিক জীবন অসম্ভব হয়।

১৪। A moral ideal can exist nowhere and nowhere but in a mind; an absolute moral ideal can exist only in a Mind from which all reality is derived. Rashdall—Theory of Good & Evil, Vol. II, P. 212

(খ) এই জীবনে নৈতিক আদর্শের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে এই ইহজীবনের পরেও পরলোকে নৈতিক আদর্শের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য অনন্তকাল আত্মার উদ্যম চলিতে থাকে।

(গ) এই জীবনে নৈতিক জীবন ও সুখের মধ্যে সমন্বয় হয় না। আমরা দেখি এই পৃথিবীতে সাধুব্যক্তিরা দুঃখ পায়, দুষ্ট লোকেরা সুখ ও আরাম ভোগ করে। কিন্তু মানুষের নৈতিক চেতনার পশ্চাতে আছে এই প্রতীতি যে, কোন দিন না কোন দিন সুবিচার হইবে, যেদিন ধর্মের জয় হইবে। কাজেই মানিতে হয় যে, একজন চরম সুবিচারক ভগবান্ আছেন, যিনি সুদূর কোন পরকালে সাধুকে পুরস্কৃত করেন ও দুষ্টকে দণ্ডদান করেন: মানুষের অন্তরের এই দৃঢ় প্রতীতি মিথ্যা হইলে কেহই ধর্ম ও নীতির পথে বিচরণ করিত না।

(ক) মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে কিনা, এ বিষয়ে দুইটি বিপরীত মত আছে। প্রথম মত বলে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। ইহারা হইলেন বাধ্যতা-বাদী (determinists)। ইঁহারা বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক নিম্নলিখিত যুক্তি দেন :— (১) প্রকৃতির সর্বত্রই কারণ কার্যের দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত—কোথায়ও ইহার ব্যতিক্রম নাই। মানুষের ইচ্ছা ও কর্মও স্বাধীন নয়, পূর্ববর্তী কতগুলি অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। (২) শক্তির অবিনশ্বরতা বিজ্ঞানের একটি মৌলিক বিশ্বাস। মানুষ স্বাধীন ইহা মানিলে, ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, মানুষ ইচ্ছা করিলে নূতন কোন শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে অথবা কোন শক্তির ক্রিয়াকে ধ্বংস করিতে পারে। ইহা অসম্ভব। (৩) ব্যক্তির ইচ্ছা ও কর্ম তাহার দৈহিক ও মানসিক গঠনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এগুলি আবার নির্ভর করে বংশধারা (heredity) এবং পরিবেশের (environment) উপরে। এগুলির উপর মানুষের কোন হাত নাই। বরঞ্চ মানুষ বংশধারা ও পরিবেশ দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে প্রভাবিত। (৪) মানুষ যে স্বাধীন নয় তাহার একটি প্রমাণ এই যে, কোন মানুষের চরিত্র ও পরিবেশ জানিলে তাহার ভবিষ্যৎ কর্ম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। (৫) জড়বাদীরা বলেন যে, অণুপরমাণুর সংযোগ-বিয়োগে এবং জড়শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে পৃথিবীতে সমস্ত ঘটনা ঘটে, মানুষের মানস জগতের ক্রিয়াও একই কার্য-কারণের কঠোর শৃঙ্খলে বাঁধা। কোথায়ও স্বাধীনতা নাই। (৬) স্পিনোজা বা শঙ্করের মতো ব্রহ্মৈকবাদীরা বলেন, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ ও মানুষের স্বাধীনতাবোধ মায়া মাত্র। (৭) ভগবানই একমাত্র কর্তা, আমাদের সমস্ত ইচ্ছা ও কর্মই তাঁহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত—তিনিই একমাত্র যন্ত্রী, আমরা সকলেই তাঁহার যন্ত্র মাত্র।

স্বাধীন ইচ্ছার সত্যতায় যাঁহারা বিশ্বাসী (Free willists), তাঁহারা উপরের যুক্তিগুলি নিম্নলিখিত ভাবে খণ্ডন করেন এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন—(১) মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে, ইহার অর্থ কার্য-কারণ শৃঙ্খল অস্বীকার করা নয়। মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কতগুলি পূর্ব অবস্থা আছে, তাহা অস্বীকার করা হইতেছে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অর্থ হইল এই যে তাহার বাহিরের শক্তি দ্বারা তাহার ইচ্ছা ও কর্ম প্রভাবিত হইলেও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত নয়; ব্যক্তিত্ব একটি স্বতন্ত্র শক্তি। সেই স্থির করে, তাহার কোন আকাঙ্ক্ষার পথ সে গ্রহণ করিবে। মানুষের কর্ম তাহার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত, তাহা সত্য নয়। তাহার পরিবেশকেও সে অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ করে, সেই

স্থির করে পরিবেশের কোন্ শক্তিকে সে স্বীকার করিবে। সে প্রকৃতির হাতে ক্রীড়নক নয়। (২) শক্তির অবিনশ্বরতা জড়শক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, মনোজগতের নিয়ম পৃথক। আর ইহা যদি স্বীকার করা যায় যে মানস শক্তি জড়শক্তিতে পরিণত হইতে পারে, জড় জগতে পরিবর্তন আনিতে পারে, তবে শক্তির অবিনশ্বরতাবাদ নূতন মর্যাদা লাভ করিবে। (৩) ভগবানই একমাত্র সত্য, কিন্তু জগৎ ও জীবন মিথ্যা নয়। তাহারও ভগবানেরই বিভাব। (৪) ভগবানই চূড়ান্ত কর্তা, কিন্তু তিনিই মানুষকে নৈতিক জীবনের অধিকারী করিবার জন্য স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন। (৫) স্বাধীন ইচ্ছা যে মানুষের আছে, তাহার সপক্ষে সবচেয়ে প্রবল যুক্তি এই যে, এই বোধ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে প্রত্যক্ষ। (৬) মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা না থাকিলে নৈতিক জীবনই অসম্ভব হইত। (৭) নৈতিকতা ও ধর্মের মধ্যে আপাতবিরোধ আছে—নীতি অহংএর প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী, ধর্ম আত্মসমর্পণে বিশ্বাসী। উচ্চতর ভাববাদ (higher idealism) এই বিরোধ মীমাংসা করিতে সক্ষম। মানুষ যখন ভগবানের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখনই সে বাস্তবিক স্বাধীনও আত্মপ্রতিষ্ঠিত।

(খ) আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত যুক্তি দেওয়া হইয়াছে—(১) মৃত্যু দেহের অবসান, কিন্তু ইহাই শেষ নয়, ইহা নূতন জীবনে উত্তরণ। জড়শক্তির যেমন অবলুপ্তি নাই, মানস শক্তিরও তেমনি অবলুপ্তি নাই, আছে রূপ পরিবর্তন। (২) এই জীবনে সমস্ত কর্তব্যের শেষ হয় না, তাহার জন্য প্রয়োজন অনন্ত জীবন। (৩) মানুষের অন্তরে অমৃতত্বের যে নিয়ত আকাঙ্ক্ষা তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। (৩) নৈতিক আদর্শের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এই সীমাবদ্ধ জীবনে সম্ভব নয়—সেই জন্য অনন্ত জীবন ও অনন্ত উদ্যম প্রয়োজন।

(গ) ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সপক্ষে শ্রেষ্ঠ হইতেছে নৈতিক (moral arguments) —(১) শুদ্ধ যুক্তি দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু মানুষের নৈতিক চেতনার মধ্যে এই প্রত্যয় বদ্ধমূল। ভগবানই সমস্ত কর্মের চূড়ান্ত বিচারক—তিনি আছেন তাই ধর্মের জয় সুনিশ্চিত। (২) বাস্তব ও আদর্শের বিরোধ চিরন্তন হইতে পারে না। ভগবানেই সমস্ত আদর্শ পরিপূর্ণ বাস্তব রূপ নিয়াছে। (৩) কর্তব্যবোধের মধ্যে যে দায় আছে, তাহা কোন সসীম ব্যক্তির কাছে নয়, ভগবানের কাছে। (৪) ভগবানই হইতেছেন সমস্ত নৈতিক উদ্যমের উৎস—তিনিই সমস্ত নীতি ও ধর্মের অসংশয়িত ভিত্তি।

Questions

1. What is the meaning of the term—Moral Postulates. What are these postulates? Show why these postulates form the basis of moral consciousness.

2. Discuss criticially the arguments in favour of and against freedom of the will. Why is belief in freedom essential to moral life?

3. Is the soul immortal? What are the grounds of this belief?

4. Critically discuss the moral arguments in support of the existence of God.

বিংশ অধ্যায়

অধিকার ও কর্তব্য

[Moral ideas must be translated into practice—Ideal of Justice—Distributive & Retributive—Justice & equity—Rights & obligations—Fundamental Human Rights—Fundamental obligations—Duties of Perfect & Imperfect obligation—Bradley's concept of stations in life and corresponding duties—Conflict of duties—Casuistry—Moral Virtues—Virtue & Knowledge—Virtue & Social Purpose—Cardinal Virtues—Virtues in the modern world—Aristotle's conception of virtues as the golden mean]

নৈতিক জীবনের আদর্শ নির্ণয়ে আমরা কতকগুলি সাধারণ মৌলিক নীতি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু নৈতিক আদর্শগুলি আলমারীতে সাজাইয়া রাখিবার বস্তু নয়, তাহা জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য।

নৈতিক আদর্শগুলি জীবনের বাস্তব পরিবেশে প্রয়োগযোগ্য

সমস্ত নৈতিক জীবনের আধার হইতেছে সমাজের বাস্তব পরিবেশ। সেই আধারেই সমস্ত নৈতিক গুণগুলির বিকাশ ঘটে। নানা সামাজিক সম্বন্ধ, সামাজিক সংস্থা, প্রথা ও আচারের মধ্য দিয়াই নৈতিক আদর্শ বাস্তব তাৎপর্য লাভ করে।

সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির স্থান (station in life) নির্দিষ্ট আছে এবং বিভিন্ন সম্বন্ধের সূত্রে বিভিন্ন কর্তব্যও নির্দিষ্ট আছে। যেমন, যিনি সন্তানের পিতা, পরিবারে তাঁহার নির্দিষ্ট স্থান, মর্যাদা ও অধিকার আছে। সন্তানেরা এবং পরিজনেরা তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিবে, ইহা তাঁহার প্রাপ্য অধিকার। আবার সংসারের কর্তা হিসাবে, তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্বও আছে।

সমাজে প্রত্যেকের বিভিন্ন স্থান ও কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে

নীতিবিদ্যা আলোচনায় এই অধিকার ও কর্তব্যের আলোচনা করিতেই হইবে। এই অধিকার ও কর্তব্যের ভিত্তিতেই নৈতিক আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ।

ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাই যায় না, সুতরাং কর্তব্য শুধু ব্যক্তির নয়, সমাজেরও। যখন বলি, ব্যক্তির কোন এক বিশেষভাবে কাজ করা উচিত, তখন সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দাবি করি যে, সমাজ-ব্যবস্থাও উপযুক্ত প্রকার হওয়া প্রয়োজন। যে ব্যক্তি তাঁহার কর্তব্য করেন, তাঁহাকে সৎলোক

বলিয়া আমরা সম্মান করি এবং যে সমাজ-ব্যবস্থায় বহু সৎলোকের উদ্ভব, তাহাকে আমরা প্রশংসা করি।[১]

সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ আদর্শ—ন্যায়পরতা

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, বা ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যে সম্বন্ধের আদর্শকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, তাহাকে এক কথায় বলা যায় ন্যায়পরতা (Righteousness) বা সুবিচার (Justice)। এই সম্বন্ধটির স্বরূপ কি? কোন সমাজ এই গুণের অধিকারী?

ন্যায়পরতা বা সুবিচার—সেই সমাজেই সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যেখানে কেহ কাহারও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধা দেয় না, বরং যেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে সহায়ক হয়। যে সমাজে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অলস বিত্তশালী ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, এবং যেখানে বৃহৎ জনসংখ্যা সেই মুষ্টিমেয়ের আরাম ও বিলাসের উপকরণ জোগাইতে, ক্ষুধার্ত দেহে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, নিঃসন্দেহেই বলা যায় সে সমাজে সুবিচার নাই। যে সমাজে বহু ব্যক্তি শিক্ষার সুযোগ পায় না, যে সমাজে স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ হইতে বহু মানুষ বঞ্চিত, সে সমাজে নিশ্চিতই সুবিচারের অভাব আছে।

যে সমাজে ব্যক্তির পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠনের উপযোগী অবস্থা বর্তমান—যেখানে কেহ কাহাকেও নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য শোষণ করে না, সেখানে আছে সুবিচার

অ্যারিস্টটল্ সুবিচারকে দুই দলে ভাগ করিয়াছেন—Distributive এবং Retributive. **Distributive justice** হইতেছে সমাজের বিত্ত ও সুযোগ-সুবিধা বণ্টনে সাম্য। যে সমাজে সবাই সমানভাবে বাঁচিতে পারে, শিক্ষা পাইতে পারে, চিকিৎসার সমান সুযোগ পাইতে পারে, জীবিকা অর্জনের সমান সুযোগ পাইতে পারে, দেশের শাসন ও পরিচালন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের সমান সুযোগ পাইতে পারে, সেই সমাজে সুবিচার আছে বলা যায়।

Distributive justice: সমাজের বিত্ত ও ক্ষমতা বণ্টনে সকলকে সমান সুযোগ দান

১। We must consider the ideal man as existing in the ideal social state.—H. Spencer

Retributive justice হইতেছে, প্রত্যেকেই তাহার কর্মের উপযুক্ত ফল ভোগ করিবে। শ্রমিক পরিশ্রম করিলে, ন্যায্য মজুরী যদি পায়, তবে সে সন্তুষ্ট থাকে যে তাহার কর্মের প্রাপ্যফল সে পাইয়াছে। আবার চোরের যখন শাস্তি হয়, তখনও তাহার কোন ক্ষোভ থাকে না, কারণ সে জানে যে, তাহাকে নিজ অপকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।[২]

Retributive justice: প্রত্যেক নিজ প্রেম ও কর্মের ফল ভোগ করিবার সুযোগ পাইবে

প্লেটোর মতে, 'সুবিচার হইতেছে, নিজ নিজ সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ কাজ করিবার ক্ষমতা'। কাজেই যখন আমার ন্যায্য কর্মের অধিকারে কেউ অযথা হস্তক্ষেপ করে, তখন সে আমার প্রতি অবিচার করে। কাজেই প্লেটোর মতে, সুবিচার করিতে গেলে, স্বাধীনতার আবহাওয়া থাকা প্রয়োজন।[৩]

সেথ্ বলেন, খ্রীষ্টীয় দুইটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ—সুবিচার ও হৃদয়বত্তা (justice & benevolence) একটি আর একটির সোপান। সুবিচার বলে, "দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ—an eye for an eye and a tooth for a tooth", আর হৃদয়বত্তা বলে—"মেরেছিস্ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?" প্রকৃত সংস্কৃতিবান্ হইতে গেলে, যেমন সংযমী হওয়া প্রয়োজন, তেমনি প্রকৃত হৃদয়বান হইতে গেলে, ন্যায়পরায়ণ হইতে হয়। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিলে সুবিচার হয়, কিন্তু যে অক্ষম তাহাকে অন্নদান করিলে, তাহা হইল হৃদয়বত্তা। শাইলক্ যখন তাহার প্রাপ্য এক পাউণ্ড মাংস দাবি করে, তখন সে সুবিচারের ভূমিতে দাঁড়াইয়াছে আর বুদ্ধদেব যখন বলিলেন

খ্রীষ্টীয় দুইটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ—সুবিচার ও হৃদয়বত্তা। সুবিচার বলে, সকলকে তাহার প্রাপ্য দাও ; হৃদয়বত্তা বলে পাপীকেও ভালবাসা দাও

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং॥

তখন তিনি হৃদয়বত্তার উচ্চতর ভূমি হইতে কথা বলিলেন।[৪]

২। Aristotle—Nicomachean Ethics, V, iii, IV

৩। Plato—Republic, Bk. IV. 433e.

৪। ধম্মপদ

বাস্তবিক পক্ষে হৃদয়বত্তা (benevolence) ন্যায়পরতারই পরিপূর্ণ প্রকাশ। ন্যায়পরতা, সামাজিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সমতার স্বীকৃতি। বাইবেলের এই বাণী, 'তোমার প্রতিবেশীকে তোমার নিজ জন মনে করিয়া ভালবাস'—ইহাই হইল ন্যায়পরতার মর্মকথা। এই আত্ম বোধেরই পরিণতি হৃদয়বত্তায়। এক হিসাবে বলা যায়, ন্যায়পরতার দৃষ্টিভঙ্গী নিষেধাত্মক—'অপরকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিও না', আর হৃদয়বত্তার দৃষ্টিভঙ্গী হইতেছে নির্দেশাত্মক—'অপরকে হৃদয় দিয়া ভালবাস।' দুইটি গুণেরই প্রকাশের ক্ষেত্র হইতেছে সমাজ সম্বন্ধ, কিন্তু এখানেও একটি প্রভেদ আছে। ন্যায়পরতার দৃষ্টিভঙ্গী গোষ্ঠিজীবনের সমৃদ্ধতায় আর হৃদয়বত্তার দৃষ্টিভঙ্গী হইতেছে ব্যক্তিজীবনের বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে।[৫]

হৃদয়বত্তা ন্যায়পরতারই পরিপূর্ণ প্রকাশ

Justice & Equity—সুবিচারের আদর্শকে সমাজের বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে হইলে (Retributive justice) তাহাকে নির্দিষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হয়, ইহাকেই বলা হয় Law বা Jurisprudence। আইন ব্যক্তির অধিকার নির্দিষ্ট করে, অন্যের অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধকে সংজ্ঞা দ্বারা চিহ্নিত করে, বিচারের প্রণালী প্রণয়ন করে, কখন কোন্ অপরাধে কি পরিমাণ শাস্তি বিধান করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করে।

অধিকার যেখানে নির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ তাহা Law

কিন্তু মানুষের সমস্ত অধিকার কাগজে-কলমে নির্দেশ করা যায় না, সব অধিকার লঙ্ঘনে শাস্তিও সুস্পষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট করা যায় না। তাই লিখিত আইনের উপরও বিচারকের ন্যায়-বুদ্ধির উপর কিছুটা ছাড়িয়া দিতে হয়। এই যে অলিখিত সুবিচারের বিধান, তাহাকে বলা হয় Equity।[৬]

অলিখিত সুবিচারের বিধান হইল equity

৫। তাই Seth বলিয়াছেন, Benevolence is more just than justice, because it is enlivened by the insight into that 'inequality' and uniqueness of individuals which is no less real than the 'equality' of persons. Seth—A Study of Ethical Principles, P. 276

৬। Term denoting moral right or justice. Something based on the law of nature, not on legislation. In England in early days, there were many cases, where right could not be done, or wrong redressed, by the processes of the ordinary law. It became the custom to refer such cases to the Chancellor as the Keeper of the King's conscience. Ignoring the common law, he gave decisions according to the principles of equity and in time a body of law and precedents grew up which was known as equity. The New Standard Encyclopaedia, P. 452

Rights and obligations—প্রত্যেক সুপরিচালিত সমাজ বা রাষ্ট্রে ব্যক্তিদের স্থান ও অধিকার নির্দিষ্ট থাকে। সেই অধিকার অন্য সকলের কাছে মর্যাদার যোগ্য। সমাজে পিতার নির্দিষ্ট স্থান আছে; মাতা ও শিক্ষকেরও নির্দিষ্ট স্থান আছে। প্রত্যেক স্থানের উপযোগী অধিকারও তাহাদের আছে, সেই অনুযায়ী মর্যাদাও তাঁহাদের প্রাপ্য। স্থান (station) অনুযায়ীই অধিকার ও মর্যাদা। সকলের সব অধিকার নাই, সব মর্যাদাও সকলের প্রাপ্য নয়। শিশু পিতা মাতার অধিকার ও মর্যাদা দাবি করিতে পারে না, ছাত্র শিক্ষকের প্রাপ্য সম্মানের অধিকারী নয়।

সমাজে প্রত্যেকের স্থান অনুসারে অধিকার নির্দিষ্ট

কিন্তু অধিকার আপনিই আসে না—তাহা অর্জন করিতে হয়। পিতা সন্তানের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করেন। শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করেন,—এবং এ কর্তব্য পালন সুষ্ঠুভাবে করিলে, তবেই তিনি উপযুক্ত শ্রদ্ধার অধিকারী হন। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে যুক্ত। যিনি কেবলই অধিকার দাবি করেন, কিন্তু যিনি নিজ স্থানানুযায়ী কর্তব্যে পরাঙ্মুখ, তিনি শ্রদ্ধালাভে বঞ্চিত হন।

অধিকার উপযুক্ত কর্তব্য সম্পাদন দ্বারাই অর্জন করিতে হয়

অধিকার ও কর্তব্যের সম্বন্ধটি আমরা দুই ভাবে দেখিতে পারি। পিতা-মাতা ও শিক্ষকের যেখানে অধিকার আছে, সেখানে অন্যদিকে সন্তান ও ছাত্রদের তাঁহাদের প্রতি কর্তব্য আছে। আবার পিতা-মাতা-শিক্ষকের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই আছে, তাহাদের নিজেদেরও কর্তব্য—সন্তানের প্রতি, ছাত্রের প্রতি। আর এক ভাবেও সম্বন্ধটি দেখিতে পারি। যখন আমি স্বাধীন নাগরিক হিসাবে কতগুলি অধিকার দাবি করি, (যথা স্বাধীন চিন্তার অধিকার, যথেচ্ছ ভ্রমণের অধিকার, দল গঠনের অধিকার, নিজ পছন্দমতো জীবিকার পথ বাছিয়া নিবার অধিকার) তখনই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অন্যের অনুরূপ অধিকারের দাবিও স্বীকার করিতে হয়। স্বাধীন নাগরিক হিসাবে অন্যদেরও স্বাধীন চিন্তার অধিকার, যথেচ্ছ ভ্রমণের অধিকার আমাদের মানিয়া নিতে হইবে, তাহাদের বাধা দিবার অধিকার আমাদের নাই।

অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে যুক্ত—পিতার যেখানে অধিকার, সন্তানের সেখানে কর্তব্য

আবার অধিকার দাবি করিলে অন্যের অনুরূপ অধিকার স্বীকার কর্তব্য

কিন্তু আরও গভীরতর অর্থে অধিকার কর্তব্যের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের কোন অধিকার একা ভোগ করিবার জন্য নহে,—সব অধিকারই বহুর সুখ ও কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত। আমার খাদ্যগ্রহণ দ্বারা সুস্থ দেহে বাঁচিবার অধিকার আছে— যাহাতে আমি যথাসময়ে সমাজের সেবার যোগ্য হইতে পারি। বিত্তভোগের অধিকার আমার আছে, কিন্তু সেই অধিকার সমাজের কল্যাণের সঙ্গে অবশ্য যুক্ত হইতে হইবে। আইন ব্যক্তির অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু সেই অধিকার কোন অবস্থায়ই সমাজের হিতের বিরোধী হইতে পারে না। নীতি ও আইন মানুষের সেই অধিকারই কেবলমাত্র স্বীকার করিবে, যাহা ব্যক্তির ও সমাজের সম্পূর্ণ বিকাশের পক্ষে উপযোগী।[৭]

কোন অধিকারই একার ভোগের জন্য নহে—সব অধিকারই বহুর সুখ ও কল্যাণের সহিত যুক্ত

ব্যক্তির মৌলিক অধিকার—ব্যক্তির মূল্য আছে, এবং ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, ইহা স্বীকার করিলে, তাহার কতগুলি মৌলিক অধিকারও স্বীকার করিতে হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় মানুষের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে যে ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে, এবং তাহার পর হইতে যে সমস্ত জাতি সংগ্রাম বা বিপ্লবের মধ্য দিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই সংবিধানে মানুষের মৌলিক কতগুলি অধিকার লিপিবদ্ধ করে। আমেরিকার Declaration of Independenceএ এই জাতীয় ঘোষণা আছে। রাষ্ট্রসংঘ সৃষ্টিকালেও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও চার্চিল কর্তৃক—মানুষের পাঁচটি স্বাধীনতা (five freedoms) রক্ষা সমস্ত রাষ্ট্রের কর্তব্য ইহা স্বীকৃত হইয়াছিল।[৮] আমাদের ভারতীয় সংবিধানেও প্রত্যেক নাগরিকের কতগুলি মৌলিক অধিকার (Fundamental rights) সম্বন্ধে সর্বোচ্চ আইনগত স্বীকৃতি আছে। নৈতিক জীব হিসাবে প্রত্যেক মানুষের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি স্বীকার করিতে হয়—(১) **জীবনের অধিকার**—প্রত্যেক মানুষের বাচিবার অধিকার আছে। যে রুগ্ন, যে অক্ষম, যে পাপী তাহাকেও বাঁচিতে দিতে হইবে,—তাহারও জীবিকার ব্যবস্থা

ব্যক্তির কতগুলি অধিকার মৌলিক বলিয়া স্বীকার করা হয়

৭। By himself, a man has no right to anything whatever. He is a part of the social whole; and he has a right only to that **which it is for the good of the whole that he should have.** MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 290

৮। Lillie—An Introduction to Ethics, Pp. 260-61

করিতে হইবে। পূর্বে স্পার্টাতে রুগ্ণ সন্তানদের পর্বতগাত্রে পরিত্যাগ করা হইত। আমাদের দেশে ধর্মের নামে নরবলির ব্যবস্থা ছিল, কন্যাসন্তানকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দেওয়া হইত। বহু দেশে যুদ্ধবন্দীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হইত, গত মহাযুদ্ধেও হিটলার জার্মানীতে বন্দীশিবিরে আবদ্ধ বহু সহস্র ইহুদীকে নিষ্করুণ ভাবে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষের জাগ্রত মানবতাবোধ ইহাকে গভীরতম পাপ বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। কিন্তু তথাকথিত সভ্য দেশে এখনও জীবনের প্রতি মারাত্মক মুষ্টিযুদ্ধ, ডুয়েল লড়াই, ভীষণ বিপজ্জনক মোটর রেসিং ইত্যাদি জনপ্রিয়, উত্তেজনা-সৃষ্টিকারী খেলা জনপ্রিয়। বাস্তবিক পক্ষে, এই সব খেলাতে উৎসাহ, জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার অভাবই সূচনা করে। একথাও বলা যায়, যে পর্যন্ত না প্রত্যেক ব্যক্তির বাঁচিয়া থাকিবার ও উপযুক্ত জীবিকার উপায় না হয়, সে পর্যন্ত জীবনের অধিকার প্রকৃত হইয়াছে ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। কাজেই জীবনের অধিকারের সঙ্গেই যুক্ত, জীবিকার জন্য শ্রমের অধিকার।[১]

(১) জীবনের অধিকার: প্রত্যেকের বাঁচিবার অধিকার আছে, আত্মরক্ষার অধিকার আছে

পূর্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক অধিকারের সঙ্গেই যুক্ত আছে, কতগুলি কর্তব্য। তাই জীবনের অধিকার দাবি করার সঙ্গেই নিজ জীবন ও অপরের বা অপরের জীবন অযথা বিপন্ন না করিবার দায়িত্বও স্বীকার করিতে হয়।

এই অধিকারের সঙ্গেই যুক্ত আছে অন্যের জীবন রক্ষার দায়িত্ব

(২) স্বাধীনতার অধিকার—নৈতিক জীবন স্বাধীনতা ভিন্ন সম্ভবপর নয়, এবং নৈতিক জীব হিসাবে মানুষের স্বাধীনতার স্বাভাবিক অধিকার আছে। দাসত্বপ্রথা মানব-স্বাধীনতা অস্বীকৃতির রূঢ়তম নিদর্শন। একদিন এই কুপ্রথা সব দেশেই প্রচলিত ছিল। সুখের বিষয়, এখন আফ্রিকা ও এশিয়ার সামান্য কয়েকটি অসভ্য দেশ ভিন্ন ইহা আইনতঃ পৃথিবীর সর্বত্রই নিষিদ্ধ। কিন্তু এখনও প্রায় কোন দেশেই যাহারা দরিদ্র ও কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, তাহারা স্বাধীন মানুষের মর্যাদা লাভ করে নাই।

স্বাধীনতা নৈতিক-গুণসম্পন্ন মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার

১। MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 290

সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার অধিকারও নাই, কাহারও থাকিতে পারে না। প্রত্যেকে নিজ ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বাধীনতাই শুধু দাবি করিতে পারে। অন্যের ব্যক্তিত্ব যাহাতে সঙ্কুচিত হয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, এমন কোন কাজের স্বাধীনতা ও অধিকার কাহারও থাকিতে পারে না। ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী বলিয়াই, স্বাধীনতার অধিকার মূল্যবান্। তাই স্বাধীনতার অধিকার তাহারই আছে, যে নৈতিক বিকাশের জন্য তাহা ব্যবহার করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক। মিল্টন তাই বলিয়াছেন, "যাঁহারা সৎ লোক তাঁহারাই কেবল স্বাধীনতাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসেন, অন্যেরা স্বাধীনতা ভালবাসে না, ভালবাসে স্বেচ্ছাচার। এবং স্বেচ্ছাচারী উৎপীড়কের অধীনেই স্বেচ্ছাচার বর্ধিত হইবার সুযোগ পায়। কাজেই স্বাধীনতার যিনি ভক্ত তাঁহাকে জ্ঞানবান্ ও সাধু হইতে হইবে।"[১০] আগুন ব্যবহারের স্বাধীনতা বুদ্ধিমতী ও কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীকে দেওয়া যায়, কিন্তু অবোধ শিশুকে এই স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। অন্য সমস্ত অধিকারের মতো স্বাধীনতার অধিকারের সঙ্গেও যুক্ত থাকে কর্তব্য ও দায়িত্ব। স্বাধীনতা সমাজকল্যাণে এবং ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশের কাজেই শুধু ব্যবহার্য। সেই জন্য স্বাধীনতা দান করা যায় না, গ্রহণ করাও যায় না। ইহা অর্জন করিতে হয়।[১১]

নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা কাহারও থাকিতে পারে না

স্বাধীনতা ভিন্ন নৈতিক গুণের বিকাশ হইতে পারে না

স্বাধীনতার সঙ্গেই যুক্ত আছে সমাজ-কল্যাণে ইহা ব্যবহারের দায়িত্ব

(৩) **সম্পত্তির অধিকার**—স্বাধীনতার অধিকারের সঙ্গেই যুক্ত, সম্পত্তির অধিকার। মানুষ নিজ বুদ্ধি বা শ্রম দ্বারা যাহা অর্জন করে, তাহা ভোগের অধিকার তাহার আছে। শ্রম দ্বারা যাহা উৎপন্ন করিতে হয়, তাহার জন্যও চাই প্রকৃতির দান, যাহাকে অর্থনীতিবিদ্‌রা বলিবেন ভূমি। এই ভূমি সমস্ত সম্পদের মূল। এই সম্পদের যে অংশে ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার, তাহাই সম্পত্তি। শুদ্ধ আদর্শবাদী সমাজতন্ত্রীরা বলিবেন, প্রকৃতির সমস্ত সম্পদে সকলের সমান অধিকার আছে, এমন কি কেহ কেহ বলিবেন, স্ত্রী-পুত্রও সমাজের

মানুষ নিজ শ্রম দ্বারা যাহা উৎপন্ন বা আহরণ করিল, তাহা ভোগের অধিকার তাহার আছে

১০। Milton—Tenure of Kings & Magistrates, § 1.

১১। MacKenzie—A Manual of Ethics, Pp. 291-92

সকলের সম্পত্তি। বর্তমান কালে কম্যুনিস্ট সমাজের দাবি এই যে, ভূমি বা প্রাকৃতিক সম্পদে কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার থাকিবে না। ইহা কতদূর সম্ভব এবং নীতিগতভাবে এ দাবি কতটা সমর্থনীয়, তাহা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এটুকুই বলা যায় যে, যে সমাজ ব্যবস্থায় বহু ব্যক্তি ভূমি বা সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত, যেখানে প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদের বণ্টনে গুরুতর বৈষম্য আছে, সে ব্যবস্থা অবশ্যই নিন্দনীয়। অন্যান্য সমস্ত অধিকারের মতো সম্পত্তির অধিকারের উদ্দেশ্য হইতেছে, ব্যক্তি ও সমাজের সুষম নৈতিক বিকাশ, এবং অন্য সমস্ত অধিকারের মতো সম্পত্তির অধিকারে সঙ্গেও

কম্যুনিস্টরা সম্পত্তির অধিকার অস্বীকার করেন

যুক্ত কতকগুলি কর্তব্য থাকে। এ বিষয়ে অ্যারিস্টটল্ যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সুগভীর চিন্তার পরিচায়ক। তিনি বলিয়াছেন স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি সমস্ত সম্পদে কাহারও কোন ব্যক্তিগত অধিকার থাকিবে না, ইহা অসম্ভব কথা। ইহাই বলা যায় যে, আদর্শ রাষ্ট্রে উৎপাদনের সমস্ত উপায় সকলের সমভাবে ব্যবহারের অধিকার বা সুযোগ সুবিধা থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের উপর এ দায়িত্বও থাকিবে, যাহাতে এই সম্পদ উৎপাদন ও ভোগের অধিকার সকলের সমবেত স্বার্থরক্ষার জন্যই ব্যবহৃত হয়।

যাহার সম্পত্তির অধিকার আছে, তাহার দায়িত্ব আছে সমাজকল্যাণে ইহার সুব্যবহারের

(৪) **চুক্তি করিবার অধিকার**—সুশৃঙ্খল সমাজজীবনে ব্যক্তিরা নানা বিচিত্র সম্বন্ধে যুক্ত হয় এবং এ সমস্ত সম্বন্ধের ভিত্তি অনেক ক্ষেত্রেই দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত, লিখিত ও অলিখিত চুক্তি। সরকারী বা বেসরকারী কোন চাকুরিতে যখন কোন লোক নিযুক্ত করা হয় তখন কতগুলি নির্দিষ্ট শর্ত দুই পক্ষই মানিয়া নিয়া, পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সমাজ এই চুক্তিকে মর্যাদা দেয়, ব্যক্তি এবং সংস্থা এই চুক্তির অধিকার স্বীকার করে, এবং ধর্মাধিকরণ এ প্রকার চুক্তির শর্ত কোন পক্ষ লঙ্ঘন করিলে, তাহার শাস্তির

ব্যক্তির নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য চুক্তি করিবার অধিকার আছে

ব্যবস্থা করে। অবশ্য, কাহারও এমন চুক্তি করিবার অধিকার নাই, যাহা নিজের বা অন্যের মানবিক মর্যাদাহানিকর। পেটের দায়ে, কেহ যদি আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া দাস হইবার জন্য, চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, অথবা সন্তানের ভরণপোষণের জন্য কোন নারী যদি সতীত্ব বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হয়, সমাজ এই অনৈতিক

কিন্তু এমন চুক্তি করা যাইবে না যাহা দ্বারা অপরের বা নিজের মানবিক মর্যাদার হানি হয়, অথবা সমাজের অকল্যাণ হয়

চুক্তি স্বীকার করিবে না। এই অধিকার সমাজস্বীকৃত, যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সহায়ক।

এই অধিকারের সঙ্গেই থাকে চুক্তি পালন করিবার দায়িত্ব। সু-শৃঙ্খল রাষ্ট্রেই স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার ও চুক্তির অধিকার উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করিতে পারে

যে কোন নৈতিক চুক্তি সম্পাদন করিবার অধিকার যেমন ব্যক্তির আছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর এ দায়িত্ব আছে যে চুক্তি সম্পাদন করিলে তাহা পালন করিতে হইবে। বিবাহ-সম্বন্ধে যুক্ত হইলে, স্বামীর যেমন স্ত্রীর সম্বন্ধে কতগুলি অধিকার জন্মায়, তেমনি স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, এবং তাহার সম্মান রক্ষার দায়িত্বও স্বামীকে স্বীকার করিতে হয়। সুস্থ, সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রেই স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার ও চুক্তির অধিকার পূর্ণ মর্যাদা লাভ করিতে পারে।[১২]

আধুনিক সমাজে প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার অধিকার আছে

(৫) **শিক্ষার অধিকার**—অত্যন্ত আধুনিক কালেই মানুষ শিক্ষার অধিকার দাবি করিতে শিখিয়াছে। পূর্বে শিক্ষা মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান কয়জনেরই ভাগ্যে জুটিত, বৃহৎ জনসাধারণ এই অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল, এবং এই অবস্থার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন ক্ষোভও ছিল না। এমন কি, স্বদেশের ও বিদেশের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদেরই শিক্ষার অধিকার থাকিবে, রাজার সন্তান বা পুরোহিতেরই উচ্চতম শিক্ষার অধিকার থাকিবে, এই অসাম্য সমর্থন করিয়াছেন। আজ অবশ্য সমস্ত সভ্য রাষ্ট্রেই সব ব্যক্তির পক্ষেই উচ্চতম শিক্ষার অধিকার আছে, ইহা আইনতঃ স্বীকৃত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আজও সর্বত্রই উচ্চতম শিক্ষার সুযোগ সকলের জন্য নাই।

ইহার সঙ্গেই দায়িত্ব আছে প্রত্যেকের শক্তি ও সম্ভাবনাকে বিকশিত করিবার

সকলের যেমন শিক্ষা পাইবার অধিকার আছে, তেমনি সেই সঙ্গে প্রত্যেকের উপর এ দাবি আছে যে, নিজের সাধ্য অনুযায়ী নিজ শক্তি ও সম্ভাবনাকে শিক্ষার দ্বারা পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে হইবে। ভারতের প্রাচীন ঋষিরা ইহাকে বলিয়াছেন, ঋষিঋণ—শাস্ত্রঅধ্যয়ন ও শাস্ত্রচর্চা দ্বারাই ব্যক্তিকে এ ঋণ শোধ করিতে হয়। তাহা ছাড়া ব্যক্তির উপর এ দায়িত্বও আছে, সমাজ তাহাকে শিক্ষার যে সুযোগ দিয়াছে সে শিক্ষার ফল সেবার দ্বারা সমাজকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

১২। Muirhead—Elements of Ethics, Pp. 183-4.

মানবের কর্তব্য—মানুষ মানুষের সঙ্গে সমাজে সহস্র বিচিত্র সম্পর্ক স্থাপন করে। সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তির স্থান ও সম্পর্ক অনুযায়ী এক দিকে যেমন কতগুলি নির্দিষ্ট অধিকার থাকে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি কর্তব্য ও দায়িত্ব থাকে, একথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। জীবনের অধিকারের সঙ্গে আছে, জীবনকে শ্রদ্ধা করিবার ও সুস্থ ভাবে পোষণ করিবার দায়িত্ব। ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা এই কর্তব্যকে আরো গভীর ও ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিয়া, তাহাকে নাম দিয়াছেন অহিংসা।

সমাজ প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি অধিকার যেমন স্বীকার করে, তেমনি তাহার নিকট হইতে কতগুলি আনুগত্যও দাবি করে

শুধু যে মানুষের জীবন সম্পর্কেই এ দায়িত্ব আছে তা নয়, লতাগুল্ম, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ সম্পর্কেও মানুষের কর্তব্য আছে। ভারতীয় ঋষি মানুষকে বিশ্বজগতের সঙ্গে যুক্ত করিয়া এক করিয়া দেখিয়াছেন। তাই গৃহস্থের প্রতি নির্দেশ—সমস্ত জীবের অনিষ্ট কামনা দূর করিতে হইবে, সকলকে সেবা করিতে হইবে। আলবালে জল সেচন, হরিণীর ক্ষতমুখে ইঙ্গুদি তৈললেপন, পক্ষীদের আহার দান ইহা যে শুধু কন্বমুনির আশ্রমেরই ব্যবস্থা ছিল তাহা নয়। এমন কি তৈজসপত্র, চুল্লী, ইত্যাদি গৃহস্থালীর জড়দ্রব্য সম্বন্ধেও গৃহস্থের কর্তব্য আছে, তাহাদের শ্রদ্ধার সহিত যথোচিত যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে।

জীবনকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে

গাছপালা, পশুপাখী, জড়দ্রব্যকেও উপযুক্ত শ্রদ্ধা দিতে হইবে

তেমনি ভাবে নিজের স্বাধীনতার অধিকার, যেমন মানুষ উদ্যমের সহিত রক্ষা করিবে, অপরের স্বাধীন অধিকারেও সে অযথা হস্তক্ষেপ করিবে না। এই আদর্শই কাণ্ট অন্য ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, "Treat humanity either in thine own person or in others always as an end and never as a meaus." সর্বপ্রকার শোষণই নিন্দনীয়, এমন কি অপরের নিকট হইতে অযথা সেবাগ্রহণও অকর্তব্য।

স্বাধীনতাকে উদ্যমের সহিত রক্ষা করিতে হইবে, পরের স্বাধীনতাকেও শ্রদ্ধা করিতে হইবে

সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা—নিজ সম্পত্তিতে যেমন আমার অধিকার আছে, তেমনি আমার দায়িত্ব রহিয়াছে অন্যের সম্পত্তির অধিকারের প্রতি। ঈশোপনিষদে তাই উপদেশ, সমস্ত সম্পদ ঈশ্বরের প্রসাদ হিসাবে বিনম্র হইয়া ভোগ করিবে, অন্যের ধনে কখনও লোভ করিবে না। বাইবেল এই উপদেশকে সংকীর্ণতর বাস্তব রূপ দিয়া বলিয়াছে, Thou shalt not steal. নিজ চরিত্র ও

সুনাম রক্ষা করিবার অধিকার যেমন প্রত্যেকেরই আছে, তেমনি প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে, অন্যের সুনাম ও চরিত্রকে শ্রদ্ধা করিবার। সম্পত্তির চেয়ে নৈতিক মানুষের কাছে, সুনাম অনেক বেশী মূল্যবান।

সমাজ-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা—সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করার কর্তব্য প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত। দেশের আইন ও প্রথা মান্য করিতে হইবে। ইহাতে ব্যক্তির অসুবিধা হইলেও, ব্যক্তির ইহা লঙ্ঘন করিবার অধিকার নাই। তখনই দেশের আইন বা সমাজের প্রথা ভঙ্গ করা চলিবে, যখন তাহা নীতি-বিরুদ্ধ, যখন তাহা ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পরিপন্থী।

শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা—কোন ব্যক্তিরই অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার অধিকার নাই, পরের শ্রমের ফল ভোগ করিবার অধিকার নাই। বাইবেল বলিবে—One who does not work, neither shall he eat. অবশ্যই এই উপদেশ সুস্থ, সবল ব্যক্তিদের সম্পর্কেই প্রয়োজ্য। গীতাতেও উপদেশ, প্রত্যেকেরই চেষ্টা করিতে হইবে, যথাশক্তি, যথোপযুক্ত কুশলতার সঙ্গে কর্ম করিবার। রাস্কিন্ এই আদর্শকেই প্রকাশ করিয়াছেন—Work is worship এই বাক্যে। যে নিজ সাধ্য অনুযায়ী, নিজ স্থান অনুযায়ী কাজ করে, সে-ই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবা করে। লেবাননের বীর্যবান্ কবি খলিল জিব্রান্ তাঁর এক কবিতায় কর্মের তাৎপর্য সম্বন্ধে সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন—

"চিরদিন তোমরা শুনে এসেছ,—"কাজ হচ্ছে অভিশাপ,
পরিশ্রম হচ্ছে দুর্ভাগ্য।"
কিন্তু আমি বলছি তোমাদের,
পৃথিবী দেখে এক রঙীন দূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন,—
তোমরা যখন কাজ কর, সেই সুন্দর স্বপ্নকেই
তোমরা সার্থক করে তোল। পৃথিবীতে যখন তোমাদের পাঠিয়েছি,
তখনই তোমাদেরও দিয়েছি ভার, সে স্বপ্নকে তিলে তিলে সত্য করে
তুলবার।

* * * * *

তোমরা শুনে এসেছ, জীবন হচ্ছে আঁধার নিশা
এবং দেহ যখন শ্রান্ত, তখন ক্লান্ত মানুষদের এ কথার
তোমরা প্রতিধ্বনি করেছ।

কিন্তু আমার কথা শোন,—'জীবন সত্যই অন্ধতমসা,
যখন থাকে না তাতে কোন উত্তম, এবং
সে উত্তম হচ্ছে অন্ধ, যার পেছনে নেই জ্ঞানের দীপ্তি।
আর সে জ্ঞান হচ্ছে মিথ্যা বোঝামাত্র, যা আমাদের
কর্মে প্রবৃত্ত করায় না, আর সমস্ত কর্মই হচ্ছে বৃথা
যার প্রেরণা জোগায় না হৃদয়ের মস্ত ভালবাসা।
যেদিন ভালবেসে কাজ কর, সেদিনই তো নিজেকে যুক্ত কর
নিজের অন্তরাত্মার সঙ্গে, বিশ্বের আত্মার সঙ্গে,
বিশ্ববিধাতার সঙ্গে' ॥[১৩]

সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে আস্থা ও দায়িত্ব

সমাজের অগ্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা—সমাজের ও ব্যক্তির অগ্রগতি কাম্য, তাই সকলের পক্ষেই কর্মের উপদেশ। ব্যক্তির উপর এ দায় আছে যে নিজের ও সমাজের অগ্রগতির জন্য নিরলস চেষ্টা করিতে হইবে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যকেই ম্যাকেঞ্জী—respect for progress বলিয়াছেন।[১৪]

সর্বোপরি সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা

সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা—সকলের শেষে এবং সকলের চেয়ে প্রধান দায়, মানুষের পক্ষে সত্যের মর্যাদা রক্ষা। বাক্যে, চিন্তায়, কর্মে সত্যকে অনুসরণ করা, সত্য হইতে বিচ্যুত না হওয়া, নীতিবান্ মানুষের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব। সত্য রক্ষা না করিলে, সাংসারিক স্বার্থও রক্ষিত হয় না, তাই বণিক ইংরাজ বলে—Honesty is the best policy। ভারতীয় আদর্শ উচ্চতর। প্রাচীন ঋষি বলেন, সত্যই ধর্ম এবং ধর্মই ধর্মের শেষ। সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের প্ররোচনায়, 'অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ' এই অর্ধসত্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই পাপে তাঁহাকে নরকদর্শন করিতে হইয়াছিল।

কতগুলি কর্তব্য স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট

Duties of Perfect obligation & Duties of Imperfect obligation—কান্ট কর্তব্যগুলিকে দুই দলে ভাগ করিয়াছিলেন। কতগুলি কর্তব্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট বিধিদ্বারা প্রকাশ করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিধিগুলি নিষেধাত্মক—চুরি করিবে না—Thou shalt not steal,

১৩। Kahlil Gibran—The Prophet—Work. ভাবানুবাদ: লেখক।
১৪। MacKenzie—A Manual of Ethics. Bk. III, Ch. 3, §§ ii—viii

মিথ্যা কথা বলিবে না—Thou shalt not lie, ব্যাভিচারে লিপ্ত হইবে না—Thou shalt not commit adultery. এ জাতীয় বিধি লঙ্ঘনের জন্য শাস্তিও আইনে নির্দিষ্ট আছে। কাণ্ট এই জাতীয় কর্তব্যকে বলিয়াছেন—Duties of perfect obligation.

এ কর্তব্য না করিলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে

কিন্তু আবার কতগুলি কর্তব্য আছে, যেগুলির সম্বন্ধে নির্দেশ নিতান্তই সাধারণভাবে দেওয়া যাইতে পারে, এবং যাহাদের লঙ্ঘনে কোন শাস্তি, আইনে নির্দিষ্ট নাই—যথা, 'অন্ধজনে দয়া কর', 'প্রতিবেশীকে আপনার মতো করিয়াই ভালবাস'। এ জাতীয় কর্তব্যকে Duties of imperfect obligation বলা হইয়াছে।

আবার কতগুলি কর্তব্য সেগুলি না করিলে আইনের কোন শাস্তি বিধান নাই

এই প্রভেদ খুবই স্পষ্ট নয়, এবং লিলি দেখাইয়াছেন যে, এই কথাগুলি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা, Duties of perfect obligation বলিতে (ক) সেই কর্তব্যগুলিকেই বুঝায় যেগুলি নির্দিষ্ট আইনে প্রকাশ করা যায়—'ধার নিলে যথাসময়ে তাহা শোধ করা কর্তব্য।' আবার এ কথাটি দ্বারা এমন কর্তব্য বোঝায় (খ) যাহা সর্ব অবস্থায়ই প্রযোজ্য—যাহা সর্বজনগ্রাহ্য—'সর্বদা সত্য আচরণ করিবে'। আবার এ কথাটি এই অর্থেও ব্যবহৃত হয় যে, (গ) ইহা এমন কর্তব্য, যাহা ব্যক্তির সমাজে বা পরিবারে স্থান বা সম্পর্ক-নিরপেক্ষ—'কোন মানুষকে অশ্রদ্ধা করিবে না।'

অন্যের প্রতি উদার আচরণ রূপ কর্তব্য, অথবা দরিদ্রকে সাহায্য দানের কর্তব্য অথবা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত হওয়ার কর্তব্য,—ইত্যাদি হইতেছে Duties of imperfect obligation—ইহাদের সম্বন্ধে সমস্ত মানুষের সমস্ত অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট দায় নাই।

এ জাতীয় প্রভেদ, নৈতিক জীবনের পথে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদিও আইনে ইহাদের গুরুত্ব আছে। তাহা ছাড়া কোন কর্তব্যকে Duty of imperfect obligation বলিলে এই ভুল ধারণার সম্ভাবনা থাকে যে, ব্যক্তি এসব কর্তব্য না করিলেও কোন ক্ষতি নাই।[১৫]

কর্তব্য সম্বন্ধে ব্রাড্‌লের ধারণা—ব্রাড্‌লের মতে, সমাজ হইতেছে

১৫। Lillie—An Introduction to Ethics, Pp. 267-68

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিভিন্ন সম্বন্ধের সমন্বয়। এ সব সম্বন্ধ সমাজে ব্যক্তির স্থান (station in life) নির্দেশ করিয়া দেয়। প্রত্যেক ব্যক্তি একই সময়ে, বিভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে যুক্ত হয়, ও বিভিন্ন স্থান অধিকার করে। ব্যক্তির দায়িত্ব হইতেছে নিজ স্থান অনুযায়ী নিজের কর্তব্য যথাসাধ্য সুসম্পন্ন করা। এই কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন কর্মের মধ্য দিয়া ব্যক্তির সুসম্পূর্ণ আত্মবিকাশ এবং সামাজিক কল্যাণ সাধন। এক সম্বন্ধে এবং অবস্থায় ব্যক্তির যাহা কর্তব্য, অন্য সম্বন্ধে ও অবস্থায় তাহার কর্তব্য স্বভাবতঃই বিভিন্ন হইবে, এমন কি কখনও তাহা বিপরীতও হইতে পারে। এই সব বিভিন্ন কর্তব্যের সুসমন্বয় দ্বারাই সুখী ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন রচিত হয়।

ব্রাড্‌লে বলেন প্রত্যেক মানুষের সমাজনির্দিষ্ট স্থান অনুযায়ী কতগুলি নির্দিষ্ট কর্তব্যও থাকে

যখন মানুষ যে অবস্থায় থাকিবে, জীবনে কোন এক মুহূর্তে সে যে স্থান অধিকার করিবে, সেই কালের কর্তব্যই তাহাকে সুসম্পন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যখন সে পিতা, সন্তানের সঙ্গে তাহার স্নেহের সম্বন্ধ, তখন তদুপযোগী কর্তব্য তাহাকে করিতে হইবে, আবার তাহার নিজ পিতার সঙ্গে তাহার শ্রদ্ধাভক্তির সম্বন্ধ। সে অবস্থায় তাহার কর্তব্যও ভিন্ন। আবার সে হয়তো বিচারক বা শিক্ষক বা ব্যবসায়ী, সমস্ত অবস্থায়ই তাহার কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে, তাহা সম্পাদন করাতেই তাহার মনুষ্যত্ব। আবার মানুষ স্বেচ্ছায় কতগুলি সম্বন্ধে যুক্ত হয়, কতগুলি দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন তদনুযায়ী কর্তব্য তাহাকে পালন করিতে হইবে। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ বা অবিচার দূর করিবার দায়িত্ব ব্যক্তির উপর নাই এবং অহংকারের বশবর্তী হইয়া হয়তো মানুষ নিজ সাধ্যের অতিরিক্ত দায় গ্রহণ করিয়া বিব্রত হয়। তাই কার্লাইল উপদেশ দিয়াছিলেন, "এই মুহূর্তে যে কর্তব্য তোমার সম্মুখে আছে তাহাই সুসম্পন্ন কর। যে কাজের তুমি উপযুক্ত তাহা স্থির কর, এবং হারকিউলিসের মত সর্বশক্তি দিয়া সে কর্তব্য সাধন কর।"

কর্তব্য তাই সাপেক্ষ

কিন্তু কোন্ অবস্থায় কাহার কি কর্তব্য, ব্যক্তির অন্তরই তাহা তাহাকে বলিয়া দেয়। কখনো বা বিচারবুদ্ধি দ্বারা তাহা নির্ধারণ করিতে হয়। ব্যক্তি নিজ কর্তব্য করিতে যদি দৃঢ়সংকল্প হয়, তবে নিশ্চয়ই সে নিজ কর্তব্য খুঁজিয়া পাইতে দিশাহারা হয় না।[১৬]

বিবেকই কোন্ অবস্থায় কি কর্তব্য তাহার নির্দেশ দেয়

১৬। About the duties of a man's station it can be said that experience shows that the individual who tries to carry out faithfully the duties

মোটামুটি এ কথা বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক মানুষেরই মানুষ হিসাবেই কতগুলি সাধারণ অবশ্যকর্তব্য আছে (জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা, সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি)। আবার বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধে যুক্ত হওয়ার জন্য মানুষের বিশেষ বিশেষ কর্তব্য থাকে। আবার অবস্থার পরিবর্তন হইলে, তাহাকে নূতন বিশেষ কর্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়।

প্রত্যেক মানুষেরই মানুষ হিসাবে কতগুলি কর্তব্য আছে, সেগুলি সাপেক্ষ নয়

কর্তব্যে-কর্তব্যে বিরোধ—Conflict of duties—জীবন বড় জটিল। বিভিন্ন অবস্থায়, কত বিভিন্ন কর্তব্য। কখনো কখনো বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে আপাতবিরোধ দেখা দেয়। পুত্র হিসাবে পরশুরামের কর্তব্য ছিল, পিতার আজ্ঞা নির্বিচারে পালন করা, আবার অন্যদিকে সমান গুরু কর্তব্য ছিল, মাতাকে রক্ষা করা। পিতা আজ্ঞা দিলেন মাতৃহত্যা করিতে, সংঘাত বাধিল এক কর্তব্যের সঙ্গে অন্য কর্তব্যের। নিদারুণ মানসিক দ্বন্দ্বের সে অবস্থা। পরশুরাম পিতার প্রতি কর্তব্যকেই উচ্চতর স্থান দিলেন, বেদনা মথিত চিত্তে মাতৃহত্যা পাতকে লিপ্ত হইলেন। মনস্বিনী গান্ধারীকেও এই কঠিন পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। প্রাণপ্রিয় পুত্র দুর্যোধন ছল দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবদের রাজ্যধন হরণ করিলেন, দ্যূতক্রীড়ায় অন্যায়ভাবে জয় করিয়া প্রকাশ্য রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের পাপে অপরাধী হইলেন। একদিকে কোমল মাতৃস্নেহ, অন্যদিকে নারীজাতির অসম্মানের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বিচার প্রার্থনা করিলেন—

কখনো কখনো কর্তব্যে কর্তব্যে আপাতবিরোধ দেখা যায়

গান্ধারী— তুমি রাজা, রাজঅধিরাজ
বিধাতার বামহস্ত ; ধর্মরক্ষা কাজ
তোমা 'পরে সমর্পিত। শুধাই তোমারে,
যদি কোন প্রজা তব সতী অবলারে
পরগৃহ হতে টানি করে অপমান
বিনা দোষে—কী তাহার করিবে বিধান ?

---

recognised by himself is constantly discovering new duties which an outsider misses altogether, and so he develops a sensitivity to what is fitting in situations connected with his own station.
Lillie—An Introduction to Ethics, P. 267

ধৃতরাষ্ট্র— নির্বাসন।

গান্ধারী— তবে আজ রাজপদতলে
সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে
বিচার প্রার্থনা করি। পুত্র দুর্যোধন
অপরাধী প্রভু!

... ...

অকলুষ
পুরুবংশে পাপ যদি জন্মলাভ করে,
সেও সহে, কিন্তু, প্রভু, মাতৃগর্বভরে
ভেবেছিনু গর্ভে মোর বীর পুত্রগণ
জন্মিয়াছে—হায় নাথ, সেদিন যখন
অনাথিনী পাঞ্চালীর আর্তকণ্ঠরব
পাষাণ প্রাসাদ ভিত্তি করি দিল দ্রব
লজ্জা-ঘৃণা-করুণার তাপে, ছুটি গিয়া
হেরিনু গবাক্ষে তার বস্ত্র আকর্ষিয়া
খলখল হাসিতেছে সভা মাঝখানে
গান্ধারীর পুত্রপিশাচেরা—ধর্ম জানে
সেদিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব।

... ...

মহারাজ, শুন মহারাজ
এ মিনতি, দূর কর জননীর লাজ
বীরধর্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত
ন্যায়ধর্মে করহ সম্মান, ত্যাগ করো
দুর্যোধনে।

বীর রমণী গান্ধারী নিঃসন্দেহে জানিয়াছিলেন যে অন্ধ পুত্রস্নেহ অপেক্ষা ন্যায়ধর্ম অনেক বড়। তাই এই বীর নারী ভারতের চোখে নমস্যা। কিন্তু দুর্বল-চরিত্র ধৃতরাষ্ট্র এই দ্বিধায় কর্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি ন্যায়ভ্রষ্ট হইলেন। তিনি কাপুরুষের মতো বলিলেন,

প্রিয়ে, সংহর সংহর
তব বাণী। ছিঁড়িতে পারিনে মোহডোর,
ধর্মকথা শুধু আসি হানে সুকঠোর
ব্যর্থ ব্যথা। পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার
তাই তারে ত্যজিতে না পারি—আমি তার
একমাত্র।[১৭]

এই দুর্বল যুক্তি দিয়া যিনি নিজ মোহের সমর্থনের চেষ্টা করেন, তিনি নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার পাত্র নন।

প্রত্যেকটি অবস্থায় একটি মাত্রই কর্তব্য থাকিতে পারে

প্রত্যেকটি বাস্তব অবস্থায় একটিই মাত্র কর্তব্য থাকিতে পারে। হৃদয় যখন আপাতবিরুদ্ধ কর্তব্যের দ্বন্দ্বে দোলায়িত, তখন সমগ্রভাবে সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া, নৈতিক আত্ম-বিকাশের শ্রেষ্ঠ আদর্শ অবিচল ভাবে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিলে সর্বদাই নির্দিষ্ট কর্তব্যটি খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

কর্তব্যের আপাত বিরোধ ক্ষেত্রে পথ নির্দেশ—Casuistry

কর্তব্যের আপাতবিরোধের ক্ষেত্রে নির্দেশ—Casuistry—বাস্তব জীবনে প্রায়ই এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। মনে হয় যেন, দুইটি বিপরীত কর্তব্য ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত—তাহার পক্ষে তখন কোন একটি নির্দিষ্ট পথ বাছিয়া নেওয়া কঠিন হয়। অনেক সময় এ দাবি করা হয় যে, নীতিবিদ্যায় এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ থাকা উচিত। কর্তব্যের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান, কোন্‌টি অপ্রধান, কোন্‌টি উচ্চ, কোন্‌টি নীচ, কোন্‌টি অগ্রাধিকার পাইবে তাহা যদি সুনির্দিষ্টভাবে নীতিবিদ্যায় নির্দেশ দেয়, তবে ব্যক্তির দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়ের নিরশন অনেক সহজ হয়। বাস্তবিক পক্ষে, প্রত্যেক দেশেই বোধ হয় এই প্রকারের বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট কর্তব্য-নির্দেশক তালিকা আছে।[১৮] যেমন, পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে পিতৃভক্তিই অগ্রাধিকার পাইবে, পরিবারের প্রতি কর্তব্য ও দেশের প্রতি কর্তব্যের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে, দেশের প্রতি কর্তব্যকেই উচ্চতর মর্যাদা দান করিতে হইবে। ক্যাথলিকদের মধ্যে জেসুইট সম্প্রদায়ের ধর্মপরিচালকগণ

এপ্রকার জটিল প্রয়োগ-শাস্ত্র কর্তব্যের মধ্যে উচ্চ-নীচ কাহার অগ্রাধিকার তাই নির্দেশ দেয়

১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গান্ধারীর আবেদন

১৮। Casuistry consists in the effort to interpret the precise meaning of the commandments and to explain which is to give way when a conflict arises. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 810

এই casuistryকে প্রায় একটি নির্ভুল ব্যবস্থায় পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১৯] মুসলমানদের হাদিস্‌ও জীবনের দৈনন্দিন প্রতিটি কার্য সম্পর্কে খুঁটিনাটি নির্দেশ দানের প্রয়াস।

জেস্যুইটদের মধ্যে এ শাস্ত্রের খুব চর্চা ছিল

কিন্তু নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ এইভাবে ছক কাটিয়া দিলে সুবিধা হইতে পারে সত্য, কিন্তু ইহা একপ্রকার চিন্তা বা বিচারের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা। অর্থাৎ কর্তব্যের বিরোধ দেখা দিলে, নীতিশাস্ত্রের বই খুলিলেই নির্দিষ্ট উত্তরটি পাওয়া যাইবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, ব্যক্তি এ ভাবে দায়িত্ব এড়াইতে পারে না। সুগৃহিণী হইতে গেলে, গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের বই খুলিয়া সমস্ত নির্দেশ পাওয়া যাইতে পারে না। মানুষের জীবন অনেক বেশী জটিল, এবং ফর্মুলা দিয়া গার্হস্থ্য জীবনের মতো, নৈতিক জীবনও নিয়ন্ত্রণ করা চলে না। তাই ব্যাশড্যাল যদিও এ প্রকারের খুঁটিনাটি কর্তব্য নির্দেশের পক্ষপাতী, ম্যাকেঞ্জী মনে করেন ইহা নিরর্থক এবং অনুচিত। জীবনের মৌলিক আদর্শগুলি নির্দেশের দায়িত্বই নীতিবিদ্যার, কিন্তু ব্যক্তিকেই নিজ শুভবুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করিয়া, প্রতিটি বাস্তব ক্ষেত্রে কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। কেবলমাত্র সাধারণ ভাবে নির্দেশই দেওয়া যাইতে পারে যে, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও গোষ্ঠীর বৃহৎ স্বার্থের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে, গোষ্ঠিস্বার্থকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। এবং এই চরম উপদেশটিই দেওয়া যাইতে পারে যে, সর্বক্ষেত্রেই এই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে যে, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন নৈতিক বিকাশ ও সমাজকল্যাণের পক্ষে প্রত্যেক মুহূর্তের কর্তব্য যেন উপযোগী হয়। সমস্ত নৈতিক কর্তব্যের মধ্য দিয়া বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত সুসঙ্গত চিন্ময় বিধিবই আমরা অনুসরণ করি।[২০]

মানুষের জটিল জীবন নীতিবিদ্যার খুঁটিনাটি নির্দেশ দ্বারা পরিচালনা সম্ভব নয়

কয়েকটি সাধারণ নির্দেশই শুধু দেওয়া যায়

১৯। Jesuits had attempted to reduce casuistry or 'cases of conscience' into a fine art. Sidgwick—History of Ethics, Pp. 151-4

২০। ··when these rules come into conflict, and when we feel ourselves in a difficulty with regard to the course that we ought to pursue—when in short a "case of conscience" arises—we must fall back upon the Supreme Commandment, and ask ourselves: Is the course that we think of persuing, the one that is most conducive to the realization of the rule of reason in the world and of all the values that the rule implies? MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 311

নৈতিক সদ্‌গুণ—Moral Virtues—যিনি নীতিবান্‌, তিনি অবশ্যই কর্তব্য পালনে অভ্যস্ত। এবং যিনি কর্তব্য পালনে অভ্যস্ত, তিনি নিশ্চয়ই কতগুলি সদ্‌গুণের অধিকারী। বাস্তবিক পক্ষে কর্তব্যগুলি হইল, ব্যক্তির নৈতিক জীবনের বহিরঙ্গ দিক আর সদ্‌গুণগুলি হইল নীতিবান্‌ ব্যক্তির আন্তরিক ও মানসিক দিক। সেই মানুষকেই সদগুণসম্পন্ন বলা যায়, যিনি নিজ চরিত্র এমন ভাবেই গঠন করিয়াছেন যে কর্তব্য পালনের অভ্যাস তাঁহার প্রকৃতিগত হইয়াছে।[২১] সদ্‌গুণগুলি ব্যক্তিকে অনুশীলন দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়। যাহা প্রকৃতিদত্ত, ব্যক্তির কোন চেষ্টা বা অভ্যাসসাপেক্ষ নয়, তাহাকে নৈতিক সদ্‌গুণ বলিব না। সদগুণ একটি সাময়িক মানসিক অবস্থা নয়। যে মানসিক অবস্থা বা দৃষ্টিভঙ্গী **ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা নিজ স্থায়ী প্রকৃতিতে পরিণত করে** তাহাকেই কেবল নৈতিক সদ্‌গুণ বলা যাইবে। **সদ্‌গুণ শুধু সম্ভাবনা মাত্র নয়, তাহা কর্তব্যকর্ম সাধনে, বাস্তবিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে।** কর্তব্য সাধনের অভ্যাস গঠন করিতে হইলে, **সক্রিয় ভাবে কোন স্থির ও যুক্তিনির্ভর আদর্শকে অনুসরণ করিতে হয়।** সুতরাং **নৈতিক সদ্‌গুণ** সহজাত সংস্কারের (Instinct) মতো প্রকৃতিদত্ত, বা **অন্ধ নয়।** এই গুণগুলি **উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না—ব্যক্তিকে নিজ চেষ্টায় সেগুলি আয়ত্ত করিতে হয়।** কিন্তু মূলত প্রকৃতিদত্ত না হইলেও, নীতিবান্‌ মানুষদের মধ্যে এই গুণগুলি অভ্যাসের ফলে তাঁহাদের স্বভাবে পরিণত হয়।[২২]

যে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সচেতন ভাবে অনুশীলন দ্বারা ব্যক্তির স্থায়ী প্রকৃতিতে পরিণত হয় তাহাকেই নৈতিক সদ্‌গুণ বলা হয়

নৈতিক সদ্‌গুণ ও জ্ঞান—Virtue & Knowledge—নৈতিক গুণগুলি বিচার ও অভ্যাসলব্ধ। যাহার নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান নাই, সে নৈতিক সদ্‌গুণের অধিকারী হইতে পারে না। সক্রেটিস ও প্লেটো সেজন্য বলিয়াছিলেন, Virtue is Knowledge—ইহা অর্ধসত্য মাত্র। অবশ্য সক্রেটিস ও প্লেটো Knowledge

জ্ঞান ভিন্ন সদ্‌গুণ আয়ত্ত হইতে পারে না

২১। The virtuous man will be on the whole, the man who has a steadfast habit of obeying the commandments ···· virtues are concerned mainly with inner habits of mind, whereas commandments deal with overt acts—MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 328

২২। Virtue is a permanent state of mind formed with the concurrence of the will and based upon an ideal of what is best in actual life—an ideal fixed by reason. Aristotle—Nicomachean Ethics, 11. vi.

বা 'জ্ঞান' কথাটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন—তাহার জন্য কর্মও জ্ঞানের অঙ্গ। কিন্তু সাধারণ ও সংকীর্ণ অর্থে, নৈতিক সদ্‌গুণ, জ্ঞান মাত্র নহে। কর্তব্য কি, তাহা বুদ্ধি দিয়া বিশ্লেষণে সমর্থ হইলেই, কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্তি হয় না—তাই অর্জুন বলিয়াছেন—'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্য ধর্মং নচমে নিবৃত্তিঃ।' নৈতিক সদ্‌গুণের অধিকারী হইতে হইলে, অবশ্যই বিচারবুদ্ধি দ্বারা নৈতিক আদর্শকে স্পষ্ট করিয়া জানিতে হইবে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে চাই সে আদর্শকে অনুসরণের অভ্যাসজাত প্রবৃত্তি। এই অভ্যাস কিন্তু দেশাচারের অন্ধ অনুসবণ নয়। ব্যক্তি বুদ্ধিদীপ্ত ইচ্ছাদ্বারা সচেতন ভাবে (by acts of will) আদর্শ অনুসরণের অভ্যাসের ফলে নৈতিক সদ্‌গুণ আয়ত্ত করে।[২৩]

Virtue is Knowledge—অর্ধসত্য মাত্র

'জানামি ধর্মং নচমে প্রবৃত্তিঃ জানাম্য ধর্মং নচমে নিবৃত্তি'

সমাজ-পরিবেশ ও সদ্‌গুণ—**Virtues & social purpose**—নৈতিক সদ্‌গুণ ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রযোজ্য হইলেও, সমাজ-পবিবেশের উপব তাহা নির্ভরশীল এবং সমাজ-প্রয়োজনের সঙ্গে তাহা যুক্ত। যে গুণগুলি এক কালে কোন সমাজে প্রশংসিত, অন্যদেশে হয়তো তাহাই নিন্দিত। স্পার্টানদেব মধ্যে কঠিনতা পৌরুষের লক্ষণ বলিয়া প্রশংসিত ছিল, কাজেই সে দেশে দুর্বল নবজাত শিশুকে খোলা পর্বতগাত্রে ফেলিয়া রাখিয়া 'শক্ত' করিবার চেষ্টা করা হইত। ইহার ফলে অনেক শিশুর মৃত্যু ঘটিত। কিন্তু ইহা নিন্দার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্তু ইংলণ্ডে অথবা আমাদের দেশে, পিতামাতার এরূপ ব্যবহার কঠিন নিষ্ঠুরতা বলিয়া নিন্দিত হইবে। আবার সমাজে ব্যক্তির স্থান ও কর্তব্য অনুযায়ী তাহার নৈতিক গুণ নির্ধারিত হয়। উচ্ছলতা ও প্রাণচাঞ্চল্য নবযুবকের পক্ষে প্রশংসনীয় হইলেও মাতা বা কুলবধূর পক্ষে এ আচরণ অশোভন। পূর্বকালে যুদ্ধে বীরত্ব বলিয়া যাহা প্রশংসা পাইত, আজ আমাদের জীবনে সেই বীরত্ব সম্ভবতঃ নাটকীয়তা বলিয়া উপহসিত হইবে। যদিও বীরত্বের পিছনে যে দৃঢ় মনোবৃত্তি, তাহার প্রয়োজন ও প্রশংসা

নৈতিক সদ্‌গুণ সমাজপবিবেশ সাপেক্ষ

বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন গুণেব মর্যাদা

২৩। Virtue is a kind of **knowledge**, as well as a kind of habit. Virtue implies knowledge, wisdom or moral insight, and a habit of performing duties. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 332

আজও আছে। কাজেই যদিও সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সদ্‌গুণ-গুলির রূপ পরিবর্তিত হইতে পারে—এবং তাহাদের মূল্যের পরিবর্তন ঘটিতে পারে, তথাপি কতগুলি সাধারণ সদ্‌গুণ নিশ্চয়ই আছে; যেগুলি সর্বকালে, সর্বদেশে আদৃত ও প্রশংসিত।[২৪]

কয়টি মহৎ সদ্‌গুণ—Cardinal Virtues—প্লেটো তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ Republic গ্রন্থে চারিটি মহৎ নৈতিক গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই গুণগুলি ব্যক্তি ও সমাজ দুইয়ের বেলায়ই প্রযোজ্য। এই নৈতিক চারিটি শ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে—প্রজ্ঞা, সাহস, সংযম ও ন্যায়পরতা—Wisdom, Courage, Temperance & Justice.

কয়টি প্রধান সদ্‌গুণ

প্রজ্ঞা—Wisdom—ইহা সমস্ত নৈতিক গুণেরই ভিত্তি—কারণ, নীতিবান্ ব্যক্তি অন্ধ নন, নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে তিনি সচেতন। এই জন্য কোন্‌টি ন্যায়, কোন্‌টি অন্যায় ইহা জানিয়াই তিনি নিজ নৈতিক জীবন সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন।

প্রজ্ঞা

সাহস—Courage বলিতে কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভীকতাই বোঝায় না। বর্তমানকালে বিশেষ করিয়া, সাহস অর্থ হইল, সমস্ত ভয় ও বিপদের মুখে অবিচল থাকিবার মানসিক দৃঢ়তা। বর্তমান জগতে বাহ্য প্রকৃতির রহস্য মানুষের কাছে অজ্ঞাত নয়, তাই প্রাকৃতিক কারণে ভয় মানুষের আজ অনেক কমিয়াছে এবং পূর্বে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইবার যে দৈহিক সাহস প্রয়োজন ছিল, তাহার প্রয়োজনও কম। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা মানুষের জীবনে নানা জটিলতা ও যন্ত্রণা আনিয়াছে—তাহার জন্যও চাই মানসিক বল ও ধৈর্য, তাহার মূল্যই আজ বেশী, এই গুণকে fortitude বলা যাইতে পারে।[২৫]

সাহস

সংযম—Temperence—বলিতে সুখের বস্তু ভোগ সম্বন্ধে পরিমিতি বোঝায়। স্বভাবতঃই ইহা প্রলোভনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তাও বোঝায়—এবং ভোগ বিষয়ে অপ্রমত্ততা বোঝায়। পৃথিবীতে সুখী হইতে গেলে, এই গুণ বিশেষ প্রয়োজন।

সংযম

২৪। Muirhead—Elements of Ethics, Pp. 74-5

২৫। Fortitude is a higher virtue than the mere active courage which goes to meet danger; because the former bears actual pain, the latter only the fear of pain. Mrs. Bryant—Educational Trends

ন্যায়পরতা—Justice—এই গুণটি বিশেষ করিয়া প্রকাশ পায় ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধের ক্ষেত্রে।

ন্যায়পরতা

অনেকে বলিবেন এই চারিটিই মাত্র প্রধান নৈতিক সদ্‌গুণ তাহা নয়। আরো অনেক গুণও আছে। এবং বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি সদ্‌গুণের বিভিন্ন তালিকা দিয়া থাকেন। কিন্তু প্লেটো যে চারিটি সর্বপ্রধান গুণের উল্লেখ করিয়াছেন—তাহাদের কিছুটা ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে—এই চারিটি গুণ হইতেই অন্য সমস্ত গুণ পাওয়া যাইতে পারে। অ্যারিস্ট্‌টল প্লেটোর তালিকাকে ভিত্তি করিয়া একটি দীর্ঘতর তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার তালিকায় তিনি যে সব গুণের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেগুলি বিশেষ করিয়া তৎকালীন এথেন্সের নাগরিকের আদর্শ গুণ—আমাদের বর্তমান জগতের জীবনে সেই গুণগুলিকে খুব মূল্যবান্ মনে করা যায় না।[২৬]

এই চারিটি গুণ হইতেই অন্য সমস্ত গুণ পাওয়া যাইতে পারে

বর্তমানে কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি নৈতিক গুণগুলিকে—আত্ম-সম্পর্কিত, (Self-regarding), পর-সম্পর্কিত (other-regarding) ও ভাবাদর্শ সম্পর্কিত (ideal-regarding) এই তিন দলে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম দলের অন্তর্গত গুণগুলি ব্যক্তির নিজস্ব কল্যাণের সাধক—যেমন, সাহস ও সংযম।

আত্মকল্যাণ সাধক গুণ

দ্বিতীয় দলের অন্তর্গত গুণগুলি—সমাজের কল্যাণ সাধক—যেমন ন্যায়পরতা।

অপরের কল্যাণ সাধক গুণ

তৃতীয় দলের গুণগুলি—সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শ স্থাপনের সহায়ক। কিন্তু আত্মসম্পর্কিত ও পরসম্পর্কিত নৈতিক গুণের মধ্যে তীক্ষ্ণ প্রভেদ করা যায় না। ধৈর্য ও সংযম ব্যক্তিকল্যাণ সাধনে যেমন সহায়ক, তেমনি সমাজকল্যাণও সাধন করিয়া থাকে। আবার ভাবাদর্শ সম্পর্কিত গুণগুলি ব্যক্তি ও সমাজের হিতসাধনেরও সহায়ক।

আদর্শ স্থাপনের সহায়ক গুণ

বর্তমান যুগের উপযোগী সদ্‌গুণ—বর্তমান যুগের মানুষ পৃথিবীকে এবং জীবনকে অতীত যুগের মানুষ অপেক্ষা পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে। সুতরাং তাহাদের মূল্যবোধও এক নয়। আধুনিক যুগ বিজ্ঞানবিশ্বাসী এবং কল্পনার চেয়ে বাস্তবকে অধিক মর্যাদা দান করে, এবং জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠাকে উৎকৃষ্ট গুণ

যুগে যুগে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়

২৬। MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 334

বলিয়া স্বীকার করে। আধুনিক মানুষ জানে বুদ্ধির সততা দ্বারাই নির্ভুল বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করা যায়।

অতীতে যে গুণকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হইত, আজ তাহা আদৃত নয়

পূর্বকালের স্বচ্ছন্দ জীবনে ধ্যান ও চিন্তাকে (contemplation) ব্রাহ্মণোচিত শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া সম্মান করা হইত। কিন্তু বর্তমানের জটিল জীবনে কর্মের স্থান অতি উচ্চে। এ যুগ অলসতাকে ঘৃণা করে—এ যুগ বলে Work is worship—যে কাজ করিবে না, যে উৎপাদন করিবে না, তাহার খাদ্যগ্রহণেরও অধিকার নাই—One who does not work, neither shall he eat. কাজেই বর্তমান যুগের মানুষের কাছে, সততার চেয়ে কর্মকুশলতার (efficiency) মূল্য বেশী।

বর্তমান যুগে জ্ঞাননিষ্ঠা, কর্মকুশলতা, সুবিচার আশাবাদিতা ও আনন্দময়তার মূল্য সমধিক

বর্তমান যুগের মানুষ অনেক বেশী সমাজ-সচেতন। সে মানব প্রীতিকে পূর্বাপেক্ষা অনেক উচ্চ মূল্য দান করে। পূর্বের যুগে মানুষ সম্মান করিত ব্যক্তিগত শৌর্যের, এখন দাবি করে সমাজ-সেবা।

বর্তমান যুগ মানুষের নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাসী, এ যুগ আশাবাদী। অতীতের যুগ ছিল দুঃখবাদী এবং ধৈর্যকেই তাহারা মহৎ গুণ বলিয়া মনে করিত। বর্তমান যুগ আনন্দময়তাকে (cheerfulness) একটি শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণ বলিয়া মনে করে।[২৭]

একেবারে এই আণবিক বোমার যুগের অত্যাধুনিক লেখক উইলিয়ম ফক্‌নার নোবেল প্রাইজ্‌ গ্রহণ করিবার কালে বর্তমান কালের লেখকদের দায়িত্ব সম্বন্ধে মূল্যবান্‌ কথা বলিয়াছিলেন।[২৮]

২৭। জন্‌ মেজফিল্ড আধুনিক যুগের মানুষকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

Laugh and be merry, remember, better the world with a song.
Better the world with a blow in the teeth of a wrong.
Laugh, for the time is brief, a thread the length of a span,
Laugh and be proud to belong to the old proud pageant of man.
John Masefield—Laugh & be merry.

২৮। Our tragedy today is a general and universal physical fear so long sustained by now that we can even bear it. There are no longer problems of the spirit. There is only the questions when will I be blown up? Because of this, the young man or woman writing today has forgotten the problems of the human heart in conflict with itself which alone can make good writing. Only that is worth writing about, worth the agony and the sweat.......I believe that man will not merely endure: he will prevail

সদ্‌গুণ সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের মত—সদ্‌গুণ হইতেছে মধ্যপন্থা গ্রহণ—Aristotle's conception of Virtue—the choice of the Mean—'সর্বমত্যন্ত গর্হিতম্' এই প্রবাদের সঙ্গে আমরা পরিচিত। সদ্‌গুণের ন্যূনতা যেমন নিন্দনীয়, অতিরিক্ততাও তেমনি দোষ। দুর্বলকে যেমন আমরা ঘৃণা করি, অতিরিক্ত বলশালীকেও তেমনি আমরা ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখি। কাজেই অ্যারিস্টটলের মতে সদ্‌গুণ হইতেছে, দুই চরমের মধ্যপন্থা গ্রহণ। এই মধ্যপন্থা সর্বদাই আপেক্ষিক। ইহা সর্বদাই অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং বিচারবুদ্ধি ও সাংসারিক জ্ঞান দ্বারা ইহা নির্ধারণ করিতে হয়।[২৯] সাংসারিক অভিজ্ঞতা এবং বিচার দ্বারাই আমরা জানি, অতিসঞ্চয়ের অভ্যাস হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা বা কৃপণতা বলিয়া নিন্দিত হয়। আবার সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ের অভ্যাসও সংযমের অভাব সূচনা করে, এবং অমিতব্যয়িতা বলিয়া সাংসারিক ও বুদ্ধিমান্ লোকের প্রতিকূল মন্তব্য অর্জন করে। বৌদ্ধ দর্শনও 'মঝ্‌ঝিম্ পন্থা' কেই (মধ্যমপন্থা) শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। গীতাতেও আমরা দেখি যোগীকে সংযমী হইতে হইবে, যিনি অতিরিক্ত নিদ্রাশীল তাঁহারও যেমন যোগাভ্যাস হয় না, যিনি একেবারেই নিদ্রা যান না, তাঁহারও যোগ আয়ত্ত হয় না। যিনি অতিভোজনে অভ্যস্ত তিনি যেমন যোগযুক্ত হন না, তেমনি যিনি একেবারে উপবাসী থাকেন, তিনিও যোগসাধনায় অসমর্থ হন।

সদ্‌গুণ সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের মত

সদ্‌গুণ হইতেছে মিতাচার—মধ্যপন্থা অনুসরণ

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।[৩০]

গীতা

যিনি পরিমিতরূপে আহার-বিহার করেন, পরিমিত রূপে কর্ম চেষ্টা

He is immortal not because he alone among creatures has an inexhaustible voice, but because he has a soul and spirit capable of compassion, sacrifice & endurance. The poet's, the writer's duty is to write about these things. It is his privilege to help man endure by lifting his heart, by reminding him of the courage and honour and hope and pride and compassion, pity and sacrifice which have been the glory of his past.

William Faulkner—Nobel Prize acceptance address—10th. Dec., 1950

২৯। Virtue is the habit of choosing the **relative mean,** as it is determined by reason and as the man of practical wisdom would determine it. Aristotle—Nicomachean Ethics.

৩০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—ষষ্ঠ অধ্যায়—১৭ শ্লোক

করেন, পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগ্রত থাকেন, তাঁহার যোগ দুঃখনিবর্তক হয়।

পরিমিততার মাপকাঠি সকলের এক নয় প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বিচার দ্বারা নির্ধারণ সাপেক্ষ

কিন্তু সকলের পক্ষে 'পরিমিত' আহার-নিদ্রা সমান নয়। ইহা অভিজ্ঞতা ও বিচার দ্বারা নির্ধারণ করিতে হয়। সদ্‌গুণগুলি তাই আপেক্ষিক, অভিজ্ঞতা ও যুক্তি বিচার সাপেক্ষ।

অ্যারিস্টটলের মত এই সত্যটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে যে, নৈতিক আদর্শ বা নৈতিক গুণ অ্যাবস্ট্রাক্ট নহে। বাস্তব অবস্থা অনুযায়ীই কোন কর্ম দোষ বা গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। অ্যাবস্ট্রাক্ট বা বিশুদ্ধ বীরত্ব বা ধৈর্য বলিয়া কিছু নাই। সাধারণ ভাবে ইহা বলা যায় যে, প্রত্যেক সদ্‌গুণই দুই চরমের মধ্য পন্থা। কিন্তু কোন ব্যক্তির পক্ষে, মধ্যপন্থা, কোন এক বিশেষ অবস্থায়, কোন্‌টি, তাহা ব্যক্তির শক্তি, বাস্তব অবস্থা ও প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। এবং কোন কোন অবস্থায়, কোন চেষ্টা কোন উদ্যমই অতিরিক্ত নয়। একটি শিশুর জীবন রক্ষার্থে বা নারীর সম্মান রক্ষার্থে কোন উদ্যমই সাধ্যাতিরিক্ত নয়। যাহা শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যানুসারী তাহাই সদ্‌গুণ—সাধারণভাবে ইহাই বলা যায়। কিন্তু সমস্ত অবস্থায় একই গুণ পরিমিত ইহা বলা যায় না।[৩১]

নৈতিক আদর্শ অ্যাবস্ট্রাকট নয় বাস্তব অবস্থা নির্ভর

সংক্ষিপ্তসার

নৈতিক আদর্শ কতগুলি বিশুদ্ধভাব মাত্র নয় তাহারা জীবনে প্রয়োগ যোগ্য। সমাজই নৈতিক জীবনের আধার, সমাজের নানা সম্বন্ধ ক্রিয়া আচারের মধ্য দিয়াই নৈতিক আদর্শ বাস্তব তাৎপর্য লাভ করে।

সমাজে ব্যক্তির স্থান দ্বারা তাহার অধিকার ও কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়। ব্যক্তিরই শুধু কর্তব্য নয়, সমাজেরও কর্তব্য আছে। সমাজের কর্তব্যকে এক কথায় বলা যায় ন্যায়পরতা বা সুবিচার।

যে সমাজ যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা (পুরস্কার বা তিরস্কার) দেয়, যেখানে প্রত্যেকে পরিপূর্ণ নৈতিক বিকাশের সুযোগ পায়। কেহই অন্যকে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে না। সেই সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। এই সুবিচার দুই প্রকার—Distributive justice ও Retributive justice, সমাজে প্রত্যেকে তাহার শক্তি ও

৩১। মুইরহেড্‌ তাই বলিয়াছেন, "Moderation in all things may be as much of a vice as immoderation in one and all. We must reject the idea of an abstract golden mean. Muirhead—Elements of Ethics.

সম্ভাবনা বিকাশের সমান সুযোগ পাইবে, কিন্তু বণ্টনে সকলে সমান ভাগ পাইবে ইহা হইল Distributive justice আর প্রত্যেকই নিজ নিজ কর্মের (সু বা কু) ফল ভোগ করিবে ইহা হইল Retributive justice; ন্যায়পরতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে হৃদয়বত্তা। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দেওয়া হইল—justice কিন্তু পাপীকেও ক্ষমা করা, দুর্বলকে করুণা করা হইল Benevolence। বাস্তবিকপক্ষে হৃদয়বত্তা ন্যায়পরতারই উচ্চতম বিকাশ।

যাহা যাহার প্রাপ্য তাহা তাহাকে দেওয়া হইল সুবিচার এবং ইহার জন্য যে স্পষ্ট নির্দেশ থাকে, তাহা হইল আইন বা Law। কিন্তু মানুষের সমস্ত কর্তব্য কাগজে কলমে নির্দিষ্ট করা যায় না—তাহার লংঘনে কোন শাস্তিও আইনে নির্দেশ করে না, সে ক্ষেত্রে বিচারকের ন্যায়নিষ্ঠার উপর নির্ভর করিতে হয় এই অলিখিত বিধানকেই বলে equity।

এবার ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাক। প্রত্যেক ব্যক্তির সংসারে সমাজে নির্দিষ্ট স্থান আছে; তাহা দ্বারা তাহার অধিকার নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু অধিকার আপনা হইতেই বর্তায় না, তাহা কর্তব্যপালন দ্বারা অর্জন করিতে হয়।

অধিকার ও কর্তব্য অবিচ্ছিন্ন পারস্পরিক সম্বন্ধে যুক্ত। পিতার অধিকার আছে, তাই সেই ক্ষেত্রে সন্তানের কর্তব্য আছে। আবার অধিকার দাবি করিতে হইলে কর্তব্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং অন্যের অনুরূপ অধিকার স্বীকার করিয়া তাহার প্রতি কর্তব্য পালন করিতে হইবে। সর্বশেষ কোন অধিকারই একা ভোগের জন্য নহে, সব অধিকারই বহুর সুখ ও কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত। আইন ব্যক্তির অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু সে অধিকার কোন অবস্থায়ই সমাজের হিতের বিরোধী হইতে পারে না।

সব উন্নতিশীল রাষ্ট্রেই মানুষের নিম্নলিখিত মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকার করা হয় (১) জীবনের অধিকার (২) স্বাধীনতার অধিকার (৩) সম্পত্তির অধিকার (৪) চুক্তি করিবার অধিকার (৫) শিক্ষার অধিকার।

এই অধিকার স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্র ব্যক্তির কাছে নিম্নলিখিত বিষয়ে আনুগত্য দাবি করে (১) জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা (নিজের ও অপরের) (২) স্বাধীনতা রক্ষার উদ্যম (রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত) (৩) সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা (৪) সমাজ শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধা (৪) ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা (৫) সমাজের উন্নতি বিষয়ে আগ্রহ (৬) সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা।

কতগুলি কর্তব্য আইন দ্বারা নির্দিষ্ট। তাহার লঙ্ঘনে নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান আছে। এগুলি হইল Duties of Perfect obligation। আবার কতগুলি অনির্দিষ্ট কর্তব্য আছে তাহা লঙ্ঘনে কোন নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান নাই এগুলি হইল Duties of imperfect obligation।

ব্রাড্‌লে বলেন, কর্তব্য সর্বদাই সমাজে ব্যক্তির স্থান ও পরিবেশ সাপেক্ষ। প্রত্যেক স্থানের জন্যই কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে। ব্যক্তির দায়িত্ব নিজ স্থান অনুযায়ী কর্তব্য যথাসাধ্য সুসম্পন্ন করা। এ সম্বন্ধে বাস্তব নির্দেশ হইল—"এই মুহূর্তে যে কর্তব্য তোমার সম্মুখে তাহা সুসম্পন্ন কর। যে কাযের তুমি উপযুক্ত তদতিরিক্ত গ্রহণ করিও না।"

অনেক সময় মনে হয় কর্তব্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। ব্যক্তি একই মুহূর্তে বিপরীত কর্তব্যের সম্মুখীন হইয়া বিব্রত বোধ করে। বাস্তবিক পক্ষে এক বিশেষ মুহূর্তে বা বিশেষ অবস্থায় একটিই মাত্র কর্তব্য থাকিতে পারে এবং বিবেকই অনেক সময় নির্ভুল নির্দেশ দেয়। অবশ্যই বিবেক একটি অন্ধশক্তি নয়—ইহার নির্দেশ অন্ততঃ অবচেতন-বুদ্ধি-নির্ভর।

এই সব বিরোধের ক্ষেত্রে কর্তব্যের স্পষ্ট নির্দেশের জন্য কোন কোন ধর্ম শাস্ত্রে জটিল ও

যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ কোন কর্তব্য উচ্চ, কোনটি নীচ, কোনটি প্রধান কোনটি অপ্রধান, বিরোধের কোন্‌টি অগ্রাধিকার পাইবে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিবার চেষ্টা আছে। ইহাকে casuistry বলে। কিন্তু বুদ্ধিমান্‌ ও নীতিবান্‌ মানুষ এরকম যান্ত্রিক ভাবে কর্তব্য নির্দেশ সমীচীন মনে করে না। কয়েকটি সাধারণ নৈতিক বিধিই শুধু নির্দেশ করা চলে, এবং সেই সাধারণ নীতি অনুযায়ী যুক্তির বিচার দ্বারা মানুষ নিজেই প্রকৃষ্ট পথটি খুঁজিয়া নিতে পারে।

যে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বা মানসিক গঠন ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা নিজ স্থায়ী স্বভাবে পরিণত করে, তাহাদিগকে নৈতিক সদগুণ বলা হয়। সদগুণ চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত হয় কিন্তু একবার আয়ত্ত হইলে, তাহারা নীতিবান মানুষের ইচ্ছা ও ক্রিয়াকে স্বাভাবিক ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে। সদগুণ অন্ধ সংস্কার নয়—যুক্তি বিচার দ্বারা নির্ধারণ করিতে হয়। কিন্তু গ্রীক পণ্ডিতেরা যখন বলেন Virtue is Knowledge তখন Knowledge কথাটিকে তাহারা একটি বিশেষ এবং অতিব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেন। ধর্মপথ কি তাহা জানিয়াও আমরা তাহা সব সময় অনুসরণ করি না। নৈতিক আদর্শ বিচার বিবেচনা দ্বারা জানিয়া সচেতন ইচ্ছা দ্বারা তাহা পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের পরই সদগুণ স্বভাবে পরিণত হয়।

সব সমাজে সব কালে সব গুণকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয় না। সদগুণ সমাজ পরিবেশ সাপেক্ষ। কাজেই পূর্বকালে গ্রীসদেশে যে গুলি শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ বলিয়া বিবেচনা করা হইত, (যেমন দৈহিক শৌর্য, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদি) বর্তমান ইয়োরোপে সেই গুণগুলি তত মর্যাদা লাভ করে না। ভারতবর্ষের মূল্যবোধ ও পাশ্চাত্যের মূল্যবোধে প্রভেদ আছে। প্লেটো প্রজ্ঞা, সাহস, সংযম ও ন্যায়পরতা এই চারিটি গুণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বর্তমান যুগ অতীতের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই গুণগুলির মূল্যায়ণ করে না ; যদিও এই গুণগুলিকে কাম্য বলিতে বর্তমান মানুষেরও কোন বাধা নাই। তবে বর্তমান মানুষের বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠা, কর্মকুশলতা মানবতাবোধ আশাবাদ ও আনন্দময়তাকে উচ্চতর মূল্য দিয়া থাকে।

অ্যারিষ্টটলের মতে প্রত্যেক সদগুণই হইতেছে দুই চরমের মধ্যপন্থা—the golden mean। গীতাতেও পরিমিততার প্রশংসা করা হইয়াছে। তবে একজনের পক্ষে যাহা পরিমিত, অন্যের পক্ষে তাহা অতিরিক্ত। এক অবস্থায় যাহা মধ্যপন্থা অন্য অবস্থায় তাহাই নিন্দনীয় চরম পন্থা। কাজেই অ্যাবস্ট্রাক্‌ট্‌ভাবে অবস্থা নিরপেক্ষভাবে কোন গুণকে সদগুণ বলা যায় না—জীবনের বাস্তব প্রয়োজন ও সমাজ পরিবেশ বিচার করিয়াই স্থির করিতে হয় কোন গুণটি কোন অবস্থায় সদগুণ।

Questions

1. Analyse the concept of Justice as a social virtue. Distinguish between Justice & Equity and Justice and Benevolence—Which is the higher virtue and why ?

2. What are the fundamental human rights and what are their fundamental obligations ?

3. What in meant by the conflict of duties and how does casuistry seek to resolve the conflict ? Is the attempt successful ?

4. Critically discuss the dictum 'Virtue is knowledge'. What are the fundamental virtues according to the modern view?

একবিংশ অধ্যায়

পুরস্কার ও শাস্তি

[Distinction between error, legal offence, crime, vice & sin. Retributive theory of punishment—Criticism. Deterrent theory—Criticism. Reformative theory—Criticism. Should capital punishment be abolished ? Arguments for & against.]

ব্যক্তির আচরণকে ন্যায় ও অন্যায় বলিয়া বিচার করা নৈতিক সমাজ-জীবনের অঙ্গ। কিন্তু সমাজের বিচার শুধু পুঁথি-পুস্তকের ব্যাপার নহে। সমাজের কারবার, বিচিত্র সম্বন্ধযুক্ত বহু ব্যক্তির বাস্তব জীবন নিয়া। সমাজের উপর শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আছে। সুতরাং ব্যক্তিকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সমাজের হাতে পুরস্কার ও তিরস্কারের ক্ষমতাও থাকে। সৎকাজ সমাজজীবনের সংহতি রক্ষা করে, তাহাকে প্রাণবন্ত করে, সুতরাং সৎকাজে উৎসাহ দিবার জন্য সমাজ এই জাতীয় কাজকে প্রশংসা করে।

নৈতিক বিচার হইতেছে মানুষের আচরণের ন্যায় অন্যায় বিচার

আবার পাপাচরণ ব্যক্তিকেই শুধু অধঃপাতিত করে না, সমাজ-শৃঙ্খলার উপর তাহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে। সমাজ তাই তাহা উপেক্ষা করিতে পারে না। সে অপরাধীকে শাস্তি দেয়।

সমাজ অন্যায় কাজের দণ্ড বিধান করে

কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ব্যক্তি পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত হইবে তাহা একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ও সামাজিক প্রশ্ন। নীতিবিদ্, আইনজ্ঞ, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষক, পিতা-মাতা সকলকেই এই বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রশ্নটি কতকটা সীমাবদ্ধ ভাবেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, এবং তাহা হইল এই—কেন শাস্তি দিব ?

কি উদ্দেশ্যে এই দণ্ড বা পুরস্কার ?

এই অতীব কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নটি জবাব দিবার আগে কতগুলি প্রভেদ করা প্রয়োজন। এই প্রভেদগুলি হইল ভুল (error), অপরাধ (crime), স্থায়ী নৈতিক-মানসিক বিকৃতি (vice) এবং পাপ (sin) এই কয়টি কথার মধ্যে।

ভুল কাহাকে বলে? যেখানে কোন ত্রুটি অনিচ্ছাকৃত, যাহা কোন স্থায়ী নৈতিক বিকারের ফল নয় তাহাকে ভুল বলা হয়। কোন সময় ইহা ত্রুটিপূর্ণ হিসাবের ফল। হয়তো তাহার জন্য নিজের বা অন্যের ক্ষতি ঘটে। কিন্তু তাহা ঈপ্সীত ছিল না। এই **ভুল, নৈতিক অপরাধ নয়।** কয়েকটি ছেলেমেয়ে দূর হইতে আমার কাছে পড়িতে আসিয়াছে। পড়া সাঙ্গ করিয়া যখন তাহারা বাড়ী যাইবে, তখন বেশ রোদ। দূরে আকাশের এক কোণে একটুখানি কালো মেঘ ছিল। তাদের বাধা দিলাম না। দুদিন বাদে সংবাদ পাইলাম ওরা সেদিন কিছু বাদেই প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়িয়াছিল, এবং ওদের বাসের উপর একটি মস্ত বড় ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া একটি মেয়ে গুরুতর আহত হইয়াছে। শুনিয়া মন খুব খারাপ হইল, কিন্তু ঝড় উঠিবে ইহা আমি বুঝিতে পারি নাই—এখানে আমার হিসাবে ভুল হইয়াছিল। হয়তো আবহাওয়া সম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞ ব্যক্তি এমন ভুল করিত না। এ ভুলের পিছনে ছিল অজ্ঞানতা (ignorance), কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা আহত হোক এমন, ইচ্ছা নিশ্চয়ই মনের মধ্যে ছিল না। সুতরাং আমার কাজটি নীতিবিরুদ্ধ (immoral) নয়। অবশ্য অসাবধানতার জন্য অন্যের ক্ষতি করিলে জবাবদিহি করিতে হয়। কিন্তু ক্ষতি করিবার সচেতন ইচ্ছা যদি না থাকে তবে তাহা নৈতিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না।

কোন হিসাবের বা বুদ্ধির বিচারের ত্রুটি যাহা কোন নৈতিক বিকারের ফল নয়, তাহাকে বলি ভুল (error)

আইন ভঙ্গ করিয়া কাহারও ক্ষতি করিলে, তাহা হয় অপরাধ। দেশের আইন না জানিয়া কেহ যদি ভুল রাস্তায় মোটর চালায়, তাহা হইলেও তাহা অপরাধ, যদিও এখানে ক্ষতি করিবার কোন ইচ্ছা ছিল না। অপরাধের মাপকাঠি হইল, আইনলঙ্ঘন।[১] অবশ্য যেখানে আইনলঙ্ঘন সচেতন ভাবে ঘটে না, সেখানে শাস্তি কম হয়, কিন্তু আইনের চোখে তাহাও অপরাধ।

আইন ভঙ্গ করিয়া কাহারও ক্ষতি করিলে, তাহা হইল অপরাধ (Crime)

১। The term crime denotes only those offences against society which are recognised by national law, and which are liable to punishment. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 327

নৈতিক অপরাধ ও আইনগত অপরাধ এক নয়। যান-চলাচল সম্পর্কিত নিয়ম (Traffic regulation) ভঙ্গ করিলে, তাহা আইনগত অপরাধ। কিন্তু সচেতন ভাবে অন্যের ক্ষতি করিবার কোন অভিপ্রায় যদি না থাকে, তাহা নৈতিক অপরাধ নয়, আবার সব নৈতিক অপরাধই, আইনগত অপরাধ নয়। মিথ্যা কথা বলা, নৈতিক আদর্শ অনুসারে অন্যায় (তাহাতে অন্যের কোন ক্ষতি না হইলেও)। কিন্তু যুবতী মেয়েরা নাকি সর্বদাই অন্যের কাছে নিজের বয়স কমাইয়া বলে। ইহা কিন্তু আইনের চোখে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। যদি কোন মেয়ে, কোন যুবকের কাছে নিজের বয়স কমাইয়া বলিয়া, তাহাকে বিবাহে প্রলুব্ধ করে, তবে তাহা আইনের চক্ষে প্রবঞ্চনার অপরাধ (Sec. 420) হইবে। ইহা নৈতিক অপরাধও বটে। সাধারণতঃ বলা যায় যে, আইন কর্মের বাহিরের ফল দিয়া অপরাধের বিচার করে আর নীতিবিদ্যা মানুষের অন্তর দিয়া কর্মের বিচার করে। অবশ্য ইহা সত্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, যাহা আইনের চোখে অপরাধ, তাহা নৈতিক অপরাধও বটে। তবে পূর্বের আলোচনা হইতে বোঝা যাইবে যে, এই দুই অভিন্ন নয়।

আইন গত অপরাধ সব সময় নৈতিক অপরাধ নয়

আইন কর্মের বাহ্যফল দিয়া বিচার করে, আর নীতিবিদ্যা মানুষের অন্তরের বিশুদ্ধতা দ্বারা বিচার করে

আমরা ইতিপূর্বে নৈতিক বিচারের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। সেখানে দেখিয়াছি যে, কর্মের ফলাফল (consequences) বা কর্মের প্রেষণা (motive) নৈতিক বিচারের বিষয় (object of moral judgment) নহে। নৈতিক বিচারের বিষয় হইতেছে, ব্যক্তির সমগ্র অভিপ্রায়ের (motive & intention) মধ্য দিয়া, ব্যক্তির চরিত্রের বিচার। নৈতিক অপরাধ, অস্থির বা বিকৃত নৈতিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।

নৈতিক বিচার ব্যক্তির সমগ্র চরিত্রের বিচার

যে অপরাধ স্থায়ী নৈতিক বিকৃতির প্রকাশ, যাহা ব্যক্তির আত্মসংযমের অভাব ও কুঅভ্যাসের ফল, (যথা পানাসক্তি, বেশ্যাসক্তি, পুনঃ পুনঃ চৌর্য) তাহাকে পাপাচার বা vice বলা হয়। পাপাচার একটি ক্ষণিক মুহূর্তের স্খলন নয়, ইহার মূল অনেক গভীরতর। একদিনে মানুষ বেশ্যাসক্ত হয় না। ইহা বহুদিনের অসংযমের ফল, তাহার ফলে দুষ্কৃতকারীর মনে অপরাধ সম্বন্ধে পাপবোধ ও অনুতাপ লুপ্ত হইয়া যায়। ইহা নৈতিক

যে অপরাধ স্থায়ী নৈতিক বিকৃতির প্রকাশ, তাহা পাপাচার বা vice

অধঃপতনের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। ইহা ক্ষণিক স্খলন অপেক্ষা অনেক বেশী নিন্দনীয়।

পাপ (Sin) কথাটি দ্বারা ধর্মের অনুশাসন লঙ্ঘন বোঝায়।

Sin কথা দ্বারা ধর্মের অনুশাসন লঙ্ঘন বোঝায়

সাধারণতঃ যাহা পাপ, তাহা নৈতিক অপরাধও বটে। কিন্তু নৈতিক অপরাধ ও পাপ এক নয়। ধর্মের প্রচলিত প্রথা অমান্য করিলে, তাহা পাপ বলিয়া গণ্য হইবে। তাই হিন্দুর ছেলে গোমাংস ভক্ষণ করিলে, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস মতে ইহা মহাপাপ এবং গুরুতর প্রায়শ্চিত্তযোগ্য; কিন্তু আধুনিক কোন শিক্ষিত হিন্দু যুবক ইহাকে নৈতিক অপরাধ বলিয়া মনে করিবে না। বর্তমান মানুষের কাছে ধর্মের প্রাচীন আচার-প্রথার চেয়ে, নীতির আদর্শ অনেক বেশী মূল্যবান্। যিনি নীতিবিদ্, তিনি ধর্মীয় প্রথা ও অনুশাসনকে ধর্মীয় বলিয়া মান্য করেন না, তাহা নৈতিক আদর্শ বলিয়াই শ্রদ্ধা করেন।[১]

ধর্মীয় দৃষ্টিতে পাপ ও নৈতিক বিচারে অপরাধ এক নয়

শাস্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত—Theories of Punishment—

জড়জগতে যেমন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে, তেমনি মানুষের নীতি-বোধের মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে, ন্যায় ও অন্যায় সর্ব প্রকার কর্মেরই প্রতিফল ভোগ করিতে হয়। জড়জগতে যেমন কোন শক্তিরই বিনাশ নাই, এবং ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া একেবারে সমান, তেমনি উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীতও আমরা বিশ্বাস করিতে ভালবাসি যে নৈতিক কর্মের শক্তিরও কোন অপচয় নাই, এবং যে

ব্যক্তি তাহার কৃত-কর্মের জন্য দায়ী

১। খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা অনেক সময়ে জন্মগত, অপরিবর্তনীয় বিকৃত স্বভাবকে Sin বলেন এবং মনে করেন ইহার মূল vice হইতেও গভীর। এই অর্থে তাঁহারা মানুষের original sinএর কথা বলেন। আদম ও হবার ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করিয়া জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণের অপরাধ রূপ পাপের অভিশাপ তদবধি সমস্ত মানুষ বহন করিতেছে। Vice হইতেছে যাহা বাহিরের পাপাচরণে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু Sin হইতেছে অন্তরের দুরপনের কলঙ্কের দাগ—Vice corresponds to virtue and means a general habit of character issuing in particular bad acts; whereas sin as used by Christian writers refers more often to the inner disposition of the heart, want of purity in the motive & the like.

MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 369, footnote.

নৈতিক কর্ম (ভাল বা মন্দ) সম্পাদন করিল, তাহাকে আপন কর্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে: এ জীবনে হয়তো দেখা যায়, অসাধু লোক সুখে-আরামে থাকে, সাধুলোক দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করে। কিন্তু পূর্বেই দেখিয়াছি কাণ্টের মতে ইহাই নীতিবোধের পশ্চাতে একটি অপ্রমাণিত বিশ্বাস (Postulate of morality) যে এ জীবনে না হইলেও, পরকালে একজন বিচারকর্তা অভ্রান্ত হিসাবনিকাশ করিবেন।

সমাজে সব মানুষ সর্বদা নীতির পথ অনুসরণ করিবে, ইহা আশা করাই যায় না। মানুষের দুষ্প্রবৃত্তি, মানুষের স্বার্থবুদ্ধি অনেক সময় তাঁহার উচ্চতর নীতিজ্ঞান ও সমাজবোধকে অন্ধ করিয়া দেয়। তখন সে এমন সব কাজ করে, যাহা অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে, নিজেকেও অধঃপাতিত করে।

সমাজ আত্মরক্ষার জন্য অপরাধের শাস্তি দেয়

সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি অন্যায় করে, সে যে অন্যায় সহে তাহার চেয়ে বেশী অপরাধী, কারণ যে অন্যায় সহে তাহার ক্ষতিটা বাহ্য। ইহা তাহার অন্তরকে কলঙ্কিত করে না। কিন্তু যে অন্যায় করে, সে অন্যেরও ক্ষতি করে, নিজের চরিত্রকেও ম্লান করে। সমাজ তাহাকে সহ্য করে না। করিলে সমাজের সংহতি বিনষ্ট হয়। অপরাধীর শাস্তি দ্বারা সমাজ নিজ মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে।

কিন্তু শাস্তির দার্শনিক যুক্তিযুক্ততা কি?

সমাজ অবশ্য মানুষের অন্তরকে বিচার করে না—তাহার কর্মের বাহ্য ফলাফলকেই বিচার করে। এই বিচার করিবার ক্ষমতা সমাজের হাতে ন্যস্ত আছে। প্রীতিপ্রদ না হইলেও, অপরাধীকে সমাজের হাতে শাস্তি গ্রহণ করিতে হয়।

কি উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া হইবে এবিষয়ে তিনটি প্রধান মত

সমাজ অপরাধীকে যে শাস্তি দেয়, তাহার উদ্দেশ্য কি? এ বিষয়ে তিনটি বিভিন্ন মত আছে: (১) শাস্তির মধ্য দিয়া ব্যক্তি তাহার কৃতকর্মের প্রতিফল যাহাতে ভোগ করে, সমাজ তাহারই ব্যবস্থা করে (Retributive theory), (২) শাস্তির উদ্দেশ্য অপরাধ নিবারণ (Deterrent theory), (৩) শাস্তির উদ্দেশ্য অপরাধীর সংশোধন (Reformative theory)। আমরা দেখিব যে, এই তিনটি আপাতবিরুদ্ধ মত বাস্তবিক পক্ষে পরস্পরের সহযোগী—সম্পূর্ণ বিপরীত নয়

(১) **Retributive theory**—এই মত অনুযায়ী, নীতিজগতের ইহা একটি মৌলিক বিধি যে, প্রত্যেক মানুষকে তাহার কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। সমাজের উপর এই ফল বণ্টনের ভার ন্যস্ত। সমাজের ইহা দায়িত্ব যে, ব্যক্তি যেন সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত হয়, এবং অন্যায় কর্মের জন্য তিরস্কার লাভ করে। যে অপরাধ করিয়াছে, সে সমাজে অপর কাহারও কিছু ক্ষতি করিয়াছে। শাস্তির উদ্দেশ্য হইল সেই ক্ষতিপূরণ।

Retributive Theory বলে, শাস্তির মধ্য দিয়া ব্যক্তির কৃতকর্মের ফল তাহাকে ভোগ করিতে বাধ্য করা হয়

ক্ষতির পরিমাণ গুরুতর হইলে, শাস্তির পরিমাণও গুরুতর হইবে। যে অপরের পাঁচশত টাকা ক্ষতি করিয়াছে, সমাজের আইন তাহাকে সেই ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য করিবে। তা ছাড়া অপরাধী সমাজের নৈতিক বিধির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, শাস্তির মধ্য দিয়া সেই মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩] যে অপরাধ করিল, সে মানবতার অমোঘ নীতিকে আঘাত করিল। শাস্তি দ্বারা সেই মর্যাদার প্রতি আঘাত বিলুপ্ত হইল।[৪]

অপরাধের দ্বারা ব্যক্তি যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা সে পূরণ করিতে বাধ্য

সমাজজীবনের প্রাথমিক অবস্থায় ব্যক্তিই তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোন অপরাধ করিলে, তাহাকে নিজেই শাস্তি দিতে উদ্যত হয়, এবং তাহার সরল বন্য বুদ্ধি অনুযায়ী সে বলে, "চোখের বদলে চোখ নিব—আর দাঁতের বদলে দাঁত—an eye for an eye, a tooth for a tooth." অপরাধ ও শাস্তি সমান সমান হইতে হইবে—ইহাই হইল সুবিচারের সহজ তত্ত্ব। আজও ভিন্দ্‌ মোরেণার ডাকাতের সমাজে সেই বন্য নীতিই প্রচলিত রহিয়াছে, তাহারা বলে 'খুন্‌কা বদ্‌লা খুন'—তাই সেখানে প্রতিহিংসামূলক নরহত্যার (vendetta) শেষ নাই!

কাজেই চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত—ইহা হইল সমাজের আদিমনীতি

৩। Punishment is in its essence, a rectification of the moral order of which crime is the notorious breach. Seth—A Study of Moral Principles, P. 315

৪। A wrong against social law is a wrong against humanity, and cannot be forgiven until the offended majesty of the law has been appeased, i. e. until the wrongness and essential nullity of this act has been made apparent. MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 374

কিন্তু সমাজজীবন সুসংবদ্ধ হইলে, তখন বিচার ও শাস্তির ভার প্রত্যেক ব্যক্তির হাত হইতে সমাজ নিজের হাতে গ্রহণ করে—বিচারালয় ইত্যাদি স্থাপিত হয়। অপরাধীকে নিজ পক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় এবং বিচার ও শাস্তি সমাজ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারকের হাতে থাকে। ইহাতে বিচার পূর্বের মতো দ্রুত ও হাতে-হাতে হয় না সত্য, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারের ব্যবস্থা হয়। বিচারক কোন পক্ষের প্রতি অনুরাগ-বিরাগের দ্বারা চালিত না হইয়া, সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করিয়া অপরাধ প্রমাণিত হইলে, অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করেন। ইহাই আধুনিক সমাজে ন্যায়পরতা বা Justiceএর রূপ। এখানেও শাস্তির পিছনে এই নীতি স্বীকৃত যে, অপরাধীকে কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। অ্যারিস্টট্‌ল শাস্তিকে বলিয়াছেন, নেতিবাচক পুরস্কার—negative reward। যে সংকাজ করে সে যেমন পুরস্কার অর্জন করে, যে অপরাধ করে সেও তাহার প্রাপ্য অর্জন করে এবং তাহাই হইল শাস্তি ও তিরস্কার।

বর্তমানে বিচারের ভার প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নয়, সমাজনিযুক্ত বিচারকের হাতে

আধুনিক সমাজে অপরাধকে অ্যাবস্ট্রাক্ট্‌ ভাবে বিচার করা হয় না, কোন্ অবস্থায় ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে তাহাও বিবেচনা করা হয়

এই মতের বিরুদ্ধে কতগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে :

উক্ত মতের বিরুদ্ধে আপত্তি—

(১) এ মতের মধ্যে আদিম মানুষের বন্য প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির চিহ্ন দেখা যায়।

(১) ইহা আদিম প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির প্রকাশ

(২) অপরাধ ও শাস্তি কখনই ঠিক সমান-সমান হইতে পারে না।

(২) অপরাধ ও শাস্তি কখনই সমান সমান হইতে পারে না

(৩) অপরাধ একটা নিবস্তুক অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিস নয়,—ইহা অনেক সামাজিক, মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, কাজেই অপরাধের বিচার করিতে হইলে, অপরাধ কোন্ অবস্থায়, কেন সংঘটিত হইল, তাহা জানিয়া তবেই শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাচীন বিচারকেরা অপরাধের বাহ্য দিকটা, অর্থাৎ তাহার দ্বারা যে ক্ষতি সংঘটিত হইল, তাহা চিন্তা করিয়া তদনুযায়ী শাস্তি বিধান করিতেন। তাঁহারা যেন আইনের বই খুলিয়া শাস্তি বিধান করিতেন—১০০৲ টাকা চুরি করিয়াছে, সুতরাং ১০০৲ টাকা জরিমানা ও একমাস জেল। ৫০০৲ টাকা ডাকাতি করিয়াছে, কাজেই ৫০০৲ টাকা জরিমানা ও ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

(৩) অপরাধ কেন করা হইল তাহা অবশ্যই বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে

মানুষ খুন করিয়াছে, কাজেই মৃত্যুদণ্ড। অর্থাৎ বিচারকের কাজ ছিল, অপরাধ-দ্বারা অন্যের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, তাহা নির্ধারণ করিয়া তদনুরূপ শাস্তি-বিধান করা, যাহাতে ক্ষতিপূরণ যথোপযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান কালের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বেশী মানবিক ও আন্তরিক। অর্থাৎ কেন, কোন অবস্থায় অপরাধী অপরাধ করিল, তাহা সহানুভূতির সহিত বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে সংশোধনের উদ্দেশ্যেই শাস্তি দেওয়া হয়।[৫]

নৈতিক বিচার শুধু বিচ্ছিন্ন একটি ক্রিয়ার বিচার নয়—সমগ্র ব্যক্তির বিচার

(৪) এই মত মানুষকে তাহার সমগ্র মনুষ্যত্বের দিক হইতে না দেখিয়া, তাহার একটি ক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়া বিচার করে। শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শের উদ্দেশ্য, ব্যক্তির সমগ্রতার পরিপূর্ণ বিকাশ। কিন্তু শুধুমাত্র শাস্তিবিধান দ্বারা তাহা সম্ভব নয়।

অপরাধী বলিয়া আলাদা কোন জাত নাই

(৫) অপরাধী একটি আলাদা জাতি নয়। সমস্ত মানুষই, বিশেষ অবস্থায়, অপরাধ করিতে পারে। অপরাধীকে তাই সাধারণ মানুষ হিসাবেই বিচার করিতে হইবে,—তাহাকে অপরাধী বলিয়া অপাংক্তেয় করিলে, তাহার প্রতি সুবিচার হয় না। অপরাধ মাত্রই দুষ্ট মনের পরিচয় নয়, এবং সেই জন্যই বিচারকালে বিচারককে অপরাধটির সমগ্র পশ্চাৎপট বিবেচনা করিতে হয়।

এই মতের মধ্যে এই সত্য আছে যে, শাস্তি হইতেছে ক্ষতিপূরণ, এবং ব্যক্তিরা নিজ কর্মের ফলাফল গ্রহণ

এই মতের মধ্যে এই মস্ত সত্যটি আছে যে, শাস্তি হইতেছে অপরাধের ক্ষতিপূরণ। অপরাধীকে এ দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে। শাস্তি তখনই সুফলপ্রসূ হইবে, যখন সমাজের শাস্তিকে অপরাধী অনুতপ্ত হৃদয়ে, সর্বান্তঃকরণে, নিজ প্রাপ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে। সমাজের বিচার বাহিরের বিচার না হইয়া, তাহার নিজ সম্বন্ধে অন্তরের বিচার হইবে।

৫। এ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন Towle খুব সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, "Yesterday we said : this is a thief. What do we do with a thief? Today we say, 'this is a person, who steals' and proceed to understand why he steals. Quoted by Maud Merrill—Problems of Child Delinquency, P. 2

এমন হইলেই শাস্তির মধ্য দিয়া নৈতিক বিধির যে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে। সমাজের শাস্তি ব্যক্তির কাছে আত্মশাসনেরই আবেদন,—যাহার অভাব অপরাধের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শাস্তির গভীর নৈতিক তাৎপর্য ও যুক্তিবত্তা এখানেই যে, ইহা ব্যক্তির লুপ্ত আত্মশাসনকেই উদ্বুদ্ধ করে।[৬]

ইহা দ্বারা নৈতিক বিধির মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়

(২) **The Deterrent theory**—এই মতের মূল কথা হইল যে, শাস্তির উদ্দেশ্য হইতেছে, অপরাধ নিবারণ। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ইহা অনুরূপ সম্ভাব্য অপরাধীদের প্রতিও সতর্কবাণী। চুরি করিলে, শাস্তি পাইতে হয়,—ইহা জানে বলিয়াই অধিকাংশ মানুষ চৌর্য অপরাধ হইতে নিবৃত্ত থাকে। ইহা সমাজের আত্মরক্ষার উপায়। ব্যক্তির যেমন আত্মরক্ষার অধিকার আছে, সমাজেরও তেমনি অধিকার আছে। শাস্তির ভয়, দুর্বৃত্তদের দমনের একটি শ্রেষ্ঠ ও বহু পরীক্ষিত সফল উপায়। সংসারেও শিশুদের বেলায় আমরা দেখি, শিশু তাহার অপরিণত বুদ্ধি দিয়া, ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্ম প্রভেদ বুঝে না। কিন্তু পিতামাতা শাসন ও শাস্তির মধ্য দিয়া তাহাকে শিক্ষা দেন যে, কতগুলি কাজ শাস্তিযোগ্য। শিশু সেই কাজগুলি হইতে, শাস্তি বা তিরস্কারের ভয়ে দূরে থাকে। সাধারণ মানুষের বোধশক্তিও শিশুর মতোই। শাস্তির ভয় দিয়াই, তাহাদের অপরাধ ও অন্যায় কার্য হইতে দূরে রাখিতে হয়।

Deterrent theory বলে—শাস্তির উদ্দেশ্য অপরাধ নিবারণ ও সমাজকে রক্ষা

এই মতের মর্মকথাটি এক বিচারক শাস্তি দিবার কালে, খুব সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন—"মেষ চুরি করার জন্য তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে না—তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে,—যাহাতে কেহ আর মেষ চুরি না করে।"[৭]

অপরাধীকে শাস্তি দিলে অন্য সকলে সাবধান হয়

৬। Here in the force of this inner appeal, in such an awakening of the man's slumbering conscience, lies the **ethical value of punishment...** the judgment of society upon the man must become the judgment of the man upon himself, if it is to be effective as an agent in his reformation.
Seth—A Study of Ethical Principles, P. 314

৭। It is expressed in the familiar dictum of the judge, "You are not punished for stealing sheep, but in order that sheep may not be stolen."
MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 374

শাস্তি অনেক সময় অপরাধ নিবারণে সহায়ক, ইহা সত্য। কিন্তু নানা কারণেই এ মতের বিরুদ্ধে কতগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি

(১) মনস্তাত্ত্বিকরা দেখিয়াছেন যে, অপরাধের শাস্তি অপেক্ষা সৎকার্যের প্রশংসা দ্বারা অধিক সুফল পাওয়া যায়। ইহাও দেখা যায় যে, শাস্তির বিরুদ্ধে অপরাধীর একটা স্বাভাবিক বিদ্রোহের ভাব থাকে। যাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে মনে করে, তাহাকে অন্যায় ভাবে পীডন করা হইয়াছে। সে আত্মসমর্থনে বহু কাল্পনিক যুক্তি দাঁড করায়, এবং দোষটা সমাজের স্কন্ধেই চাপাইতে চেষ্টা করে। কখনই প্রায় দেখা যায় না যে, শাস্তির ফলে ব্যক্তি অনুতপ্ত হইয়া, আত্মসংশোধনে চেষ্টিত হইয়াছে। বরঞ্চ দেখা যায়, জেলখানা হইতে চোর, গুণ্ডা, বদমাইসেরা আরো বেশী দুর্বৃত্ত-চরিত্র হইয়া ফেরে।

(১) শাস্তিদ্বারা অনেক সময়ই সংশোধন হয় না

(২) এ মত মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি অবজ্ঞা ও অবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ কেবলমাত্র শাস্তির ভয়েই সৎপথে চলে, মানুষের সম্পর্কে ইহা একটি অশ্রদ্ধেয় অর্ধসত্য মাত্র। মানুষের মধ্যে নীতিবোধ আন্তরিক, এই মত অনেক গভীর ভাবে সত্য।

মানুষ শাস্তির ভয়েই সৎপথে চলে, ইহা ঠিক নয়

(৩) শাস্তি যদি অপরাধ নিবারণে সক্ষম হইত, তাহা হইলে মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে নরহত্যা অনেক পূর্বেই পৃথিবী হইতে লোপ পাইত। শাস্তি দ্বারা মানুষের আত্মমর্যাদাবোধের তীক্ষ্ণতা লোপ পায় এবং ভবিষ্যতে অপরাধ করা সম্বন্ধে চক্ষুলজ্জা কাটিয়া যায়। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, 'যার এক কান কাটা গিয়াছে সে গ্রামের বাহির দিয়া লুকাইয়া ফেরে, কিন্তু যাহার দুই কান কাটা গিয়াছে সে বুক ফুলাইয়া গ্রামের মধ্য দিয়াই প্রকাশ্যে চলাফেরা করে'।

কঠোর শাস্তি সত্ত্বেও অপরাধের অনুষ্ঠান বন্ধ হয় নাই

(৪) এই মত সম্বন্ধে গুরুতর নৈতিক আপত্তি হইতেছে ইহা মানুষকে মানুষ হিসাবে সম্মান দেয় না,—বস্তু হিসাবে ব্যবহার করে। যে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হইল, সমাজকে অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার উপায় (as a means) হিসাবে তাহাকে দেখা হয়। সে উদ্দেশ্য নয় (not an end)।

এই মত মানুষকে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে, মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করে না

তাহার আত্মবিকাশের সহায়ক বলিয়া, তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে এমন নয়।[৮]

অপরাধ নিবারণ কল্পে নিরপরাধকেও তাহা হইলে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে

(৫) অপরাধ নিবারণই যদি শাস্তির উদ্দেশ্য হয়, তবে এই মত অনুযায়ী, নিরপরাধ ব্যক্তিদেরও শাস্তি দেওয়া, চলে যাহাতে অন্যেরা সাবধান হইতে পারে (just to make an example) এবং হিংস্র কঠোর শাস্তিই তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু এমন কথা কিছুতেই নীতিবুদ্ধির সমর্থন লাভ করিতে পারে না।

Reformative theory

Reformative theory—এই মতের মূল কথা হইল যে, অপরাধীর সংশোধনের জন্যই শাস্তিদান। তাহার বিচার ও শাস্তির দ্বারা, অপরাধী ব্যক্তি যদি বুঝিতে পারে যে, তাহার কাজটি অন্যায়, সে অনুতপ্ত হয় এবং সে নিজেকে সংশোধন করিতে চেষ্টিত হয়, তবেই শাস্তিদান সার্থক। তাহা না হইলে, ইহা তো পীড়ন মাত্র

শাস্তির উদ্দেশ্য সংশোধন

এই মত আধুনিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্যোতক।

কেন ব্যক্তি অপরাধ করিল তাহা বুঝিতে হইবে এবং সহৃদয়তার সহিত সে কারণগুলি দূর করিতে হইবে

বর্তমানে মানুষ অপরাধকে ব্যক্তির সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে। অপরাধের শাস্তি দেওয়া সহজ, কিন্তু তাহার সুবিচার অনেক কঠিন। বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাসী সমাজবিদ্ ও বিচারক মনে করেন, কোন ব্যক্তি কেন অপরাধ করিল, তাহার মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক পটভূমিকা জানিলে, তবেই অপরাধের কারণ আবিষ্কার করা যায়। এবং কারণ জানিতে পারিলে, তবেই অপরাধ নিবারণ সহজ হয়। এবং ইহাও তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে অপরাধীর

৮। it could scarcely be regarded as just to inflict pain on one man **merely** for the benefit of others. It would involve treating a man as a **thing**, as a **mere means, not an end** in himself.
MacKenzie—A Manual of Ethics, P. 375

সংশোধন দ্বারাই সমাজ সবচেয়ে বেশী লাভবান্ হয়। সংশোধিত অপরাধী, সমাজের মূল্যবান্ সম্পদে পরিবর্তিত হইতে পারে। কঠিন শাস্তি দ্বারা তাহাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিলে, সে চিরদিন সমাজের শত্রু হইয়াই থাকে। যে মানুষ অভাবের জন্য চুরি করে তাহাকে এমন শিক্ষাই দিতে হইবে যে, ভবিষ্যতে সে সৎপথে থাকিয়া জীবিকা উপার্জন করিতে পারে। ইহাতে ব্যক্তি যেমন উপকৃত হয়, সমাজের সম্পদও তেমনি বৃদ্ধি পায়। এই মতের পক্ষে মনস্তাত্ত্বিক বহু যুক্তি দেওয়া যায়।

কঠিন শাস্তি অপরাধীকে সমাজের স্থায়ী শত্রুতে পরিণত করে

মানসিক অস্থিরতা, ক্ষণিক উত্তেজনা, আকাঙ্ক্ষার অস্বাভাবিক অবদমন জনিত মানসিক বিকার অপরাধের মূল কারণ। অপরাধী এক পৃথক নিকৃষ্ট জাতি নয়। যে কোন সাধারণ মানুষও কোন বিশেষ মানসিক উত্তেজনা ও অস্থিরতার ফলে, অপরাধ করিয়া বসিতে পারে। মানসিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ না করিয়া, তাহার অপরাধের দ্বারা যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দ্বারাই বিচার করিলে বাস্তবিক সুবিচার হয় না। যে অপরাধ করিল, বাস্তবিক পক্ষে অপরাধের মূহূর্তে সে 'অসুস্থ', সে স্বাভাবিক অবস্থায় অপরাধ করে নাই। কলেরার রোগী প্রতিবেশী ও সংসারে অন্যান্য সকলের বিপদের হেতুও ত্রাসের কারণ। কিন্তু তাই বলিয়া তো তাহাকে জেলে দেওয়া হয় না; তাহার চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়।—তাহাকে তিরস্কার করা নিরর্থক, তাহার আরোগ্যেরই চেষ্টা করিতে হইবে। কোন কোন মনোবিদের মতে, সাময়িক ভাবে অপ্রকৃতিস্থ (temporary insanity) না হইলে, কেহ আত্মহননে (suicide) প্রবৃত্ত হইতে পারে না। ফ্রয়েডপন্থীরা বলেন যে, বহু ক্ষেত্রেই মনোবিকলন দ্বারা (psycho-analysis) জানা যায় যে, অপরাধীর অবচেতন মনে অবদমনের ফলে অমীমাংসিত ও অস্থির দ্বন্দ্ব (conflicts) উপস্থিত থাকে। ধীর ও সংবেদনশীল এবং কুশলী মনোসমীক্ষক এই দ্বন্দ্বের নিরসন করিতে ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে পারেন। তাহার ফলে রোগীর অপরাধপ্রবণতা দূর হয়। শাস্তি এ সব ক্ষেত্রে নিরর্থকই শুধু নয়, ইহা

অপরাধের মূল অনেক ক্ষেত্রে অবচেতন মনে

অপরাধী মানসিক 'অসুস্থ'—তাহার চিকিৎসা প্রয়োজন, কঠিন শাস্তি নয়

দূষিত পরিবার বা সমাজ-পরিবেশ অপরাধের মূল

বরঞ্চ ব্যক্তির মানসিক বিকার বাড়াইয়াই দেয়। সমাজ-সংস্কারকদের অভিজ্ঞতাও এই মতের অনুকূল। তাঁহারা বলেন, অপরাধ-প্রবণতার মূল কারণ হইতেছে, দূষিত পারিবারিক বা সামাজিক পরিবেশ। অপরাধ নিবারণ করিতে হইলে, শাস্তি নিকৃষ্ট উপায়। সমাজ-পরিবেশ পরিবর্তন দ্বারা, সহৃদয় ব্যবহার দ্বারা, এবং বিশুদ্ধ চরিত্রের সংসর্গে অপরাধীর সুপ্ত আত্মমর্যাদাবোধ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাহার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে। কারাগারের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কারাগারের নিষ্ঠুর শাস্তি এবং পুরাতন অপরাধীদের সঙ্গ ও কুদৃষ্টান্ত, অল্পবয়স্ক নূতন অপরাধীদের তিক্ত সমাজ-বিদ্বেষী, ভয়ংকর ব্যক্তিতে পরিণত করে।

তাহার সংস্কার দ্বারা এবং অপরাধীর লুপ্ত মর্যাদাবোধ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া অপরাধীকে সুস্থ ও সমাজের কল্যাণকামী সেবকে পরিণত করা যায়

আধুনিক যুগের জাগ্রত মানবতাবোধ সমস্ত মানুষের জীবনকেই মূল্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করে। অপরাধীকেও মানুষের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হইবে। মর্যাদা-হানিকর দৈহিক শাস্তি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

অপরাধীকেও মানুষের মর্যাদা দিতে হইবে

রাশিয়ায় ম্যাকারেংকো এবং তাঁহার সহকর্মীরা ভীষণ অপরাধপ্রবণ এবং সংশোধনের অযোগ্য বহু ছেলে মেয়েদের নিয়া যে অভিনব সামাজিক পরীক্ষায় রত হইয়াছেন, তাহার ফল যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। সেখানে অপরাধী ছেলেমেয়েদের একত্র নানা প্রকার গঠনাত্মক ও আনন্দময় কাজে নিযুক্ত রাখা হয়, শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে, তাহারা ক্ষেতখামারে শস্য-সব্জী, ফল উৎপাদন করে ; কাঠের কাজ, লোহার কাজ, মিস্ত্রীর কাজ, কলকব্জার কাজ শিখিবার সুযোগ দেওয়া হয়। তাহাদের উৎপন্ন সব জিনিস বিদ্যালয়ের সকলের ভোগের জন্য। প্রত্যেককেই কিছু না কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়। গান, বাজনা, খেলাধূলা, পিক্‌নিক্ ইত্যাদির ব্যবস্থায় ছাত্রদের অনেকখানি স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সকলকেই সমবেতভাবে ড্রিল, কাজ, লেখাপড়া ও খেলাধূলা করিতে হয়, কিন্তু প্রত্যেককেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী কিছু না কিছু শিখিবার, বা গড়িয়া তুলিবার সুযোগ ও উৎসাহ, দেওয়া হয়। তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য সুস্থ স্বাভাবিক ছেলেমেয়ের মতই ব্যবহার করা হয়, কখনও তাহাদের অতীত অপরাধের কথা স্মরণ করাইয়া লজ্জা দেওয়া হয় না। কিন্তু সকলকেই কঠিন শৃঙ্খলা ও শাসন (discipline) মানিতে

রাশিয়ায় ম্যাকারেংকোর সফল পরীক্ষা

হয়। কখনো কোন অবমাননাকর তিরস্কার বা শাস্তি তাহাদের ভোগ করিতে হয় না। শিক্ষকেরা তাহাদের মধ্যেই বাস করেন, তাহাদের একজন হইয়া তাহাদের সমস্ত কার্য ও আনন্দে অংশগ্রহণ করেন। তাহাদের শিক্ষা দেন, তাহাদের গঠনকার্যে সাহায্য করেন, তাহাদের উপদেশ দেন, তাহাদের পরিচালনা করেন, কিন্তু তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা সহ্য করেন না। ক্রমেই এই ছেলেমেয়েরা নিজেদের দল সম্বন্ধে, নিজেদের শ্রেণী সম্বন্ধে, নিজেদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে, ও নিজেদের সম্বন্ধে গর্ববোধ করিতে আরম্ভ করে, এবং আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনি করিয়া অপরাধপ্রবণ ছেলেমেয়েরা সুস্থ ও উৎসাহী সমাজপ্রেমিক কর্মীতে পরিবর্তিত হয়।[৯]

এই সমস্ত অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার নিরিখে অধিকাংশ সভ্য দেশেই অপরাধ সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইয়াছে এবং প্রচলিত কারাবিধির সংস্কার হইতেছে। পূর্বে মানুষ মনে করিত, শাস্তিই শাস্তির উদ্দেশ্য।[১০] ইহার দ্বারা অপরাধের ক্ষতিপূরণ হইল। কিন্তু আধুনিক মানুষ বিশ্বাস করে যে, ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল বিধানই শাস্তির শেষ উদ্দেশ্য। ইহার নিজস্ব কোন সার্থকতা নাই।

শাস্তি সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ও কারাবিধির সংস্কার

ব্যক্তির সংশোধন ও তাহার সুস্থতা সাধনই শাস্তির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত

শাস্তির উদ্দেশ্য অপরাধীর সংশোধন, মানসিক পীড়িত ব্যক্তির সুচিকিৎসার দ্বারা, তাহার রোগ নিরাময়, এবং তাহাকে সমাজের সম্মানিত সভ্য হিসাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। এই দৃষ্টিভঙ্গী উচ্চ মানবিকতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। এবং শাস্তির উদ্দেশ্য অপরাধীর পরিপূর্ণ বিকাশের পথে যে বাধা, তাহা অপসারণ করা। ইহা শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ অনুসারী ইহাতে সন্দেহ নাই।

এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি

সমস্ত অপরাধই মানসিক অসুস্থতা জনিত নয়

কিন্তু অপরাধী মাত্রই মানসিক দিক হইতে পীড়িত, এই মত কি সর্বদাই সত্য? ইহা কি ব্যক্তির পক্ষে আত্ম-সম্মান-হানিকর নয়? এই মত যেন অপরাধীকে বলে, "ষাট্, তোমার অপরাধের জন্য তুমি দায়ী নও, দায়ী তোমার মানসিক অসুস্থতা, অথবা সামাজিক পরিবেশ। তোমার কোন দোষ নাই।" কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অপরাধীই ইহা স্বীকার

৯। A. Makarenko—A Book for Parents

১০। Punishment can never be administered merely as a means for promoting another good either with regard to the criminal himself or to society. The penal law is a categorical imperative—Kant.

করিতে রাজী হইবে না যে, সে অপ্রকৃতিস্থ। সে নিজেকে ব্যক্তি বলিয়াই জ্ঞান করে এবং মানুষের প্রাপ্য সম্মানই দাবি করে।[১১] কর্মের জন্য ব্যক্তির দায়িত্ব অস্বীকার করিলে, নৈতিকতার ভিত্তিই ধ্বংস হইয়া যায়। ইহা ব্যক্তির সংশোধনের শ্রেষ্ঠ পথ হইতে পারে না। ব্যক্তিকে সরলভাবে নিজ কর্মের দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে, এবং পৌরুষের সঙ্গেই শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তবেই বাস্তবিক তাহার সংশোধন হইবে। ফ্রয়েডও বলেন, মনোবিকলন প্রণালী দ্বারা চিকিৎসার শেষ উদ্দেশ্য হইল, ব্যক্তিকে তাহার অন্তরের অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হইয়া, শান্ত বিচারবুদ্ধি দ্বারা, নিজ সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা। অপরাধ যদি মানসিক রোগই হয়, তথাপিও তাহার মূল চিকিৎসা বাহির হইতে সম্ভব নয়, ব্যক্তিকে নিজের সমস্যা সমাধানে নিজেই অগ্রসর হইতে হইবে।

ব্যক্তির মনে এই বোধ জাগরিত করা চাই যে তাহার কৃতকর্মের জন্য সে নিজে দায়ী

অপরাধী নিজেও নিজেকে মানসিক অসুস্থ বলিয়া নিজ কর্মের দায়িত্ব এড়ানো মর্যাদা হানিকর মনে করে

অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন কারণ হইতে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতে পারে। (১) অপরাধী নিশ্চিতভাবেই উন্মাদ। (২) সাময়িকভাবে মানসিক বিকৃতির ফলে কোন ভ্রমাত্মক বিশ্বাস (obsession) অথবা অবচেতন মনে জটিল গ্রন্থির (complexes) প্রভাবে অপরাধটি করিয়াছে। (৩) কোন ভ্রমাত্মক তত্ত্ব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সেই অনুসারে ক্রিয়া করিয়াছে। (৪) নৈতিক আদর্শের প্রতি উদাসীন বা আস্থাহীন।

প্রথম ক্ষেত্রে অবশ্যই শাস্তিদান নিরর্থক নিষ্ঠুরতা। অপরাধীর সুচিকিৎসাই একমাত্র কর্তব্য। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও মানসিক রোগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ ও সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। তৃতীয় ক্ষেত্রে অপরাধীকে আবদ্ধ রাখিয়া উপযুক্ত উপদেশ দ্বারা, তাহার ভ্রম দূর করা প্রয়োজন। চতুর্থ ক্ষেত্রে শাস্তি দিতেই হইবে। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীতি-উপদেশ দ্বারা তাহার মানসিক পরিবর্তনের চেষ্টাও করা উচিত।[১২]

যেখানে বাস্তবিক মানসিক বিকৃতিই অপরাধের কারণ সেখানে অবশ্যই সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নৈতিক বিধি লঙ্ঘন করে, তাহাকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হইবে

১১। The ordinary criminal, whether he be a pathological specimen or not, will not submit to be treated as a patient or a case. For he, like yourself is a person, and insists on being respected as such; he is not a thing to be passively moulded by society according to its ideass either of its own convenience or of his good.
Seth—A Study of Ethical Principles, P. 313

১২। MacKenzie—A Manual of Ethics, P 383

অপরাধের কারণ যেমন বিভিন্ন হইতে পারে, তাহার সংশোধনও তেমনি বিভিন্ন পথে হইতে হইবে। সর্বদাই তাহা চিকিৎসা নয়—শাস্তিরও সেখানে স্থান আছে।

উপরোক্ত মতগুলি সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী নয়, পরস্পর পরিপূরক

শাস্তির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য আছে। কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নয়। এই মতগুলি পরস্পরের পরিপূরক।

শাস্তির উদ্দেশ্য সমাজবিধির মর্যাদার পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও ক্ষতিপূরণ

শাস্তির উদ্দেশ্য, সমাজের স্বাস্থ্য ও সংহতি রক্ষা করা এবং অপরাধ নিবারণ করা, এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীকে মিথ্যা বলা চলে না। আবার শাস্তির উদ্দেশ্য, অপরাধীর সংশোধন, এই আধুনিক ও মানবতাবোধ দ্বারা প্রবুদ্ধ মতও অবশ্যই শ্রদ্ধার যোগ্য। কিন্তু চূড়ান্ত দার্শনিক মত এই যে, শাস্তি হইতেছে অপরাধীর নিজ কর্মের ফলপ্রাপ্তি—শাস্তি দ্বারা নৈতিক বিধির ক্ষুণ্ণ মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে। অপরাধী যখন বুঝিতে পারে যে অপরাধ দ্বারা তাহার নিজের প্রকৃতির যে সত্যরূপ (যাহার প্রকাশ হইল নৈতিক আদর্শে) তাহার প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, এবং শাস্তির ও অনুতাপের মধ্য দিয়া সে আত্মস্বভাবে পুনরাবর্তনে স্বীকৃত হয়, তখনই তাহার সত্যিকার সংশোধন ঘটে এবং ভবিষ্যৎ অপরাধ নিবারিত হয়।[১৩]

সমাজের সংরক্ষণ ও ব্যক্তির সংশোধন এই সব কয়টি মতই আংশিক সত্য। ইহাদের সমন্বয় প্রয়োজন

প্রাণদণ্ড সমর্থনযোগ্য কি?—বর্তমানকালে এই প্রশ্নটি বাস্তব গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, এবং বহু সভ্য দেশের চিন্তাশীল মানবপ্রেমিকেরা প্রাণদণ্ড উচ্ছেদের পক্ষপাতী। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, সংশোধনই শাস্তির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এবং যাঁহারা মনে করেন সাময়িক উন্মত্ততা ভিন্ন নরহত্যা সম্ভব নয়, তাঁহারা অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড উচ্ছেদের পরামর্শ দেন। তাঁহারা ইহার পক্ষে আরো অনেক যুক্তির অবতারণা করেন। (১) মানুষের

প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে যুক্তি: মানুষের বিচারে গুরুতর ভ্রম হইতে পারে

১৩। Punishment is, in its essence, a rectification of the moral order of which crime is the notorious breach. Yet it is not a mere barren vindication of that order; it has an effect on character, and moulds that to order.···the total conception of punishment may contain various elements indissolubly united···Might we not sum up these elements in the word 'discipline', meaning thereby that the end of punishment is to bring home to a man such a sense of guilt as shall work in him a deep repentence for the evil past and a new obedience for all time to come?
Seth—A Study of Ethical Principles, P. 315

বিচার সম্পূর্ণ নির্ভুল হওয়া সম্ভব নয়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে ভুল বা অসম্পূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, অথবা উত্তেজিত জনমতের চাপে, নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে।

হত্যাকারীও মানুষ, তাহারও বাঁচিবার অধিকার আছে

(২) যত ঘোরতর অপরাধই হোক্ না কেন, তাহারও বাঁচিবার অধিকার আছে। যদি সাংঘাতিক সংক্রামক রোগীর, যাহার জন্য আরো অনেক মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্য বিপন্ন হইতে পারে, বাঁচিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে যে নরহত্যা করিল তাহারও বাঁচিবার অধিকার আছে।

নরঘাতকও অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া সাধুপুরুষ হইতে পারে

(৩) হয়তো নরঘাতকও একদিন সুযোগ পাইলে এবং অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠ সাধুপুরুষ বা সমাজসেবী হইতে পারে।

যে জীবন দিতে পারি না, তাহা নেওয়ার অধিকার মানুষের নাই

(৪) যে জীবন আমরা দিতে পারি না, সেই জীবন গ্রহণ করিবারও কোন অধিকার আমাদের নাই।

প্রাণদণ্ড নরহত্যা নিবারণ করিতে পারে নাই

(৫) প্রাণদণ্ড আজ পর্যন্ত কোথায়ও নরহত্যা নিবারণ করিতে পারে নাই। সুতরাং শাস্তি হিসাবে ইহা ব্যর্থ হইয়াছে।

এ শাস্তি দ্বারা নরহত্যাকারীর নিষ্পাপ সন্তানেরা বিপন্ন হয়

(৬) এ শাস্তি দ্বারা অপরাধীর পরিবার ও সন্তানেরাই বিপন্ন হয়। নরহত্যাকারীর স্ত্রী, সন্তান ও পরিজন সমাজে ধিকৃত হয়, নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়, যদিও তাহারা নিরপরাধ।

প্রাণদণ্ডের সমর্থনের যুক্তি: শাস্তি অপরাধের অনুরূপ হওয়াই উচিৎ

যাঁহারা প্রাণদণ্ড সমর্থন করেন তাঁহারা বলেন: (১) শাস্তি অপরাধের অনুরূপ হওয়াই উচিত। তাই যাহারা নৃশংস নরহত্যাকারী, তাহাদের মৃত্যুদণ্ড অবশ্যই প্রাপ্য। Retributive theory তাই বিশেষ গুরুতর ক্ষেত্র (যেখানে অপরাধী, ক্ষণিক উত্তেজনার বশে নয়, চিন্তা ভাবনা করিয়া, ঠাণ্ডা মাথায়, নিষ্ঠুর হত্যার অপরাধে অপরাধী) মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করেন।

মৃত্যুদণ্ডের ভয় অনেক সম্ভাব্য অপরাধ নিবারণ করিয়াছে

(২) মৃত্যুদণ্ডের বিষম ভয় বহু সম্ভাব্য গুরুতর অপরাধ নিবারণে সহায়ক। ইহা তুলিয়া দিলে, নরহত্যা ইত্যাদি অপরাধ বৃদ্ধি পাইবে। Preventive theoryর সমর্থকরা মৃত্যুদণ্ডও সমর্থন করেন।

(৩) যথেষ্ট বিচার বিবেচনার পরই এই চরম দণ্ড দেওয়া হয়। ক্ষণিক উত্তেজনার বশে, অথবা আত্মরক্ষার জন্য, অথবা স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষার জন্য নরহত্যা করিলে, লঘুদণ্ডই দেওয়া হয়। এই দণ্ড মানবতাবোধ বিবর্জিত নয়। মানব কল্যাণের জন্যই এ প্রথা বন্ধ করা উচিত নয়।

আধুনিক বিচারকালে যথেষ্ট সাবধানতা নেওয়া হয়, লঘুপাপে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় না

সংক্ষিপ্তসার

ব্যক্তিব মতো সমাজেরও আত্মবক্ষাব অধিকাব আছে। সমাজ ব্যক্তির বিচার কবে, দুষ্টেব দমন ও শিষ্টেব পালন কবে। ইহা না কবিলে, সমাজেব শৃঙ্খলা রক্ষা হয না।

শাস্তি নৈতিক অপবাধেব জন্য। ভুল, হিসাবেব ত্রুটি—তাহাতে অন্যেব ক্ষতি কবিবাব অভিপ্রায় না থাকিলে তাহা নৈতিক অপবাধ নয। দেশেব নির্দিষ্ট আইন ভঙ্গ কবিয়া অন্যেব ক্ষতি ঘটাইলে তাহা আইনগত অপবাধ। আইনগত অপবাধ ও নৈতিক অপরাধ অভিন্ন নয। যেখানে ইচ্ছাকৃত ভাবে, ভাবিয়া-চিন্তিযা অন্যেব ক্ষতি কবা হয়, সেখানেই ঘটে নৈতিক অপবাধ। এই জাতীয় অপবাধ ব্যক্তিব চবিত্রের বিকৃতিব প্রকাশক। সমাজেব চোখে এমন কাজ দণ্ডযোগ্য। পাপ (Sin) কথা দ্বাবা ধর্মেব অনুশাসন লঙ্ঘন বোঝায—ধর্মেব অনুশাসন লঙ্ঘন অনেক ক্ষেত্রেই নৈতিক অপবাধও বটে, তথাপি ইহাবা অভিন্ন নয়।

সমাজের শাস্তি দিবাব ক্ষমতা আছে। কিন্তু শাস্তিব উদ্দেশ্য কি তাহাব দার্শনিক যুক্তি-যুক্ততা কি এ বিষযে তিনটি প্রধান মত আছে।

(ক) **Retributive Theory** অনুসাবে যে অপবাধ কবে সে অপবেব ক্ষতি কবে। শাস্তিব মধ্য দিযা অপবাধীকে নিজ কর্মেব ফল ভোগ করিতে, তাহাব কৃত ক্ষতিব পূবণ কবিতে বাধ্য কবা হয়। শাস্তি দ্বাবা সমাজ নৈতিক বিধিব ক্ষুণ্ন মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি হইল যে—(১) ইহা আদিম প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিব প্রকাশক। (২) শাস্তি কখনই অপবাধেব ঠিক সমান হইতে পাবে না। (৩) অপবাধ একটা নির্বস্তুক জিনিস নয়। অপবাধ সর্বদাই কোন বিশেষ অবস্থায, কোন বিশেষ কাবণে ঘটিয়া থাকে। কাজেই অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন কবিয়া অপবাধেব শাস্তি বিধেয় নয়। (৪) শাস্তিবিধান কবিতে হইলে অপবাধকে ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন কবিযা, অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন কবিয়া, কেবল মাত্র অপরাধেব ফলে যে ক্ষতি হইল, তাহাব পবিমাণ দিযা শাস্তি বিধান সঙ্গত নয়। (৫) অপবাধী আলাদা কোন জাতি নয। সুস্থ মানুষও, অবস্থা বিশেষে অপবাধ করিযা থাকে।

এই যুক্তিব মধ্যে এই মস্ত সত্য আছে যে অপবাধীকে তাহাব কৃতকর্মেব ফল ভোগ কবিতে হইবে। নৈতিক বিধিব মর্যাদা ক্ষুণ্ন কবাব অধিকাব কাহাবও নাই, শাস্তি তাহারই স্বীকৃতি।

(খ) **Deterrent theory** অনুযায়ী শাস্তিব উদ্দেশ্য, সমাজকে সংবক্ষণ। অপবাধীর শাস্তি হইলে ভবিষ্যতে সে আব অপরাধ কবিবে না, এবং অন্যান্য সম্ভাব্য অপরাধীবা সাবধান হয়।

এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি—(১) শাস্তি দ্বারা অনেক সময়ই অপরাধীর সংশোধন হয় না। সদয় ব্যবহার দ্বারা অনেক বেশী সুফল পাওয়া যায়। কঠোর শাস্তি অপরাধীকে বিষম সমাজ-বিদ্বেষীতে পরিণত করে। (২) মানুষ শাস্তির ভয়েই অন্যায়ের পথ হইতে দূরে থাকে—ইহা মনুষ্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে অবজ্ঞা ও অবিশ্বাসপ্রসূত। (৩) শাস্তি দ্বারা অদ্যাবধি পৃথিবীতে অপরাধের অনুষ্ঠান নিবারিত হয় নাই। (৪) এই মত অনুসারে মানুষ উদ্দেশ্য মাত্র। সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহার নিজের হিতের জন্য শাস্তিবিধান নয়। (৫) অপরাধ নিবারণের জন্য নিরপরাধকেও শাস্তি দেওয়া চলে।

(গ) **Reformative theory** অনুসারে (১) সমাজের বিচার ও শাস্তি তখনই অনুমোদনযোগ্য, যখন তাহার উদ্দেশ্য হয় অপরাধীর সংশোধন, তাহাকে আবার পরিপূর্ণ নৈতিক সত্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। (২) ব্যক্তি কেন অপরাধ করিল, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া সেই সামাজিক অবস্থাগুলি দূর করাই, অপরাধ নিবারণ করার শ্রেষ্ঠ উপায়। অপরাধীকে কঠিন শাস্তির পরিবর্তে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে ভবিষ্যতে সে সমাজের একজন আন্তরিক সেবকে পরিণত হইতে পারে। (২) অপরাধ অনেক সময় অপরাধীর অবচেতন মনে বিশৃঙ্খলা ও অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের ফল। মনোবিকলন ইত্যাদি সহৃদয় মানসিক রোগের চিকিৎসা দ্বারা অপরাধী সুস্থতা লাভ করে। অপরাধী 'অসুস্থ', তাহার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োজন—হৃদয়হীন শাস্তি উৎপীড়ন মাত্র। (৪) কঠিন শাস্তি দ্বারা অপরাধীর নৈতিক অবনতিই ঘটে। রাশিয়া দেশে এবং অন্যত্রও পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে অপরাধীর আত্মমর্যাদাবোধ পুনরুজ্জীবিত করিয়া এবং গঠনাত্মক সামাজিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া তাহাদের সম্পূর্ণ সংশোধন সম্ভব। এই সমস্ত মানবিক চিন্তা ও পরীক্ষার ফলে সমস্ত উন্নতিশীল রাষ্ট্রই শাস্তি সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং কারাবিধির সংস্কার করা হইতেছে।

এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি—(১) সমস্ত অপরাধই মানসিক বিকারের ফল নয়। ইচ্ছাকৃত অপরাধ নৈতিক বিকৃতির প্রকাশক এবং তাহা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য। যেখানে অপরাধ মানসিক রোগের ফল, সেখানে অবশ্যই উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (২) সামাজিক কুব্যবস্থা অথবা ব্যক্তির অবচেতন মনে বিশৃঙ্খলা সমস্ত অপরাধের জন্য দায়ী—এই মত ব্যক্তির নৈতিক চেতনার মূলোচ্ছেদ করে। ব্যক্তি নিজ কর্মের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া তাহার কর্মের দ্বারা যে ক্ষতি সাধিত হয় তাহা পূরণ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় যখন রাজী হয়, তখনই তাহার নৈতিক সংশোধন সম্পূর্ণ হয়। (৩) অপরাধী নিজেও 'রোগী' বা 'অসুস্থ' বলিয়া নিজেকে করুণার পাত্ররূপে স্বীকার করাকে আত্মমর্যাদাহানিকর বলিয়া মনে করে। তাহাকে মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করার ইহা একেবারেই সদুপায় নয়।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি মতের মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য আছে। তাহারা পরস্পরবিরোধী বোধ হইলেও বাস্তবিক পক্ষে পরস্পর পরিপূরক। অপরাধী সংগঠিত সমাজের বিচারকে যখন তাহার অন্তরের বিচাররূপে গ্রহণ করে, তখনই স্বেচ্ছায় সে নিজকর্মের ফল বহন করিতে প্রস্তুত হয়—তখনই তাহার প্রকৃত সংশোধন ঘটে এবং সমাজের সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। বাহিরের শাসন বা শাস্তি আত্মশাসনে পরিণত হইলেই ব্যক্তির নৈতিক পুনর্গঠন সম্পূর্ণ হয় এবং ব্যক্তি তখন এ কথা অনুশোচনার মধ্য দিয়া স্বীকার করিয়া নেয় যে নৈতিক বিধির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার অধিকার কাহারও নাই।

বর্তমানে বহু সভ্যদেশে শাস্তি হিসাবে প্রাণদণ্ড তুলিয়া দিবার প্রস্তাব বিবেচিত হইতেছে। সাধারণতঃ নরহত্যা অথবা দেশদ্রোহ এই দুইটি গুরুতম অপরাধের জন্য এ শাস্তির বিধান আছে।

প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলি দেওয়া হয় তাহা হইতেছে—(১) মানুষের বিচারে গুরুতর ভুল হইতে পারে। নরহত্যার অপরাধে নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইয়াছে এমন উদাহরণ বিরল নয়। (২) নরঘাতকও মানুষ, তাহারও বাঁচিবার অধিকার আছে। উপযুক্ত প্রভাবে নরহত্যাকারী দুর্বৃত্তও সাধু ও সমাজকল্যাণকামী ব্যক্তিতে পরিণত হইতে পারে। (৪) নরহত্যা ইত্যাদি জঘন্য অপরাধ স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ করিতে পারে না, প্রবল উত্তেজনার বশে সাময়িক উন্মত্ততার বশবর্তী হইয়াই মানুষ এমন ভয়ানক কাজ করে। ইহারা মানসিক অসুস্থ। (৫) যে জীবন মানুষ দিতে পারিবে না, তাহা হরণ করিবার অধিকার তাহার নাই। (৬) প্রাণদণ্ডের শাস্তির ফলভোগ করে, এমন ব্যক্তির নিরপরাধ স্ত্রী বা সন্তানেরা। শাস্তির উদ্দেশ্য অপরাধীর সংশোধন। প্রাণদণ্ডরূপ চরম শাস্তিতে অপরাধীর সংশোধনের আর সুযোগ থাকে না।

কিন্তু এই শাস্তির পক্ষেও যুক্তি আছে—(১) শাস্তি অপরাধের যোগ্যই হওয়া উচিত, যে প্রাণ হরণ করিল, প্রাণদণ্ডই তাহার উপযুক্ত শাস্তি। (২) অনেক নরঘাতক স্থায়ী নৈতিক বিকৃতিসম্পন্ন, তাহারা সমাজের পক্ষে বিষম বিপদ। (৩) উপযুক্ত বিচার-বিবেচনার পরই এই চরম শাস্তি দেওয়া হয়। যেখানে প্রবল ক্ষণিক উত্তেজনার মুখে মানুষ নরহত্যা করে, সেখানে চরম দণ্ড দেওয়া হয় না। (৪) এই ভয়ঙ্কর শাস্তির ভয়ে, বহু সম্ভাব্য অপরাধী সংযত থাকে।

Questions

1. Distinguish between physical evil & moral evil and between error, legal offence, crime, vice & sin. Which of these is the subject of punishment ?

2. Explain the Retributive theory of punishment and add your criticism of the theory. Does the theory contain an element of truth ? If so, what is it ? Discuss.

3. Explain & critically discuss the different theories of punishment. Which of these theories seems to you to be the most satisfactory and why ? Discuss.

4. Should capital punishment be abolished ? Critically examine the arguments for and against such abolition.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নৈতিক চেতনার বিকাশ ও নৈতিক আদর্শের উন্নয়ন

Moral Development & Moral progress

[Ideal vs. the Real—An Ideal leads to a higher ideal—Herbert Spencer applies the principle of evolution to the field of morals—the progressive discovery of the individual—progress from an external to an internal view of morality—progress from the sterner to the gentler virtues—progressive widening of the scope of virtues—deepening moral insight—has man declined in morals? Growth of character—Final merging of morality in religion]

বাস্তব ও আদর্শের সম্বন্ধ আলোচনা কালে আমরা বলিয়াছিলাম যে, এক হিসাবে বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে বিরোধ আছে। আদর্শ বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। যাহা আছে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বাস্তব ; কিন্তু আদর্শ এমন, যাহা বাস্তবে ঘটে নাই। বাস্তবের মধ্যে আছে অপূর্ণতা,—স্থান, কাল, অবস্থার বাধা, তাহাদের শাসন ও সীমা। কিন্তু আদর্শ হইতেছে, পূর্ণতার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা। এ ভাবে দেখিলে, মনে হইতে পারে, আদর্শ বুঝি নিতান্তই অবাস্তব কল্পনা, অলীক স্বপ্নরাজ্যে তাহার বাসা। ইহা সত্য নয়। আদর্শ বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহা বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন নহে। লোহাকে সোনায় পরিবর্তন করা (alchemy) রাসায়নিকের একটি অতি প্রাচীন স্বপ্ন। ইহা তাহার আদর্শ। আজও সে স্বপ্ন সফল হয় নাই। কিন্তু ইহা অলীক স্বপ্ন নয়। বিজ্ঞান এই পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, লোহার মধ্যে সোনা হইয়া ওঠার সম্ভাবনা লুক্কায়িত আছে, তাহার পথে কতকগুলি বাধা অতিক্রম করিতে পারিলে, এই স্বপ্ন সফল হইবে।

আদর্শ বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া যায

নৈতিক আদর্শের বেলায়ও একথা সত্য। সদা সত্য কথা বলা মানুষ নীতির আদর্শ হিসাবে শ্রদ্ধা করে। এ আদর্শ আজও সফল হয় নাই। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন একজনও মানুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। তথাপি মানুষ এই আদর্শে বিশ্বাস হারায় নাই। মানুষ বিশ্বাস করে, মানুষের মধ্যে এই মহৎ সম্ভাবনা লুক্কায়িত আছে যে, সে সর্বদা সত্য কথা

আদর্শের আকর্ষণ দুর্বার

বলিবে। তাই মিথ্যা কথা বলিলেই, অন্তরের মধ্যে সে লজ্জা ও অনুতাপ বোধ করে।

আদর্শ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়। এবং তাহা স্থাণু ও অচলও নয়। অতীতে জীবনের প্রযোজনে, আচরণের যে আদর্শ মানুষ গ্রহণ করিয়াছিল, জীবনের উন্নতির সঙ্গে সেই আদর্শকে পিছনে ফেলিয়া মানুষ আগাইয়া যায়, এবং নূতন উন্নততর জীবনের উপযোগী, নূতন ও উন্নততর আদর্শ সে দাবি করিতে থাকে। এমনি করিয়া, চলিয়াছে আদর্শেরও ক্রমোন্নয়ন ও বিকাশ। একদিন পাঁচ মিনিটে এক মাইল দৌড়ানোকে মানুষ আদর্শ বলিয়া মনে করিয়াছিল, ইহা খুব বেশী দিন আগের কথা নয়। কিন্তু আজ চার মিনিটে এক মাইল অতিক্রম মানুষের কাছে আর অসম্ভব ঘটনা নয়। তাই আজ মানুষের আদর্শ উচ্চতর —আজ তাহার আদর্শ সাড়ে তিন মিনিটে এক মাইল অতিক্রম।

আদর্শ ক্রমশঃই উচ্চ হইতে উচ্চতরে

আদর্শের পথে অগ্রসরণের তাই কোন শেষ নাই। আদর্শের পথে চলিয়া কোন স্তরেই মানুষ বলিতে পারে না, 'এখানেই যাত্রা শেষ—আর উচ্চতর কোন লক্ষ্য নাই'। মানুষ যতই উচ্চতর নৈতিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, ততই সে উচ্চতর আদর্শের স্বপ্ন দেখিবে। তাই নৈতিক জীবন সদাজাগ্রত উদ্যম ও সংগ্রামের জীবন। ধর্মেই শুধু সংগ্রামের সমাপ্তি—ব্রহ্মনির্বাণেই শুধু সংগ্রাম ও উদ্যমের অবসান, নদী তখন সাগরে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে, এবার তাহার গতি ও চঞ্চলতা নিস্তব্ধ।

আদর্শের জয়যাত্রার শেষ নাই

নীতিহীনতা হইতে নৈতিক জীবনে অগ্রসরণ?—হারবার্ট স্পেন্সার ক্রমবিকাশবাদ নীতির ক্ষেত্রেও প্রযোগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নৈতিক জীবন গতিশীল, তাহা অগ্রসরমাণ, কিন্তু কোথায় এই নৈতিক চেতনার মূল? তাঁহার মতে, এই চেতনা মানব সভ্যতার ক্রমোন্নয়নের ফল। আদিম অসভ্য মানুষ, গোষ্ঠীর প্রথাপদ্ধতি দ্বারাই চালিত হইত। প্রথা অনুসরণের ফল ছিল, দলের সমর্থন ও প্রশংসালাভ: আর প্রথার বিরুদ্ধাচরণের ফল ছিল, নিন্দা ও ভর্ৎসনা। তখনও মানুষের বিচারবুদ্ধির এতটা পরিণতি ঘটে নাই যে, মানুষ নিজেকে গোষ্ঠী হইতে পৃথক করিয়া দেখিবে এবং প্রথা-আচার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া,

হারবার্ট স্পেন্সার নীতির ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশবাদ প্রয়োগ করিয়া নৈতিক জীবনের গতি নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন

কোন কর্মের আন্তরিক শুচিতার মূল্য বিচার করিয়া, তাহাদের ন্যায় ও অন্যায়, এ ভাবে বিচার করিবে। ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণে, যাহা ছিল বাহ্য অনুকরণ, তাহা পরিবর্তিত হইল আন্তরিক সমর্থনে—যাহা ছিল শাস্তি দ্বারা সংগৃহীত বাধ্যতা, তাহা পরিবর্তিত হইল স্বেচ্ছাকৃত অন্তরের অনুমোদনে। যাহা ছিল গোষ্ঠীর প্রথা-আচার, তাহা পরিবর্তিত হইল ব্যক্তির নৈতিক আদর্শে।

প্রথমে ব্যক্তি নিজেকে গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত করিয়া দেখে, পরে আসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ

নীতিহীনতা হইতে নীতির বিকাশ অসম্ভব—নৈতিক আদর্শের বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। সমাজের অবস্থার পরিবর্তনে ও উন্নয়নে নৈতিক আদর্শও ক্রমশঃ বিশুদ্ধতর ও উচ্চতর হইয়াছে। কিন্তু হারবার্ট স্পেন্সার যখন বলিলেন যে, আদিম মানুষ সম্পূর্ণ নৈতিক চেতনাহীন ছিল, এবং তাহার নীতিবুদ্ধি অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে, **পরে জন্মলাভ করিয়াছিল,** তখন তাঁহার মত গ্রহণযোগ্য নয়। প্রাথমিক আদিম অবস্থায়ও মানুষের অন্তর নীতিবোধ-বিবর্জিত ছিল না। নীতিবোধ-বর্জিত মানুষ কখনোই কোন অবস্থায়ই নীতিচেতনাবান্ হইয়া উঠিতে পারিত না, Ex Nihilo Nihil fit —শূন্য হইতে কোন কিছুরই জন্ম হইতে পারে না।

প্রথমে নীতির বিচার হয় বাহির হইতে, পরে বিচার হয় ভিতর দিক হইতে

হারবার্ট স্পেন্সার মানব-সভ্যতার ব্যাখ্যায় সরল দ্বারা জটিলকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগে নীতিবর্জিত মানুষ ছিল কিনা, ইহা গবেষণার বিষয়। কিন্তু সেই প্রায়ান্ধকার সভ্যতার জন্মযন্ত্রণা হইতে মানব-সভ্যতার তাৎপর্যের সার্থক ব্যাখ্যা হয় না। বরঞ্চ, সভ্যতার পরিণত ফল যে নৈতিক আদর্শ, তাহার নিরিখেই সমগ্র মানব-সমাজের সভ্যতার ইতিহাসের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়। বীজেই আছে পরিণত বৃক্ষের সম্ভাবনা, ইহা সত্য। আবার তেমনি ইহাও সত্য যে, মহীরুহেই আছে ক্ষুদ্র বীজের প্রকৃত তাৎপর্য।[১]

আরম্ভ দ্বারা শেষকে ব্যাখ্যা নয়, শেষ দ্বারা আরম্ভের তাৎপর্য বিচার

১। Morality cannot arise out of the non-moral, as Spencer seems to think. Moral progress is morality in progress, 'progressive' morality ; never at any stage a progress **to** morality, or a progress from the non-moral to the moral stage...It is also and equally true in all these spheres that we find in the later stages the full manifestation of the essential nature whose evolution we are tracing, that the latest is the truest As the **oak is the truth of the acorn,** so is **man of ripe culture and refinement the truth dimly prefigured by the primeval savage.** Seth—A Study of Ethical Principles, P-319

নৈতিক চেতনার বিকাশের সূত্র ও ধারা—আদিম অরণ্যচারী অথবা গুহাবাসী মানুষ হইতে মানব-সভ্যতা অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। মানুষের নৈতিক চেতনায়ও এই ক্রমবিকাশ ও অগ্রগমনের ছাপ রহিয়াছে। যদি এক কথায় মানব-সমাজের অগ্রগমনের সূত্রটি প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে বলা যায়, ইহা হইতেছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা, the progressive discovery of the individual.[২] আদিম অবস্থায় মানুষ ছোট ছোট যূথবদ্ধ হইয়াই বাস করিত। সেখানে স্বতন্ত্র ব্যক্তিজীবন বলিয়া কিছু ছিল না। যূথের জীবনের সে ছিল অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাহার স্বতন্ত্র কোন মর্যাদাও ছিল না, অধিকারও ছিল না। সে অবস্থায়, ব্যক্তির কর্তব্য-অকর্তব্য সবই যূথপতিদের আদেশ দ্বারাই নির্ধারিত হইত।

নৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশের মূল-সূত্র—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা

এই আদেশ পালনই ছিল ন্যায়, আর আদেশ অমান্যকরণই ছিল,—কঠিন শাস্তিযোগ্য, সুতরাং অন্যায়। এ বিষয়ে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা বা বিচারের কোন স্থানই ছিল না। মানুষ যখন যাযাবর জীবন ছাড়িয়া, জনপদবাসী হইল, তখন গোষ্ঠিজীবনের নির্দিষ্ট প্রথা-পদ্ধতি স্থাপিত হইল, এবং তখন সেই প্রথা অনুসরণই ছিল সমাজে প্রশংসাযোগ্য আর তাহার বিরুদ্ধাচরণ নিন্দনীয়। তখনই ব্যক্তি নিজেকে স্পষ্টভাবে গোষ্ঠিজীবন হইতে পৃথক করিয়া ভাবিতে শিখে নাই। তখনও ব্যক্তি ছিল, অনাবিষ্কৃত ও অনাদৃত। তাহার নিজস্ব নৈতিক জীবন তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তখনও সে নিজেকে গোষ্ঠিজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে, দেখিতে শিখে নাই। কিন্তু ক্রমেই সমাজজীবনের উন্নতির সঙ্গে, প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক জীবিকা অর্জনের সুযোগ আসিল, এবং প্রয়োজন দেখা দিল। হয়তো মাঝে মাঝে ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে গোষ্ঠীর স্বার্থের বিরোধ ঘটিতে লাগিল। ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিল, মূল্য দিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠিজীবনের প্রথা-আচারের শাসনও সে বিচার

সভ্যতার আদিম অবস্থায় গোষ্ঠীর প্রথা-আচার ব্যক্তি গ্রহণীয় বলিয়া মানে

২। Seth—A Study of Moral Principles, P. 323

করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। পূর্বের অন্ধ আনুগত্যের স্থানে আসিল: বিচার দ্বারা গ্রহণ এবং, নিজ অন্তরের বিবেক ও বিশ্বাস অনুযায়ী চলিবার দাবি। এই দাবি ও অধিকার একদিনে স্বীকৃত হয় নাই, এবং আজও এ অধিকার সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্যার হেনরী মেইন্ সমাজজীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিকাশের সূত্রটি সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "এ পর্যন্ত সমস্ত অগ্রসরমান সমাজে আমরা সমাজজীবনের যে গতিটি লক্ষ্য করিতে পারি, তাহা হইতেছে,— a movement from Status to Contract.[৩] প্রথমে ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য সম্পূর্ণ ভাবেই পরিবারে বা গোষ্ঠীতে তাহার স্থান দ্বারা নির্ধারিত হইত,—যেমন, পিতা হিসাবে তাহার কতগুলি অধিকার ও কর্তব্য স্বীকৃত ছিল, কিন্তু গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসাবে তাহার অস্তিত্ব স্বীকৃত ছিল না। পরিবার বা গোষ্ঠীতে তাহার স্থান, তাহার নিজ ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিত না। উন্নত ও অগ্রসর সমাজে, ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নানা সংস্থা-সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে এবং তাহার কর্তব্য ও অধিকার তাহার স্বেচ্ছাকৃত চুক্তির উপর নির্ভর-শীল।

ক্রমে বিশ্লেষণ ও বিচার দ্বারা ব্যক্তি নিজের স্বতন্ত্র মূল্য বুঝিতে শিখে

from Status to Contract

সমাজের নীতিবোধের ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করিলে আমরা দেখি, প্রথম, মানুষ অনতিবৃহৎ খণ্ডজাতি (tribe) বা উপজাতির (clan) বিশ্বাস ও প্রথা অনুযায়ীই নিজ জীবন পরিচালনা করে। সমাজের সংহতি আরো বৃদ্ধি পাইলে, রাষ্ট্রের শাসনই হয়, নৈতিক আদর্শের মাপকাঠি। সক্রেটিস বা প্লেটোর কালের গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রে ব্যক্তি নিজেকে রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়াই বিশ্বাস করিত, এবং প্লেটোর মতো তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত এই মত প্রচার করিয়াছেন যে, ব্যক্তির সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য তো বটেই, তাহার সমস্ত নৈতিক গুণের বিকাশও রাষ্ট্রের আধারেই কেবলমাত্র হইতে পারে। কিন্তু এই অবস্থায়ও ব্যক্তি নিজ মর্যাদায় সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহারও পরে, ব্যক্তি হয়তো অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নিজেকে কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবেই গণ্য করে, এবং সেই শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাসকেই নৈতিক জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু মানুষের

প্রথম অবস্থায় ব্যক্তি গোষ্ঠীর প্রথা-আচারকেই অনুসরণ করে

তাহার পরের স্তরে সুসংহত রাষ্ট্রের আইনকানুনই হয় আচরণের নিয়ন্ত্রক

৩। Sir Henry Maine—Ancient Law, Ch V, P. 170

বিচারবুদ্ধি ও নৈতিক চেতনার সম্যক বিকাশের ফলে মানুষ বুঝিতে শিখে যে, তাহার নিজের কাছেই তাহার শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। বুঝিতে শেখে যে, তাহার নিজস্ব একটি স্বাধীন সত্তা, মর্যাদা ও অধিকার আছে। সে বুঝিতে শিখে, তাহার নৈতিকতার দায় বাহিরের কোন শক্তির কাছে নয়, নিজেরই কাছে। তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশই শ্রেষ্ঠ মূল্য এই, তাহা নৈতিক বিধির অনুসরণ দ্বারাই শুধু সম্ভব।[8]

সর্বশেষ বিচারবুদ্ধি দ্বারা ব্যক্তি নিজস্ব দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নৈতিক বিধি আবিষ্কারের চেষ্টা করে

সেথ্ ব্যক্তির নৈতিক মর্যাদার ক্রমবিকাশের তিনটি বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

(১) **নৈতিক গুণকে বাহির হইতে বিচার না করিয়া ক্রমশঃ অন্তরের দিক হইতে বিচার** করার প্রবণতা দেখা যায়। পূর্বে মানুষের কাজের বিচার হইত, কি পরিমাণে ইহা গোষ্ঠীর প্রথা-অনুসারী বা রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী, সেই দিক হইতে। আর একদিক হইতেও এ বিচার ছিল বাহ্য। কার্যের ফলাফল দিয়াই তাহার নৈতিক মূল্যবিচার হইত। কিন্তু ক্রমশঃই মানুষের কর্মের বিচারে তাহার আন্তরিক শুচিতা ও অভিপ্রায়ের শুভাশুভই অধিকতর গুরুত্ব প্রাপ্ত হইল। ব্যক্তি কি করিল তাহার চেয়ে মূল্যবান হইল ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব।[5]

নৈতিক গুণগুলিকে বাহির হইতে বিচার না করিয়া ক্রমশঃ অন্তরের দিক হইতে বিচার

(২) **ক্রমশঃ কঠোরতা হইতে কমনীয়তার নৈতিক মূল্য অধিকতর** বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। পূর্বে শৌর্য, বীরত্ব, নির্মমতাকে শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণ হিসাবে সমাজে উচ্চমূল্য দেওয়া হইত। সমাজজীবনের বিঘ্নসঙ্কুল সংগ্রামশীলতা ও অনিরাপত্তার জন্য আদিম মানুষের পক্ষে কঠোর গুণগুলির চর্চাই বেশী প্রয়োজন ছিল। তৎকালীন জীবনের পোষণে বীরত্বই ছিল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কিন্তু সমাজজীবন যতই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল হইল, ততই কোমলতর মানবিক গুণ যথা, দয়া, প্রেম, সহানুভূতি ইত্যাদি অধিকতর মর্যাদা লাভ করিল।

কঠোর গুণগুলি অপেক্ষা কমনীয় গুণগুলি অধিকতর মর্যাদা লাভ করে

৪। The ethical unit of earlier times is the tribe or the family; later it becomes the State; later still perhaps, the caste or class and last of all, the individual --the trend of moral progress has been in the direction of a true individualism; it has meant the gradual discovery of the place of the individual in the body politic. Seth—A Study of Moral Principles, Pp. 331-39

৫। Ibid, P. 341

মানব সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় জীবন ছিল বিপদসঙ্কুল। প্রত্যেক মানুষকেই আত্মরক্ষার তাগিদে সতর্ক ও সন্দিগ্ধ থাকিতে হইত। কাজেই মানুষ ছোট ছোট গোষ্ঠিবদ্ধ হইয়া বাস করিত, এবং আপন গোষ্ঠীর বাহিরে অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সন্দেহ ও নিষ্ঠুর হিংসার। তখন অন্য গোষ্ঠীর মানুষকে হত্যা করা, তাহার সম্পদ লুণ্ঠন করা অতিশয় শ্লাঘার বিষয় বলিয়াই গণ্য হইত। কিন্তু মানুষের সমাজজীবন যত সুশৃঙ্খল হইল, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত নিরাপত্তা বৃদ্ধি হইল পরস্পরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা নানা ব্যাপারেই মিলিত হইবার প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইল তখন, সহযোগিতা, প্রীতি, সহানুভূতি, দয়া, ক্ষমাপরায়ণতা ইত্যাদি গুণ ক্রমশঃ অধিক আদৃত হইতে লাগিল। এই সমস্ত সদ্‌গুণ বিকাশের মূলেও আছে, ব্যক্তিকে ব্যক্তি হিসাবে মর্যাদা দিতে হইবে, এই দৃষ্টিভঙ্গী।[৬]

(৩) সদ্‌গুণগুলির পরিধির বিস্তার—Wider scope of virtues
—মানব-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে আমরা দেখি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার। অসভ্য আদিম মানুষ আপনার ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বাহিরে আর কাহাকেও আপন বলিয়া ভাবিতে শিখে না। শিশু বা অশিক্ষিত মানুষ আপনার পরিবার বা গ্রামের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর বাহিরে তাহার ভালবাসা প্রসারিত করিয়া দিতে পারে না। কিন্তু মানুষের শিক্ষা যত মার্জিত হয়, নৈতিক বুদ্ধি যত পরিণত হয়, ততই তাহার সহানুভূতি ও প্রীতির গণ্ডী বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হয়। দুই শতাব্দী পূর্বে, মানুষের কাছে দেশপ্রেমই ছিল, শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণ। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগমনের সঙ্গে দেশের সঙ্গে দেশের দূরত্ব ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে—দ্রুত সংবাদ চলাচল, পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য যতই উন্নত হইতেছে, ততই মানুষের মনের বেড়াগুলিও একটি একটি করিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে, মানুষের নৈতিক চেতনা এক সমৃদ্ধতর বিরাট আত্মীয়তাবোধে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতেছে। আজ মানুষ নিজ দেশের গণ্ডী ছাড়াইয়া, সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে ভাই বলিয়া, পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করিতে পারে। এই এক

নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্তার

প্রীতি ও সহানুভূতির সম্পর্ক, যাহা আবদ্ধ ছিল পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে, তাহা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া বিশ্বমানব-প্রীতিতে পরিণত হয়

৬। The transition from the sterner to the gentler virtues is the transition from an unsympathetic to a sympathetic, from an inconsiderate to a considerate attitude towards the individual. Seth—A Study of Ethical Principles, Pp. 345-46

অত্যদ্ভুত আত্ম-আবিষ্কার। যে মানুষ আপনাকে বড-ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিযা রাখিযাছিল, আজ সে দেখিল তাহাব 'আত্ম' কত বড, সমগ্র বিশ্বে তাহারই প্রতিবিম্ব। যতদিন দৃষ্টি থাকে আচ্ছন্ন ততদিন—

'ভেবেছিনু আমাতে সে বাঁধা,
এ প্রাণেব যত হাসা কাঁদা
গণ্ডী দিযে মোব মাঝে
ঘিবেছে তাহাবে মোর সকল খেলায সব কাজে।
ভেবেছিনু সে আমারি আমি
আমাব জনম বেযে আমাব মবণে যাবে থামি।'[৭]

মানুষের অন্তবের 'নির্ঝবেব স্বপ্নভঙ্গ' হয—মানুষ সেদিন জানে নিজেকে বৃহৎ পটভূমিকায—চিবকালেব মানুষ, সকল দেশেব মানুষ তাহার আপন জন। কিন্তু ইহার জন্য সাধনা কবিতে হয, অন্তবেব আলো জ্বালিযা খুঁজিতে হয—

'দলের উপেক্ষিত আমি মানুষের মিলন ক্ষুধায ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায প্রাচীব নেই, পাহাবা নেই।
লোকালযের বাইরে পেযেছি আমাব নির্জনেব সঙ্গী
যাবা এসেছে ইতিহাসেব মহাযুগে
আলো নিযে, অস্ত্র নিযে, মহাবাণী নিযে।
তাবা বীব, তারা তপস্বী, তাবা মৃত্যুঞ্জয,
তারা আমাব অন্তবঙ্গ, আমাব স্ববর্ণ, আমাব স্বগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায আমি শুচি।
তাবা সত্যেব পথিক, জ্যোতিব সাধক, অমৃতেব অধিকারী।
মানুষকে গণ্ডিব মধ্যে হারিযেছি,
মিলেছে তার দেখা দেশবিদেশেব সকল সীমানা পেরিযে।
তাকে বলেছি হাত জোড ক'রে—
হে চিরকালেব মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের-তিলক-পরা সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।'[৮]

৭। ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিচিত্রা
৮। ববীন্দ্রনাথ—কবি আমি ওদেব দলে

কিন্তু মানুষের ভূমার মধ্যে আপনাকে আত্ম-আবিষ্কার—আত্মবিলোপ নয়। বহুর মধ্যেই দেশ কাল ছাড়াইয়া সর্বমানুষের মধ্যে আপনার আত্মপ্রতিষ্ঠা।[১]

ভূমার মধ্যেই মানুষ আপনার সত্যপরিচয় আবিষ্কার করে

আর এক দিক হইতেও কথাটিকে বুঝিতে পারি। মানুষ বিচ্ছিন্ন আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হয় না; প্রত্যেক কর্মের পিছনেই থাকে কতকগুলি আকাঙ্ক্ষার পরস্পর-সংবদ্ধ ঐক্য, যাহাকে আমরা পূর্বে 'আকাঙ্ক্ষার দিগ্বলয়' এই আখ্যা দিয়াছি। এই আকাঙ্ক্ষার দিগ্বলয় কোন ব্যক্তির মধ্যে সুশৃঙ্খলবদ্ধ ও তাহার পরিধি বহুবিস্তৃত, আবার অন্য ব্যক্তির মধ্যে আকাঙ্ক্ষাগুলি খুব সুসম্বদ্ধ নয় এবং বলয়টির পরিধিও বহুবিস্তৃত নয়। প্রথম ব্যক্তির চরিত্র সুগঠিত, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির চরিত্র সুগঠিত নয়। নৈতিক জীবনের উন্নতির ধারা এই সংকীর্ণ দিগ্বলয় হইতে বিস্তীর্ণ দিগ্বলয়ে আমরা লক্ষ্য করি। যিনি কেবল নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের ভূমি হইতে কর্ম করেন, তাঁহাকে আমরা কৃপণ ও স্বার্থপর বলিয়া নিন্দা করি। আর যিনি গান্ধীজীর মতো মানব-মঙ্গলের উচ্চ ভূমি হইতে (সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত আকাঙ্ক্ষার দিগ্বলয় হইতে) কর্ম করিতে অভ্যস্ত, তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান করি। ইহাও স্বীকার করি যে, মহত্তের সেই উচ্চতম বিকাশের দিকেই মানুষের নীতিবুদ্ধির গতি। কোথাও হয়তো এ আদর্শ সম্পূর্ণ সত্য হইয়া ওঠে নাই, কিন্তু ইহাকেই মানুষ নৈতিক জীবনের লক্ষ্যস্থল বলিয়া অন্তরে গ্রহণ করিয়াছে।

নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্রমগভীরতা—Deepening Moral Insight—নৈতিক চেতনার পরিধিই শুধু বিস্তৃততর হয় না, ইহা নূতন গভীরতা বা ব্যঞ্জনা লাভ করে। গ্রীন্ এই কথাটি নৈতিক সদ্‌গুণগুলি সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক্‌দের ও আধুনিক কালের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দ্বারা সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন। গ্রীক্‌রা সাহস ও ধৈর্য এই দুইটিকেই ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের মানুষের কাছে এই দুটি গুণের প্রয়োগের ক্ষেত্রও যেমন সংকীর্ণ ছিল, তাহাদের

যতই নৈতিক চেতনার উন্নতি হইবে, ততই দৃষ্টিভঙ্গী গভীরতর হইবে

১। As the individual comes to self-discovery he discovers his community of being and of life with his fellows, his citizenship in the city of humanity.···But moral life is always a personal life ··whether in his relations to others or to himself, the individual can never be called upon to negate himself as a moral personality. Ibid—Pp. 350-359

ব্যঞ্জনাও তেমন গভীর ছিল না। গ্রীক্‌দের কাছে সাহস নামক সদ্‌গুণ যুদ্ধক্ষেত্রের বিপদসঙ্কুল অবস্থা সম্পর্কেই প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল এবং সাহসকে শুধু দৈহিক গুণ বলিয়াই তাঁহারা দেখিয়াছেন। কিন্তু সমাজের মূঢ়তা ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে যে আত্মিক দৃঢ়তা ও মনোবল প্রয়োজন হয়, তাহার সহিত প্রাচীন গ্রীস দেশের মানুষদের প্রায় কোন পরিচয়ই ছিল না।

সাহস ও সংযম ইত্যাদি সদ্‌গুণকে মানুষ যে দৃষ্টিতে দেখিত, তাহা বর্তমানে নূতন তাৎপর্য লাভ করিয়াছে

কিন্তু আধুনিক মানুষের কাছে সেই আত্মিক দৃঢ়তা ও মনোবলের মূল্যই সমধিক। তেমনি সংযম। জিহ্বা ও উপস্থের সংযমের প্রয়োজনীয়তাই প্রাচীন গ্রীস দেশবাসী বুঝিতে পারিতেন এবং তাহাদের নিয়ন্ত্রণই ছিল তাঁহাদের নৈতিক আদর্শ। কিন্তু আধুনিক মানুষের কাছে সংযমের প্রয়োগেরক্ষেত্র ব্যাপকতর এবং ইহার তাৎপর্যও গভীরতর।

মানুষের আন্তরিক মর্যাদা সম্পর্কে বর্তমান যুগের মানুষ অনেক বেশী সচেতন, এবং আত্মসংযমের ক্ষেত্রে যেমন তাহাব ব্যাপকতর, তাহার তাৎপর্যও গভীরতর। গ্রীসেব বিত্তবান্‌ নাগরিকেরা তাহাদের ক্রীতদাসীদের যৌনাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির উপায় হিসাবে ব্যবহার করিতে বিবেকের কোন ধিক্কার বোধ করিত না। আজও অনিয়মিত যৌন সংসর্গ ঘটে, কিন্তু মানুষের নৈতিক চেতনা আজ এতটা বিকশিত যে, ইহাকে দেশের আইন 'অবৈধ' বলিয়া নিন্দা করে। অনুরূপভাবে পূর্বে পিতা সন্তানকে কঠিন দৈহিক পীডন দ্বারা শাসন করিলে, তাহা নিতান্ত সঙ্গত বলিয়াই মনে করা হইত। কিন্তু আধুনিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর আজ এত পরিবর্তন হইয়াছে যে, সন্তানদেরও মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত এবং আজ তাই দেশের আইনেই কঠিন দৈহিক পীডনমূলক শাস্তি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[১০]

মানুষ আজ নূতন মর্যাদা লাভ করিয়াছে

সদ্‌গুণগুলি সম্পর্কে বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী হইতেছে যে প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব মূল্য ও মর্যাদা আছে, প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ আত্মবিকাশের অধিকার আছে এবং সমস্ত বিধি সমস্ত প্রথার উদ্দেশ্য হইতেছে, ব্যক্তির নৈতিক জীবনের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করা। বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর ইহাও বৈশিষ্ট্য যে, কতগুলি পৃথক পৃথক কর্তব্যনির্দেশ অপেক্ষা, তাহাদের অন্তর্নিহিত নৈতিক সূত্র আবিষ্কারকেই অধিকতর মূল্যবান্‌ মনে করা হয়, এবং বিচার-বিবেচনা দ্বারা সেই সূত্র বা নৈতিক বিধির যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয় এবং সমস্ত

১০। Green—Prolegomena to Ethics, Bk. III, Ch. V, Pp, 284-88

কর্মকেই তাহার বাহিরের ফলাফল দ্বারা বিবেচনা না করিয়া, ব্যক্তির আন্তরিক শুচিতা দ্বারা তাহার নৈতিক মূল্য নিরূপণ করা হয়।[১১]

মানুষের নৈতিক চেতনার অবনতি হইয়াছে কি?—আমরা নৈতিক চেতনার ধারা অনুসরণ করিয়াছি এবং সেই প্রসঙ্গে প্রাচীন কালের মানুষের নীতিবোধের সহিত বর্তমান যুগের মানুষেব নীতিবোধের তুলনা করিয়াছি। তাহাতে এই প্রত্যয়ই প্রকাশ পাইয়াছে যে, আধুনিক কালে মানুষের নীতিবোধ অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু কথাটা কি সত্য? আমরা কি আমাদের পূর্বপুরুষদের তুলনায় অধিকতর নীতিবান্? রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের মহৎ ও গৌরবময় নৈতিক আদর্শ কি আমরা অতিক্রম করিয়া গিয়াছি? বরঞ্চ এই আক্ষেপই কি বহু মানুষের মুখে শোনা যায় না, যে যতই দিন যাইতেছে, ততই আমরা অধঃপতিত হইতেছি?

কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন কালেব মানুষেবা অধিকতব নীতিবান্ ছিলেন

মানুষের নীতিবোধ তাহার শিক্ষা ও পরিবেশ দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতীত কালে মানুষের জ্ঞান অনেক সীমাবদ্ধ ছিল, এবং জীবনযাত্রা একদিকে বর্তমান অপেক্ষা কঠিন ও বিপজ্জনক ছিল, আবার অন্য দিকে, তাহা অনেক কম জটিল ছিল। অতীতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার পথে অনেক বেশী বিঘ্ন ছিল, তাই সে যুগে ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্য, উপস্থিতবুদ্ধি ইত্যাদি যে সব গুণ, সবচেয়ে মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ তাহা হয় না। আজ মানুষের সমাজ অনেক বেশী সুসম্বদ্ধ, ও রাষ্ট্রের আইন অনেক বেশী নির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ। সুতরাং মানুষ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী নিরাপদ। কিন্তু

নূতন জ্ঞান, নূতন প্রযোজন দ্বাবা নীতিবোধ নূতন তাৎপর্য লাভ করিয়াছে

১১। The principle of the virtues, in fact, becomes universalized, and ceases to attach itself simply to this or that particular mode of manifestation. And along with this universalization there comes a deeper consciousness of the inwardness of the virtuous life. So long as the virtues are connected with particular modes of manifestation in social life, they seem to be little more than outer facts. When on the other hand, we see that the essence of the virtues consists in the application of a certain principle···we recognize at the same time that, their essence lies rather in the attitude of the individual heart than in the particular forms of outward action. MacKenzie—A Manual of Ethics Pp. 303-04

মানুষের অধিকারবোধ ও ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী তীক্ষ্ণতর হইয়াছে, সামাজিক দায়ও অনেক বেশী বিস্তৃততর হইয়াছে। পূর্বে নৈতিক আচরণ অনেকটাই ছিল প্রথা-অনুসরণ—নৈতিক বিধির বিশ্লেষণ এবং তাহার স্বরূপবিচার-নির্ভর ছিল না। কিন্তু আজ মানুষ অনেক বেশী সচেতন, তাহার নৈতিক দায়িত্ব অনেক বেশী। মানুষ পূর্বাপেক্ষা অধিক নীতিবান্ হইয়াছে কিনা সন্দেহ, তবে তাহার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইয়াছে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। পূর্বে যে ব্যবহার মানুষের নৈতিক চেতনাকে কোন নাড়া দিত না, আজ সে ব্যবহার স্পষ্ট ভাবে নিন্দিত। দাসত্ব প্রথার উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। আজ মানুষ সমস্ত নৈতিক আদর্শ-কেই বিচার করে, তাহাদের ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার স্পর্ধা প্রকাশ করে। আজ নীতিবোধ অন্ধ প্রথা-অনুসরণ নয়, তাহা নৈতিক আদর্শের সচেতন বিশ্লেষণ ও বিচারসাপেক্ষ। ইহা নিশ্চয়ই অধঃপতনের লক্ষণ নয়।

বর্তমানের মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটে নাই

মানুষের মানবিকতাবোধ এ সচেতন বিচারের ফলেই অনেক বেশী ব্যাপক, অনেক দূরবিস্তারী হইয়াছে। আজ সুদূর মেক্সিকোতে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে বহু মানুষের গৃহ বিধ্বস্ত হইলে, ভারতবর্ষে আমরা বোধ করি, আমাদেরও সেই দুর্গত মানুষদের সম্পর্কে কর্তব্য আছে। সহানুভূতির এই বিস্তার নিশ্চয়ই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, এই সহানুভূতি বুদ্ধির স্তরে, কিন্তু বাস্তবিক হৃদয়ের স্তরে পৌঁছায় নাই। পূর্বে প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীর জন্য যে সহানুভূতি ও তাহাদের প্রতি যে ভদ্রতা ছিল, তাহার পরিধি ছোট হইলেও, তাহা আন্তরিক ছিল। আজ আমাদের দূর দেশের মানুষদের প্রতিও সহানুভূতি প্রসারিত, কিন্তু তাহা নিতান্তই মৌখিক ও বুদ্ধিজাত। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আমরা আপনকে ভালবাসিতে ভুলিয়াছি, আর পরকে ভালবাসিবার ভান করিতেছি। এই সহানুভূতিকে তাই তাঁহারা telescopic sympathy বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

আজ মানুষের মর্যাদাবোধ, নারী ও শিশুর অধিকার, অক্ষমদের সম্পর্কে দায়িত্ব, অপরাধীদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী, বিদেশীদের প্রতি ন্যায়পরতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিক আদর্শ পুরাতন কাল হইতে উন্নততর, অনেক বেশী যুক্তি-সহ, কিন্তু সত্যই কি এই আদর্শগুলি আমাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিজীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে? আমরা কি পূর্বাপেক্ষা সৎ, হৃদয়বান্ ও অধিকতর

সদাচারী হইয়াছি? সম্ভবতঃ, সমগ্র ভাবে আমরা অধিকতর নীতিবান্ হই নাই। সম্ভবতঃ মনুষ্য চরিত্রের গুরুতর ও মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নাই, তাহা কখনও ঘটে না। কিন্তু মানুষ যদি আজ উচ্চতর নৈতিক আদর্শের কল্পনা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে ইহাও যুক্তিসঙ্গত ভাবে বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, বর্তমান কালের কিছু ব্যক্তি এই উচ্চতর আদর্শগুলি জীবনে রূপায়িত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে অন্ততঃ কিছুটা অগ্রগমন ও উন্নতি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে বর্তমান যুগে পাপ ও অধঃপতনের যে ভয়াবহ চিত্র আমাদের চোখে পড়ে, তাহা পূর্বকালে নিতান্ত বিরল ছিল। ইহার উত্তর হইল যে, মানুষ পশুর চেয়ে উন্নততর জীব বলিয়াই তাহার পতনও গভীরতর। পশু তো প্রকৃতির দাস, তাই বাস্তবিক পক্ষে পশুর কখনো পাপাচরণ হয় না। মানুষ বুদ্ধিমান্ বলিয়াই তাহার বুদ্ধিকে পাপের পথে নিয়োজিত করিয়া ভয়ঙ্করতম পাপে লিপ্ত হইতে পারে। মানুষের বুদ্ধিই অ্যাটম বোমা তৈয়ারী করিয়া হিরোসিমা ও নাগাসাকির নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিতে পারিয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা কি মানুষের ক্রমিক নৈতিক অধঃপতন সূচিত হয়? আজ কি আমরা ইহাও দেখি না যে সমস্ত পৃথিবীর বিবেক এই উন্মত্ততা ও ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে সরব হইয়া উঠিয়াছে? ইহা পূর্বে কখনও সম্ভব হইত না। সুতরাং মানুষের নৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশাবাদী হওয়ার প্রয়োজন নাই। মানুষ উচ্চতম নৈতিক চেতনার অধিকারী বলিয়াই তাহার অধঃপতন অনেক বেশী ভয়ঙ্কর—Corruptio optimi Pessima—শ্রেষ্ঠদের যখন বিকার ঘটে তখন তাহা সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। পশুর নৈতিক চেতনাই নাই, সুতরাং তাহার অধঃপতনও নাই।[১২] আধুনিক মানুষের শত অপূর্ণতা

হয়তো সমগ্রভাবে আমরা অধিকতর নীতিবান্ হই নাই, কিন্তু আজ আমরা উচ্চতর আদর্শ কল্পনা করিতে পারি

মানুষের নৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যের হেতু নাই

১২। Walt Whitman পশুদের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন,

They do not sweat and whine about their condition,
They do not lie awake in the dark and weep for their sins.
They do not make me sick discussing their duty to God;
Not one is dissatified, not one is demented
With the mania of owning things.
Not one kneels to another, nor to his that lived thousand of years ago,
Not one is respectable or unhappy over the whole earth.

সত্ত্বেও তাহার বিচারবুদ্ধিচালিত, অধিক-যন্ত্রণাদায়ী, তীক্ষ্ণতর নৈতিক চেতনার পরিবর্তে পূর্ববর্তী যুগের অন্ধ প্রথা-অনুসরণের সহজ নীতিবোধের যুগে প্রত্যাবর্তন করিতে রাজী হইবে না। ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা কাহারও পিছনে ঘুরাইয়া দেওয়ার সাধ্য নাই। জীবন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তাহার নৈতিক চেতনাও উন্নততর হইতেছে, এই আশাবাদ আত্মমর্যাদাশীল মানুষের জীবনে শক্তি ও সাহস যোগাইতেছে।[১৩]

Growth of Character—সমস্ত নৈতিক জীবনের শেষ উদ্দেশ্য, ব্যক্তিত্ব গঠন, চরিত্র গঠন। মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে বহু অন্ধ আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, প্রবণতা ও সম্ভাবনার বিশৃঙ্খল সমষ্টি মাত্র। যে উত্তরাধিকার নিয়া আমরা পৃথিবীতে আসি, তাহা প্রকৃতির দান। পরিবেশ এই জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর ক্রিয়া করে, যাহা ছিল কেবলমাত্র সম্ভাবনা, তাহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট রূপ নেয়। ইতর প্রাণীর জীবনেও এই ক্রমবিকাশ আছে, কিন্তু তাহা অনেকটা অন্ধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাত্র। প্রকৃতি ও পরিবেশের ঘাত প্রতিঘাতে পশুর জীবন গড়িয়া ওঠে। তাহারাই তাহাকে চালিত করে, গঠিত করে। কাজেই পশুর 'নিজস্ব' জীবন কিছু নাই। তাহার গঠিয়া উঠিবার মধ্যে, তাহার কৃতিত্ব সামান্যই। অবশ্য তাহারও ইচ্ছা-অনিচ্ছা একেবারে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে কখনও সংগ্রাম করে না। তাই পশুর সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে, প্রকৃতির শক্তিই তাহার মধ্য দিয়া ক্রিয়া করে, তাহাকে ইতস্ততঃ চালনা করে, তাহাকে একই ছাপে গড়িয়া তোলে—তাই সে প্রকৃতিরই সন্তান, প্রকৃতিরই দাস।[১৪] ইহার ঊর্ধ্বে যে উঠিতে পারে না, সে কখনও 'ব্যক্তিত্ব' লাভ করিতে পারে না। সৃষ্টির রহস্যে সে কাঁচা মালপত্র মাত্র, তাহার কোন অবদান নাই।

সমস্ত নৈতিক চেতনার উৎকর্ষের উদ্দেশ্য, চরিত্র গঠন ও চরিত্রের বিকাশ

মানুষ প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক নয়

মানবশিশু যখন পৃথিবীতে আসে, তখন সেও প্রায় পশুরই মত একান্তভাবে প্রকৃতিনির্ভর। তাহার ইন্দ্রিয়বোধ, ক্রিয়া, আবেগ-আকাঙ্ক্ষা অন্ধ, অস্পষ্ট, অসংযত, বিচ্ছিন্ন। কোন কেন্দ্রীয় ঐক্যের বন্ধনের সূত্র তাহার জীবনে তখনো ফুটিয়া ওঠে নাই। সেও

১৩। MacKenzie—A Manual of Ethics, Pp. 586-88

১৪। He is nature's offspring, veritable "part of nature" which moves in him and sways him hither & thither—he is the "slave of nature."

S. S. Laurie—Ethica, P. 22

প্রায় প্রকৃতির হাতে অসহায় ক্রীড়নক। কিন্তু না, সেই শৈশবেও আছে তাহার মাঝে 'ইচ্ছা'র অস্ফুট স্ফুলিঙ্গ—আছে ব্যক্তিত্বের অনির্দেশ্যতা।

কিন্তু এই প্রশস্তি সত্ত্বেও আমরা কি পশুব বুদ্ধিহীন জীবনে ফিরিয়া যাইতে রাজী হইব? না কি আমাদের উন্নততর নীতিবুদ্ধির ফল হিসাবে তীক্ষ্ণ বিবেকের ভৎর্সনা ও জীবনযন্ত্রণা ভোগ করাকেই অধিকতর শ্রেয় বলিয়া জ্ঞান করিব?

লীলাময় বিধাতাপুরুষ কৌতুকের বশেই বুঝি বা, মানব শিশুরূপ মাংসপিণ্ডে এই 'ইচ্ছা'র স্ফুলিঙ্গ যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। হয়তো তিনিও জানিতেন না, তিনি প্রকৃতির মধ্যে কি বিপ্লবের বীজ বপন করিতেছেন! তিনিও বুঝি জানিতেন না এই 'ইচ্ছা' ও বুদ্ধিব বলেই মানুষ প্রকৃতিব শাসনকে অস্বীকার করিবে। সৃষ্টির বুকে আলোড়ন আনিবে, যাহা নিয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া সে নূতন গুণ, নূতন 'মূল্য' সৃষ্টি করিবে। প্রকৃতি সৃষ্টি কবিয়াছিল 'প্রাণী'—যে তাহাব শাসন মানিয়া চলে, যে তাহারই সুরে সুর মিলাইয়া, (ল্যরীব ভাষায—'attuent') তাহারি ছন্দে তাল মিলাইয়া চলে। কিন্তু মানব শিশু নিজ উদ্যমে হইয়া উঠিল 'অবাধ্য সন্তান'—Enfant Terrible, 'হইয়া উঠিল' প্রবল ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষ। সে গর্ব করিয়া বিধাতাকে বলিল,

সে বিচাবও ইচ্ছা দ্বাবা নূতন মূল্য সৃষ্টি করে

পাখীরে দিয়াছো গান,
গায় সেই গান।
তার বেশী করে না সে দান।
আমারে দিয়াছো স্বর
তার বেশী করি আমি দান
আমি গাই গান।[১৫]

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গীতাঞ্জলি
এই সঙ্গে তুলনীয় কবি Watson এব The Dream of Man

This is my loftiest greatness
To have been born so low.
Greater than Thou, the ungrowing
Am I that forever grow.
From glory to rise unto glory
Is mine, who have risen from gloom.
I doubt if thou knew'st at my making
How near to Thy throne I should climb,
Over the mountainous slopes of the ages
And the conquered peaks of time.

মানুষ শুধু প্রাণী নয়, সে ব্যক্তি—সে বুদ্ধি, ইচ্ছা, অনুভূতি, সংকল্পের সংহত কেন্দ্র। কিন্তু ব্যক্তিত্ব চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা প্রকৃতির অকুণ্ঠ দান নয়।

আমরা যে নৈতিক জীবনের কথা এতক্ষণ বলিয়াছি—তাহা এই ব্যক্তিত্ব গঠনেরই বিচিত্র ও বৈপ্লবিক ইতিহাস। চরিত্র হইতেছে নৈতিক উদ্যমের শেষ ফল,—যাহা ব্যক্তি, নিজ চেষ্টায়, সচেতন ইচ্ছা দ্বারা, বুদ্ধিবিচার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আদর্শের অনুসরণে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া তোলে। ইহা আকস্মিক নয়, যান্ত্রিক অনুকরণের ফল নয়, ইহা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া, নীতিবান্ মানুষের অনলস অনুশীলন দ্বারা লব্ধ। চরিত্র হইল সেই ইচ্ছা-শক্তির স্থির কেন্দ্র, যাহা পরস্পর-বিরোধী, অসংযত, তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে সংহত করিয়া, সদভ্যাসে পরিণত করে। অথবা বহু চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত চিন্তা, বাক্য ও কর্মের সুসংযত সদভ্যাস ও স্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গীকেই বলিব চরিত্র। ইহা আয়ত্ত করা ক্লেশসাধ্য, কিন্তু আয়ত্ত হইলে ইহা সমস্ত নৈতিক ক্রিয়াকে সহজ করিয়া দেয়।[১৬] নৈতিক জীবন গঠনে আলস্যের অবকাশ নাই। এই অনন্ত নৈতিক জীবনে, উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ মানুষকে হাতছানি দিয়া ডাকে। এই পথ 'ক্ষুরস্য ধারা ইব' দুর্গম,—অসতর্ক হইলেই এখানে পতনের আশঙ্কা। তবুও যে এ ডাক শুনিয়াছে—আর মানুষ হইলেই এক ডাক না শুনিয়া উপায় নাই—সে জানে পথে পথে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে বহু কণ্টক, বহু দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, তবু তাহাকেও সেই আলোর অভিসারে যাত্রা করিতেই হইবে। ব্যক্তিত্ব চরিত্র গঠনের তাই শেষ নাই। কিন্তু কঠিন পরীক্ষা, বহু পতন, বহু ক্লেশকর অভ্যাসের দ্বারা, নীতির পথে বিচরণ অভ্যস্ত হয়। যাঁহার কাছে এই নীতির পথে চলা প্রীতিপ্রদ হইয়াছে, তাঁহাকেই বলি চরিত্রবান্। ইহা তাঁহার 'দ্বিতীয় স্বভাবে' তখন পরিণত হয়।[১৭] তখন সত্যকথন, সত্যচিন্তন, সত্যকর্ম তাঁহার কাছে সহজ হয়। কিন্তু এই 'সহজ'

নৈতিক চেতনার ক্রম-বিকাশের শেষ ফল সুগঠিত চরিত্র

চরিত্র স্থাণু নয় বিকাশশীল

চরিত্র অপেক্ষাকৃত স্থায়ী মানসিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভ্যাস

১৬। Character is itself a habit of will and habit is always easy. Virtue is not virtue until it has become pleasant. Seth—A Study of Moral Principles, P. 51

১৭। The honest man is the man to whom it would be difficult and unnatural, to act dishonestly, the man in whom honesty is a 'second nature.' Seth—A Study of Moral Principles, P. 52

হওয়া তো সহজ নয়—Before virtue the gods have put toil and effort. যতক্ষণ মানুষ নীতির ভূমিতে অবস্থান করে, ততদিন এই সংগ্রাম ও নিয়ত উদ্যমের শেষ নাই।

নীতির পরিণতি ধর্মে

কিন্তু মানুষ এই 'অহং' কার ও পুরুষকারের বিষম বোঝা তো চিরদিন বহিতে পারে না। তাহার যাত্রার শেষে তাই আনন্দিত মনে সে তাহার সমস্ত কর্ম, সমস্ত উদ্যম, নৈতিক জীবনের সমস্ত ফসল সেই ভবের কাণ্ডারীর পায়ে ঢালিয়া দিয়া বলে,

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ, যা-কিছু আছিল মোর—
যত শোভা, যত গান, যত প্রাণ, জাগরণ ঘুমঘোর।
শিথিল হয়েছে বাহু বন্ধন
মদিরাবিহীন মম চুম্বন—
জীবন কুঞ্জে অভিসার নিশা আজি কি হয়েছে ভোর?
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা
আনো নবরূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহো আরবার চির পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবনডোরে।[১৮]

জীবনদেবতার কাছে আত্মোৎসর্গ

এই নূতন জীবনেরই নাম ধর্ম—নৈতিক জীবনের এখানেই পরিসমাপ্তি। এখন আর শুধু 'আমি' নয়—এবার 'তুমি আমি একাকার।'

সংক্ষিপ্তসার

বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে বিরুদ্ধতা আছে। বাস্তব হইল যাহা আছে, যাহা ঘটিতেছে। কিন্তু আদর্শ হইল যাহা এখনও সত্য হইয়া উঠে নাই, যাহা বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবের মধ্যেই আছে আদর্শের সম্ভাবনা আদর্শের দিকে প্রবণতা। আদর্শ সর্বদা উচ্চতর ভূমিতে আকর্ষণ করে, কিন্তু ইহা কখনও সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় না। আদর্শের অগ্রগমনের শেষ নাই।

হারবার্ট স্পেন্সার নীতির ক্ষেত্রেও ক্রমবিকাশের সূত্র প্রয়োগ করিয়া নৈতিক আদর্শ ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে আদিম যুগে মানুষের নৈতিক চেতনার উন্মেষ হয় নাই। সে গোষ্ঠীর প্রথা আচার দিয়া নিজ আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিত। এ নিয়ন্ত্রণ ছিল,

১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবনদেবতা।

বাহিরের নিয়ন্ত্রণ। ব্যক্তির বিচার বুদ্ধি তখনও যথেষ্ট বিকশিত হয় নাই এবং ব্যক্তি তখনও নিজেকে গোষ্ঠী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে শেখে নাই এবং আত্মমর্যাদা বোধ তখনও জাগ্রত হয় নাই। ক্রমে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সে নিজেকে গোষ্ঠী হইতে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন সত্তা হিসাবে মর্যাদা করিতে শিখে এবং নিজ আচরণ অন্তরে বিবেকের আদেশ দ্বারা (অথবা নৈতিক বিধি দ্বারা) নিয়ন্ত্রণ করিতে শেখে। তখনই বলা যায়, তাহার নৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটিয়াছে। তাঁহার বিশ্লেষণ মূলতঃ সত্য, তবে নীতিহীনতা হইতে নীতিচেতনার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার এ মত গ্রহণীয় নয়। তিনি অস্পষ্ট আরম্ভ দ্বারা পরিণত শেষকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু জীবন ও নীতির ক্ষেত্রে পরিণত শেষ উদ্দেশ্য দ্বারাই তাহার অস্পষ্ট আরম্ভের তাৎপর্য ব্যাখ্যা সঙ্গত।

নৈতিক আদর্শের বিকাশ বা উন্নয়নের মূল সূত্রটি হইল ব্যক্তিত্বের ক্রম আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা। সভ্যতার আদিম স্তরে গোষ্ঠীও ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয় না, ব্যক্তিও নিজেকে গোষ্ঠী হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে শেখেনা। তাহার নৈতিক চেতনা তখনও অপরিণত। তাহার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় গোষ্ঠীর প্রথা আচার দ্বারা। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে ব্যক্তি নিজেকে স্বতন্ত্র নৈতিকসত্তা হিসাবে মর্যাদা দিতে শিখে। স্যার হেনরী মেইন্ আইনের ভাষায় এই অগ্রসরণকে বলিয়াছেন a movement from status to contract. সমাজ যতই উন্নত হয় সমাজে ব্যক্তির স্থান ও কর্তব্য ততই স্বেচ্ছাকৃত চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সভ্যতার প্রথম স্তরে ব্যক্তি গোষ্ঠীর প্রথা আচারকেই অনুসরণ করে। দ্বিতীয় স্তরে সুসংহত রাষ্ট্রের আইন-কানুনই হয় ব্যক্তির আচরণের নিয়ন্ত্রক। সর্বশেষ স্তরে ব্যক্তি নিজ বিচার বুদ্ধিদ্বারা নৈতিক বিধি আবিষ্কার করে এবং সচেতনভাবে তাহা অনুসরণ করে। তখন সে নিজ কর্মের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে এবং ব্যক্তি হিসাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করে।

সেথ্ নৈতিক আদর্শের ক্রমবিকাশের তিনটি সূত্র লক্ষ্য করিয়াছেন। (১) মানুষের আচরণকে বাহিরের দিক হইতে বিচার না করিয়া ক্রমশঃ অন্তরের দিক হইতে বিচার করা হইতে থাকে। (২) মানুষের সভ্যতার আদিতে শৌর্যবীর্য ইত্যাদি কঠোর গুণগুলিই অধিকতর মর্যাদা লাভ করে। তৎকালের জীবনের অনিরাপত্তা ও নৃশংসতার যুগে কঠোর গুণগুলিরই অধিক প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সমাজের সংহতি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির সঙ্গে দয়া, মায়া, স্নেহ, সহানুভূতি ইত্যাদি মানবিক গুণই প্রশংসিত হয়।

(৩) যতই সভ্যতার বিকাশ হইতে থাকে, ততই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্তার ঘটিতে থাকে। প্রথমে, মানুষ আপনার পরিবারের মানুষদেরই ভালবাসে, ক্রমে সে ভালবাসার গণ্ডী ছড়াইয়া যায়—নিজ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে, তাহার পর নিজ গ্রামে। ক্রমে মানুষ বৃহৎ দেশকে ভালবাসিতে শিখে সর্বশেষে বিশ্বজগতের সমস্ত প্রাণীর প্রতিই আত্মীয়তার সম্বন্ধ বিস্তৃত হয়।

এই নৈতিক চেতনার অগ্রগমনের আর একটি লক্ষণ যে, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ গভীরতর হইতে থাকে এবং এক নূতন তাৎপর্য লাভ করে। পূর্বে সংযম, বা সাহস ইত্যাদি সদগুণকে নিতান্তই দৈহিক গুণ হিসাবেই দেখা হইবে। কিন্তু বর্তমান কালে এই গুণগুলির মানসিক ও আন্তরিক দিককে মানুষ অধিকতর মর্যাদা দিতেছে। এই গুণগুলি গভীরতর আত্মিক তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। বর্তমানে মানুষের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর আর একদিকেও পরিবর্তন ঘটিতেছে। পূর্বে পৃথক পৃথক কর্তব্য নির্দেশই ছিল নীতিশাস্ত্রের কাজ কিন্তু বর্তমানে নৈতিক বিধি বা আদর্শ নিয়াই ও তাহার বিচারই নীতিশাস্ত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান

অধিকার করে। ইহাও লক্ষণীয় মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্রমেই মানুষ এ দাবি করিতেছে যে, নীতি, সমাজ, ধর্ম সবই মানুষের হিতের জন্য।

হতাশাবাদীরা অনেক সময় বলেন পূর্বাপেক্ষা মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে, নিষ্ঠুরতা মিথ্যাচার, ভোগাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াছে। সমগ্রভাবে মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে এই সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ সত্য নয়। ইহা অবশ্যই সত্য যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও সমাজের গঠনের প্রভূত পরিবর্তনের ফলে, মানুষের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মানেরও বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন মানুষ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সংশয়ী ও সচেতনভাবে সমস্ত প্রথা আচার যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ ও বিচার করিবার পক্ষপাতী এবং পূর্বের অনেক প্রথা আচার, আদর্শ, বর্তমানের দৃষ্টিতে মূল্য হারাইয়াছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, আজ মানুষ অনেক উচ্চতর নৈতিক আদর্শের স্বপ্ন দেখে এবং অনেক উচ্চতর আদর্শের মাপকাঠিতে মানুষকে বিচারের দাবি করে। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের নৈতিক চেতনা লুপ্ত হয় না, তাহার মূল্যবোধ পরিবর্তিত হইয়াছে। তাই মানুষ সম্বন্ধে নৈরাশ্যের হেতু নাই।

সমস্ত নৈতিক চেতনার বিকাশের উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন ও চরিত্রের বিকাশ। চরিত্র প্রকৃতিদত্ত নয়—উদ্যম ও অনুশীলন দ্বারা কষ্টার্জিত। মানুষ সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে নূতন মূল্য সৃষ্টির জন্য। ইহা বিশ্লেষণ ও বিচার সাপেক্ষ এবং উদ্যম সাপেক্ষ। চরিত্র গঠন তাই বিকাশমান ক্রিয়া। কিন্তু স্থির আদর্শ অনুসরণ করিয়া, অনুশীলন ও অভ্যাস দ্বারা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণের অভ্যাস সৃষ্টি হইলে, তখনই বলা যায় যে চরিত্র গঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যক্তির 'দ্বিতীয় স্বভাবে' পরিণত হওয়া চাই। যাহার চরিত্র গঠিত হইয়াছে সৎকর্ম তাহার পক্ষে সহজ ও আনন্দময়।

নীতি ও ধর্মের মধ্য আপাতবিরোধ আছে—নৈতিক জীবন হইল সংগ্রাম ও উদ্যম। ধর্ম হইল আত্মসমর্পন ও শান্তি। কিন্তু নীতি না হইলে ধর্ম হয় না, আবার নৈতিক সংগ্রামও মানুষের জীবনের শেষ পরিণতি হইতে পারে না। সংগ্রামের অবসানে ধর্মের শান্তিময় আশ্রয় জীবনদেবতার কাছে আত্মোৎসর্গে।

Questions

1. Show how Herbert spencer sought to apply the principle of evolution to the field of moral consciousness. Do you agree with his view? Give reasons for your answer.

2. The evolution of morals is marked by "the progressive discovery of the individual"—Elucidate the statement with your comments.

3. Indicate some of the main characteristics of the process of moral progress. Which of these characteristics seem to you to be the most significant and why?

4. Is the human race morally progressing? Give reasons for your answer.

5. What is character? What is the meaning of the term growth of character? What are the characteristics of this growth?